ছোটগল্প

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৩৬৯

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও তপন প্রিন্টিং, ৪০/১/এ, আর. এন. দাস রোড
কলিকাতা ৭০০০৩১ হইতে তপনকুমার সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

দুই প্রিয় দম্পতি

শ্রীপিনাকী চক্রবর্তী

শ্রীমতী মন্দিরা চক্রবর্তী

এবং

শ্রীঅমিত মৌলিক

শ্রীমতী বিউটি মৌলিক

বাগার্থবিবসম্পৃক্তযুগলেষু—

সূচীপত্র

সূচীপত্র

ছোটগল্প

নেশা

অভিরাম বলল—না, আপনি অন্যত্র চেষ্টা করে দেখুন।

দশ আঙুলে আটখানা আংটি পরা সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে লোকটা কেমন একটু অবাক হয়ে তাকাল—যদি ডবল দিই? চার হাজার?

—টাকার কথা হচ্ছে না। কাজটা আমি করব না।

মানুষ চরিয়ে খায় বলে লোকটার মনে গর্ব আছে। শহরে কত খাতির তার, সব জায়গায় সম্মান আর খাতির পায়। মুখের ওপর 'না' শোনার অভ্যেস নেই একেবারেই। সে বুদ্ধিমানের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল—নাঃ, তোমাকে নিয়ে আর পাবা গেল না। রেট বাড়িয়েছ তা বললেই পারতে। কত দিতে হবে?

অভিরাম স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল—আপনি বড্ড লোকের সময় নষ্ট করেন। আপনার এখন অন্য কোনো কাজ নেই?

অসহ্য অপমানে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বালা করলেও কিছু করবার নেই। যারা অন্যায় করে তাদের অপমানবোধ থাকলে চলে না। লোকটা যেন অভিরামের রসিকতা বুঝতে পেরেছে এমনভাবে বলল—তুমি কি তাহলে কাজ ছেড়ে দিচ্ছ?

—তাই।

—এরপর খাবে কি? লটারি পেয়েছ নাকি? আর নীতির কথাই যদি বল, তাহলে মাখন সর্দারের আর বেঁচে থাকা উচিত নয়। ব্যাটা কী পাপ না করেছে বল তো? এখন আমার পেছনে লেগেছে—

চৌকো প্লাস্টিকের বাক্স থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল অভিরাম, বলল—নিজে থেকে লাগে নি, মাখন সর্দারের কী স্বার্থ আছে এতে? যে তাকে টাকা দিয়ে লাগিয়েছে সে লোককে আপনি ভাল করে চেনেন। যদি নিকেশ করতে হয় তাকেই করুন গিয়ে—

তারপর একটু থেমে বলল—যদি হিম্মত থাকে।

লোকটা এ বক্রোক্তিও গায়ে মাখল না। তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছে।—সে তো খুব ভাল। পারবে তুমি? ছ'হাজার পর্যন্ত উঠতে পারি—

পাশে রাখা কোদাল হাতে উঠে দাঁড়াল অভিরাম।—আমি এখন বাগান কোপাবো, কাল লঙ্কার চারা লাগাতে হবে। আপনি আসুন—

লোকটা এবার সহজভাবেই উঠে দাঁড়াল, হালকা চালে বলল—আমাকে ফিরিয়ে ভাল করলে না অভিরাম। কাজটা করে দিলেই পারতে।

এবার অভিরাম সত্যিই হাসল, বলল—ভয় দেখাচ্ছেন নাকি? ওতে লাভ নেই, এ তল্লাটে যারা নিকাশী কাজ করে তারা আমার গায়ে কেউ হাত দেবে না—আমার কাছেই সবার শিক্ষা কিনা। আমরা যারা এইসব নোংরা কাজ করি, আমাদের মধ্যে বেশ একটা ভালবাসা আছে—আপনাদের মত নয়। আমরা কেউ কারো সঙ্গে বেইমানি করি না। তাছাড়া যেদিন এ কাজে নেমেছি, মরার ভয় ছেড়েই নেমেছি।

বিড়িতে শেষ দুটো সুখটান দিয়ে বলল—যান, বাড়ি যান—

অভিরামরা দু'পুরুষে এই কাজ করছে। বাপকে বেশিদিন পায় নি, কিন্তু বাপের সব গুণগুলো পেয়েছিল। নিখুঁত সময়-বোধ, শক্ত স্নায়ু এবং কোন্ কাজটা করবে আর কোন্‌টা করবে না এই বোধ ছাড়াও অন্য একটা গুণ বিশেষ প্রয়োজন, সেটা হল উদাসীনতা। অভিরাম মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে এটা একরকম ব্যবসা। অন্য ব্যবসায় মূলধন—টাকা। এই ব্যবসায় মূলধন—সাহস। একজনকে খতম করবার জন্য আর একজন তাকে টাকা দিচ্ছে, এতে মনের দিক দিয়ে তার জড়িয়ে পড়বার কোনো কারণ নেই। যাকে সরাতে হবে, দিনের পর দিন তার গতিবিধি লক্ষ্য করে, অভ্যেসগুলো বিচার করে, চক্রাকারে উড়তে উড়তে বাজপাখি যেমন তার বৃত্তকে ক্রমশ ছোট করে আনে, তারপর লাফিয়ে পড়ে শিকারের ওপর—তেমনি অভিরাম বহু পরিশ্রম আর পর্যবেক্ষণের ফল হিসেবে যখন শিকারকে হাতের মুঠোয় পায়, তখন তার মনে নিষ্ঠুরতা নেই, হিংসা নেই, ক্রোধ নেই—আছে শুধু পরিষ্কারভাবে কাজ শেষ করার চমৎকার আনন্দ। প্রতিটি হত্যার পর তার মনে আশ্চর্য প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। কাজ শেষ হতে দেরি হলে, কিম্বা বাধা পড়লে ভয়ানক বিরক্তি জন্মায়। জীবনের দ্বিতীয় কি তৃতীয় কাজের কথা এখনো মনে পড়ে। তখন নতুন হাত, ভোজালি ঠিকমত চালাতে পারে নি, কচুবনের পাশে লোকটা পড়ে গোঙাচ্ছিল। কাটা জায়গা দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে জমি, তবু ব্যাটা মরে না। একমুঠো ঘাস ছিঁড়ে ভোজালি মুছতে মুছতে নিস্পৃহভাবে দেখছিল অভিরাম। সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হতে বড্ড দেরি হচ্ছে দেখে মজুমদারদের ভাঙা ভিতের থেকে একখানা থান ইঁট এনে তাই দিয়ে লোকটার মাথা থেঁতলে দেয় সে। এইখানেই উদাসীনতার কথা এসে যায়। থান ইঁটের একটা ঘা-ই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু দেখা যাচ্ছে লোকটার কড়া জান, যদি আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে নাড়িভুঁড়ি হাতে নিয়ে হাসপাতালে গিয়ে হাজির হয়? এমন কাণ্ডের কথা সম-ব্যবসায়ীদের কাছে শুনেছে অভিরাম। তাতে অবশ্য তার কিছু আসে যায় না, কারণ অন্ধকারে আচমকা পেছন থেকে মুখ চেপে ধরে ছুরি চালিয়েছিল সে। লোকটা তার মুখ দেখতে পায় নি, কাজেই তার নাম ফাঁস করে দেবার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। এমন ঘটলে কাজটা সুচারু-ভাবে নিষ্পন্ন হবে না, যে কাজের জন্য সে টাকা নিয়েছে। কাজেই খুব শান্তভাবে উবু হয়ে বসে আট-দশটা ঘা দিয়ে সন্দেহাতীত ভাবে কাজ শেষ করল অভিরাম।

তারপর চরখালির শুকনো বিলের ওপর দিয়ে, ঘুমন্ত গাজিপাড়ার পাশ দিয়ে, হাতিয়াবেড়ার গোভাগাড় বাঁয়ে রেখে নিজের নিঃসঙ্গ ঝুপড়িতে ফিরে খাস জনতা স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল বসাল সে। অভিরাম, খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, মদ খায় না। অন্য কোনো নেশাও করে না। কিন্তু মনে খুব আনন্দ হলে তক্ষুণি তার চা খাওয়া চাই। দোকানের চায়ে তার পোষায় না। পোণে একসের জল ধরে এমন একটা গ্লাসভর্তি চা প্রয়োজন। সে চা তৈরি হবে শুধু মোষের দুধ দিয়ে। দুধ ফোটানোর সময় তাতে ফেলতে হবে ছোট এলাচ, তেজপাতা আর দারচিনি। যেদিন কাজ হবে সেদিন রাতে ব্যবহারের জন্য অভিরাম আগে থেকেই দুধ এনে রেখে দেয়। অত রাত্তিরে কোথাও কি পাওয়া সম্ভব? অথচ প্রতিবার হত্যার পর মনে যে অদ্ভুত আনন্দ হয় সেটাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে

চা চা-ই-ই চাই।

এই ঝুপড়িতে অনেকদিনের বাস অভিরামের। তার বৌ আছে, ছেলে আছে —তারা সব থাকে দেশের বাড়িতে। এখানে তারা কখনো আসে না। মেয়ের বিয়ে দিয়েছে বছরপাঁচেক আগে, জামাই কলকাতা-শিলিগুড়ি লাইনে ভারী ট্রাক চালায়। শ্বশুরের প্রকৃত ব্যবসা সম্বন্ধে কিছু জানে কিনা বোঝা যায় না, তবে এ নিয়ে সে কোনো কথা বলে না বা প্রশ্ন করে না। দেশে যে টাকা পাঠায় অভিরাম, তা দিয়ে বৌয়ের নামে বেশ কিছু জমি কেনা হয়েছে। ছেলে সে জমি চাষ করে। সম্প্রতি মুরগির চাষ করবে বলে তোড়জোড় করছে। ভাল। দু'পুরুষ এইভাবে গেল। ছেলেকে এ ব্যবসায়ে এনে লাভ নেই। আজকাল দিন বদলেছে কাজে ঝুঁকিও আগের চেয়ে বেশি। চাষের কাজ করে করে ছেলেটাও কেমন নরম ধাতের হয়ে পড়েছে, ভোজালি চালাতে পারবে বলে বিশ্বাস হয় না। যাক, সে যা রেখে যাচ্ছে বুদ্ধি করে খেলে ছেলের কষ্ট হবে না।

ঘন ঘন কাজ নেয় না অভিরাম। লোভ করলেই মৃত্যু। নেহাৎ চেনা লোকের সুপারিশ নিয়ে না এলে সে কাজ হাতে নেয় না। ডবল টাকা কবুল করলেও অচেনা মানুষের কাজ নেবে না অভিরাম। চারদিকে কত শত্রু, কে কোথায় ফাঁদ পেতে রেখেছে কে জানে? বছরে খুব বেশি হলে পাঁচ-ছ'টা কাজ করে সে। তার দর চড়া বলে, সামান্য কাজেই পুষিয়ে যায়। যারা আসে তাদের গলায় কাঁটা বিঁধে আছে, চড়া দর শুনে পিছিয়ে গেলে তাদের চলে না। আর অভিরামের সততার খ্যাতি আছে, টাকা দিলে কাজ হবেই। বাকি সময়টা অভিরাম পাম্প সেট সারানো, গ্যাস ওয়েল্ডিং ইত্যাদি কাজ করে।

শেষ বড় কাজ সে করেছে মাস দুই আগে। কথাবার্তা হবার দিনটার কথা এখনো ছবির মত ভাসছে চোখের সামনে।

সারাদিন আকাশ মেঘলা, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যে থেকে বেশ ঝুপঝুপ করে নামল। গোভাগাড়ের দিক থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে। বড় একগ্লাস চা বানিয়ে দাওয়ায় বসে খেল অভিরাম। স্টেশন চত্বরের হোটেল থেকে মাটির ভাঁড়ে কষা মাংস আর খবরের কাগজে জড়িয়ে আটখানা রুটি নিয়ে এসেছিল। সেগুলো সাবাড় করে একলোটা জল খেয়ে শোবার উদ্যোগ করতে লাগল অভিরাম। বিছানার পাশে শুইয়ে রাখল তেল চুকচুকে লাঠিটা, বালিশের তলায় গুঁজে রাখল ধারালো ভোজালি। তার ঘুম খুব হাল্কা, এ দুটো জিনিস হাতের কাছে থাকলে দশজন মানুষেও তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। একটু আগে চরখালির বিলের ওপর দিয়ে দশটার লোকাল যাবার শব্দ পাওয়া গিয়েছে। আর রাত না করে এবার শুয়ে পড়াই ভাল।

দরজায় টকটক আওয়াজ।

নিমেষে ঘুমের চটকা কেটে গেল, লাঠি উঠে এল হাতে। সমস্ত দেহ সম্ভাবিত বিপদের আশঙ্কায় টানটান—প্রস্তুত।

বাইরে অঝোরধারে বৃষ্টির শব্দ। দরজায় আওয়াজটা কি ভুল শুনেছে?

না, ওই তো আবার টকটক শব্দ।

—কে ?

দরজা খোলো।

একহাতে লাঠি ধরে অন্যহাতে বালিশের তলা থেকে ভোজালি বের করে নিল অভিরাম। বলল—এখন দরজা খোলা যাবে না, ভাগো !

—আমি লাল সর্দারের কাছ থেকে আসছি। নিশানি আছে।

লাল সর্দার ! অভিরামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে, এই জেলার উত্তর অংশে তার আধিপত্য।

বিছানা থেকে উঠে দরজার কাছে যায় অভিরাম, বলে—সঙ্গে টর্চ আছে ?

—আছে।

—হাতে নিশানি নিয়ে তার ওপর টর্চ ফেল—

দরজার ফুটোয় চোখ রাখে সে। হ্যাঁ, টর্চের উজ্জ্বল আলোকবৃত্তের নিচে হাতের তালুতে চকচক করছে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা ধাতব পদার্থ। ভাল করে তাকালে বোঝা যায়—অর্ধেক করে কাটা একখানা রুপোর টাকা। লাল সর্দারের দলের চিহ্ন।

দরজা খুলে আগন্তুককে ভেতরে এনে বসাল অভিরাম। চটের থলে পেতে।

—কি চাই ?

গায়ের পলিথিনের বর্ষাতি খুলে পাশে রেখে লোকটা বলল—একজনকে সরাতে হবে। লাল সর্দার তোমার কাছে পাঠাল।

সে নিজেই তো কাজটা করতে পারত, আমার কাছে কেন ?

কাজটা এদিকের, তার এলাকার বাইরে।

—টাকাটা সবটা আগাম চাই। কাজ হবে পনেরোদিন পরে।

—টাকা পাবে। আজই দিয়ে যাচ্ছি—

আগন্তুক পকেট থেকে নোটের তাড়া বের করে অভিরামের হাতে দিতে গেল, অভিরাম বলল—দাঁড়াও, টাকায় আগে হাত দেব না—

লোকটা অবাক হয়ে বলল—তার মানে ? টাকা নেবে না ?

—নেব। কিন্তু তার আগে কাজ আছে। এসো আমার সঙ্গে।

ঘরের কোণে ঠাকুরের আসনের সামনে দেশলাই ঠুকে প্রদীপ জ্বালাল অভিরাম। বলল—একটা কাঁচা টাকা দাও—

বিস্মিত আগন্তুক পকেট হাতড়ে একখানা একটাকার মুদ্রা বের করে দিলে। ফুলে আর মালায় ঢাকা ছোট কালী প্রতিমার পায়ের কাছে রাখা কৌটো থেকে তেল-সিঁদুর নিয়ে টাকাটায় মাখালো অভিরাম, আগন্তুকের হাতে দিয়ে বলল—ধরো। এগিয়ে এসো, এটা মা কালীর পায়ে ছুঁইয়ে রেখে আমি যা বলছি বলে যাও—

লোকটা তাই করল। অভিরাম বলল—বলো, হে মা কালী, আমি অমুকচন্দ্র অমুক আজ মজুরির বিনিময়ে অমুকচন্দ্র অমুককে খতম করবার জন্য অভিরাম পাড়ুইকে নিয়োগ করছি। এ কাজের যাবতীয় পাপ আমার হবে, অভিরামের নয়। সে টাকা পেয়ে আমার আজ্ঞা পালন করছে মাত্র।

আগন্তুক কলের পুতুলের মত কথাগুলো বলে গেল। তারপর বাকি রাতটুকু

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিকারের নাম, স্বভাব, বন্ধুবান্ধব, আড্ডার ঠেক আর কর্মক্ষেত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করল অভিরাম। ভোরের দিকে দরজা খুলে দিয়ে বলল—যাও, কাজ হয়ে যাবে। আমার কাছে আর আসবার দরকার নেই। মনে রেখো, আমাকে তুমি চেনো না, কোনোদিন দেখ নি।

যাবার সময় আগন্তুকের বোধহয় একটু রসিকতা করার ইচ্ছে হয়েছিল। সে বলল—যদি কাজের পরে তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দিই?

প্রশ্নটা শুনে কিছুক্ষণ যথার্থই অবাক হয়ে অভিরাম লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল—কিন্তু এরকম ভুল তুমি কেন করবে?

অভিরামের কণ্ঠস্বরে সেই উদাসীন, আদিম নিষ্ঠুরতা। লোকটার বুক কেঁপে উঠল, বোধহয় এই প্রথম সে বুঝতে পারল লাল সর্দার তাকে ঠিক লোকের কাছেই পাঠিয়েছে। পেছনে ফিরে সে দ্রুত পালিয়ে গেল।

কেবল একটা প্রশ্নই অভিরাম করে নি—কেন লোকটা শিকারকে মারতে চায়। এ বিষয়ে তার কোনো কৌতূহল নেই। ঝগড়া অন্যের, কাজটা তার।

একদিন রাত্তিরে কাজটা হয়েও গেল। শনিবার বিকেলে নিয়ম করে শিকার যায় শহরের বাইরে সন্ন্যাসীবাগানে হিন্দুস্থানি মহল্লায়। কী সব কথাবার্তা বলে ফেরে অনেক রাত্তিরে। অভিরাম আবছা আবছা টের পেয়েছিল ঝগড়াটা ভাগাভাগি নিয়ে। বর্ডারের ওদিক থেকে মাল আসছে, ক্যামেরা, শাড়ি, ভিডিও, ঘড়ি— আরো হরেকরকম মালপত্র। তার লাভের বখরা নিয়ে এখন মনান্তর হচ্ছে। শিকার চাইছে আলাদা বিজনেস করতে। দলের অন্য লোকেরা ছাড়বে কেন? তাদের সুলুক-সন্ধান জেনে নিয়ে শিকার যদি এখন বিশ্বাসঘাতকতা করে? এ লাইনে সর্বদাই রেষারেষি।

সন্ন্যাসীবাগান থেকে বেরিয়ে এসে পথ যেখানে প্রথম বাঁক নিয়েছে, সেই নির্জন জায়গায় কাজ সেরে ফেলল অভিরাম। চকিতে। তার হাত এখন অভিজ্ঞতায় পাকা। সব মিলিয়ে মিনিটখানেকের মামলা। রাস্তা দিয়ে হেঁটে না এসে সে উলটো দিকের মাঠে নেমে পড়ল, উঁচু-নিচু জমি আর তিনটে নালা পার হয়ে আধঘণ্টা পর বাড়িতে ঢুকেই জনতা স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ বসিয়ে দিল। মনে ভারি ফুর্তি—ফলে এখুনি একবার চা খেতে হবে।

একটু পরে বড় গেলাসটায় তেজপাতা-দারচিনির গন্ধওয়ালা চা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে তৃপ্তিতে অভিরামের চোখ বুঁজে আসছিল।

আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল দিন-তিনেক পরে।

শহরে শম্ভু মিস্ত্রির গ্যারেজে গ্যাস ওয়েল্ডিং-এর কাজ করছিল সে। দুপুরে কাজ থামিয়ে শম্ভু বাড়ি গেল খেতে, যাবার সময় চারটে টাকা তাকে দিয়ে বলে গেল—তুমিও কিছু খেয়ে নাও। একঘণ্টা পরে এলেই হবে। টাকাটা পকেটে পুরে হোটেলে যাবার জন্য একটা শর্টকাট পথ ধরেছিল অভিরাম। হঠাৎ একটা জটলা দেখে সে কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টিনের চালওয়ালা ছোট একখানা বাড়ির সামনে পনের-কুড়িজন নারী-পুরুষের ভিড়, তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। ভিড়ের বৃত্তের মধ্যে

থেকে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ, মেয়ের গলা।

এমনিতে কোনো পথচলতি ব্যাপারে নাক গলায় না অভিরাম। আজ হঠাৎ কি হল, ভিড়ের পেছন থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে গেল ঘটনাটা কি।

বাড়ির দরজায় সিঁড়ির ধাপের ওপর বসে হাপুসনয়নে কাঁদছে বছর চল্লিশ বয়েসের একজন মেয়েছেলে, মাঝে মাঝে বুক চাপড়াচ্ছে। পাশে বসে আছে ইজের-পরা খালি-গা একটা-বাচ্চা, সে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ক্রন্দনরতা নারীটির দিকে, আর একবার জমায়েত হওয়া ভিড়ের দিকে তাকাচ্ছে।

শোকের কান্নার ভাষা বোঝা কঠিন, অভিরাম ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারল না। পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে ভাই এখানে?

লোকটি বলল—এর ছেলে খুন হয়েছে। ওই যে সন্ন্যাসীবাগানে একটা লাশ পাওয়া গিয়েছে না ক'দিন আগে? এ সেই লাশের বিধবা মা, আর ওই ছেলে। লাশের বৌ অজ্ঞান হয়ে ঘরের ভেতরে পড়ে আছে—আঠারো বছর বয়েস। আহা, গেঞ্জিকলে কাজ করে মা আর বৌকে খাওয়াচ্ছিল—

আরো কি সব বলে চলল লোকটা। অভিরাম তখন আর শুনছিল না সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল মেয়ে-ছেলেটার দিকে, ছোট্ট বাচ্চাটার দিকে। কেন সে মরতে দাঁড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা কি জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল! চলে গেলেই হতো।

কিছুক্ষণ নির্ণিমেষ চোখে তাকিয়ে থেকে সে আস্তে করে সরে এলো বটে, কিন্তু তার ভেতরে কি একটা জিনিস যেন গোলমাল হয়ে গেল। নিজের কাজ সে এতদিন করেছে মনের আনন্দে, কর্তব্য ভেবে। কৃতকর্মের পরবর্তী ঘটনাবলী কখনো চোখের সামনে দেখে নি। তার প্রত্যেকটি কাজের পর কোথাও না কোথাও এমন একটা কিছু ঘটে তাহলে? এইরকম কান্না আর হাহাকার? আশ্চর্য, সে তো বোকা নয়, এটা তো তার আগেই বোঝা উচিত ছিল, কখনো তবু মাথায় আসে নি কেন? গেঞ্জিকলে কাজ করে মা আর বৌকে খাওয়াতো। হাঃ! তার মানে তারই মত দশা, সবাই যেমন জানে সে মিস্ত্রির কাজ করে।

অভিরাম আদৌ নরম ধাতের লোক নয়, কল্পনাশক্তির লেশমাত্রও তার মধ্যে নেই, তবু সে কি করে যেন নিজেকে শিকারীর বদলে শিকারের জায়গায় বসিয়ে ফেলল। যদি তার বৌ—অথবা তার ছেলে যদি রাত্তিরে বাড়ি ফেরবার পথে—

কে যেন বাইরে কোথায় কাঁদছে না? নাঃ, ও মনের ভুল।

জড়িয়ে পড়তে নেই। কক্ষনো না। জড়িয়ে পড়লেই আর কাজ করা যায় না।

গত তিনমাসে দুটো ভাল কাজ ফিরিয়ে দিয়েছে অভিরাম। আর কাজ করবে না—এ সিদ্ধান্ত যেমন সে নেয় নি, তেমনি এখন কাজ করতে ইচ্ছে করছে না, সে কথাও ঠিক। বেশ কিছু জমি কেনা আছে, বরং দেশে ফিরে গিয়ে মনোযোগ দিয়ে চাষবাস করবে।

তবে কিছুদিন পরে, এখনই নয়। অনেকদিন এখানে বাস করছে, অকস্মাৎ জিনিসপত্র গুছিয়ে বাড়ি চলে গেলে লোকের মনে নানারকম সন্দেহ জাগবে। ততদিন উঠোন কুপিয়ে লঙ্কা আর বেগুনের চাষ করা যাক।

কোদালের মুখে আগাছা উপড়ে ফেলতে ফেলতে হঠাৎ বাতাসে ভেসে আসা

কান্নার শব্দ শুনতে পায়। কে কাঁদে?

নাঃ, টিয়াপাখির বাচ্চা ডাকছে নারকেল গাছের মাথায় বসে।

কিন্তু সময় যাওয়ার সঙ্গে একটু একটু করে পুরনো ক্ষুধাটা আবার জেগে উঠতে লাগল। শুধু বেগুনের চাষ করে কি জীবন কাটে? যে একবার ভয়ংকরতম কাজে নিজেকে লিপ্ত করেছে, নির্জন রাত্রিতে অন্ধকারের গুণ্ঠনে গা ঢেকে লৌহ-কঠিন হাতের পেষণের মধ্যে অনুভব করেছে হতভাগ্য শিকারের ক্রমক্ষীয়মান জীবনস্পন্দন, চাষের মত শান্ত বৃত্তি তার জন্য নয়। জীবন যেন কেমন পানসে পানসে লাগে।

হত্যার পরেই সারা দেহে আর মনে সেই অপূর্ব তৃপ্তি—আঃ, কতদিন সে অনুভব করে নি। সেই সময়টা নিজেকে যেন ভগবানের মত লাগে।

এর পরের কাজটা বরং সে নিয়েই নেবে। পাপ আর কি বাড়বে তার? অপরাধই বা কতটা বাড়বে? একটা বেশি খুন করলে কি একবার বেশি ফাঁসি হয়? রক্তের নেশা তার রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছে, সে ছাড়লেও নেশাটা তাকে ছাড়বে না। বৃথা লড়াই করে লাভ কি? এবার কাজের ডাক এলেই সে রাজি হবে।

পরের দিন একটা ঘটনায় অভিরামকে আবার সিদ্ধান্ত বদল করতে হল।

রঙ ওঠা নীল ফুলপ্যাণ্ট আর ঘিয়ে রঙের নোংরা গেঞ্জি পরে সকালে অভিরাম কাজে যাচ্ছিল। বেলা আটটা হবে। শসাপুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। পুকুরের পাড়ে আসার আগেই অভিরাম শুনতে পেল চিৎকার চেঁচামেচি। বাঁক ফিরে দেখল বছর কুড়ি-বাইশের শ্যামবর্ণ একটি মেয়ে পাগলের মত দৌড়ে জলে নামতে চাইছে তাকে বাধা দিচ্ছে রায়পাড়ার বুড়ো পুরোহিত—করো কি! সাঁতার জানো না, ডুবে যাবে যে! পাড়ায় খবর গেছে, এক্ষুণি ছেলেরা এসে তুলবে এখন—

মেয়েটি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল—ওগো, ততক্ষণে আমার খোকা মরে যাবে! আমায় ছেড়ে দাও—

পাড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে জলের ওপর একজোড়া হাত ভেসে উঠে ব্যর্থ প্রত্যাশায় শূন্য আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে পরক্ষণেই আবার ডুবে গেল।

একমুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝে নিল অভিরাম। মেয়েটি এর ভেতরে বৃদ্ধের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে। তার কাছে গিয়ে অভিরাম ধমক দিল—চুপ করে দাঁড়াও।

চোখের নিমেষে গেঞ্জিটা খুলে জলে লাফিয়ে পড়ল অভিরাম। তার দেশের বাড়ির গ্রামে সতেরোটা পুকুর আর দুদিকে দুটো নদী। মাছকে সে সাঁতার শেখাতে পারে। সবল হাতে জল কেটে এগিয়ে গিয়ে জোরে দম নিয়ে ডুব দিল। নাঃ, ছেলেটা বহুৎ নিচে তলিয়েছে। এদিক-ওদিক হাতড়ে পাওয়া গেল না। ভেসে উঠে আবার দম নিল সে। তাকে খালি হাতে উঠতে দেখে কেঁদে উঠল তরুণী মা। এবার ডুব দিয়ে একেবারে তলায় চলে গেল অভিরাম। হ্যাঁ, ঠেকেছে হাতে। চুলের গোছা শক্ত মুঠোয় ধরে একহাতে ছেলেটাকে ভাসিয়ে রেখে পাড়ে নিয়ে এলো সে। ততক্ষণে পাড়ার ব্যায়াম সমিতির ছেলেরা এসে পড়েছে হৈ-হৈ করে। ছেলেটাকে উপুড় করে শুইয়ে একজন পিঠ চেপে পেটের জল বের করতে লাগল। মেয়েটি পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে আস্তে আস্তে বলল অভিরাম—ভয় নেই, বেশি জল খায় নি।

এখুনি ঠিক হয়ে যাবে—

ছেলেটা নড়ে উঠে চোখ মেলার পর গেঞ্জি দিয়ে গা-মাথা মুছে নিঃশব্দে সেখান থেকে চলে এলো অভিরাম. কেউ তাকে খেয়াল করল না।

কি আশ্চর্য ! মনে তার সেই অদ্ভুত তৃপ্তিটা ! সেই—সেই কাজ করার পর যেমনটা পাওয়া যেত। অন্যভাবেও এ আনন্দ আসে তাহলে ?

কাজে না গিয়ে বাড়ির দিকে ফিরল অভিরাম। এক্ষুণি খাঁটি দুধ দিয়ে বড় একগ্লাস চা বানিয়ে খেতে হবে।

ব্যাঙ্কোর চেয়ার

নিশীথ সরকারকে আপনারা অনেকেই চেনেন না। নিশীথ সেই দলের লোক যারা নিজেদের জাহির করতে পারে না। অনেক নেমন্তন্ন বাড়িতে হয়তো নিশীথের হাত আপনার পাতে দই দিয়ে গেছে, কিন্তু আপনি তাকিয়ে সে হাতের মালিককে দেখেন নি। জীবনে সব কাজই সে করেছে নিঃশব্দে। নিশীথ মারাও গেল বাড়ি থেকে অনেক দূরে—নিঃশব্দে।

সহদেবকে অনেকেই চেনে। সে ফুর্তিবাজ. কথায় কথায় কবিতা শুনিয়ে দেয়। বন্ধুদের নিজের পয়সায় সিনেমা দেখায়, রেস্টুরেণ্টে খাওয়ায়। যা করে তা খুব হইচই করে। নিশীথ ছিল সহদেবের বন্ধু।

নিশীথ ভালো ক্রিকেট খেলতো। এমন কিছু বড়ো খেলোয়াড় নয়, কিন্তু খেলতে ভালোবাসতো। কোনোদিনই সে চমক লাগানো রান সংখ্যায় পেঁছোতে পারে নি; সত্যি বলতে কি, সাতান্নর বেশি রানও সে কখনো করে নি, অথচ খেলা যখন হাতের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হতো তখন ক্লাব নামাতো নিশীথকে। নিশীথ সে খেলার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে আউট হয়ে ফিরে আসতো।

সময়টা ডিসেম্বরের শেষ। শীতের ভেতর হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে সবাই এগিয়ে চলেছিল বেণী মিত্তিরের ঘাটের দিকে। খাটিয়ার এককোণ ছিল সহদেবের কাঁধে। পেছনে শবানুগমনকারীদের একজনের হাতে দুলছিল একটা লণ্ঠন মাঝে মাঝে উঠছিল হরিধ্বনি। এক একবার হরিধ্বনির সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছিল খই আর খুচরো পয়সা। আঠাশ বছরের জীবন শেষ করে খাটে চেপে চলে যাচ্ছে নিশীথ সরকার, ফেলে যাচ্ছে তার বাবা-মা বোন স্কুলের চাকরি, কষ্ট করে কেনা বইপত্র, মুদির দোকানে সামান্য কিছু দেনা এবং আলমারির পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা ক্রিকেট ব্যাটটা।

এসব গতকালকের কথা। খুব ব্যস্ত সহদেব। আজ তার মাসতুতো বোন শর্মিষ্ঠার বিয়ে। শ্মশান থেকে বাড়ি ফিরে স্নান করেই মাসীর বাড়ি এসে কাজে লেগেছে। পঁয়ত্রিশ ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল সে ঘুমোয় নি। অথচ খুব যে ঘুম পাচ্ছে, ক্লান্ত লাগছে, তাও নয়। সারাদিন একটা ঘোরের মধ্যে কাজ করছে সহদেব। একবার ছাদে টাঙানো সামিয়ানার একটা কোণ খুলে পড়লো। সহদেব ডাকতে গেল ডেকরেটার্স-এর লোককে। তারা এসে দুপুর নাগাদ ঠিক করে বেঁধে দিয়ে গেল সামিয়ানা। দু'টিন ঘি কম এসেছিল, সহদেব গিয়ে নিয়ে এলো। রান্নার জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তদারক করল। ছাদের ওপর করল নিমন্ত্রিতদের খেতে

বসবার ব্যবস্থা।

কাজ করে যাচ্ছে সহদেব যন্ত্রের মতো, কিন্তু মনের ভেতব পর্যন্ত যেন সে-সবের সাড়া পেঁছিচ্ছে না। নিশীথ কাল মারা গেছে। তবে এখন সবাই আনন্দ করছে কেন? শর্মিষ্ঠার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাচ্ছে, সকালের ব্যাবাকপুর লোকাল ছেড়ে গেছে ঠিক সময়ে। পাশে সিনেমা হলটায় দুপুরের শো-তে অনেক লোককে সে দেখেছে, টিকিট কেটে ঢুকতে। নিশীথ বেঁচে নেই, তবুও শর্মিষ্ঠার বিয়ে নির্দিষ্ট লগ্নে হবে, লোকে স্ফূর্তি করবে, ট্রেনে চেপে যাবে কলকাতায়।

সহদেব এত কাছ থেকে কখনো মৃত্যুকে দেখে নি। শ্মশানে গেল জীবনে এই প্রথম। আর নিশীথকে সে রোজ দেখেছে শতকাজের মধ্যে। তাকে যখন গতকাল ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ধূপকাঠি গুঁজে দেওয়া হচ্ছে খাটিয়ার কোণে কোণে তখনই সমস্ত ব্যাপারটা হঠাৎ ভীষণ অবাস্তব লাগছিল সহদেবের কাছে। নিশীথটা একেবারে মরে গেছে, আর উঠবে না, দাড়ি কামাবে না, স্কুলে যাবে না, জুতো সারাবে না মুচির কাছে। যাঃ, তাও কি কখনো হয়। আসলে নিশীথের এটা গুরুত্ব পাবার একটা কায়দা। কোনোদিন জীবনে কাবো মনোযোগেব কেন্দ্র হতে পারলো না নিশীথ, এখন তাই এভাবে চেষ্টা করে দেখছে।

কিন্তু যখন খাটিয়া তুলে ফেলা হলো কাঁধে, অমরকাকা বললেন—ধবো হে সহদেব, তুমিও ধরো একটা দিক; তখন এগিয়ে গিয়ে নিশীথের মাথাব দিকে কাঁধ দিতে দিতে সহদেবের মনে হলো সমস্ত ঘটনাটা তাহলে সত্যি। তাবপর সারা রাস্তা সে শুধু শুনেছে হরিধ্বনি, দেখেছে মুঠো মুঠো সাদা খই ছড়িয়ে পড়ছে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের কালো পিচের ওপর। সেই সঙ্গে দু'একটা পয়সাব টুংটাং। শহরের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ মনোযোগেব কেন্দ্র হয়ে উঠছিলো নিশীথ।

—কে যায় হে, কে যায়?

—যায় পুব পাড়ার নিশীথ সরকার।

—নিশীথ? ভবতারণের ছেলে? আহা, অল্প বয়সে গেলো। শুনেছি ভুগছিলো—

আলো ঝলমলে রাস্তা দিয়ে চলে যায় নিশীথ। তার শহব ছেড়ে চলে যায় শুয়ে শুয়ে। ক্রমে আলো ছেড়ে অন্ধকারে, বেণী মিত্তিরের ঘাটের দিকে। পেছনে একজনের হাতে দোলে লণ্ঠন, রাতের আকাশ থেকে খসে পড়া একটা হলুদ নক্ষত্রের মতো। অন্ধকার রাস্তায় দ্রুত চলে চারজোড়া পা, কাঁধে তাদের খাটিয়া। সে খাটিয়ায় শুয়ে থাকে নিশীথ সরকার, শিক্ষক, টাউন স্কুল।

—এই যে সহদেব, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে। চট্ করে দ্যাখো তো ফ্রাইগুলো হলো কিনা। আর চাটনিতে নাকি তিন সের চিনি বেশি লাগবে। অমিয়কে পাঠিয়ে দাও একবার—

কাজ—কাজ। ফ্রাই হয়ে আসে, এক সময় চাটনিও নেমে যায। তখনও কাজ বাকী থাকে। একটু সময় করে বিকেলের দিকে হলুদের দাগ লাগা তোয়ালেটা এঁটে নিয়ে শর্মিষ্ঠাকে যে ঘরে সাজানো হচ্ছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায় সহদেব।

বড়রা কেউ নেই, সব কিশোরী-যুবতীর ভিড়। বেশির ভাগই চেনা। অর্ধেক কপালে চন্দন পরানো হয়েছে কনের অর্ধেক বাকি। দরজার পাল্লায় ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে দেখতে লাগলো সহদেব। শর্মিষ্ঠা হেসে বললো—বড়দার এতক্ষণে সময় হলো?

সহদেব গুছিয়ে উত্তর দিতে পারলো না। বললো—না, মানে সকাল থেকেই তো নানা রকম—এখন আবার ফ্রাইটা—

দুটো মেয়ে হেসে উঠলো। শর্মিষ্ঠা খাটের একটা কোণ দেখিয়ে বললো - বসো না, বসে সিগারেট খাও।

সহদেব বসলো। তাকালো শর্মিষ্ঠার দিকে।

—কেমন লাগছে রে শর্মি?

—কি কেমন লাগছে?

—বিয়ে করতে কেমন লাগছে?

—বারে! সে এখন কি করে বলবো? বিয়েটা হোক আগে। কাল সকালে জেনে নিও বরং।

—কি রঙের বেনারসী পরবি রে শর্মি? আমারই তো সব কেনবার কথা ছিলো। এদিকে আবার নিশীথের ব্যাপারটা—

থেমে গেলো সহদেব। আজকের শুভদিনে নিশীথের কথা বলা বোধহয় উচিত হচ্ছে না। শর্মিষ্ঠা একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো—সত্যি, এখনো বিশ্বাস হয় না যে নিশীথদা আর নেই। সেই সেবার বুলুর অন্নপ্রাশনে—

কে দু'জন প্রৌঢ়া মহিলা ঘরে ঢুকে তাড়া দিতে লাগলেন—হাত চালা, লগ্ন অব্দি সাজাবি নাকি রে, অ্যাঁ?

নিশীথের কথা চাপা পড়ে যায়। সহদেব বেরিয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে। চারদিন আগেও ঠিক এই সময় সে হাসপাতালে কথা বলছিলো নিশীথের সঙ্গে। লম্বা হল ঘরটায় ঢুকেই বাঁদিকে চারটে বেড্ ছেড়ে জায়গা পেয়েছিলো নিশীথ। প্রায়ই শুয়ে থাকতো গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে, বইটই পড়তো। সহদেবরা কেউ গেলে হঠাৎ চোখে উৎসাহের আলো খেলতো। বই সরিয়ে রেখে দুর্বল স্বরে রসিকতা করার চেষ্টা করতো—ইস্কুলের কিবা সমাচার, কহো মোরে হে বান্ধব?

চারদিন আগেও সহদেব বলছিলো—কাল স্টুডেণ্ট ভার্সেস স্টাফ ক্রিকেট ম্যাচ হলো রে, আমিও খেললাম—

নিশীথ সত্যি উৎসাহ পেলো। বললো—সত্যি? কারা জিতলো?

সহদেব বললো—আমরা।

—তুই কত রান করলি?

—দূর, আমি বাজে খেলেছি। যা করবার করেছে অপূর্ব দত্ত।

—আউট হলি কি করে? কত রানে?

—তিনটে রান মাত্র। একটা বল খুব লাফালো প্রায় কোমর সমান। লোভে পড়ে ব্যাকফুট খেলতে গেলাম, আনাড়ি হাত তো—উঠে গেলো ক্যাচ।

উত্তেজনায় প্রায় উঠে বসলো নিশীথ।—ওই তো তোর দোষ, অত উঁচু বল কেন ব্যাকফুটে খেললি? তুই একটা আনাড়ি, ও বল ব্যাকফুটে খেলা কি তোর

কর্ম ? কত প্র্যাকটিস দরকার জানিস ?

—শুয়ে পড় নিশীথ, আবার শরীর খারাপ হবে নইলে। ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? আমরা তো আর হারি নি। তাছাড়া মর্নিং সেকশনের স্টাফরা একটা ম্যাচ দিতে চাইছে, তুই সেরে উঠলে সেটাও সেট্‌ল্‌ করা যাবে।

সেরে ওঠার কথাটা নিশীথ বিশ্বাস করেছিলো। অথচ নিশীথকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগের দিন সহদেব গিয়েছিলো ডাঃ সেনের চেম্বারে। ডাক্তারবাবুর চশমার মোটা কাঁচে ফ্লুরেসেন্ট আলো ঠিকরে পড়েছিলো। আন্তরিক উৎকণ্ঠার সঙ্গে সহদেব জিজ্ঞাসা করেছিলো—নিশীথ সেরে উঠবে তো ডাক্তারবাবু ?

পেপার ওয়েটটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন ডাঃ সেন। সহদেবের মনে হলো উনি প্রশ্নটা শুনতে পান নি।

—ডাক্তারবাবু, নিশীথ সেরে উঠবে না ?

ডাঃ সেনের উত্তর এত খাদের গলায় এলো যে প্রায় চমকে উঠেছিলো সহদেব।

—ভেরি স্যাড কেস, সহদেব। এ রোগ আমাদের দেশে—কিডনী টোট্যালি ড্যামেজড্‌। আমার মনে হয় না—আই ডোণ্ট থিংক দি পুওর বয় উইল সারভাইভ্‌।

নিঃস্তব্ধতা। কেবল বহু দূরে কোথায় একটা কুকুর ডাকছে। বাকি সব শান্ত। কি বলবে সহদেব ? এখন কী বলতে হয় ?

আবার বললেন ডাঃ সেন—সহদেব, আজ থেকে আঠাশ বছর আগে, তখন আমি সবে প্র্যাকটিস শুরু করেছি, আমার হাতেই নিশীথের জন্ম হয়। হি ওয়াজ এ ভেরি হেল্‌দি চাইল্ড।

নিঃস্তব্ধতা। দূর থেকে ভেসে আসা কুকুরের ডাক। সহদেবের গলায় সব শব্দ জমাট বেধে গেছে।

এক সময় ডাঃ সেন উঠে দাঁড়ালেন।—সহদেব, প্যাথলজিই শেষ কথা নয়। শেষ কথা কে বলতে পারে ? দেয়ার ইজ ইয়েট হোপ্‌। আচ্ছা, আমি এখন ডাক্তারখানা বন্ধ করবো। গুড্‌ নাইট্‌।

মাসীর পুরনো চাকর ভূষণ আতরদানে গোলাপজল ভরছে, নিমন্ত্রিতদের গায়ে ছিটোনো হবে। বেলা গড়িয়ে গেছে। সমস্ত বাড়িতে চাপা ব্যস্ততা। আজ শুভ দিন—আনন্দের দিন, আজ একটা উৎসবের দিন। অথচ নিশীথ সরকার গতকাল মারা গেছে।

সহদেবের মনে হলো আমাদের জীবনে এক-একটা ঘটনা যেন অতিথি, প্রত্যেকের জন্য রয়েছে এক-একটি নির্দিষ্ট আসন। অন্নপ্রাশন, পৈতে, প্রেম, বিয়ে—এইসব। জীবন এগিয়ে চলে, ধীরে ধীরে ভরে ওঠে এক-একটি আসন। কেবল একটি থেকে যায় খালি। তখন, সেই নির্জন প্রহরের পড়ন্ত রোদ্দুরে গা দিয়ে বসে কেবল অপেক্ষা, কখন আসবে শেষ অতিথি।

হঠাৎ সহদেবের মনে পড়লো ম্যাকবেথের কথা। কতবার সে বন্ধুদের জায়গাটা শুনিয়েছে আবৃত্তি করে। সেই যেখানে ভোজ হচ্ছে, সবাই এসেছে, কিন্তু ব্যাঙ্কো আর আসে না। ব্যাঙ্কোর মৃতদেহ তখন পড়ে আছে কোথায় ! ব্যাঙ্কো ম্যাকবেথের ভাড়াটে খুনীর দ্বারা নিহত। ভোজ আরম্ভ হতেই ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রবেশ।

ম্যাকবেথের আসনে গিয়ে বসলো ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মা। ম্যাকবেথের জীবনের সব আসনগুলি পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো, বাকি ছিলো একটি। এসে গিয়েছিলো শেষ অতিথি। কতবারই তো স্কুলের টিফিন আওয়ারে এ জায়গাটা আবৃত্তি করে শুনিয়েছে সহদেব। ব্যাঙ্কোর প্রেতাত্মার প্রতি ম্যাকবেথের উক্তি—দাই বোন্স্ আর ম্যারোলেস্, দাই ব্লাড্ ইজ কোল্ড্।

শেষ অতিথি যে আসে তার শরীর গঠিত মজ্জাহীন অস্থি দিয়ে, তার রক্ত হিমস্পর্শ। সে জীবনের উৎসবের মধ্যে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়ে দখল করে তার জন্য পেতে রাখা আসন। সহদেব অনুভব করলো সমস্ত জীবনটা আসলে একটা দীর্ঘ প্রতীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। কবে ভোজসভার হুল্লোড়ে প্রবেশ করবে ব্যাঙ্কোর কায়াহীন অস্তিত্ব—সেটা উৎসবের শেষ দিন।

নিশীথ ভালোবেসেছিলো একটা কালো মেয়েকে। রোজ মেয়েটি যেতো স্টাফ রুমের পাশ দিয়ে বিকেলবেলা, আড়চোখে তাকাতো। সহদেব বলতো—নিশীথ, তোকে খুঁজছে রে—

নিশীথ যেন কেমন হয়ে যেতো, ওর চোখে নেমে আসতো আশ্চর্য তৃপ্তির গাঢ় ছায়া।

সহদেব ভালোবেসেছিলো নন্দিনীকে। নন্দিনী এক অদ্ভুত মেয়ে। তার স্পর্শ সহদেবের জীবনের তাবৎ স্তরকে এক এক করে ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে লাভ হয় নি কিছুই। নন্দিনীরা বিয়ে করে না, ধরা দেয় না। নন্দিনীরা শান্ত জলের বুকে সুন্দরের প্রতিচ্ছবি। ধরতে গেলে ভেঙে ভেঙে যায়, প্রতিচ্ছবি কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে আসে।

আসলে সেই কালো মেয়েটির প্রতি নিশীথের ভালোবাসা, নন্দিনীর প্রতি সহদেবের প্রেম—এ সবই শেষ অতিথিকে অস্বীকার করার জন্য। সহদেব, নিশীথ এবং ওদের মতো আরো সবাই দু'হাতে প্রাণপণ ঠেকাচ্ছে তাকে, যে এসে বসে পড়তে পারে খালি আসনে। যার অস্থি মজ্জাহীন, যার রক্ত হিমস্পর্শ।

শুভদৃষ্টির সময় সবাই বললো—ধরো সহদেব, এক কোণ ধরো পিঁড়ির—

শর্মিষ্ঠা কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে বরকে। বর সপ্রতিভভাবে সোজা তাকিয়ে শর্মিষ্ঠার চোখে। মেয়েদের চিৎকার—তাকিয়েছে, তাকিয়েছে। পিঁড়ির কোণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সহদেবের মনে হলো সে চাকরি করে, ভালোবাসে, সিনেমা দেখে, পাড়ার সুভেনিরে লেখা দেয়, উৎসব করে—কিন্তু জীবনের সব উৎসব, আনন্দ ও কলরোলের মধ্যে তার চেতনার কিনারা ধরে হেঁটে যায় চারজোড়া পা। হাঁটে—হাঁটে—হাঁটে। পেছনে যেন নিরালম্ব শূন্যে দোলে একটা খসে পড়া নক্ষত্রের মতো লণ্ঠন। মাথার ওপরে ধীরে ধীরে ঘুরে যায় ছায়াপথ। মৃদুকণ্ঠে ওঠে হরিধ্বনি, ছড়িয়ে পড়ে সাদা খই।

এখন, এই ছাঁদনাতলায়, যে কোনো মুহূর্তে ঢুকে পড়তে পারে চারজন ক্লান্ত মানুষ। তাদের কাঁধে খাটিয়া। তার ওপরে চিত হয়ে শুয়ে নিশীথ সরকারের মৃতদেহ।

মাকে যে সারিয়ে তুলতে পারবো এমন আশা ছিলো না। রাতের পর রাত গভীর উদ্বেগে জেগে বসে থাকতাম মায়ের মাথার কাছে। দেখতাম জ্বরের ভেতর ওঁর ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিছু বলতে চান ভেবে মুখের কাছে কান নিয়ে যেতাম। কিন্তু না, দু'একটা অব্যক্ত শব্দ মাত্র। এক ঘণ্টা বাদে বাদেই থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখতাম। ডাক্তারবাবু অবশ্য বলেছিলেন দু'ঘণ্টা অন্তর টেম্পারেচার নিতে, কিন্তু আমার মন মানতো না। যেন আমি ঘন ঘন থার্মোমিটার দিলেই জ্বর নেমে যাবে। ক্রমে জ্বর ছাড়া অন্য উপসর্গও দেখা দিল। ডানদিকে পিঠ থেকে বুক অবধি বেয়ে আসা একটা যন্ত্রণা, সেই সংগে বমি। মা আর জলও খেতে পারেন না—যা খান তাই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে যায়। ডাক্তারবাবু প্রাণপণে চিকিৎসা চালালেন বটে, কিন্তু উপকার কিছু হলো না। বরং কিছুদিনের মধ্যে মায়ের সমস্ত শরীর হলুদ হয়ে গেল। ডাক্তারবাবু বললেন—জণ্ডিস্, সঙ্গে আরো নানা রোগ আছে। কোনো ওষুধেই সিস্টেম রিঅ্যাক্ট করছে না, তুমি বাবাকে হাসপাতালের ব্যবস্থা করতে বলো।

আমরা নিতান্ত মধ্যবিত্ত অবস্থার মানুষ। জ্বরজারি বা অন্য সামান্য অসুখ-বিসুখ হলে বাড়িতেই চিকিৎসা হয়—সেরেও যায়। বাবা হাসপাতালের কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন, বললেন, কি বললো রে ডাক্তার? আমার কাছে সত্যি করে বল্, লুকোস না। তোর মা বাঁচবে তো?

—বাঁচবে বইকি। না বাঁচবার কি আছে এতে? বাড়িতে সেবাযত্ন ঠিকমতো হয় না, তাই—

এসব অনেকদিন আগেকার কথা। তখন কলেজে পড়ি। পরীক্ষা দেবার বছর। সারা সেশন ভালোভাবে ক্লাশ করা ছিলো তাই এখন মায়ের অসুখের জন্য কামাই হওয়াতে ভয় পাই নি। পার্সেন্টেজ কম পড়বে না। রাত্তিরে মায়ের কাছে বসে বসেই পড়তাম। একবারে বুঝতে পারতাম না, সব কেমন গোলমাল হয়ে যেত মাথার ভেতর।

মাঝে মাঝে অনেক রাত্তিরে শুঁড়তোলা বিদ্যাসাগরী চটির আওয়াজে চমকে দেখতাম বিছানা ছেড়ে বাবা উঠে এসেছেন। কাছে এসে মায়ের কপালে হাত দিয়ে জ্বরটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে বলতেন, তুই এবার একটু ঘুমিয়ে নে খোকা, আমি এখানে বসছি বরং—

—না বাবা, আমার কিছু কষ্ট হচ্ছে না।

—অসুখে পড়লে পরীক্ষায় বসতে পারবি না যে। একেই তোর মাকে নিয়ে হিমসিম খাচ্ছি। পুষ্পকে তাহলে বসতে বল।

পুষ্পদি আমাদের অনেকদিনের কাজের লোক, আমাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। সে এসে বসলে এক একদিন আমি ঘুমোতে উঠে যেতাম।

মায়ের অসুখকে অবলম্বন করেই জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আমার

দরজায় এসে' কড়া নেড়েছিলো। তারপর কতোদিন তো কেটে গেল—এখনও এক নম্বরের এ্যাসবেস্টস লাগানো প্ল্যাটফর্ম, বইয়ের দোকান, ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস ওয়েটিং রুম, স্টেশন ক্যাটারিং। ডানদিকে টিকিট কালেক্টরের ঘর, পার্সেল রুম, জালে-ঘেরা পার্শেল শেড, সহকারী স্টেশন-মাস্টার ও স্টেশন-মাস্টারের ঘর। পাকা মোটা থামে খিলানের মতো অর্ধবৃত্তে অর্ধবৃত্তে ওপরের মসজিদতুল্য ঢেউ-খেলানো ছাদটা দৃঢ়সম্বন্ধ। ঢালাও সিমেন্টের মেঝেতে, দেয়ালের পাশে বিরাট বিরাট কাঠের বাক্স বসানো। অবসন্ন বা ক্লান্ত কুলী-কামিনেরা সেখানে ঘুমোয়। ছাদ শেষ হলে আরও দূর পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মের সমান্তরাল গতি হঠাৎ সেতারের ঘাটের মতো নেমে, নীচের এ্যাশ ডাম্পে মিশে গেছে। তারপরে খোয়া পাথর, চোখা চোখা তীক্ষ্ণ টুকরা। প্ল্যাটফর্মের ধারে ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছ, সোনাঝুরি, তিরতিরে পাতার কাঁপন।

ফুলি লোহার গেট দিয়ে ঝটিতি ঢুকে পড়েই, বাঁদিকে ঘুরে, ওভারব্রীজের দেয়াল আর 'পানীয় জল'-এর গলিপথে টুপ করে ডুবে যায়।

প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে। কামরার উচ্চতা থেকে প্ল্যাটফর্মের নীচুতে, একটা একটা চকচকা বুটের লাথি আর রুলারের গোঁত্তায়, ধপাস করে আছড়ে পড়ছে এক একটা শরীর। স্টেশনময় কান্নার রোল। 'আরে মা গো, বাঁচাও বাঁচাও, ও বাবারে, ভগমান, মা-আ-আ-আ-আ-গো, বাবু, ছাড়ি দাও রে' কাটাকাটা নিরালম্ব ধ্বনি গমকে গমকে বমির রক্তের মতো বেরিয়ে আসে। কামরায় কামরায় বুটের শব্দ। বেঞ্চের তলায় কুঁকড়ে দুমড়ে আছে নাবালিকা, কিশোর, বিধবা, সধবা রমণীর দেহ। গোটা ট্রেনের মেঝেতে কামরায় সমস্ত চাল ছড়ানো। যাতে, কার চাল বোঝা না যায়। যেন শুকতে দিয়েছে কেউ কুলোবাছা করে। হামানদিস্তার গর্জনে প্ল্যাটফর্ম থেকে এক একজোড়া নালের বুট, মোটা চামড়ার এ্যাংকল-ঢাকা বারোটা ফিতের ঘরওয়ালা চকচকা পায়ের সারি লাফ মেরে উঠে আসে। তাদের পায়ের চাপে চালের দানা গুঁড়িয়ে যায়। এক বিধবা বসে আছে বেঞ্চির তলায়। তার পরনের ত্যানা ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তার ঝুলেপড়া অথব্ব শরীরটা হড়কে বেরিয়ে যায়। ছেঁচড়ে যাওয়ায় তার প্রায়-নগ্ন দেহটার ছাল উঠে ছালাবালা। বুড়ি নিজেকে সামনের টানের থেকে পেছনে নিয়ে যেতে পাল্টা টান লাগায়—আর কেঁদে ফেলে। 'ইক্' করে কান্নার আওয়াজটা একটা প্রকাণ্ড আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় দম-আটকানো আটাশ লাগতেই 'ছাড়বি না, শালা, চাল দিবি না' এমন চোয়ালচাপা ক্রুদ্ধতায় লাথিটা পড়ে পেছনের মেরুদণ্ডে। বুড়ির শরীরটা কামরা আর প্ল্যাটফর্মের মধ্যবর্তী শূন্যতায় বৌদ্ধমঠে হাওয়ায়-ওড়া মৃত-সঞ্জীবনী পতাকার মতো পত্-পত্ করে ত্যানা উড়িয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে আছড়ে পড়ে সিমেন্টে। তার শরীর ফেটে চালের পেটি ফেটে ছলছল করে ছড়িয়ে যায় চাল প্ল্যাটফর্মের অনেকটা, বুড়ির কপাল কেটে গলগলিয়ে রক্তস্রোত, হলুদরঙা চালগুলোকে পোলাওয়ের মতো রাঙিয়ে তোলে। বেঞ্চির তলা থেকে আর এক লাফে হড়কে আসে এক সধবা। পা জড়িয়ে ধরতে যায়। ফুটবলের হুক করবার পজিশনে যেন, তার বুকের ভেতর আমূল বুটটা চাপিয়ে, ওপরের দিকে একটা ধাক্কা মারতেই, রমণী দলামোচড়া

পাকিয়ে, 'আঁক' করে বুড়ির পাশে দড়াম কবে পড়ে। আছাড়ে তার দুই পা চকিতে শূন্যে উঠে পেটি পেটি চালের গোপন আড়ত ফাটিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। তার শাঁখা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো আর লোহাটা দুমড়ে বেঁকে কেটে যায় হাত। বেঞ্চির পাশে কুঁকড়ে দুমড়ে থাকা কচি কচি নাড়ুগোপাল সন্ত্রাসে মিশে গেছে। কাটা মুরগীর ছানার মতো ঘিটি ধরে সেই নয়, দশ, বারো, তেরো, ষোলোবছরী নরম তুলতুলে নাড়ুগোপালদের জানলা দিয়ে ছুঁড়ে দেয়। দলা দলা মাংসপিণ্ডের জীবন্ত উষ্ণতায় ফেটে যাওয়া মাথার রক্তে গোটা প্ল্যাটফর্মের চাল ভিজে উঠতে থাকে। প্রতিটি কামরার সামনে স্তূপীকৃত মাংসদলা শরীর, ফাটা ফাটা চালের বস্তা, আর চতুর্দিকে ছড়ানো নোনিয়া, বাসমতী, গোবিন্দভোগের বিভিন্ন রঙাল দানা দানা রক্তে ভেজা। পুলিশের পা জড়িয়ে চিৎকার, যন্ত্রণাদীর্ণ শরীরের ক্ষত-জ্বালায় কান্না, বাচ্চাদের পিতৃমাতৃহীন অবলম্বনশূন্য হাহাকার—মাড়িয়ে, নখের আওয়াজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন এক একটা সেণ্ট বার্নার্ড, বুলডগী থ্যাবড়া হিংস্রতা, এ্যালসেশিয়ান-অব্যর্থ টুঁটিকামড়ানো ঝাঁপ, ছিঁড়ে টুকরো করে রক্তাক্ত গোঁফ, বিষদাঁতের উল্লাসে, বন্দুকে, বেয়নেটে কষাইখানার রলরোল।

ইস্টিশনে ঢুকে বিজয় পাগলা এদিক-ওদিক চায়। আজ মোবাইল হচ্ছে। খোলাখুলি থাকবে না ফুলিরা। এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করতেই হঠাৎ তার নাম ধরে ডাক শুনতে পায়। বিজয় পিছিয়ে এলে চিপাগলিতে ফুলিকে দেখে।

"কী হইল?" ফুলি জিজ্ঞাসা করে।

বিজয়ের চোখ আজ অন্যরকম। তার নিষ্পলক দৃষ্টি আজ শিথিল।

"কী হইছে? এহানে আইলা যে?"

"আমার সাথে আয় তুই।"

"কনে যাব? অখনি গাড়ি ছাইড়বে। ক্যামনে যাই?"

"আমি কইত্যাছি, আমার সাথে আয়। দেরি করস না।"—বিজয় বলে যায়।

বিজয়ের সঙ্গে ফুলি বেরিয়ে আসে। ইস্টিশনেব গেট পেরিয়ে ওরা হাঁটে। স্টেশনের রাস্তা পেরিয়ে তেমাথার মোড়ে ওরা পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরে। কিছুদূর যেতেই রেড ক্রুশের লাল চিহ্ন সবুজ পাতার আড়ালে আড়ালে দেখা যায়।

ফুলি জিজ্ঞেস করে, "হাসপাতালে লইতাছ ক্যা?"

বিজয় কথা কয় না। গেট পেরিয়ে, বাঁদিকে মেডিক্যাল ওয়ার্ডের দিকে যেতে থাকে। আউটডোরের বেঞ্চিভর্তি রুগী। তাদের ভেতর দিয়ে বিজয় ঢুকে যায়। পেছনে পেছনে ফুলি। ডানদিকে ঘোরে। নিতেই, তলায়, মেঝেতে একটা কঙ্কালের দেহ দেখা যায়। প্রায়-নগ্ন একটা শরীর শুয়ে আছে মেঝেতে আর পশ্চিমান্তে সূর্য ঢলে গেলে তার দীর্ঘ দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়ার মতো লম্বা লম্বা লম্বা নিঃশ্বাস টানছে একটা বুক। গলার গণ্ডগুলো অমন শ্বাসকষ্টে ঢুকে ঢুকে যাচ্ছে। পৃথিবীর সমস্ত হাওয়া যেন তার বুকের পাতালে সে টেনে নিতে চায়। সেই শ্বাসটানের ভেতর, একটা অনির্দিষ্ট চাউনী, ধীরে, অতি ধীরে, প্রায় শিশিরপাতের গতিতে ফুলির দিকে ঘুরে যায়। ফুলি দেখে। হাড়জিরজিরে সোয়ামীর শ্বাস-কষ্টের সামনে, রঙ্গীন শাড়ি, চকমকা ব্লাউজ আর সারা শরীরময় খাদ্যের সম্ভার

নিয়ে ফুলি দাঁড়িয়ে। আর সামনে ভুখা পেটের নালীগুলোন্ দগদগা ক্ষুধায় যেন কুঞ্জন পাকস্থলীর রস শুষে নিয়েছে। হাপরের মতো শব্দ উঠছে নিঃশ্বাস নেবার। এবার মুখটা হাঁ হয়ে কুঞ্জর সমস্ত দাঁত বেরিয়ে যায়।

ফুলি বলে, "আস। বাইরে আস।"

বিজয় তাকায়। ফুলি বেরিয়ে আসে। বিজয় পিছে পিছে। বিজয় তার পাশে এসে জিগ্যেস করে "যাস কই?"

"টেরেন ধইরতে হইবো না?" ফুলি ঘাড় ঘোরায়।

"টেরেন। তুই এহন উহানে যাবি!"

ফুলি বিজয়ের দিকে নিষ্পলক। "যাইব না। আমারে তো যাতি হইবই। নাইলে তুমি কী খাবা! আমাগো বেপতণ্গ পোলাটা কী খাইব! একবার ভাবছ— আমাগো বাঁচনের কী হইব।"

বিজয় কোনো কথা বলতে পারে না।

ফুলি বলে, "বাড়ি যাও, আমি বেলাবেলি আইল্যাম বইল্যা—জিনিসপাতি সব ছড়ানো রইছে, নজর রাইখ।"

বিজয় নিঃশ্বাস টানতে টানতে বলে, "ফুলি!"

আত্মরক্ষার জন্য শাড়িতে আর খোঁপায় গাঁথা কাঁটার আস্তরণে নিজের সমস্ত পরাজয়কে বিঁধে, চোখে টলটলে জলভাব নিয়ে ফুলি চিকন হেসে বলে ওঠে, "মইর‍্যা দ্যাখছ কুনদিন? মইর‍্যা কোনো সুখ নাই।"

ব্যস্ত দিনের মধ্যে আচম্‌কা মনে পড়ে যায় সেসব কথা, কাজ করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে একদিকে তাকিয়ে থাকি। দিন যায় কথাটা ভুল। সময় কোথাও চলে যায় না। আমাদেরই বুকের ভেতর জমা থাকে স্থায়ী আমানতের মতো— এ চুরি হয়ে যাওয়ার জিনিস নয়।

একদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে দেখেছিলাম বাবা বসে আছেন মায়ের পাশে, ঘরে অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠেছে, কিন্তু কেউ আলো জেবলে দিয়ে যায় নি। মা তাঁর শীর্ণ বাঁহাত রেখেছেন বাবার কোলে, আর বাবা মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছেন, ভয়ে নেই কল্যাণী, এবার সেরে উঠবে তুমি। কোনো ভয় কোরো না। আমি তো আছি, খোকা আছে।

মা ক্ষীণ গলায় বলছেন, ভয় পাইনি তো। তোমরা সবাই আছো—আমার কি ভয়?

তারপর অনেকগুলো দিনের স্মৃতি এখনো আমাকে ভয় পাওয়ায়। মা হাসপাতালে গেলেন। চিকিৎসকরা কেউ একমত হতে পারলেন না মায়ের অসুখের বিষয়ে। কেউ বললেন, হেপাটাইটিস, কেউ বললেন, ইনফেকটিভ্ জন্ডিস। একজন তো খুবই জোর দিয়ে বললেন, প্যাংক্রিয়াসে ক্যান্সার হয়েছে। যদিও খুব রুডিমেণ্টারী অবস্থা, তবু এখনই অপারেশন করা দরকার। বাঁচবার আশা কম— কারণ আপাততঃ সেরে উঠলেও পরে অন্য কোথাও আবার ক্যান্সার দেখা দেবেই। যে ক'দিন বাঁচেন!

রাত্তিরে আমার ঘুম হতো না ভাল করে। মা যে আমার সব। বাবাকেও প্রাণ

দিয়ে ভালোবাসি ঠিকই, কিন্তু মায়ের সঙ্গে কিছুর তুলনা হয় না। মা যদি না থাকেন।

কালো কালো ভয়ের ছায়া সারারাত ঘুমের মধ্যে আমাকে তাড়া করে ফিরতো। একটু-আধটু কবিতা লিখতাম তখন, দু'একটা পত্রিকায় ছাপাও হতো। কোথায় গেল আমার কবিতা লেখা, কোথায় গেল আমার কবিতা লেখার কালো রঙের খাতাটা!

চিরদিন কারো খারাপ যেতে পারে না। মনে আছে, একদিন সকালে দাঁড়িয়ে আছি হাসপাতালের করিডরে, ডাক্তারবাবু এলে মা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবো? একজন বেয়ারা এসে বললো, আপনি কি বত্রিশ নম্বরের আত্মীয়? আপনাকে সার্জন সাহেব ডাকছেন।

গেলাম। সার্জন বললেন, আপনার মাকে আমার ওয়ার্ডে দেওয়া হয়েছে। ভয় পাবেন না, ইট্ ইজ্ এ পিওরলি সার্জিক্যাল কেস। এতদিন ঠিক চিকিৎসা হয় নি—এবারে সেরে যাবেন উনি।

সাহস করে বললাম, ওঁরা বলছিলেন ক্যান্সার—

—ওঁরা? ওঁরা কারা?

তারপরই হেসে উঠে বললেন—যাকগে, যাঁরাই বলুন, আপনার মা এখন আমার পেসেন্ট। আমি বলছি ওসব কিছু হয় নি ওঁর। গল্‌ব্লাডারে পাথর আছে গোটা-কতক, অপারেশন করে বের করে দেবো এখন। যান, বাড়ি যান। ভয় নেই কিছু—

সার্জনের হাসিতে অনেকখানি ভয় উড়ে গেল দিগন্তের ওপারে। অপারেশন হয়ে গেল। সত্যিই স্টোন বের হলো এতগুলো। একটু একটু করে মা ভালো হয়ে উঠতে লাগলেন।

এই সময়টায় মনে হতো কোথায় যেন এক নির্মল আকাশে সূর্যোদয় হচ্ছে। একটু একটু করে মা সেরে উঠতেন, একটু একটু করে সূর্যটা উঠতো।

মা একদিন ফিরে এলেন বাড়িতে। সম্পূর্ণ সুস্থ, কিন্তু খুব দুর্বল। ট্যাক্সি থেকে নেমে আমার কাঁধে ভর দিয়ে ঘরে ঢুকেই আগে লক্ষ্মীর আসনের সামনে প্রণাম করলেন, তারপর আমার আর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, ফিরে এলাম তাহলে। আমার সংসার, আমার আমার খোকা—মরে গিয়েও আমি শান্তি পেতাম না কক্ষনো—

মা কেঁদে ফেললেন। এই প্রথম আমি বুঝলাম মা বাঁচবার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

সার্জন বলে দিয়েছিলেন মা একটু সচল হলে কোথাও হাওয়া বদলাতে নিয়ে যেতে। বাবা ভাবতে লাগলেন মাকে কোথায় পাঠানো যায়। আমার মনে তখন বিরাট মুক্তির আলো ভরে আছে চারদিক। আমি আবার পড়াশুনোয় লেগে গেলাম।

একদিন রাত্তিরে খেতে বসে বাবা বললেন, খোকা, একটা ভালো জায়গার খোঁজ পেয়েছি। পাহাড়ী জায়গা, জলহাওয়া খুব ভালো। ঘন ঘন খিদে পায়। দূরও খুব বেশি নয়, হাওড়া থেকে পাঁচ-ছ' ঘণ্টার রাস্তা। আমার ছোটবেলার এক বন্ধুর বাড়ি আছে সেখানে, তারা এখন কলকাতায় থাকে—বাড়ি খালি পড়ে রয়েছে। তুই তোর মাকে নিয়ে মাস দুই থেকে আয় না কেন?

—আমি যাবো ?

—অসুবিধে কি ? নিরিবিলিতে প্রিপারেশনও করতে পারবি।

—তুমি যাবে না ?

—আমি তো এখন আর ছুটি পাবো না, অনেক ছুটি নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তুই চলে যা তোর মাকে নিয়ে, আমি ফাঁক পেলেই গিয়ে তোদের দেখে আসবো। পুষ্পকেও নিয়ে যা সঙ্গে, রান্নাবান্না করে দিতে পারবে—তোর মা এখনো খুব দুর্বল তো—

মা এই সময় বলে উঠলেন, পুষ্পকে নিয়ে গেলে তোমার রান্না করবে কে ? তা হয় না—

বাবা বললেন, বাঃ, আমি রাঁধতে পারি না বুঝি ? মনে আছে, সেই পুরীতে খিচুড়ি রেঁধে খাইয়েছিলাম, আর ডিমভাজা ?

মা বললেন, হুঁ,—জন্মের মধ্যে কম্ম।

বাবা শেষ অবধি শুনলেন না। একাই থেকে গেলেন। যাবার আগে একদিন একা পেয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আমাদের চেঞ্জে পাঠাচ্ছো যে, তুমি টাকা পেলে কোথায় ? মার অসুখে এত খরচ হলো, তোমার হাতে তো এখন টাকা থাকাব কথা নয়।

বাবাকে কেমন বিষণ্ণ দেখালো, আমতা আমতা করে বললেন, ইয়ে হয়েছে. মানে, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে কিছু লোন নিয়েছি। সে শোধ হয়ে যাবে এখন—

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করে বললেন, তাছাড়া তুই পাশ করে একটা চাকরি পেয়ে গেলে আর আমার চিন্তা কি ? ততদিন আমি ভালো-ভাবেই চালিয়ে নেবো। চিন্তা নেই।

বাবার বন্ধুর নাম যামিনী চক্রবর্তী। এটা আসলে ওঁর পৈতৃক বাড়ি, উনি নিজে করেন নি। বাবার সঙ্গে কোলকাতায় এক কলেজে পড়তেন। পরে সারা-জীবনই বদলির চাকরিতে বাইরে বাইরে ঘুরেছেন। বর্তমানে কিছুদিন হলো কোলকাতায় পোস্টেড।

বাড়িটার অবস্থান খুব সুন্দর জায়গায়। লালমাটির ছোট্ট ডাঙার ওপরে বাড়ি, চারদিক ঘিরে অনেক ছোট-বড় টিলা আর পাহাড়। একেবারে গাঁয়ের ওপরে নয়, অথচ হেঁটে পনেরো মিনিটের মধ্যে পেঁছানো যায়। স্থানীয় লোকেরা সবচেয়ে কাছের টিলার নাম দিয়েছে টিকি পাহাড়। অনেকদিন আগে নাকি ও পাহাড়ের চূড়ায় একটিমাত্র গাছ ছিলো, দূর থেকে ন্যাড়ামাথায় টিকির মতো দেখাতো। এখন বিহার সরকারের বন-বিভাগ থেকে বহু গাছ পোঁতা হয়েছে এবং সেসব গাছ বড় হয়ে জঙ্গলও হয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু টিকি পাহাড় নামটা রয়েই গিয়েছে। টিকি পাহাড়ের পেছনে বন-বিভাগের সংরক্ষিত শাল-পিয়ালের অরণ্য। অরণ্যের ভেতর বেশ সুন্দর একটা প্রাকৃতিক হ্রদও আছে শুনেছি, তবে আমার এখনো যাওয়া হয় নি।

বাড়ির পেছনে নদী। বালির চরের ওপর দিয়ে এখানে-ওখানে জল বয়ে যাচ্ছে তির্ তির্ করে। প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর বেঢপ বিরাট শরীরের মতো পাথরের

চাঁই ছড়িয়ে রয়েছে নদীর বুকে। সূর্যের আলোয় নদীর চরে চমকে ওঠে অভ্রের কুচি। ওপারে ধু-ধু প্রান্তর দিগন্তে গিয়ে মিশেছে, সেখানে উড়িষ্যার কেঁওঝর জেলার সীমানা। নীলচে ধোঁয়া দু'একটা পাহাড় দেখা যায় সেদিকে।

এখানে এসে আমার রাখালের জন্য কেবলই মন কেমন করছিল। রাখাল আমাদের পাড়ার ছেলে, বেশিদূর লেখাপড়া করে নি, ম্যাট্রিক পাশ করে হাতের কাজের কি একটা ট্রেনিং নিয়ে এখন বেশ ভালো চাকরি করছে। আমার একনিষ্ঠ ভক্ত। আমার সব কবিতা ও মনোযোগ দিয়ে পড়ে, তারপর গম্ভীরভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করে। মাথায় সামান্য কিছু ছিটও আছে বোধহয়। ছোটবেলা থেকে বঙ্কিম চাটুজ্যে পড়ে শাশ্বত প্রেম সম্বন্ধে ওর একটা নিজস্ব ধারণা জন্মে গিয়েছে। কথাটা যেখানে সেখানে ব্যবহার করতে ভালোবাসে। কবিতা লেখার শখ আছে, বাড়িতে একটা বাঁধানো খাতায় রাত্তিরে বসে গুচ্ছের কবিতা লেখে। তাতে লাইনে লাইনে পবিত্র এবং শাশ্বত প্রেমের ছড়াছড়ি। আমাকে আবার তার সমালোচনা করতে হয়। হাতে-কলমে প্র্যাকটিক্যাল প্রেমেরও শখ আছে, সেটা কিছুতেই করে উঠতে পারছে না। কোনো মেয়েই নাকি ওর মানসপ্রতিমার সঙ্গে মেলে না। অপেক্ষায় আছে।

রাখাল প্রকৃতিপ্রেমিকও বটে। প্রায়ই বলে, শহরের ধোঁয়া আর ধুলোতে দম আটকে যে মরলাম অশোকদা। চলুন, বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসি। এভাবে আর চলে না।

এখানে এলে রাখালেরও খুব ভালো লাগতো, আমিও একজন সঙ্গী পেতাম। সারাদিন কেবল পড়ি আর রাত্তিরে দেওয়ালগিরির আলোয় বসে কবিতা লিখি। একা একা লাগে।

এখানে আসার পাঁচ-ছ'দিন পরে বাবার একটা চিঠি পেলাম। বাবা লিখেছেন —আশা করি তোমরা মঙ্গলময়ের কৃপায় সুস্থই আছো। প্রতি সপ্তাহে অন্তত দুটি চিঠি দিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত রাখবে। একটা কথা জানাই, যামিনীর স্ত্রী ও কন্যা কয়েক দিনের জন্য ওখানে যাচ্ছে। নিজেদের বাড়ি বটে, কিন্তু বহুদিন বাইরে থাকার ফলে ওরাও ওখানে প্রায় তোমাদেরই মতো বিদেশী। তোমার মাকে দিয়ে ওদের কাছে একসঙ্গে খাওয়ার প্রস্তাব করবে। যামিনী পুরনো বন্ধুত্ব মনে রেখে বিনা-ভাড়ায় থাকতে দিয়েছে, আমাদেরও এটুকু করা কর্তব্য।

আমার মন বিশেষ প্রসন্ন হয়ে উঠলো না। কি বিপদ! একা থাকতে খারাপ লাগছিল বটে, কিন্তু এরকম সঙ্গী চাই নি তাই বলে! সারাদিন ভদ্রতা করতে করতেই মরবো। এক একজন মহিলার আবার ভয়ানক বক্‌বক করা স্বভাব থাকে। ইনি কেমন কে জানে!

এর তিন দিন পরে যামিনীবাবুর স্ত্রী ও মেয়ে এসে হাজির হলেন যখন, তখন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম মনের মধ্যে পূর্বের বিরক্তির আর লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। আমি এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে ভদ্রমহিলা আমার থুতনিতে হাত ছুঁইয়ে চুমু খেয়ে বললেন, এসো বাবা, এসো। কল্যাণ হোক। তুমিই তো অশোক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—বুঝতে পেরেছি। তবে আগে দেখি নি তো কখনো, তাই আর কি—তুমি আমাকে মাসীমা বলে ডেকো বাবা। তোমার বাবা আর উনি তো হরিহর আত্মা ছিলেন, আমি অবশ্য সে যুগটা দেখি নি। উনি যখন দিল্লীতে, তখন আমার বিয়ে হয়। আমার বাবাও ওখানেই কাজ করতেন কিনা। এই আমার মেয়ে নন্দিনী। আলাপ করে নাও তোমরা। মা কই তোমার?

আমার হাতে নন্দিনীকে সমর্পণ করে মাসীমা মায়ের সঙ্গে গল্পে জমে গেলেন। আমি মেয়েটিকে ততক্ষণে বেশ ভালো করে দেখেছি কয়েকবার, অবশ্য আড়চোখে। ছিপছিপে গড়ন, একটু লম্বার দিকে। একটা নীল জমির ওপরে সাদা ডুবে দেওয়া শাড়ি পরে তাকে আরও লম্বা দেখাচ্ছে। হাতকাটা নীল ব্লাউজ গায়ে। সুন্দরী নয় সে কোনোমতেই, কিন্তু তার শরীরের সুন্দর ছন্দ, আশ্চর্য আবেদনময় চোখ, যা সেরে ওঠায় আমার মনের একটা বাঁধনহারা নরম অবস্থা এবং সবচেয়ে বড় কথা, আমার সেই সাংঘাতিক বয়েস আমার রক্তে নেশা ধরিয়ে দিল। আমি হাতজোড় করে বললাম, নমস্কার।

নন্দিনী আমার নমস্কার ফিরিয়ে দিল না, ঈষৎ গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা বলছিলেন আপনি নাকি পড়ছেন। কি পড়েন আপনি?

ওর কথাবার্তায় সুস্পষ্ট দাম্ভিকতা রয়েছে। প্রতিনমস্কার না করায় একটু অবাক হয়েছিলাম, এবার দেখলাম ওর দুই চোখে তীব্র আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্বিনীত বন্যভাবও বর্তমান। প্রথম দৃষ্টিতেই আমি প্রেমে পড়ি নি বা 'এই মেয়েটিকে আমার চাই' এমন কথা মনে হয় নি, অথচ নন্দিনীর এই অবহেলা ও গর্বমিশ্রিত ব্যবহারে আমার মাথায় আগুন লেগে গেল। ওর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম, আমি বি. এ. পড়ি, এবার পরীক্ষা দেবো।

—অনার্স আছে?

—আছে। ইংরিজিতে।

বলেই রাগের মাথায় প্রশ্ন করলাম, আপনার ম্যাট্রিক পাশ করা হয়ে গিয়েছে?

ম্যাট্রিক' একটুখানি হকচকিয়ে গেল নন্দিনী, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য তারপরই বেশ শব্দ করে হেসে উঠলো। ওর হাসি দেখেই বুঝলাম আমার মনের ভাব ধরা পড়ে গিয়েছে, অসহায় রাগ আমার মনের মধ্যে ফুলে উঠলো। হাসি থামিয়ে নন্দিনী বললো, হ্যাঁ, আমার ম্যাট্রিক পাশ করা হয়ে গিয়েছে। আজ নয়, কয়েক বছর আগে। আমিও সামনের বছর বি. এ. পরীক্ষা দেবো।

আমার রাগ কমে নি, বললাম, আপনার কি বিষয়ে অনার্স? একটু ঝুঁকে ডান হাতের ফর্সা দু'আঙুলে শাড়ির কুঁচি ঠিক করতে করতে নন্দিনী বলল, ফিলজফি। তারপর চট্ করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মানে—দর্শন।

বললাম, জানি।

ওর মা ডাকলেন ভেতর থেকে, আমাকে কিছু না বলেই ও বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

অনেক দিন কেটে যাওয়ার পরে এখন পরিণত বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে

বুঝতে পারি আমার সেদিন যে মনোভাব হয়েছিল, তা ঠিক রাগ নয়। নারীকে অধিকার করবার আকাঙ্ক্ষা পুরুষের আদিমতম প্রবৃত্তি, সেদিন আমার সেই প্রবৃত্তির মূলে আঘাত লেগে আমি অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। মনের গোপন কামনার স্থির জলে নন্দিনীর ছায়া পড়েছিল।

এই নন্দিনীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা।

সারাদিন নন্দিনী ঘুমিয়ে রইলো। ট্রেন জার্নি করে ওরা ক্লান্ত। আমার দিন কাটলো ছটফট করে। কিছুই যেন আর ভালো লাগে না। রাত্তিরে খাবার জায়গা হলে পুষ্পদিকে ডেকে বললাম, আমার খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দাও। এখন খেতে ইচ্ছে করছে না।

সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি তখন একা রাত জেগে প্রেতগ্রস্তের মতো প্রমিথিউস আনবাউন্ড পড়ছি। পাহাড়ের চূড়ায় শেকল দিয়ে বাঁধা প্রমিথিউস শুয়ে। রোজ এক দানব পাখি এসে খেয়ে যায় তার যকৃত, উৎকট যন্ত্রণায় চিৎকার করে প্রমিথিউস। পরের দিন দেবতার অভিশাপে আবার নতুন যকৃত জন্মায় তার। আবার নতুন করে সেই যন্ত্রণা। পড়ছি, আর টের পাচ্ছি আমার শরীরেব ভেতরেও কোথায় একটা বিষাক্ত লাল পিঁপড়ে কামড়াবার মতো কষ্ট ঘুরপাক খাচ্ছে। কষ্ট সবটাই কি শুধু নন্দিনীর কথায়? তা নয়। আসলে আমার প্রচ্ছন্ন হীনমন্যতাই আমাকে রাগিয়ে তুলছিল। নন্দিনীকে দেখে আমাব ভালো লেগেছে। প্রেমের কথা বলছি না, একবার মাত্র দেখে বাছুরে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া আমি বরাবর ঘৃণা করি। কিন্তু কেবলমাত্র রূপ ও সান্নিধ্যেরও তো একটা মোহ আছে। তাছাড়া আমার বাবা এবং নন্দিনীর বাবা বাল্যবন্ধু। অথচ ওর বাবা দু'পয়সা করে বেশ গুছিয়ে বসেছেন, আর আমার বাবা আজও সামান্য কেরানী। আমি মায়ের স্বাস্থ্য মেরামত করবার জন্য ওদেরই বাড়িতে এসে বিনা-ভাড়ায় রয়েছি। মনে মনে বুঝতে পারছি ওর দিকে আমার হাত বাড়ানো উচিত নয়, কিন্তু বুঝতে পারাই কি সব? অপ্রাপ্তব্য বস্তুর প্রতি লোভ থাকাটাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কষ্ট। রাগ, ক্ষোভ, কামনা—সব মিলে একটা মিশ্র অনুভূতি আমাকে ছিঁড়ে ফেলছিল।

পরের দিন বিকেলে বসে ভাষাতত্ত্ব পড়ছি, হঠাৎ দরজার কাছে কাব ছায়া পড়লো। ভেবেছিলাম পুষ্পদি, তাই আর তাকাই নি। এমন সময় প্রশ্ন শুনলাম, পড়ছেন নাকি?

নন্দিনীর গলা।

চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে বললাম, না, বেগুন বিক্রি করছি।

একটু আশ্চর্য হয়ে ভ্রূ কোঁচকালো নন্দিনী। বেগুন বিক্রি করছেন, তার মানে?

—মানে, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন পড়ছি, তবু ও প্রশ্নের অর্থ কি? বই সামনে নিয়ে একজন পড়া ছাড়া আর কি করে?

—আপনি আশ্চর্য লোক তো, অমনভাবে কথা বলে নাকি?

—আমি বলি।

—বেশ, বলবেন তাহলে।

হাত দিয়ে খোঁপা ঠিক আছে কিনা দেখল নন্দিনী, বলল, এখন কি তাহলে

পড়াশুনোই করবেন ?

আমার কথা ওকে একটুও বিচলিত করতে পারে নি। এভাবে চললে আমার হার হবেই। বললাম, কেন ? কোনো দরকার আছে ?

—আজ আর পড়তে হবে না, বই তুলে রাখুন। চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

—আপনার সঙ্গে ? কোথায় ?

নন্দিনী হাসলো—কেন ? আমার সঙ্গে গেলে কি হয় ? নিন, উঠে পড়ুন। আর দেরি করবেন না।

মেয়েটার অনুরোধের মধ্যেও একটা প্রচ্ছন্ন আদেশের সুর আছে, শুনলে রাগ হবারই কথা। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম বই বন্ধ করে রেখে আমি উঠে চটিতে পা গলাচ্ছি। এই প্রথম একটি অনাত্মীয়া তরুণী মেয়ে আমাকে আহ্বান জানাচ্ছে, হোক প্রেমে, হোক অপ্রেমে—আমার বুকের মধ্যে দুলে উঠলো। এ আকর্ষণ অগ্রাহ্য করা যায় না। আমার অভিমান ও রাগকে ছাড়িয়ে প্রভাব বিস্তার করছে দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো নন্দিনীর উপস্থিতি। স্বয়ং আদি পিতা আদম পারেন নি, আমি তো সামান্য বি. এ ক্লাশের অর্বাচীন ছাত্র।

জানালা দিয়ে বাড়ির পেছনে নদী দেখতে পাচ্ছি। বিকেলের স্বচ্ছ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে প্রসার। ওই নদীর পাড়ে, বালির ওপরে এখন আমি আর নন্দিনী বেড়াবো। কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। আঁটো করে শাড়ি পরেছে, টান করে বেঁধেছে চুল। কপালের ঠিক মাঝখান বড় একটা বেগুনী রঙের টিপ। আশ্চর্য মাদকতায় আমার শরীর ঝিমঝিম করে উঠলো। কবি ঠিকই বলেছিলেন—শী ওয়াকস্ ইন বিউটি—বড় সত্যি কথা।

নদীর চরে নেমে আমরা হাঁটছিলাম। কাকের চোখের মতো স্বচ্ছ জল তিন-চারটি ধারায় বালির ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। নন্দিনী জলের ধারে দৌড়ে গিয়ে বলল, দেখুন—কতো মাছ এখানে।

কাছে গিয়ে ওর পাশে দাঁড়ালাম। জলে অনেক তেচোখা মাছ কিলবিল করছে সত্যিই। আরো কিসব মাছ রয়েছে, সব চিনতে পারলাম না।

জলে নন্দিনীর ছায়া পড়েছে। স্রোতের জল, তাই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে প্রতিবিম্ব। বাতাসে উড়ছে নন্দিনীর দু'একটা ছড়িয়ে থাকা খুচরো চুল। ও মুখ নিচু করে একমনে মাছ দেখছে। আমি দেখছি ওকে।

পশ্চিমের আকাশ একটু একটু করে পাটলবর্ণ হয়ে উঠছে। একেই কি কনে-দেখা-আলো বলে ? হলুদবাটা রঙের সেই আলো এসে পড়েছে নন্দিনীর শরীরে। পেছনে পটভূমি হিসাবে বালুচর, তার পেছনে রাঙামাটির প্রান্তর, তারও পেছনে নীল নীল পাহাড় আকাশে হেলান দিয়ে রয়েছে। আমার দম আটকে এলো অদ্ভুত এক ভালো লাগায়। শুধুই শরীর নয়, প্রেম নয়, জোলো রোম্যাণ্টিসিজম্ নয়—এ যেন তার চেয়েও বড়ো কিছু। ভাষা দিয়ে তা বোঝানো যায় না। মোটকথা, আমি যেন অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম নন্দিনীর প্রতি আমার যে আকর্ষণ, তার মূল প্রোথিত রয়েছে এই পরিবেশে, এই পাহাড়-নদী দিয়ে ঘেরা সৌন্দর্যময় ভূখণ্ডে,

মা সেরে ওঠায় আমার মনের আনন্দিত অবস্থার মধ্যে, আজকের এই হলুদ গোধূলি থেকে, এই নদীর পাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কোথাও নিয়ে গেলে নন্দিনী যে কোনো সাধারণ মেয়ের মতো হয়ে যাবে। হয়তো পাশ দিয়ে চলে গেলেও ওকে আমি চিনতে পাববো না।

কিন্তু বর্তমান বড়ো সত্যি। এখান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নন্দিনীকে দেখলে কি হবে সেটা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু আজ এর চেয়ে বড়ো সত্য নেই যে নন্দিনীর ছায়া আমাকে আবৃত করেছে।

জল থেকে চোখ তুলে নন্দিনী বললো, আচ্ছা, ওই পাহাড়টার নাম কি?

তার নির্দিষ্ট করা দিকে তাকিয়ে বললাম, টিটকি পাহাড়।

—ওটাই সবচেয়ে কাছে, না?

—হ্যাঁ।

—কালকে আপনি আমাকে ওইখানে বেড়াতে নিয়ে যাবেন।

এটা অনুরোধ নয়, প্রশ্নও নয়। বরং কিছুটা আদেশের মতো শোনালো। ও যেন ধরেই নিয়েছে ও যা বলবে আমি তা করতে বাধ্য। বললাম, আমার সময় হবে না। কাল আমার পড়া আছে।

—পড়া আগে করে রাখবেন।

—না, আমার সময় হবে না।

নন্দিনী কিছুটা যেন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, বাঃ, আমি তাহলে কার সঙ্গে যাবো?

আমি চমকে উঠলাম। অদ্ভুত তো মেয়েটা। এক একটা এমন কথা বলে যার কোনো মানে হয় না। ও কার সঙ্গে বেড়াতে যাবে আমি তার কি জানি? আমার সঙ্গে চুক্তি করে বেড়াতে এসেছে নাকি ও? যার ওপরে দাবী আছে, যে নিতান্ত ঘনিষ্ঠ, তাকে ছাড়া এসব কথা বলে নাকি কেউ? ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম ও খুব স্বাভাবিক মুখেই চারদিক তাকিয়ে দেখছে। নন্দিনী কি বোঝে না কোন্ কথার কি অর্থ? নাকি নাচিয়ে বেড়ানো ওর স্বভাব?

বুঝতে পারলাম না, কিন্তু ভেতর থেকে তাগিদটা অনুভব করলাম। ওকে অস্বীকার করা যায় না। নিশির ডাকের মতো নন্দিনী আমাকে ইচ্ছামতো ডেকে নিয়ে যেতে পারে বিপজ্জনক চোরাবালির ওপরে, আমি একটুও আপত্তি না করে ওর সঙ্গে চলে যাবো।

বললাম, ঠিক আছে, ভেবে দেখবো কালকে।

নন্দিনী সেই গর্বিত ধরনে হেসে বললো, তার মানেই যাবেন।

প্রসঙ্গ পাল্টে আমি বললাম, আচ্ছা এখানকার কিছু আপনি চেনেন না, এটা কি রকম কথা। বাড়ি তো আপনাদের, আমি আজ কয়েকদিন হলো এসেছি। কোথায় আপনি আমাকে সবকিছু চেনাবেন, উল্টে আপনিই জিজ্ঞাসা করছেন ওই পাহাড়টার কি নাম?

নন্দিনী বললো, আমরা এখানে থাকি নি তো কখনো। বাবা চিরকাল বাইরে বাইরে চাকরি করে বেরিয়েছেন, আসবার সুযোগই হয় নি। খুব ছোটবেলায় একবার এসে হপ্তাখানেক ছিলাম, সে আমার ভালো মনে পড়ে না।

—দেখাশুনো করতো কে?

—এখানে বাবার এক বন্ধু আছেন, তাঁর কাঠের ব্যবসা। বাবা মাঝে মাঝে বাড়ি মেরামত করার জন্য তাঁর কাছে টাকা পাঠিয়ে দেন। তাঁরই কর্মচারী একজন শোয় রাত্তিরে।

একটু থেমে নন্দিনী বললো, আপনারা ক'দিন থাকবেন?

—দেখি, ঠিক নেই কিছু। মায়ের শরীর একটু ঠিক হয়ে এলেই ফিরে যাবো।

—কি হয়েছিল মায়ের?

—গলব্লাডারে পাথর ছিলো। ভয়ানক যন্ত্রণা হতো, তার সঙ্গে জন্ডিস, জ্বর। অপারেশন করতে হয়েছিলো। কোনোরকমে বেঁচেছেন।

এখানে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। আমার কথা শুনে নন্দিনীর চোখ করুণায় নত হয়ে এলো, মেকী নয়—প্রকৃত নারীজনোচিত সমবেদনা। নিতান্ত স্বাভাবিক একটি মেয়ের মতো নন্দিনী বললো, আহা রে, বড়ো কষ্ট গেছে তো আপনার মায়ের!

কিছুই নয়, অত্যন্ত সাধারণ কথা, কারো অসুখের কথা শুনলে সবাই এই কথাই বলে। কিন্তু নন্দিনীকে প্রথম থেকেই আমি আমার গণ্ডীর বাইরে অবস্থিত এক গর্বিত, উদ্ধত এবং অসাধারণ অস্তিত্ব হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। ওর এই কথা আমার চোখে ওকে কিছুটা মাটির কাছাকাছি এনে দিলো। ছেলেমানুষ, বড়ো হয়েছে বাংলার বাইরে। ব্যবহারে অসঙ্গতি থাকাটা আশ্চর্য নয়।

বললাম, পাহাড়ী জায়গা ভালো লাগে আপনার?

—খু-উ-ব। জঙ্গলে ঘেরা পাহাড় থাকলে আরো ভালো লাগে।

—তাই নাকি? টিকি পাহাড়ের ওপারেই তো বিরাট জঙ্গল, কাল দেখাবো আপনাকে।

—জঙ্গলে বাঘ আছে? বুনো জানোয়ার?

—বাঘ বোধহয় নেই। তবে হাতী আছে শুনেছি, আর ভালুক।

চোখ বড়ো বড়ো করে মুখের একটা সুন্দর ভঙ্গি করলো নন্দিনী।

বললাম, কি, শুনেই কাঁপুনি ধরেছে তো?

—বটেই। আমি কাল যাচ্ছিনে আপনার সঙ্গে।

—ভয় নেই। হাতীরা জঙ্গলের ভেতর থাকে। টিকি পাহাড়ে কোনো ভয়ের কারণ নেই।

নন্দিনী হাসলো, বললো, আচ্ছা—যাবো তাহলে।

দু'জনে নদীর বুকে একখানা কালো পাথরের ওপরে উঠে বসলাম। এবার গোধূলি ফুরিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। পাথরে ওঠবার সময় নন্দিনী কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে, ওর বেতের লতার মতো দেহ, অনাবৃত কাঁধ শেষ বিকেলের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এত কাছে বসে আছে নন্দিনী, কিন্তু জীবনে কোনোদিনও আমি ওকে স্পর্শ করতে পারবো না। বিত্তবান পিতার মেয়ে, ওর যোগ্য হয়ে উঠে যখন ওকে চাইতে যাবো—ততদিনে বিয়ে হয়ে ও সন্তানের জননী হয়ে গিয়েছে। আর তাছাড়া ওকে কোথায় রাখবো আমি? দু'কামরার দেওয়ালে

নোনাধরা বাসাবাড়িতে ও থাকতে পারবে কখনো? পাশ করেই বা আমি এমন কি চাকরি পাবো? এমনিতেও এতসব ভাবার কোনো অর্থ হয় না। আমার মনের ভাব প্রকাশ করলেই হয়তো ক্রুদ্ধ, বিস্মিত মুখে নন্দিনী বলে উঠবে—ছি ছি! আপনি এইরকম!

তার চেয়ে চুপ করে থাকবো আমি, দু'দিনের আনন্দ কুড়িয়ে নেবো পৃথিবীর পথ থেকে।

নন্দিনী কথা না বলে তাকিয়ে ছিলো দিগন্তস্পর্শী মাঠের দিকে। খুব বড়ো খোলামেলা জায়গা সবারই মনে প্রভাব বিস্তার করে। মন উদার হয়ে যায়, অকারণ আনন্দ জেগে ওঠে হঠাৎ। চিরশত্রুকেও এমন জায়গায় বসে ক্ষমা করে দেওয়া যায়।

নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বললাম, আপনি গান গাইতে পারেন?

ও বোধহয় একটু অনমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, মাঠ থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকালো, বললো, আমি?

—হ্যাঁ। গান গাইতে পারেন?

—না তো। কেন?

—জানলে এখন একটা গাইতে বলতাম।

—আহা, আপনি বললেই আমি গাইতাম যেন।

—গাইতেন না?

—কক্ষনো না। আমি কারো হুকুমে কিছু করি না।

বুঝলাম। মেয়েটা আসলে ভয়ানক জেদী। আদরে আদরে মানুষ হয়েছে। যা ভাবে তাই করে, ওর বিরোধিতাও যে কেউ করতে পারে, এটা মাথায় আসে না। বললাম, হুকুম ভাবছেন কেন? অনুরোধও তো হতে পারে?

—পারে। কিন্তু আমি গান জানি না।

তারপর আমার দিকে মুখ করে ঘুরে বসে বললো আপনি গাইতে পারেন?

—না, কিন্তু আমি কবিতা লিখতে পারি।

নন্দিনীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো—সত্যি বলছেন?

—সত্যি। মেয়েদের কাছে মিথ্যে কথা বলে বাহাদুরী নেওয়া আমার স্বভাব নয়।

—কি নিয়ে লেখেন?

—তার কি কোনো ঠিক আছে? যেটা মনে ছাপ ফেলে তাই নিয়েই লিখতে পারি। নদী, বালির চর, বিষণ্ণ বিকেল, একটা শালিক পাখি, এমন কি—একটু থেমে বললাম, এমন কি আপনি, আপনাকে নিয়েও লিখতে পারি কবিতা।

ভেবেছিলাম রাগী মেয়ে আবার রেগে উঠবে, কিন্তু নন্দিনী হাসিমুখে বলল, যাঃ! আমার বিশ্বাস হয় না!

—কি বিশ্বাস হয় না?

—আমাকে নিয়ে লিখতে পারবেন না আপনি।

স্বপ্নের দেশে যাবার ছাড়পত্র একজন আমার হাতে তুলে দিচ্ছে। মনের ভাব চেপে গম্ভীরমুখে বললাম, শুকনো কথার কোনো দাম নেই। আপনি বাজি ধরুন, কালকে বিকেলের মধ্যে আমি কবিতা লিখে দেখাচ্ছি।

জেদী মেয়ে, বললো, ঠিক আছে, বলুন কি বাজি?

—এখন বলে দরকার নেই, যে জিতবে সে কাল তার নিজের ইচ্ছেমতো চেয়ে নেবে।

হারবে না কিছুতেই। বললো, আচ্ছা—তাই হবে তাহলে। কখন শোনাবেন কবিতা?

—কালকে টিঁক পাহাড়ে ওধারের বনে বেড়াতে যাবেন তো?

—যাবো।

—সেখানেই শোনাবো আপনাকে।

—বনের মধ্যে কেন?

—বাঃ। সব কিছুরই জন্য একটা পরিবেশ দরকার হয় না? শিল্প কি যেখানে-সেখানে পরিবেশন করতে আছে? কাল তৈরি থাকবেন তাহলে। বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে বেরুবো।

সেদিন সারারাত তারায় তারায় জ্বলে রইলো দীপ্তশিখার আগুন। স্তব্ধ প্রহরের সুযোগে কখন সে আগুন নেমে এসে ছুঁয়ে গেলো আমার বুকের ভেতরটাকে। সদ্য নিরাময় হয়ে ওঠার গভীর শান্তিতে মা ঘুমিয়ে রয়েছেন পাশের ঘরে। ওই বারান্দার ওপাশে একটা ঘরে ঘুমিয়ে রয়েছে নন্দিনী। আমি কেরোসিনের আলোয় একা জেগে বসে তার জন্য কবিতা লিখছি। সময়ের এমন সদ্ব্যয় জীবনে আর কখনো করি নি।

আজ ঘুম আসবে না। জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি নদীর বুকে অপূর্ব জ্যোৎস্না ফুটেছে। চাঁদের নরম আলোয় থৈ-থৈ ভাসছে প্রান্তর। আমার সার্বিক অস্তিত্বের ওপর ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে মধ্যরাত্রি। না হোক আমার সঙ্গে নন্দিনীর মিলন, হোক না কেন দু'দিনের ছায়াবাজি—তবু একথা তো সত্য যে, এই আমার জীবনে প্রথম প্রেম। আজ থেকে বিশ ত্রিশ কি চল্লিশ বছর পরে বুড়োবয়েসেও যদি কোনোদিন আবার এখানে ফিরে আসি, তাহলে ওই নদীর চর দিয়ে হেঁটে গেলে আশ্চর্য উপলব্ধিতে শিউরে উঠবে আমার দেহ—কারণ এই নদীচর একদিন নন্দিনীর পায়ের স্পর্শ পেয়েছিলো। সেই পাথরটার ওপরে বসে সেদিন নির্জন প্রান্তরে সূর্যাস্ত দেখবো আমি—একা।

এই আমার কবিতার উপাদান।

এই ভাব নিয়ে সমস্ত রাত খরচ করে একটি কবিতা লিখলাম আমি। শেষ করে যখন আলোটা কমিয়ে দিয়ে শুতে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, তখন জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে নিভে এসেছে। গভীর ক্লান্তি নেমেছে শরীরে। যা বলবার ছিলো তা বলতে যে কতো কষ্ট! ঘুমিয়ে বাকি রাতটা নন্দিনীকে স্বপ্নে দেখলাম আমি।

পরের দিন বিকেলে ঠিক সাড়ে চারটের সময় নন্দিনী তৈরি হয়ে এসে বলল, আপনার হয় নি এখনো? বেরুবেন না?

—বেরুবো বইকি!

—লিখেছেন কবিতা?

—সে কথা এখন বলবো না। হয়তো লিখেছি হয়তো লিখি নি। চলুন, বেরিয়ে

তো পড়ি আগে, তারপরে দেখা যাবে।

মাঠের মধ্যে দিয়ে সাঁওতালদের হাটে যাবার জন্য একটা পায়ে চলার পথ আছে। সেটা ধরে দু'জনে হাঁটতে শুরু করলাম। একবার আমার দিকে তাকিয়ে নন্দিনী বললো, কি ভাবছেন?

—ভাবছি, এই যে আপনি আমার সঙ্গে একা বেড়াতে বের হলেন, আপনার মা কিছু মনে করবেন না তো?

—কেন, এতে মনে করবার কি আছে?

—হাজার হোক, আমি আপনার সম্পূর্ণ অনাত্মীয়। একেবারে একা আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোটা—

নন্দিনী আবার তার পুরানো তেজে ঝলসে উঠলো—আমার মাকে আপনি কি এত হীন মনে করেন?

একটু থতমত খেয়ে বললাম, মাসীমা না হোক, অন্য কেউও তো কিছু মনে করতে পারে।

—অন্য কাউকে আমি পরোয়া করি না।

হেসে বললাম, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—করুন।

—আপনার কি সিংহ রাশি?

অবাক হয়ে নন্দিনী বললো, কি করে জানলেন। সত্যি আমার সিংহ রাশিই তো! কি করে জানলেন বলুন না!

—এতে কোনো ম্যাজিক নেই। আপনার তেজ দেখে আন্দাজ করলাম। সিংহ রাশি হলে মানুষ খুব তেজী হয়।

ঠোঁট টিপে হেসে নন্দিনী বললো, আমার বুঝি খুব তেজ আছে?

বললাম, তা একটু আছে।

—গালাগাল দিচ্ছেন?

—সত্যি কথা বলছি। গালাগাল মনে হচ্ছে?

নন্দিনী এবার হেসে ফেললো। ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর এই প্রথম ওর মুক্ত উজ্জ্বল হাসি দেখলাম। বুঝলাম কুয়াশা অনেকখানি কেটে গিয়েছে।

নন্দিনী বললে, একটা কথা আপনাকে বলা দরকার, সত্যি উত্তর দেবেন কিন্তু।

—শুনি তো আগে।

—আমার ওপরে আপনি খুব চটে আছেন না?

—নাঃ। চটে থাকবো কেন খামোকা?

—আমি জানি। প্রথম আলাপে আপনার সঙ্গে আমি অনেকগুলো কাঠ কাঠ কথা বলেছি, তাই না? আপনি হয়তো আমাকে ভীষণ দাম্ভিক আর অহংকারী ভেবেছেন। আসলে কি জানেন, প্রথম আলাপে আমি কারো সঙ্গে সহজ হতে পারি না। ওই রকম হয়ে যায়। যাকে আমার ভালো লাগে না, তার সঙ্গে আমার ব্যবহার আপনা আপনি ওইরকম হয়। রাগ করবেন না।

বললাম, আমার সঙ্গে তো এখন ভালো ব্যবহার করছেন। এর কারণ কি?

নন্দিনীর কান লাল হয়ে গেলো।

বললাম—থাক্। উত্তর চাই না। জেনে যাবো একদিন।

টিকি পাহাড়ের ওধারের অরণ্যে বিকেল নেমেছে। নিঃঝুম বন, কেবল শালের পাতায় পাতায় যাযাবর বাতাসের উদাস শব্দ। যেন প্রকৃতি আপনমনে একটি কবিতা পড়ে শোনাচ্ছে।

নন্দিনী বললো, কি সুন্দর জায়গা ! এ রকম জায়গায় এলে আমার খুব খারাপ লাগে, জানেন ?

—খারাপ লাগে ! কেন ?

—মনে হয়, আবার তো ফিরে যেতেই হবে শহরে। যতই ভালো লাগুক, এখানে চিরদিন থাকবার অধিকার নেই।

কথাটা আমার বুকে ধ্বক্ করে লাগলো। কিছুরই তো চিরদিনের অধিকার নেই আমাদের। খেলাটা যখন জমে ওঠে, ঠিক তখনই শেষ হয়ে যায়।

শালপাতা খসে খসে পড়ছে হাওয়ার দোলায়, সেগুন গাছের বড়ো বড়ো হাতীর কানের মতো পাতা ঝট্‌পট্ করে নড়ে উঠছে। সোনালী মুগার সুতো দিয়ে কাজ করা শাড়ি পরেছে নন্দিনী, আঁচলটা ওর অভ্যেসমতো শক্ত করে কোমরে জড়ানো। বহ্নিলতা যেন! ঠিক যেন একটা আগুনের পাখি। বিকেল আর একটু গাঢ় হলেই যেন শেলীর স্কাইলার্কের মতো ও পশ্চিমের মুক্তমেঘস্তূপের ওপর দিয়ে আগুনের গোলকের মতো উড়ে যাবে অন্য কোথাও, যেখানে পার্থিব ভীতির ছায়া আত্মাকে কৃশ করে না, আশাভঙ্গের বেদনা ম্লান করে না হৃদয়ের উজ্জ্বল অবয়ব।

আমরা থেমে গিয়ে পাতার মর্মর শুনছিলাম। নন্দিনী হঠাৎ বললে, আপনি কি কবিতাটা সত্যিই লিখেছেন ?

বললাম, লিখেছি।

—তাহলে এইখানে শোনান। আমি এই গাছটার নিচে বসি, আপনি মুখোমুখি বসে শোনান।

ছায়া ছায়া শান্ত অরণ্য। নন্দিনী একটা দীর্ঘদেহ শালগাছের নিচে বসলো, ওর সামনে বসলাম আমি—পকেট থেকে কাগজটা বের করে নিলাম হাতে। পড়বো কবিতাটা? পড়লেই ও আমার মনের কথা জেনে ফেলবে—যা এখনো স্পষ্ট করে বলা হয় নি।

নন্দিনী বললো, কি হলো ? পড়ুন—এরপর অন্ধকার নেমে আসবে। আমাদের ফিরে যেতে হবে যে—

কাগজের ভাঁজ খুলে একবার ওর দিকে তাকালাম। দুটি আগ্রহী চোখ প্রত্যাশিত কিছু শোনবার আকাঙ্খায় উদগ্রীব।

আর মুখ না তুলে আস্তে আস্তে পড়ে গেলাম সমস্ত কবিতাটা। ঝিরঝিরে বাতাস আমার শরীরে হাল্কা আঙুল বুলিয়ে গেল, খস্‌খস্ শব্দে সরে গেল শুকনো ঝরাপাতার রাশি। দু'হাত দিয়ে হাঁটু জড়িয়ে ধরে তার ওপর চিবুক রেখে নন্দিনী চুপ করে শুনলো।

আমার কবিতা ফুরিয়ে গেল, নন্দিনী কথা বললো না। আমার হাতে ধরা কাগজখানা ফর্‌ফর্ করছে হাওয়ায়। ঘরমুখো কি একদল পাখি চিক্ চিক্

করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। বললাম, কিছু বললেন না?

আস্তে আস্তে নন্দিনী বললে, এই কবিতাটা কি আপনি সত্যিই আমাকে নিয়ে লিখেছেন? আমাকে উদ্দেশ্য করে?

—হ্যাঁ। তাই তো কথা ছিলো।

সামান্য স্তব্ধতা।

তারপর নন্দিনী কেমন বিহ্বল গলায় বললো, জানেন, এই প্রথম কেউ আমাকে নিয়ে কবিতা লিখলো।

—আপনার ভালো লেগেছে?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ও বললো, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

—বলুন।

—যা লিখেছেন তা সত্যি, নাকি লিখতে হয় তাই লেখা?

বললাম, পড়ে বুঝতে পারেন নি?

ও চুপ করে বসে রইলো।

বললাম, কেমন লেগেছে বললেন না?

নন্দিনীর যেন সম্বিত ফিরে এলো, মুখ তুলে বললো, ভালো লাগে নি। বিচ্ছিরি হয়েছে।

—তাই?

—হ্যাঁ। আপনি হেরে গিয়েছেন। আমি মোটেও বিশ্বাস করি নি এটা আমাকে নিয়ে লেখা। কথামতো আমাকে বাজিটা দিয়ে দেওয়া উচিত।

হাসলাম।—বেশ তো, না হয় হারই স্বীকার করলাম। কোথাও কোথাও পরাজয় জয়ের চাইতে গৌরবময় হয়ে ওঠে। বলুন, কি চাই আপনার? সাধ্যের মধ্যে হলে দেব নিশ্চয়।

—প্রার্থনা একটাই, আজ থেকে আপনি আমাকে 'তুমি' বলবেন।

—এই মুহূর্তে একথা বলবার কি মানে হয় জানো তুমি?

—জানি।

—তবু বলছো?

—তবু বলছি।

—নন্দিনী—

—বলুন।

—জিতলে কি এর চেয়ে বেশি পাওয়া হতো?

উত্তর নেই।

আমার মনে আর উন্মাদনা নেই, কোনো আবর্ত নেই। নন্দিনীর মনের কথা জানা হয়ে যেতেই ঢেউ শান্ত হয়ে এসেছে। আর কোনো ভয়ও নেই আমার। এবার ও যেখানে খুশি চলে যাক, সারাজীবন আর দেখা হোক্ বা নাই হোক্, ওর মনের কথা তো আমার জানা হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ নন্দিনী বললো, আপনাকে ঠকাতে চাই না আমি। আজ যার শুরু, আজই তার শেষ হয়ে যাক্।

অবাক হয়ে বললাম, কি বলতে চাইছো তুমি?

—আমার বিয়ে বাবা ঠিক করে রেখেছেন অনেকদিন। পাত্র বিলেতে পড়তে গিয়েছে, ফিরলেই বিয়ে হবে। আপনি মিথ্যে কষ্ট পাবেন না।

তারপর একটু থেমে আবার বললো, আপনি কষ্ট পেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

এ তো আমি ধরেই রেখেছিলাম। কি এমন নতুন কথা বললে নন্দিনী? কিন্তু তবু—তবু যেন অদৃশ্য একটা কাঁটা বেঁধে বুকের গভীরে। রক্ত পড়ে। অধিকার ছেড়ে দেওয়া বড়ো কষ্টের, বুক থেকে উপড়ে দিতে হয় শ্রেষ্ঠ রত্ন।

বললাম, জানতাম। আমি তো অসম্ভবের আশা করি নি। তাছাড়া প্রেম আর বিয়ে কি এক জিনিস? অনেকদিন একসঙ্গে থাকলে হয়তো একদিন আমার ত্রুটিগুলো, আমার হীনতা তোমার চোখে ধরা পড়ে যেতো। তার চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কি হতে পারে? প্রাত্যহিকতার স্পর্শ প্রেমের শুচিতাকে ধ্বংস করে। পড়ো নি শেষের কবিতা? তার চেয়ে এই তো ভালো—আজকের দিনটাই মহৎ হয়ে থাক।

ঘর-পালানো-ছেলের বাড়ি ফিরে আসার মতো চুপি চুপি অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকার। টিকি পাহাড়ের গায়ে ইউক্যালিপটাসের সারি শাখা-প্রশাখা নেড়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে,—না—না—না। আমরা ফিরে যাচ্ছি শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে। শাল-সেগুনের পাতার ফাঁকে প্রায়ান্ধকার আকাশ চোখে পড়ে ক্বচিৎ।

হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়লো নন্দিনী।

—কি হলো?

—একটা পাথর পায়ে লেগে—উঃ।

নিচু হয়ে দেখলাম একটা ধারালো পাথরে লেগে বাঁ পায়ের পাতার ধারের দিকে খানিকটা কেটে গিয়েছে। ফর্সা পায়ের পাতায় ফুটে উঠেছে একটা লাল ফুল। রক্ত বেরিয়ে আসছে।

বললাম, বসে পড়ো দেখি।

—কেন?

—বসে পড়ো না।

ও সন্তর্পণে বসলো ছড়িয়ে থাকা শুকনো পাতার ওপরে। আমি পকেট থেকে রুমাল বের করে আলতো করে ওর পা কাছে টেনে নিলাম। নন্দিনী সঙ্কুচিত হয়ে বললো, না, না, ছিঃ। তা হয় না। কি করছেন আপনি?

—খুব হয়। চুপ করে বসে থাকো তো।

রুমালটা ছিঁড়ে দু'টুকরো করে এক টুকরো দিয়ে ওর রক্ত মুছিয়ে দিলাম। হাত বুলিয়ে আদর করে দিলাম একটু। তারপর অন্যটা দিয়ে বেঁধে দিলাম ওর পা।

মুখ তুলে দেখি নন্দিনী নিঃশব্দে কাঁদছে।

—কেঁদো না নন্দিনী। তুমি কষ্ট পেলে আমিও কষ্ট পাবো। তোমারই মতো। নাও ওঠো, আমার ওপরে ভর দিয়ে চলো। বাড়ি গিয়ে পায়ে ডেটল লাগিয়ে দিও, আর এই রুমালটা দিয়ে দিও আমাকে। তার বদলে এই কবিতাটা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। একটা তোমার কাছে থাক, একটা আমার কাছে। চলো, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

নন্দিনী তখনও কাঁদছে।

তারপর কেটে গিয়েছে বহুকাল। কতো অদলবদল হয়ে গিয়েছে জীবনে। কেবল কবিতা লেখা ছাড়ি নি এখনও। সারাদিন কলেজে পড়িয়ে, সন্ধ্যেবেলা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে হাসিমুখে গল্প করে স্ত্রী-পুত্রের প্রত্যাশা মিটিয়ে গভীর রাত্তিরে লেখার টেবিলে কাগজ কলম নিয়ে একবার নিজের মুখোমুখি বসি।

তখন মনে হয়—হলো না। কিছুই ঠিকঠাক করা হয়ে উঠলো না। সারাজীবন ধরে একটাও ভালো কবিতা লিখতে পারলাম না। যে কথা বলার ছিল যথাযথভাবে বলা হয়ে উঠলো না আর।

উঠে আয়নার সামনে দাঁড়াই। রগের কাছে পাকা চুল কয়েকটা চকচক করে। কি পাথেয় সংগ্রহ করলাম সমস্তটা জীবন?

না, একেবারে ফাঁকি পড়ে যাই নি। নির্জন প্রহরে অনেক কবিতা শেষ করার আনন্দ পেয়েছি, গভীর শালবনে শুনেছি উদাস হাওয়ার হাতে বেজে ওঠা ঝরা-পাতার সেতার। এই তো অনেক।

অনেক দূরে হলেও মাঝে মাঝে কানে আসে দাঁড়ের শব্দ। একটা নৌকো আসছে নদী বেয়ে। ওই নৌকোয় একদিন আমি ওপারে যাবো। তার আগে বলে যেতে পারবো তো যা আমার বলার ছিলো? এই সামান্য পারানি নিয়ে নৌকোয় উঠতে দেবে তো মাঝি?

বিভাস ডাকছে

বেশ শীত পড়েছে। নির্জন প্ল্যাটফর্মে কনকনে হাওয়া বইছে হাড় কাঁপিয়ে। কোটের কলার উল্টে দিয়ে, কান ঢেকে মাফলার জড়িয়ে বসে আছি। বিহারের কোনো এক লুপ লাইনের একটি অখ্যাত গ্রাম্য স্টেশন। যাত্রীদের জন্য একটা ওয়েটিং রুমও নেই, যেখানে ঢুকে এই ঠান্ডা বাতাস থেকে রেহাই পাওয়া যায়। আমাদের ট্রেনের এখনও প্রায় একঘণ্টা দেরি। এর মধ্যে উল্টো দিকে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাবে। সে-ট্রেন আসবার প্রথম ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে।

সমস্ত প্ল্যাটফর্মে সব মিলিয়ে বোধহয় জনাদশেক যাত্রী। এ-স্টেশনে বিদ্যুৎ নেই। এখানে-ওখানে গোটাকয়েক তেলের বাতি টিমটিম করছে। একটা সাদা-কালো কুকুর দেয়ালের কোণে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছে আর মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠছে। একজন সবুজ আর কালো চেকওয়ালা কোটপরা লোক আমার দিকে পেছন ফিরে টিকিট-ঘরে টিকিট কিনছে। লোকটার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় আমার সঙ্গী বললেন—ব্যানার্জি, আপনার কাছে সিগারেট হবে?

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে তাকে দিয়ে আমিও একটা ধরালাম। সঙ্গী আরাম করে একটা টান দিয়ে বললেন—কি শীত দেখেছেন! কোথায় বাড়িতে চাদর মুড়ি দিয়ে বসে এখন গরম খিচুড়ি আর পাঁপড়ভাজা খাবো, আর কোথায় এই দেহাতের খোলা হাওয়ায় বসে কাঁপছি! শালা চাকরির দায়ে কি না করতে হয়!

আমি এ-কথার উত্তর দিলাম না। কারণ, আমি তখন ভ্রূ-কুঁচকে সবুজ কোট-পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে দেখছি।

এমন একটা কোট আমি যেন এর আগেও কোথায় দেখেছি।

কোথায় ?

ঠিক মনে আসছে না। অথচ জিনিসটা আমার খুব পরিচিত। এইরকমই হাল্কা সবুজ জমির ওপরে কালো চেকওয়ালা টুইডের কোট। আমার নিতান্ত চেনা কে একজন যেন পরতো। মনে আসি-আসি করেও আসছে না। এরকম হলে ভারি অস্বস্তি হয়।

টিকিট কিনে লোকটা সোজা ওদিকে হেঁটে চলে গেল। প্ল্যাটফর্মের সেদিকটায় ঘন অন্ধকার। অবশ্য আমার দিকে হেঁটে এলেও চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ আছে। কারণ, ম্লান কয়েকটা তেলের লণ্ঠন অন্ধকারকে আরো রহস্যময় করেছে মাত্র। এমন আলো-আঁধারিতে তিন হাত দূরে থেকে মানুষ চেনা কঠিন।

আমার সঙ্গী বোধহয় আমার ভাবান্তর খেয়াল করেন নি। বললেন—জমি এদিকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। লোহারডগা কিম্বা ডালটনগঞ্জের ওদিকেই খোঁজ করতে হবে। একেই একসঙ্গে এত জমি পাওয়া কঠিন, তারপর ব্যাটারা আমাদের গরজ বুঝতে পেরে দাম চড়িয়ে দিচ্ছে।

বললাম—হুঁ।

খুব চেনা। খুব। একবার উঠে গিয়ে দেখে আসবো নাকি ? নাঃ, তাতে লাভ নেই। এদিকে তো তবু কয়েকটা আলো আছে, প্ল্যাটফর্মের ও-প্রান্তের অন্ধকারে লোকটার নাকে নাক ঠেকিয়ে না তাকালে চেনা সম্ভব হবে না। আব যদি অচেনা হয়, তাহলে আমাকে কাছে ঘুরঘুর করতে দেখলে ভয় পেয়ে যেতে পারে। চোর-গুন্ডার উৎপাত যা বেড়েছে! বরং দেখি এদিকে আসে কিনা আবার।

কিন্তু লোকটা ফিরে আসার আগেই উল্টোদিকের প্যাসেঞ্জার ট্রেন এসে দাঁড়ালো। স্টেশন দেড়-দু' মিনিটের জন্য সরগরম হয়ে উঠলো। মাটি ফুঁড়ে যেন তিন-চারটে চা-ওয়ালা আবির্ভূত হয়ে দৌড়ে গেল ট্রেনের দিকে। চার-পাঁচজন লোক নামলো, চার-পাঁচজন উঠলো। সবুজ কোটপরা লোকটিও কি এই গাড়িতে উঠবে ?

দু'মিনিট পরে ট্রেন ছাড়লো। কামরার মধ্যে তীব্র আলো জ্বলছে। নানা ধরনের মুখ জানালায়। তাকিয়ে দেখছি। ট্রেনের বেগ একটু একটু করে বাড়ছে।

এমন সময় ঘটলো ব্যাপারটা।

শেষ কামরাটা যখন আমার মুখোমুখি, কামরার উজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে বিভাস। তার গায়ে কালো-সবুজ কোট।

আমি প্রথমটা যেন বুঝতে পারলাম না কি হচ্ছে। খুব আচমকা কোনো অবাক-করা ঘটনা ঘটলে মস্তিষ্ক ঠিকঠাক কাজ করে না। জানালার মুখ, পরিচিত কোট—এ সবকিছু আরো অনেক স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে এক মুহূর্তের ভগ্নাংশের মধ্যে মাথায় কোলাহল বাধিয়ে দিল। পরমুহূর্তে আমি 'বিভাস'! বলে চিৎকার করে বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়ালাম। কামরাটা তখন আমাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। গার্ডের গাড়ির পেছনের টেল-ল্যাম্প মিলিয়ে আসছে। আমি কি

করছি না ভেবেই দু'পা দৌড়ে গিয়ে কাজটার অসম্ভাব্যতা বুঝতে পেরে থেমে গেলাম।

আমার সঙ্গী ব্যস্ত হয়ে উঠে এসেছেন। একটা দেহাতী কুলি অবাক হয়ে হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। গাড়ি চলে গিয়েছে দূরে। ঐ গাড়ির শেষ কামরায় বিভাস বসে আছে।

—কি হলো ব্যানার্জি ? চেনা কেউ নাকি ? কি হয়েছে ?

কি হয়েছে কি করে বোঝাই ? বিভাস আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বন্ধু। সেই ইস্কুল থেকে। আজ কতদিন পরে বিভাসকে—

কিন্তু তা কি করে হয়! তা যে একেবারেই অসম্ভব।

দশ বছর আগে বিভাস মারা গিয়েছে!

আমি তখন সবে চাকরি পেয়ে পাটনায় আছি, বাবা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন বিভাসের মৃত্যু-সংবাদ। হঠাৎ মৃত্যু আসে। অন্ত্রে ফুটো হয়ে মারা যায়। দু'তিন দিনের মধ্যে সব শেষ। কিছু করা যায় নি। ওই সবুজ কোটটা খুব প্রিয় ছিল বিভাসের।

—ব্যানার্জি !

—এ্যাঁ ?

—কি হল ? কাকে দেখলেন ?

আমতা আমতা করে কি যেন বলে গেলাম। কাকে যেন দেখলাম, তা তো আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। বললাম—আপনি একটু বসুন, আমি এক্ষুনি আসছি।

স্টেশনের অফিসঘরে ঢুকলাম। স্টেশন-মাস্টার বিহারী। গোল মাথা, ঝাঁটার মত গোঁফ, গায়ে গলাবন্ধ কোট। আমাকে ঢুকতে দেখে বললেন—কি চাই ?

—এইমাত্র যে ট্রেনটা গেল, সেটা কতদূর যাবে ?

—ওঃ, হানড্রেড থার্টি-সেভেন ডাউন। ওটা সামনের জংশন অবধি গিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে, আর যাবে না। এটা আগের জংশন থেকে পরের জংশন অবধি একটা শাট্‌ল ট্রেন আর কি-

—আচ্ছা, গাড়ি আসার আগে শেষ যে ভদ্রলোক টিকিট নিলেন, গায়ে কালো আর সবুজ কোট, উনি কোন্ স্টেশনের টিকিট কিনেছেন বলতে পারেন ?

স্টেশন-মাস্টারের ঝাঁটার মত গোঁফ দু'বার কাঁপলো, দেখলাম সন্দেহে চোখের দৃষ্টি ছুঁচলো হয়ে এসেছে।

—কেন বলুন তো ? আপনি কে ?

—না, মানে—উনি আমার একজন বন্ধু। পেছন থেকে চিনতে পারি নি, পরে ট্রেনের জানালায় মুখ দেখে বুঝলাম। বলতে পারবেন ?

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর দেখলেন ঝামেলা মিটিয়ে দেওয়াই ভাল, বললে কারো ক্ষতি নেই। বরং না বললে ওর ক্ষতির আশংকা আছে। জনহীন স্টেশন। উত্তর না পেলে আমি রেগে গিয়ে কিছু একটা করে বসলে ওঁকে বাঁচাবার কেউ নেই।

—তা বলতে পারি। কারণ, আমিই স্টেশন-মাস্টার, আবার আমিই টিকিট-বাবু। ছোট স্টেশন, বুঝলেন না ? আপনার বন্ধু জংশনের টিকিট কিনেছেন। মানে

একেবারে শেষ অবধি যাবেন।

—ওদিকে যাবার আর গাড়ি আছে এখন?

—নাঃ, এখন নেই। ঘণ্টা-পাঁচেক পরে একটা আছে। মিক্সড্ প্যাসেঞ্জার। শেষ রাতে পেঁাছায়।

ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। সঙ্গী বললেন—কি ব্যাপার ব্যানার্জি? একটু আপসেট লাগছে। এনিথিং রং?

বললাম—না। আসলে ওই গাড়িতে আমার ছোটবেলার এক বন্ধুকে যেতে দেখলাম। তাকে আমার খুব দরকার। আপনি একটা কাজ করুন, আপনি রাঁচি ফিরে যান। আমি কাল-পরশু আসছি। অফিসে যা-হোক বুঝিয়ে দেবেন। আর হ্যাঁ, আমার বাড়িতে একটু খবর দিয়ে যাবেন। শিউলী চিন্তা করবে।

—কিন্তু আপনি এখন চললেন কোথায়?

—আমি এখন কোথাও যাচ্ছি না। আপনিই আগে যাবেন। আমি পরের প্যাসেঞ্জারে ওদিকের জংশনে যাবো।

আপনার বন্ধু কি ততক্ষণ স্টেশনে বসে থাকবে আপনার জন্য? সে কি আপনাকে দেখতে পেয়েছে?

বললাম—দেখা যাক।

আধ ঘণ্টা পরে রাঁচির গাড়িতে চেপে আমার সঙ্গী রওনা হয়ে গেলেন।

স্টেশন আবার ফাঁকা। আমার হাতে পাঁচটি দীর্ঘ ঘন্টা।

অফিস ঘরে আবার ঢুকে বললাম—একটা কথা বলবো?

আমার গলার স্বরে কি লিখতে লিখতে স্টেশন-মাস্টার চমকে তাকিয়ে দেখলেন আপদটা এখনো দূর হয় নি।

—বলুন—

—বাইরে বড় শীত, এখানে এই চেয়ারটাতে একটু বসবো? ভয় নেই আমি চোর-ডাকাত নই—ভদ্রলোক।

বোধহয় একটু লজ্জা পেয়ে ব্রিজপ্রসাদ বললেন (এ নামটা বাইরের সরকারী বোর্ডে লেখা দেখে এসেছি)—না না, চোর-ডাকু কেন হবেন, বসুন ওই চেয়ারটায় আরাম করে। এ ট্রেনে তাহলে গেলেন না?

নাঃ। একবার জংশন ঘুরে আসি। দেখি বন্ধুকে পাই কিনা। আপনার বাড়ি এখানেই?

—বাড়ি আরা জেলা, এখানে কোয়ার্টার। আপনি?

—আমার বাড়ি বাংলায়। রাঁচিতে থেকে চাকরি করি। কোম্পানী একটা নতুন কারখানা খুলবে, তার জন্য জমি খুঁজতে পাঠিয়েছিল।

—নাঃ। একসঙ্গে বেশি জমি কোথাও নেই।

কথা বলতে বলতে টিং-টিং করে ফোনের ঘন্টা বেজে উঠলো। ব্রিজপ্রসাদ উঠে গিয়ে বললেন—হ্যালো—

আমি আরাম করে চেয়ারে গা এলিয়ে চোখবুঁজে ভাবতে লাগলাম।

আমাদের ছোট্ট শহর। শহরের এক প্রান্ত দিয়ে বয়ে গিয়েছে নদী। রোজ বিকেলে আমি আর বিভাস বেড়াতে যেতাম নদীর ধারে। সূর্য অস্ত গিয়েছে,

পশ্চিম আকাশ মুখ লাল করে নদীর আয়নায় নিজের ছায়া দেখছে। মাথার উপরে ঘরমুখো পাখির সারি।

বিভাস আর আমি দু'জনেই তখন কবিতা লিখতাম। অবশ্য সে আর এমন কি কবিতা। এখন মনে হলে হাসি পায়। কিন্তু তখন আমাদের ধারণা ছিল আমরা খুব বড়ো কবি হবো। আমি বেশিদিন কাব্যচর্চা বজায় রাখতে পারি নি, আরো নব্বইজন মধ্যবিত্ত বাঙালীর মতো কলেজ ছেড়েই চাকরিতে ঢুকে পড়লাম। কেবল স্মৃতি হিসেবে খাতা ক'খানা পড়ে আছে পুরনো একটা সুটকেসের তলার দিকে। কিন্তু বিভাসের মধ্যে সত্যি কিছু প্রতিভা ছিল। নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও আমাকে কবিতায় চিঠি লিখতো। কয়েকটা কবিতা বেশ ভালো কাগজে ছাপাও হয়েছিল জানি।

একদিন নদীর ধারে বসে বিভাস বলেছিল—আচ্ছা, মরে গেলে মানুষ কোথায় যায় রে? আবার জন্মায়?

এর উত্তর কি দেব? বললাম—তোর মাথায় এসব ঢুকেছে নাকি? সাধু-টাধু হবি না তো?

বিভাস বললো—নারে, ভাবলে অবাক লাগে। এই একটা জ্যান্ত মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই আর সে কোথাও নেই। যায় কোথায়?

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—দ্যাখ, একটা প্রতিজ্ঞা করি আয়। আমাদের মধ্যে যে আগে মরবে, সে অপরজনকে এসে দেখা দেবে। করবি প্রতিজ্ঞা?

হেসে বললাম—তখন দেখা করা না করা কি তোর-আমার হাতে থাকবে?

—যদি সে ক্ষমতা মৃত্যুর পরে থাকে তাহলে দেখা দিবি প্রতিজ্ঞা কর—

মৃত্যুর এতদিন পরে কি বিভাসের মনে পড়লো? তাই কি শীতের রাতে চকিতে দেখা দিয়ে ডেকে গেল আমাকে?

বিভাস নিজের অবস্থা বিশেষ ভালো করতে পারে নি। ইদানীং একটা স্কুলে পড়াতো আর বাড়িতেও গ্রুপ করে ছাত্রদের কোচ করতো। তিন-চারটি বোন ছিল। ধার-দেনা করে তাদের বিয়ে দিয়েছিল। আমরা ওকে বিয়ে করতে বলতে হেসে বলতো—দাঁড়া ভাই। আগে হাঁফ জিরিয়ে নিই। অনেক দেনা এখনো ঝুলে আছে মাথার ওপরে।

বিয়ে করে নি ভালোই করেছে। ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর বৌ বাচ্চা-কাচ্চাও মরতো তাহলে।

কত স্মৃতিই যে মনে আসে। আমাদের তিন-চারটে প্রিয় জায়গা ছিল বিকেলে বেড়ানোর। এক জায়গায় একজনকে না পেলে অন্য জায়গায় খুঁজতে যেতাম। এখনো চোখে ভাসছে সরকার বাগানের ভেতর জমিদারদের পোড়ো বাড়িটা। বড় বড় থাম, দেওয়াল ভেঙে স্তূপ হয়ে আছে। তার মধ্যে গজিয়ে উঠেছে জঙ্গল। এই ধ্বংসস্তূপের ভেতরে বসে আমরা সিগারেট খেতাম (তখন সবে সিগারেট ধরেছি) আর কবিতা লিখতাম।

একজন এসে অপরজন ভেতরে আছে কিনা বুঝতে না পেরে যাতে ফিরে না যায়, সেজন্য বিভাস মাথা খাটিয়ে একটা বুদ্ধি বের করেছিল। সচরাচর বিভাসই আগে এসে যেতো। ও, ঢোকবার পথে কোথাও ভাঙা থামে কি দেয়ালে খড়ি দিয়ে যেদিকে গিয়েছে সেদিকে লক্ষ্য করে একটা তীরচিহ্ন এঁকে দিত। সেটা দেখলেই

আমি বুঝতাম বিভাস ভেতরে আছে।

আচ্ছা, আমি কাকে দেখলাম ট্রেনের জানালায়? এক মুহূর্তের জন্য একচমক দেখা—আমার ভুলও তো হয়ে থাকতে পারে। হয়ে থাকতে পারে কেন, নিশ্চয়ই হয়েছে। মৃত মানুষ কি আর ফিরে আসে?

শুধু একবার চকিত দেখার ওপর নির্ভর করে কাজকর্ম ফেলে এভাবে আলোর পেছনে দৌড়ে যাওয়া বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কোথাও নিশ্চয় একটা ভুল হয়েছে। বিভাসকে কিভাবে দেখা সম্ভব? বিভাস আর বেঁচে নেই। ভুল হয়েছে বটেই।

তারপর চোখের সামনে দিয়ে অনেক ছবি চলে গেল। অনেক সূর্যোদয়, অনেক সূর্যাস্ত—অনেক বৃষ্টিভেজা দিনে সবুজ ঘাস মাড়িয়ে হেঁটে যেতে যেতে বিভাসের উদাত্ত গলায় কবিতা শোনা। সত্যি, মানুষ মরে কোথায় যায়? প্রাণশক্তি মানবচেতনা তো একটা বড় শক্তি। শক্তির ক্ষয় নেই, ধ্বংস নেই। বিভাসের চেতনা তাহলে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায় নি। হ্যাঁ, এই তো বিভাস এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। গায়ে কালো-সবুজ কোট। হাসছে, বলছে—কি রে, ডাকলাম তোকে, আর তুই এলি না? আয়, আয়—

—বাবুজী, এ বাবুজী।

চমকে জেগে উঠলাম। ব্রিজপ্রসাদ আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে—উঠিয়ে। গাড়ি আ রহী হ্যায়। খবর হো গয়া—

চেয়ারে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কে জানে। লজ্জিত হয়ে চোখ কচলে বললাম—কিন্তু আমার টিকিটটা যে বদলে দিতে হবে—

—হ্যাঁ, দিন বদলে দিচ্ছি। জংশনের তো?

—হ্যাঁ।

টিকিট পকেটে পুরে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। ভয়ানক শীত। লাইনের ওপারে দিগন্তস্পর্শী প্রান্তর। মেঘহীন নির্মল আকাশে ঝকঝক করছে নক্ষত্রের দল। শহরে এত তারা দেখা যায় না। শীত কাটাবার জন্য একটা সিগারেট বের করে ধরাতে ধরাতে শুনলাম অন্ধকার ফুটো করে তীক্ষ্ণ হুইসেলের আওয়াজ। ট্রেন আসছে।

জংশনে যখন পৌঁছোলাম, তখন রাত প্রায় শেষ। সামান্য আলোও ফুটেছে পূর্বদিকে। বিহারের এক অখ্যাত জংশন—এমন কিছু জমজমাট স্টেশন নয়। তবু এরই মধ্যে চা-ওয়ালা ঘুম চোখে ট্রে-তে কেটলী আর ভাঁড় নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। এক ভাঁড় চা কিনে খেলাম। ভাঁড়টা লাইনে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে মনে হল—এবার?

তাই তো। এবার কি? পাগলের মত চলে তো এলাম, এখন কোথায় যাবো? কে আমাকে বলে দেবে কাল রাতে যাকে আমি দেখেছি সে কে? সে কোথায়? রাতের অন্ধকার কেটে দিন হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হচ্ছে একটু ভুলই বোধহয় হয়ে গেল।

রাত্রির গভীরতা, নির্জন রহস্যময়তা মানুষের যুক্তিকে দুর্বল করে দেয়। এখন আমার আসন্ন দিনের ম্লান আলোয় দাঁড়িয়ে বড় ক্লান্ত আর অবশ লাগলো। বড্ড ছেলেমানুষি হয়ে গিয়েছে—

ফেরবার ট্রেন নিশ্চয় এই মুহূর্তে নয়। খুব খিদে পেয়েছে। স্টেশনের বাইরে কোনো খাবারের দোকান পাওয়া যেতে পারে এই ভেবে এগুলাম।

হ্যাঁ, আছে দোকান। দোকানী সবে ঘুম থেকে উঠে দোকানের সামনে গামছা পরে উবু হয়ে বসে দাঁতন করছে। পাশে একটা বেঞ্চি। তাতে বসে বললাম—খাবার হবে কিছু?

লোকটা ব্যস্ত হয়ে বলল—জী হাঁ, হবে। লাড্ডু, কটকটি, গুজিয়া—যা চাইবেন। এ বনারসীয়া, বাবুকো কা চাহিয়ে দেখ্—

কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় বাসি খাবার খেতে খেতে হঠাৎ সামনে তাকিয়ে আমার পিঠ বেয়ে একটা ঠান্ডা শিহরণ নেমে গেল।

আমি ভুল করি নি তাহলে। বিভাসও ভোলে নি এতদিন পরে।

আমার সামনে রাস্তার ওপারে একটা বাঁধানো কালভার্ট—সেই কালভার্টের গায়ে খড়ি দিয়ে একটা তীরচিহ্ন আঁকা।

বিভাস ওই দিকে গিয়েছে। আমি যাতে পথ চিনে যেতে পারি তার জন্য রেখে গিয়েছে পথের নির্দেশ।

এখন আর রাত নয়, প্রসন্ন সকাল একটি আলোর ফুলের মত ফুটে উঠেছে। এখন আমার মস্তিষ্কে কোনো কুয়াশা নেই। ওই তো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি কালো সিমেন্টের ওপর সাদা খড়ি দিয়ে আঁকা তীরচিহ্ন। বিভাস আমাকে ডাকছে।

যাচ্ছি বিভাস, যাচ্ছি। ডাক শুনেছি আমি, তুই একটু অপেক্ষা কর।

তীর যেদিকে নির্দেশ করছে সেদিকে শুধুই ধু-ধু মাঠ, আর অনেকদূরে আকাশের গায়ে আঁকা নীল পাহাড়শ্রেণী। খাবারের পয়সা দিয়ে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম—এ রাস্তা কতদূর গিয়েছে?

দোকানী আমার দিকে তাকিয়ে বলল—কেন, কোথায় যাবেন আপনি?

কোথাও না। এমনি বেড়াতে এসেছি এদিকে। এ রাস্তায় কিছু দেখবার নেই?

—জী বহুৎ আছে। জঙ্গল, পাহাড়—শহর থেকে লোক আসে দেখতে। আপনি যাবেন?

—কিসে যাবো?

—বাস আছে। এখুনি ওদিক থেকে বাস আসবে, একটু দাঁড়ান। কোলেবীরা থেকে শেষ রাতে ছাড়ে, আসার সময় হ'ল।

বলতে বলতেই একটু ঝরঝরে চেহারার বাস বিকট আওয়াজ করে এসে দাঁড়াল দোকান থেকে একটু দূরে। কুড়ি-পঁচিশজন লোক নেমে দ্রুতপায়ে চলে গেল স্টেশনের দিকে। চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ধুলোমাখা কন্ডাক্টর এসে বেঞ্চিতে বসে আড়ামোড়া ভেঙে বলল—বনরসীয়া, তুরন্ত চায় লাও—

আমি তার কাছে গিয়ে বললাম—ভাই, এ বাস কোথায় যায়?

একটা হাই চেপে লোকটা বলল,—কোলেবীরা। যাবেন?

—আমার এক বন্ধু কাল রাত্তিরে এই পথে গিয়েছে। তাকে আমার দরকার। সবুজ-কালো কোট পরা কাউকে কি আপনি বাসে উঠতে দেখেছেন?

—সবুজ-কালো কোট? হ্যাঁ, তা দেখেছি—

—আপনার বাসে উঠেছিল?

লোকটার যেন পৃথিবীর কোনো ব্যাপারে ঔৎসুক্য নেই। আঙুল মটকাতে মটকাতে আবার হাঁক পাড়ল—আরে এ বনরসীয়া, চায় তো লাও বব্বা। জাড় কে মারে হাড্ডিগুড্ডি সব জম গিয়া—

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল—রাত্তিরে লাস্ট ট্রিপ নিয়ে যাবার সময় আপনার সবুজ কোট পরা বন্ধু আমার বাসে উঠেছিলেন। মাঝরাস্তায় পালঘাটের কাছে নেমে গেছেন। আপনার যদি যাবার থাকে তাহলে ওই বাস দাঁড়িয়ে আছে, উঠে পড়ুন—ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবো।

একঘণ্টা পরে নীল পাহাড়ের পায়ের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বাস কোলেবীরার দিকে চলে গেল। বোলতার পাখার আওয়াজের মত দূরে বাসের ইঞ্জিনের গুঞ্জন মিলিয়ে আসছে। পথের ধারে লাল মাটিতে জন্মানো ঘাসের ওপরে জমা শিশিরে চক্‌চক্ করছে শীতের মিষ্টি রোদ্দুর। একদিকে খোলা প্রান্তর, আব একদিকে ছোট পায়ে চলা সুঁড়িপথ চলে গিয়েছে পাহাড়ের দিকে।

সকালের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে। বাতাসে সেই গন্ধ পাচ্ছি। দেখতে দেখতে পথ আমাকে নিয়ে এলো শাল-পিয়াল-কেঁদ গাছের জংগলে। পায়ের নিচে ঝরা-পাতার রাশ, শিশিরে ভিজে আছে বলে শব্দ হচ্ছে না। চারদিকে সুনিবিড় স্তব্ধতা। কেমন শান্তি মিশে আছে আজ সকালের আলোয়! এই তো কাল সন্ধ্যে অবধি কারখানার জমি খুঁজতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, বৈষয়িক কথা বলছিলাম পাকা ব্যবসায়ীদের সংগে। এখন মনে হচ্ছে সে সব যেন কবেকার অতীতের কথা। শহরের ধুলো আর গায়ে একটুও লেগে নেই।

অরণ্য আরো নিবিড় হয়ে এসেছে। ওপরে তাকালে পাতার ফাঁকে হীরের কুঁচির মত আকাশ চোখে পড়ে। দু'দিক দিয়ে পাহাড় ঢালু হয়ে এসে সামনে যেন সংকীর্ণ একটি গিরিপথের সৃষ্টি করেছে। কি অপূর্ব সে পথ। ঘন সবুজ গাছপালা ছায়া দিচ্ছে সেই পথে। দু'একটা গাঢ় লাল কাঠবাদাম পাতা ঝরে পড়ছে নিঃশব্দে। বাতাস যেন দেব-ধূপের সৌরভ। স্বপ্নে দেখা রামধনুর রংযের মত আলো কোথা থেকে এসে ছড়িয়ে পড়েছে জায়গাটায়। এবং—

এবং আমার বাঁদিকে একটা বড় পাথরের গায়ে একটা সাদা তীরচিহ্ন নির্দেশ করছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ওই সুন্দর পথের দিকটা।

আমি আবাব সামনে তাকালাম। সবুজের অলংকারে, ছায়ার আলোয় মায়াময় হয়ে আছে পথটা। বনের ভেতরে বাঁক ফিরে চলে গিয়েছে অজানা কোন পরীদের দেশে। সেখানে বিভাস আছে। আর আছে পৃথিবীর উন্মত্ত কোলাহল থেকে দূরে সুগভীর শান্তি। ওখানে একবার পেঁছিতে পারলে আর কষ্ট পেতে হয় না, আর ব্যস্ত হতে হয় না পার্থিব চিন্তার দোলায়। ওখানে একবার পেঁছোতে পারলে আর ফিরে আসতে হয় না। কারা যেন পথের বাঁকের ওপাশে আমার জন্য মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, শুধু আমার যাওয়ার অপেক্ষা।

বিভাস আমাকে ভালোবাসে। তাই সে আমাকে পৃথিবীর কূট-কোলাহল থেকে দূরে ওই রামধনুর দেশে নিয়ে যেতে চায়, যেখানে মিষ্টি রোদে পিঠ দিয়ে আমরা দুই বন্ধু সেই কবেকার হারিয়ে যাওয়া ছোটবেলার মত পাশাপাশি বসে থাকবো। বিভাস তাই আমাকে এই পথে ডেকে গিয়েছে।

কিন্তু এমন হয় না। ঘুমোবার আগে অনেক কাজ বাকী। শিউলি অপেক্ষা করে আছে। সে আমার জন্য রেঁধে রাখবে, বাড়ি গেলে আসন পেতে খেতে দেবে গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত, কাঁকরোল ভাজা, মুগের ডাল। আমি বাড়ি ফিরলে সে হাসবে। আমার ছেলে দৌড়ে এসে বলবে—কি এনেছ আমার জন্যে বাবা?

এরা সবাই অপেক্ষা করে আছে। এখন আমার বিভাসের সঙ্গে দেখা করা হয়ে উঠবে না। আরো কত সুন্দর শিশির ভেজা সূর্যোদয়—বর্ষণমুখর সিক্ত দিন তাদের সৌন্দর্য নিয়ে অপেক্ষায আছে। এমন হয় না।

কি সুন্দব দেখাচ্ছে পথটা। গেলেই হয়! এই তো এক পা।

মন শক্ত করে সেদিকে হাত নেড়ে বললাম—আজ না রে বিভাস, আজ পারলাম না। খোকা কাঁদবে, খোকার মা কাঁদবে। অনেক কাজ বাকি। সব সেরে আমি আসবো, তুই অপেক্ষা করে থাক। কথা দিচ্ছি আসবো।

পেছন ফিরে এগিয়ে চললাম অরণ্যের বাইরে, সেখানে কোলেবীবা থেকে ফিরতি বাস কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে দাঁড়াবে।

দুই পুরুষ

আনন্দবাজাবে রাশিফলের স্তম্ভে আজ সকালেই দেখেছেন—অপ্রত্যাশিত পথে আর্থিক সমস্যার সমাধান। তবে সেটা যে বেলা একটার মধ্যেই অক্ষবে অক্ষবে ফলে যাবে তা রাজ্যেশ্বর বুঝতে পারেন নি। খবরের কাগজ পড়বার সময বাশিফলে চোখ বোলানোটা এমনি একটা অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস কবেন বলেই পড়েন —এমন নয়। তবে যেদিন ভাল ভাল কথা লেখা থাকে সেদিন মনটা বেশ খুশি হয়ে ওঠে। বর্তমানে রাজ্যেশ্বরের ভয়ানক আর্থিক সমস্যা চলেছে, কাজেই সকালে তুলারাশির ফলে সমাধানের আশ্বাস পেয়ে মন ভাল হয়ে গেল। ওসব ভবিষ্যৎ-বাণী যে সত্যি হয় না, সে আর কে না জানে? তবে কিছুক্ষণ আশায় আশায় থাকতে পারলে বুকের ভারটা অন্তত কমে। সেটা কম লাভ নয়।

পেঁয়াজ দিয়ে মুসুরির ডাল, ধনেপাতার বড়া আর মুরলা মাছেব ঝাল খেয়ে চিরদিনেব সঙ্গী ছাতাটি হাতে অফিস রওনা হলেন রাজ্যেশ্বর। বেবুবার মুখে বারান্দায় টাঙানো তারাপীঠের মা কালীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রোজকার প্রণামটি সারছেন, সর্বাণী বললেন—আজ একটু দেখ, বুঝলে? আর তো সময় নেই। তুমি যেমন গা হিম করে রয়েছ—

তাই বটে। রাত্তিরে দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারছেন না, অফিসে কাজে ভুল হচ্ছে, সন্ধ্যের দিকে উদ্বেগে পেটে গ্যাস ফর্ম করছে, একে গা হিম করে থাকাই বলে বটে। টাকার চিন্তায় নিজের নীতিবিরোধী কাজ অবধি করতে শুরু করেছেন। ঘনা পাল অফিসে নানা রাজ্যের লটারির টিকিট বিক্রি করতে আসে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে। সহকর্মীরা অনেকেই কেনে। ঘনা পাল এলেই তাকে ঘিরে বেশ একটা ভীড় জমে যায়। কেউ একটা বিশেষ সিরিজের টিকিট ছাড়া কিনবে না, কারো আবার এমন টিকিট চাই যার নম্বরের শুরুতে বা শেষে পাঁচ আছে। রাজ্যেশ্বর কখনও লটারির টিকিট কেনেন না, কারণ তাঁর মতে ব্যাপারটা জুয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া সত্যিকারের লাভজনক পুরস্কার থাকে গোটা-

পাঁচেক, বাকি সব দশ-বিশ টাকার। দশ লক্ষ টিকিটে পাঁচটা পুরস্কার—প্রোব্যাবিলিটি বেশিও। কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ভাবলেও বিশ্রী লাগে। কিন্তু এ মাসের প্রথমে যখন নিয়মমত ঘনা পাল টিকিটের গোছা হাতে এসে বলল—কী রাজুবাবু, এবার নেবেন নাকি একখানা? ভাগ্যটা একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না কেন—মেঘধন বাম্পার ফার্স্ট প্রাইজ দু'লাখ টাকা বেড়েছে। তখন রাজ্যেশ্বর একটু গলা খাঁকারি দিয়ে লাজুক গলায় বললেন—বলছ? আচ্ছা, দাও একটা। অবশ্য পাব না জানি—

কেন পাবেন না দাদা? এটাতেই পাবেন তা বলছি না। কিন্তু এতগুলো প্রাইজ—প্রতি খেলাতেই কেউ না কেউ তো পাচ্ছে, বলুন? নাহলে এত লোক কিনছে কেন? সিরিজ বা নম্বরের প্রেফারেন্স আছে?

না। যে কোন একখানা দাও—

ট্রামের মান্থলির প্লাস্টিক্ কভারের মধ্যে টিকিটটা ভাঁজ করে রেখে খেয়াল করলেন সবাই তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি পেন্সিল তুলে নিয়ে আগের দিনের পোস্টিং চেক্ করতে লাগলেন।

আজ অফিসে এসে প্রথমেই তাকালেন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরের দিকে। ঘষা কাঁচের দরজার পাশে টুলটা খালি, সাহেবের বেয়ারা পানখেকো দীনু বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে। মানে অনাথ হালদার এখনও আসেন নি। বড় হলের এককোণে নিজের টেবিলে পৌঁছে প্রথমে পকেট থেকে চাবি নিয়ে ড্রয়ার খুললেন রাজ্যেশ্বর। বড় রুমালের সাইজের ঝাড়নটা বের করে টেবিল মুছলেন, পেপারওয়েটগুলো বের করে সাজিয়ে রাখলেন (এগুলো টেবিলে রেখে গেলে পরদিন এসে আর পাওয়া যায় না), তারপর হেঁকে বললেন—পঞ্চু, গ্লাসের জলটা ভরে দিয়ে যা বাবা—

পৌনে এগারোটায় উঠে একবার দেখতে গেলেন। হ্যাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এসে গিয়েছেন। ঘষা কাঁচের ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে, পানখেকো দীনবন্ধু মুখে সতর্ক ভঙ্গী ফুটিয়ে টুলে বসে আছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছে রাজ্যেশ্বর এগুলেন। সকালের দিকে ভিজিটারদের ভীড় কম থাকে, এখনি কথাটা সেরে নেওয়া ভাল। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের মেজাজও বদলায়।

ডিরেক্টরের দরজা অবধি পৌঁছনর আগেই ওদিকে করিডোরের বাঁক ঘুরে সিমসন হিথুকোটের পার্চেজ ম্যানেজার বিমল লাহিড়ী হন্তদন্ত হয়ে অ্যাটাচি হাতে পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলেন। ডোর-ক্যাচার লাগান পাল্লা 'ফুস' গোছের শব্দ করে আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল। রাজ্যেশ্বর নিঃশ্বাস ফেলে নিজের টেবিলে ফিরে এলেন।

সাড়ে এগারটার সময় একবার উঠে গিয়ে দীনুকে জিজ্ঞাসা করলেন—সাহেব খালি আছে রে? একবার ভেতরে যাব?

না, সাহেব ব্যস্ত। সিমসনের লাহিড়ী সাহেব কথা বলছেন।

এখনও বিমল লাহিড়ী রয়েছে। করে কী লোকটা? পুরো রবীন্দ্র-রচনাবলীখানা পড়ে শোনাচ্ছে নাকি? এ তো বড় জ্বালা হল।

সিটে ফিরে এসে বসতেই ওধার থেকে নিখিল দত্ত বলল—রাজুদা, আপনি একখানা মেঘধনের টিকিট কিনেছিলেন না? আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে, দাঁড়ান

আসছি—

খবরের কাগজ হাতে নিখিল দত্ত এসে পাশের চেয়ারে বসল। মুখে নিরাসক্ত ভাব ফুটিয়ে মান্থলি কভার থেকে টিকিটখানা বের করে তাকে দিলেন রাজ্যেশ্বর, তারপর বুকে ধুকপুক নিয়ে বসে রইলেন। হতে পারে না কি আর ? কত লোকের তো ভাগ্য খুলে যাচ্ছে। এই সময়টায় হলে—

টিকিটটা তাঁর হাতে ফেরৎ দিয়ে নিখিল দত্ত বলল—সরি দাদা, ব্যাড লাক দিস টাইম। তবে কিনে যান, ঠিক পেয়ে যাবেন।

পকেটে রাখতে গিয়েও টিকিটটা ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিলেন রাজ্যেশ্বর। লটারির প্রাইজ পাওয়াটা যে সুদূরপরাহত অসম্ভাব্যতা তা তো তিনি জানেনই। তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু—খুবই সামান্য একটু—আশা জেগেছিল। এখন তিনি হঠাৎই ডোর-ক্যাচার বন্ধ হবার 'ফুস্' শব্দটা আবার শুনতে পেলেন।

বারোটায় বিমল লাহিড়ী বেরিয়ে গেলেন। সোয়া-বারোটায় রাজ্যেশ্বর খুক্ খুক্ করে দু'বার কেশে ঘষা কাঁচের পাল্লা সামান্য ঠেলে ভেতরে তাকালেন। পাইপের ডাঁটি দাঁত দিয়ে কামড়ে রেখে অনাথ হালদার ফাইল দেখছেন। পরণে পিনস্ট্রাইপ সুট, হাতে পেন্ট করা টাই, ধবধবে সাদা শার্ট। রাজ্যেশ্বর বিনীত গলায় বললেন—একটু আসব স্যার ?

মুখ তুলে তাকিয়ে অনাথ হালদার বললেন—কে ? কি চাই ?

আজ্ঞে, আমি রাজ্যেশ্বর। একটু কথা ছিল—

আসুন। কি কথা ?

রাজ্যেশ্বর ভেতরে ঢুকে অনাথ হালদারের টেবিলের এধারে দাঁড়ালেন।

স্যার, আমার—মানে, হয়েছে কি—

কাফ ইট আপ, রাজ্যেশ্বরবাবু। আই হ্যাভ টু মেনি থিংস টু মাইণ্ড দিস মর্ণিং—

রাজ্যেশ্বর মরীয়া হয়ে বললেন—স্যার, আমার কিছু টাকার প্রয়োজন।

লোন ? অফিস লোন ?

হ্যাঁ স্যার।

কত ?

ঢোঁক গিলে রাজ্যেশ্বর বললেন—দশ হাজার টাকা।

অনাথ হালদার সোজা হয়ে বসলেন, তারপর ফোমের একজিকিউটিভ চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।—এত টাকা হঠাৎ কেন দরকার হল আপনার ?

স্যার, সামনের মাসের বারোই আমার মেয়ের বিয়ে। মধ্যবিত্ত চাকুরে, ক্ষমতা যে কত তা তো আপনি জানেন। তবে একমাত্র মেয়ের বিয়ে—সব বাপমায়ের মনেই কিছু ইচ্ছে থাকে। কিন্তু হল কি—

হালদার বললেন—ইচ্ছেটাকে নিজের বাজেটের মধ্যে বেঁধে রাখতে পারলে আর দুশ্চিন্তা করতে হত না। অবস্থা ডিঙোতে গেলেন কেন ?

স্যার, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। যা খরচ পড়বে তা আমি গত তিন-চার বছর ধরে মোটামুটি জোগাড় করে রেখেছিলাম। কিন্তু দু'মাস আগে আমার স্ত্রীর অসুখে তার থেকে বেশ খানিকটা খরচ হয়ে গিয়েছে। এদিকে পাত্রপক্ষের কাছে

কমিটমেন্ট রাখতে হলে—

পাইপে নতুন করে তামাক ভরে অনাথ হালদার দেশলাই খুঁজছেন। রাজ্যেশ্বরের কাছে দেশলাই রয়েছে, কিন্তু আপার ডিভিশন ক্লার্ক হয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে পকেট থেকে দেশলাই বের করে দেওয়া যায় না।

ফাইলের নীচে দেশলাই পাওয়া গেল। ভাল করে পাইপ ধরিয়ে অনাথ বললেন—বসুন।

বসব ?

বসবেন না কেন ? বসুন। স্ত্রীর কি হয়েছিল ?

অপারেশন স্যার। র‍্যাডিক্যাল হিস্টেরেক্‌টমি। এক ধাক্কায় আট হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল। কি করব বলুন, প্রাণটা তো আগে—

চাকরি আর ক'বছর আছে ? টাকাটা শোধ দিতে পারবেন ?

রাজ্যেশ্বর ব্যাকুল হয়ে সামনে ঝুঁকে পড়ে বললেন—পারব স্যার, নিশ্চয় পারব। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে আমরা তো ঝাড়া হাত-পা। খরচ কমিয়ে দেব, মাসে মাসে যতটা বেশি পারি কাটিয়ে দেব—

আচ্ছা, আপনি প্লেন পেপারে একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখে আমাকে দিন। আজই। কাল ভোরের ফ্লাইটে আমি দিল্লী যাব—

রাজ্যেশ্বর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই স্যার। আপনি যে আমার কতদূর—

সেভ ইট। কেউ কারও উপকার করছে না। কোম্পানী আপনার কাছ থেকে সুদসুদ্ধ টাকা ফেরৎ নেবে। যান, দরখাস্ত লিখে আনুন।

টেবিলে ফিরে এক শিট ফুলস্ক্যাপ কাগজে লোনের দরখাস্ত লিখতে লিখতে রাজ্যেশ্বর ভাবলেন আনন্দবাজারের রাশিফলটা আজ নিতান্তই খেটে গেল দেখা যাচ্ছে। নইলে অনাথ হালদারের মত বিখ্যাত বদমেজাজী লোক এককথায় লোন দিতে রাজি হয়ে যায় !

কুড়ি মিনিটের মধ্যেই দরখাস্ত হাতে আবার ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকলেন রাজ্যেশ্বর।—স্যার, আমি এসেছি।

ও, আপনি। দরখাস্ত এনেছেন ? দিন।

বাঁ পাশের মার্জিনে খস্‌খস্‌ করে কী লিখে দিয়ে অনাথ হালদার বললেন—নিন অ্যাকাউন্টসের দীপক মজুমদারকে দিয়ে দিন। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবেন।

মুখে যতদূর সম্ভব কৃতজ্ঞতা ফুটিয়ে ফিরে আসছিলেন রাজ্যেশ্বর, ডিরেক্টর পেছন থেকে বললেন—শুনুন একটা কথা।

আজ্ঞে ?

ডটপেন দিয়ে ব্লটারে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে অনাথ বললেন—আপনাকে এখন টাকা না দিতে পারলেই ভাল হত। কারণ কোম্পানী থেকে আমার নিজের প্রয়োজনেই সামনের মাসে অনেক টাকা তুলতে হবে। কিন্তু একটা বিষয়ে আজ আপনি আর আমি সমান। সামনের মাসের বাইশে আমারও মেয়ের বিয়ে।

রাজ্যেশ্বরের প্রথমটায় খুব হাসি পেল। তিনি আর অনাথ হালদার সমান। কোথায় একজন চুনোপুঁটি ক্লার্ক, আর কোথায় হালদার গ্রুপ অফ্‌ ইন্ডাস্ট্রিজ-এর

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! আবেগের ঝোঁকে মানুষ কী না বলে। অবশ্য মুখে তিনি বললেন—তাই নাকি ? আমি জানতাম না স্যার। খুব ভাল কথা ! বিশেষ আনন্দের কথা—

তারপর সাহস করে জিজ্ঞাসা করলেন, পাত্র কী করেন স্যার ?

পাত্র ? পাত্র ইলেকট্রনিকস্-এর জগতে একজন নাম করা লোক। থাকেন কানাডায়, মণ্ট্রিয়াল-এ। মেয়েও বিয়ের পরে সেখানেই চলে যাবে।

একটু থেমে হালদার বললেন—আমারও একমাত্র মেয়ে।

মিলগুলো ভালই, ভাবলেন রাজ্যেশ্বর। তবে জীবনের অন্যান্য বিষয়েও মিল থাকলে তবে সেটা কাজের কথা হত। অনাথ হালদার মেয়ের বিয়েতে কী কী জিনিস দিচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল। কিন্তু অতদূর ঘনিষ্ঠতা করতে সাহস হয় না।

অনাথ নিজেই তার বিবরণ দিলেন। নিভে যাওয়া পাইপে অন্যমনস্কভাবে গোটা-দুই টান দিয়ে বললেন—পাত্র বিদেশে থাকে, তাকে আর জিনিসপত্র দিয়ে লাভ কী ? কাজেই সে সব দিকে খরচ কিছু হচ্ছে না। যৌতুক হিসেবে ভেবেছি ওদের সুইজারল্যান্ডে হনিমুন করার খরচটা দেব। আলিপুরের ফ্ল্যাটটা মেয়ের নামে করে দিচ্ছি, পাঁচ বছর বাদে কন্ট্রাক্ট জব শেষ হলে জামাই যদি ফিরে আসা মনস্থ করে তাহলে ওইখানেই থাকতে পারবে। বিলেতে তো আর জামাইষষ্ঠী হয় না, তাই এখনি গোটাকতক গরম সুট করে দেব—

তারপর অনাথ হালদার আরো কি সব খরচের ফিরিস্তি দিয়ে গেলেন। সবকিছু পরিষ্কার মাথায় ঢুকল না রাজ্যেশ্বরের, তবে এটুকু বুঝতে পারলেন যে প্রত্যেকটা আইটেমের জন্য যা খরচ হচ্ছে সেই সংখ্যার পেছন থেকে দুটো শূন্য খসিয়ে দিলে তাঁর মেয়ের বিয়ের খরচের সমান হয়। বেশি ভাবলে গা কেমন করে।

কতক্ষণ বসে থেকে উঠে আসাটা ভাল দেখাবে ঠিক করতে না পেরে রাজ্যেশ্বর বিব্রত হয়ে উসখুস করছিলেন। অনাথই মুক্তি দিয়ে বললেন—আচ্ছা কাজ করুন গিয়ে। আপনার মেয়ের বিয়ে তো আগে হয়ে যাচ্ছে, বরং পারলে তারপর আমার কাজে একটু হেল্প করবেন—

নিশ্চয় স্যার, এ তো আমার কর্তব্য স্যার—বলতে বলতে রাজ্যেশ্বর বেরিয়ে এলেন।

বাড়ি ফিরতে রাত আটটা। নমস্কারী কেনা হবে সারদা বস্ত্রালয় থেকে। অফিস থেকে বেরিয়ে তাদের শ'তিনেক টাকা অ্যাডভান্স করে এলেন। মালিক পতিতপাবন আঢ্য বললেন—বাকি টাকাটা কিন্তু বিয়ের আগেই দিতে হবে রাজুবাবু, দোকানে আমাদের বহু বাকি পড়েছে। এবার শোধ দিতেই হবে—

আমি খুব চেষ্টা করব আঢ্যমশাই। অন্তত যতটা হয়—যেটুকু বাকি থাকবে বিয়েটা হয়ে যাবার পরে পরেই—

না রাজুবাবু। সে সময় আপনার মাথায় একরাশ দেনা থাকবে, আপনি বিয়ের আগেই এরকম অল্প অল্প করে মিটিয়ে দিন—

আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়।

বাড়ি ফিরে দেওয়ালের হুকে জামাটা টাঙাতে টাঙাতে রাজ্যেশ্বর বললেন—

একটা জিনিস ঠিক করলাম, জান?

সর্বাণী বললেন—কী?

মেয়ে-জামাইকে বিয়ের পর হনিমুন করতে সুইজারল্যান্ড পাঠাব ভাবছি। বেশি নয়, হাজার চল্লিশেক টাকার মধ্যে হয়ে যাবে—

সর্বাণী কাছে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখে বললেন—হ্যাঁগো, তোমার শরীর খারাপ করে নি তো? ভুল বকছ কেন?

রাজ্যেশ্বর হেসে বললেন—না, বস। শরীর ঠিক আছে। বাকি টাকাটার জোগাড় হয়ে গেল, বুঝলে? দশ হাজার টাকা—

সেকি! কী করে জোগাড় হল?

রাজ্যেশ্বর বললেন। তারপর আপনমনেই হাসলেন।—ডিরেক্টর আজ একটা মজার কথা বলেছেন। ওঁরও একমাত্র মেয়ের বিয়ে, আমারও তাই। সেজন্য আমরা দু'জন নাকি সমান। মজার কথা নয়? চারখানা মোটরগাড়ি, ব্যাংকে লাখ লাখ টাকা, খাস কলকাতায় একখানা বাড়ি আর দু'খানা ফ্ল্যাট, মেয়ে-জামাই বিলেতে বেড়াতে যায় বিয়ের পর—সে আর আমি নাকি সমান।

সর্বাণী বললেন—তা হোক অতবড় লোক একটা—বলেছেন যখন, খুকির বিয়েটা হয়ে গেলে তুমি একটু গিয়ে খাটাখাটি ক'র—

সে তো যেতেই হবে। দরকার নেই যদিও, অনাথ হালদারকে সাহায্য করবার লোকের অভাব হবে না। তবুও চাকরি বাঁচানোর জন্য যেতেই হবে।

খুকির বিয়ে ভালয় ভালয় মিটে গেল। জামাই মানুষটা ভাল। অল্প বয়সে, হাসি হাসি মুখ। ওপরচালাকির ভাব নেই, সবাই মিলে ঠাট্টা করলে মুখ নামিয়ে লাজুকভাবে হাসে। নিজেদের পাড়ায় ইলেকট্রিকের জিনিসপত্তরের একচিলতে দোকান দিয়েছে, তাছাড়া টি-ভি সার্ভিসিং-এর কাজও কিছু কিছু করে। আয় এখনও তেমন বেশি কিছু না হলেও অদূর ভবিষ্যতে বাড়বে—এ আশা রাজ্যেশ্বর রাখেন।

বিয়ের পরদিন মেয়ে বিদায়ের কিছুক্ষণ আগে জামাইকে একটু একান্তে ডেকে তার হাতে দশখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দিয়ে রাজ্যেশ্বর বললেন—এটা তোমাকে নিতে হবে বাবা।

জামাই অবাক হয়ে বলল—একি! আমাকে টাকা দিচ্ছেন কেন?

বাবা, তুমি উদারপন্থী ছেলে বিয়েতে কিছু দাবি কর নি। আমি গরীব মানুষ, নিজের সাধ্যে যতটুকু কুলোয় তা দিয়েছি। কিন্তু বাপের মনে ইচ্ছে তো অনেক থাকে, তাই তোমাদের বেড়াতে যাবার জন্য সামান্য টাকা—

না না, এ আপনি রেখে দিন। এমনিতেই আপনার অনেক খরচ হয়েছে, এ আমি নিতে পারব না। বেড়াতে যাবার টাকা আমার আলাদা করে রাখা আছে—

রাজ্যেশ্বরের বুক খুশিতে ভরে গেল জামাইয়ের বিবেচনায়। তিনি বললেন—আমার কোন অসুবিধে হবে না বাবা। তুমি না নিলে আমি কষ্ট পাব—

আর কিছু না বলে টাকাটা নিয়ে জামাই রাজ্যেশ্বরকে প্রণাম করল।

চব্বিশ বছর আগে বাবা মারা যাওয়াতে শেষ কেঁদেছিলেন, আর আজ যখন বিদায়ের সময় খুকি প্রণাম করতে এল তখন দুই যুগ পরে আবার কেঁদে ফেললেন

রাজ্যেশ্বর। পুরনো বন্ধু বিশ্বনাথ কাঁধে হাত রেখে বললেন—কি হচ্ছে রাজু? আজ আনন্দের দিন, আজ কেউ কাঁদে?

জামাই লাজুক হলেও সপ্রতিভ। গাড়িতে ওঠবার সময় নিচু গলায় তাঁকে বলল—চিন্তা করবেন না, আপনার মেয়েকে আমি কষ্ট দেব না—

চোখে জল নিয়ে রাজ্যেশ্বর বললেন—জানি বাবা। জানি।

মেয়ে-জামাই চলে গেলে বাড়ি সুনসান। পাড়ার কয়েকজন মহিলা ভেতরের ঘরে সর্বাণীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। বিশ্বনাথকে নিয়ে রাজ্যেশ্বর বারান্দায় এসে বসলেন।

চা খাবি বিশু?

বিশ্বনাথ ইতস্ততঃ করে বললেন—এখন থাক, সবাই ব্যস্ত রয়েছে—

কিছু না, দাঁড়া, আমিও একটু খাব।

বিয়ের ব্যাপারে দু'জন ঠিকে কাজের লোক রাখা হয়েছিল, তাদের একজনকে ডেকে চা করতে বললেন রাজ্যেশ্বর। বিশ্বনাথ বললেন আমার চায়ে চিনি দিও না।—

তোর সুগার আবার বেড়েছে নাকি?

নাঃ, সাবধান হচ্ছি। এই বয়েসটা ভাল না তো। সব দেখবি পঞ্চাশ-পঞ্চান্নতে একটা ধাক্কা খায়। হয় সেরিব্রাল, নয় করোনারি স্ট্রোক। এই বয়েসটা পেরুলে আবার কিছুদিন নিশ্চিন্দি—

ষাট-পঁয়ষট্টিতে লোকে মরে না?

মরে। তবে কম। সত্তরের পর আবার স্ট্যাটিস্টিকস্‌টা বাড়ে।

মানুষের মরণশীলতা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর চা এল। চায়ে চুমুক দিয়ে বিশ্বনাথ বললেন—তোর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। এবার তুই ঝাড়া হাত-পা। খুকির বরও বেশ ভাল হয়েছে। তোর ছেলের অভাব মিটল।

রাজ্যেশ্বর কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলেন। তাঁর বর্তমান মনের অবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ খুকি বিদায় নেবার পর এই আধ ঘন্টাতেই আশ্চর্য শূন্যতা তাঁকে গ্রাস করেছে। মেয়েটা যে জীবনের এতখানি জুড়ে ছিল তা যেন আগে বুঝতে পারেন নি। মেয়ের ছোটবেলা থেকে সব ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। এই তো সেদিনও বারান্দার ওই কোণটায় বসে ডলপুতুল নিয়ে খেলা করেছে। কবে কেটে গেল এতগুলো বছর? আজ বাড়িতে এত আত্মীয়-স্বজন গিজগিজ করছে, কিন্তু খুকি না থাকায় যেন মনে হচ্ছে কেউ নেই।

দ্বিতীয়তঃ মনে হচ্ছে বয়েস হয়ে গেল।

বয়েস অবশ্য সত্যিই হয়েছে। কিন্তু পরিপক্ক বয়েসে মনে যে একটা শান্তি আসবে বলে ভেবেছিলেন, তার কোন দেখা নেই। চরিতার্থতার বোধ তাঁর হৃদয়ে নেমে আসে নি। কী করলেন সারাটা জীবন? ছোটবেলায় কবি হবার ইচ্ছে ছিল। দিস্তে দরে কাগজ কিনে হাতে সেলাই করে খাতা বানিয়ে হাজার হাজার কবিতা লিখেছেন। সে সব কবিতার খাতা কিছু পোকায় কেটেছে, কিছু কোথায় হারিয়ে গিয়েছে কে জানে! তরুণ বয়েসে আফ্রিকার জঙ্গলে অ্যাডভেঞ্চারে যাবেন সখ হয়েছিল, কার্যত এত বয়স অর্থাৎ মধুপুরের থেকে দূরে কোথাও যাওয়া হয় নি। হেনরি ফোর্ডের জীবনী পড়ে ইচ্ছে হয়েছিল ব্যবসা করে বড়লোক হবেন।

আরম্ভও করেছিলেন। বাবার রেখে যাওয়া সাত হাজার টাকা লোকসান দিয়ে সে ব্যবসা উঠে গেল। শরীর আর আত্মাকে একত্র করে রাখবার প্রয়োজনে চাকরিতে ঢুকে পড়তে হল। সেই চাকরিই এখনও করে চলেছেন। চরিতার্থতা আসবে কোথা থেকে?

মানুষ বাঁচে নতুন কিছু করার উৎসাহে। আগামী দিনের আশায়। এই চাকরিতে তিনি পনেরো বছর আগে যা করেছেন, আজও তাই করছেন, কালও তাই করতে হবে। কয়েকটা টাকা আর একমুঠো ভাতের জন্য সমস্ত স্বকীয়তা, উদ্যম আর স্বাধীনতা বলিপ্রদত্ত।

তিনি আর অনাথ হালদার সমান!

আপনমনেই একবার হাসলেন রাজ্যেশ্বর। বিশ্বনাথ সন্দিগ্ধ চোখে বন্ধুর দিকে তাকালেন।—হাসছিস যে?

কিছু না, এমনি। বিশু, আমাদের ছোটবেলার কথা মনে আছে? কলকাতা কত ফাঁকা ছিল তখন, বল্?

উঃ, দারুণ দিন গিয়েছে! দত্তদের বাড়ির পেছনে খোলা জায়গাটার কথা মনে পড়ে? সেই যেখানে একবার হরতুকীবাগানের ছেলেদের সঙ্গে রবারের বল দিয়ে ম্যাচ খেলা হয়েছিল? আমি একাই তিনটে গোল দিয়েছিলাম।

আর আমি দুটো—

দুঃখের মুহূর্তে মানুষ চায় সহমর্মী মানুষের সান্নিধ্য, মনের কথা খুলে বলবার মত সঙ্গী। কিন্তু বয়েস বাড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এককালের প্রিয় সঙ্গীরা ক্রমেই দূরে সরে যায়। রাজ্যেশ্বরেরও একমাত্র বিশ্বনাথ ছাড়া পুরনো বন্ধু বলতে আর কেউ নেই। দুই প্রৌঢ় অনেক রাত অবধি বারান্দায় বসে হারানো কৈশোরের গল্প করলেন।

মেয়ের বিয়েতে বারো দিন ছুটি নিয়েছিলেন রাজ্যেশ্বর। বৌভাত মিটে যেতে পরের দিন দুপুরের দিকে একবার অফিসে গেলেন। পানখেকো দীনু পিঠ টান করে টুলে বসে আছে মানে ডাইরেক্টর ঘরে রয়েছেন। রাজ্যেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন—ঘরে কেউ আছে রে?

নাঃ। সাহেব একাই আছেন। যান—

ঘরের পর্দা সব টানা। বড় আলোটা নেভানো। ছোট টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় অনাথ হালদার কি লিখছেন। সারা ঘরে ছায়া-ছায়া আলো।

আসব স্যার?

কে? এদিকে সরে আসুন, আলোটার জন্য দেখতে অসুবিধে হচ্ছে। ওঃ, রাজ্যেশ্বরবাবু। ভাল হয়েছে আপনি এসে পড়েছেন। একবার ফ্লুরিতে যেতে পারবেন? পার্ক স্ট্রীটে?

হ্যাঁ স্যার। কি করতে হবে?

বিয়ের দিন রিসেপশন লবির ধারে ওরা একটা সার্ভিস কাউণ্টার রাখবে। স্ন্যাক্স্ আর সফট্ ড্রিংক। আমার বন্ধুবান্ধব আর আত্মীয়স্বজন অনেকেই সকালে এসে পড়বে, আর অতিথিরাও ধরুন এসেই খেতে বসে যাবে না। কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা রাখা ভাল। ওদের সব বলা আছে, শুধু খাবারের স্পেসিফিকেশনটা লিখে দিচ্ছি, আর একটা চেক দিচ্ছি, আপনি দিয়ে আসবেন।

বলবেন সকাল দশটার ভেতরে চলে আসতে।

আচ্ছা স্যার।

আমার গাড়িটা নিয়ে যান, তাড়াতাড়ি কাজ কবে—

অনাথ হালদার টেবিলের গায়ে লাগানো বোতাম টিপলেন। মুহূর্তের মধ্যে দীনু ঘরে ঢুকে দাঁড়াল।—ডাকছেন স্যার?

হ্যাঁ। নিকুঞ্জকে বলে দাও, রাজ্যেশ্বরবাবুকে একবার পার্ক স্ট্রীটে নিয়ে যেতে, ওখানে কাজ হয়ে গেলে আবার অফিসে ফিরিয়ে আনবে—

দীনু বেরিয়ে যেতে অনাথ হালদার এক শিট কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন—এতে সব লেখা আছে। ওদের দিলেই বুঝবে। আর এই চেকটা—

কাজ বুঝে নিয়ে রাজ্যেশ্বর বেরিয়ে আসছিলেন, অনাথ হালদার আবার ডেকে বললেন—ভাল কথা, আপনার মেয়ের বিয়ে কেমন হল?

ভালই স্যার আপনাদের শুভেচ্ছায়। আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে যেমন হয় আর কি—

বেশ বেশ, শুনে সুখী হলাম।

গাড়ির পেছনের সিটের আশ্চর্য নরম গদিতে গা এলিয়ে দিয়ে রাজ্যেশ্বর রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এটা তাঁর মালিকের আসন। সারাজীবন চাকরির ফল হিসেবে দুনিয়ায় প্রায় সবাইকে ভয় আর শ্রদ্ধার দূরত্বে রাখতে অভ্যস্ত হয়েছেন। এখন এই সিটে আরাম করে বসতে তাঁর ভারি সঙ্কোচ হতে লাগল। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় দুটো পিরিয়ডের ফাঁকে একবার দুষ্টুমি করে মাস্টারমশাইয়ের চেয়ারে বসেছিলেন। সেই অস্বস্তির কথা এখনও মনে আছে। এও অনেকটা তেমনি। কিছুক্ষণ উসখুস করে সামনের সিটের পেছনটা আঁকড়ে পিঠ টান করে উদ্ভট ভঙ্গীতে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলেন রাজ্যেশ্বর।

উঃ, মানুষের কত টাকা থাকে ' শুধু মাত্র হাল্কা জলখাবারের দাম হিসেবে যে টাকার চেক তিনি পকেটে করে নিয়ে যাচ্ছেন সেই অঙ্কের টাকার জন্য তাঁর মেয়ের বিয়ে প্রায় আটকে যেতে বসেছিল। এত টাকা কোথা থেকে পায় লোকে? ব্যবসা করে? তাঁর নিজেরও তো প্রথম জীবনে উদ্যম, বুদ্ধি বা কর্মক্ষমতার অভাব ছিল না। ছাত্র হিসেবেও ভালই ছিলেন। তাহলে? আসলে আজকের যুগে টাকায় টাকা আনে, অনেক টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করলে অনেক টাকা লাভ হয়। আলামোহন দাসের মত মাথায় খইয়ের ধামা নিয়ে বিক্রি করে বড়লোক হবার দিন গিয়েছে।

পরের দিন রাজ্যেশ্বর লিন্ডসে স্ট্রীটের একটা ইন্টেরিয়র ডেকরেশনের কোম্পানীতে গেলেন। তারা বিয়ের দিন সমস্ত বাড়ি আর বিয়ের মণ্ডপ আধুনিক কায়দায় সাজিয়ে দেবে। এখানেও টাকাটা তাঁরই মারফৎ জমা পড়ল। রাজ্যেশ্বর মনে মনে হিসেব করে দেখলেন এই দুটো আইটেমের খরচ সাকুল্যে তাঁর মেয়ের বিয়ের সম্পূর্ণ খরচের সমান। এরপরেও তো প্রায় সমস্ত খরচই বাকি রয়ে গেল। লোক খাওয়ানো (করবে শহরের সবচেয়ে দামী ক্যাটারার), বরাভরণ, মেয়ের গয়না এবং অন্যান্য যাবতীয় সব। আহা, তাঁর যদি অনাথ হালদারের মত একখানা চেক বই থাকত। যে চেক বই থেকে ইচ্ছেমত অনন্ত চেক কাটা যায়। যে চেক বইয়ের মালিক বাস করে মালিন্যহীন দারিদ্র্যহীন ক্ষুধা-চিন্তা-অশ্রুহীন এক চিরসুখের

রাজ্যে—তাঁর মত সাধারণ ক্লিষ্ট মানুষের হাসিকান্না যে জগতে অন্যের মুখে শোনা করুণ গল্পের মত ব্যঞ্জনাহীন।

সেদিন রাত্রিতে বিছানায় শুয়ে সর্বাণী বললেন—রোজ রোজ কী অফিসে যাওয়া আরম্ভ করেছ? তাহলে আর ছুটি নেবার মানে কী রইল? মেয়ের বিয়েতে এত খাটনি গেল, এবার একটু বিশ্রাম কর—

রাজ্যেশ্বর বললেন—উপায় নেই। মালিকের মেয়ের বিয়ে না মেটা পর্যন্ত একটু দৌড়োদৌড়ি করতেই হবে। চাকরির শেষদিকে লোকটা এক কথায় দশ হাজার টাকা লোন দিয়েছে, বুঝলে না? এই তো পরশু বিয়ে, তারপরই—

সর্বাণী তাঁর দিকে ফিরে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। কোমরের ওপর দিয়ে লম্বা করে রাখা হাত শীর্ণ দেখাচ্ছে। প্রায় তিনদশকের কঠিন জীবনযাপন মুখের লালিত্য চুরি করেছে। অথচ বিয়ের সময় সর্বাণী দেখতে বেশ ভালই ছিলেন। রাজ্যেশ্বর স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে বললেন—একটা কথা বলব, সত্যি উত্তর দেবে? আমি কি বিয়ে করে তোমাকে কেবলই কষ্ট দিয়েছি? তুমি একটুও সুখী হও নি?

অনেকদিন পরে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আদর পেলেন সর্বাণী। কোন দ্বিধা না করে, অনুপম মিথ্যা বানানোর জন্য নিজেকে কোন সময় না দিয়ে সর্বাণী বললেন—আমি সুখী। তুমি বিশ্বাস কর, আমি সুখী। একজন মানুষ কতটা ভাত খায়? ক'খানা শাড়ি পরে? সে-সব কষ্টকে আমি কষ্ট বলে গ্রাহ্য করি না। তোমার মত মানুষ ক'জন হয়? ভগবান করেন যেন জন্মে-জন্মে তোমার কাছে আসি—

রাজ্যেশ্বর স্ত্রীর কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন। কিন্তু তবুও মনের গভীরে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে থাকে। কষ্ট দেয়। ছোট হয়ে থাকার কষ্ট। জীবনভোর উচ্চাসন অপরকে ছেড়ে দেবার কষ্ট।

বিয়ের দিন খুব ভোরে অনাথ হালদারের বাড়ি চলে গেলেন রাজ্যেশ্বর। সকাল সাতটা থেকেই কাজের ভিড় লেগে গেল। বাড়ির পেছনদিকে একটু খোলা জমি, তার ধারে কর্মচারীদের থাকবার আউট-হাউস। এই জমির একধারে ত্রিপল খাটিয়ে দুপুরে খাবার জন্য রান্না হচ্ছে। একটু আগে তিনচাকা টেম্পোগাড়ি করে তরকারি আর মাছ এসে পৌঁচেছে। এমন অসময়ে ফুলকপি কি করে জোগাড় হল কে জানে! পয়সা থাকলে সবই সম্ভব। জগু চাকর দুগ্ধধবল নিটোল কপি-গুলো রান্নার জায়গায় নিয়ে সাজিয়ে রাখছে। মাছগুলো ঠিক ঠিক রুই তো? না তিমিমাছের বাচ্চা? এক একটার ওজন আট-দশ কিলো তো বটেই।

ওদিকে কোম্পানীর লোক এসে বাড়ি সাজাতে আরম্ভ করেছে। তারা চেয়ার-টেবিল টেনে, তার খাটিয়ে, যেখানে-সেখানে মই বেয়ে উঠে দক্ষযজ্ঞ আরম্ভ করে দিয়েছে। বেলা ন'টা বাজতে না বাজতে হালদার পরিবারের আত্মীয়রা আসতে শুরু করলেন। বাড়ির সামনে মোটরগাড়ির মেলা লেগে গেল। মেয়েদের দামী দামী বিচিত্র শাড়ি, পুরুষদের সুট-বুট-টাই অথবা চওড়াপাড় ধুতি আর ফিন্-ফিনে পাঞ্জাবী, গলায় আবার সোনার হার। ছেলেপুলেগুলো যেন পরীর দেশ থেকে নেমে এল। তাদের কারো মুখে কোন দুঃখের ছায়া নেই, চাহিদার প্রকাশ নেই, আঙুলের ফাঁকে বা কানের পিঠে ময়লা নেই। সর্বসুন্দর, সব ছিমছাম।

আচ্ছা, অনাথ হালদারের কোন গরীব আত্মীয় নেই? সবাই এমনি বড়লোক? সবার গাড়ি আছে?

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে স্বয়ং অনাথ হালদার সদ্য আগত এক আত্মীয়কে আপ্যায়ন করছেন—এই যে, আসুন আসুন। যাক, বিয়ে উপলক্ষে তবু আসা হল। দু'দিন থাকতে হবে কিন্তু। খুবই কষ্ট হবে যদিও, কোন আয়োজন করতে পারি নি—

অকারণ বিনয়ে মানুষ কিনা বলে।

আর একটা কথা ভেবে রাজ্যেশ্বরের হাসি পেল। তিনি সারাজীবনের সঞ্চয় ব্যয় করে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ভবিষ্যতের পাথেয় বলতে বাকি কিছু নেই। আর এই ভদ্রলোক দু'হাতে দেদার খরচ করে নিশ্চিন্তে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন—তবু ইনি অনাথ, আর তিনি রাজ্যেশ্বর। নামগুলো মাঝে মাঝে এমন গোলমাল করে।

গোধূলি লগ্নে বিয়ে। আলো থাকতেই বিকেল বিকেল পাত্র এসে হাজির। সঙ্গে অসংখ্য বরযাত্রী। পাত্র খুব সুপুরুষ—লম্বা, ফর্সা রঙ, থুতনির কাছে নিখুঁতভাবে ছাঁটা দাড়ি। একেই কী ফ্রেঞ্চ-কাট বলে? বাকি গালে নীলচে আভা। বিয়ে করতে যাবার সময় বরের যে স্বাভাবিক সঙ্কোচ থাকা নিয়ম তা এর মধ্যে নেই। বেশ চটপট কথা বলছে, খটমট হেঁটে নিজের সঙ্গীদের তদারক করছে। কিন্তু মনের গভীরে তুলনা করে নিজের অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ জামাইয়ের প্রতি একটা অদ্ভুত মমতা অনুভব করলেন রাজ্যেশ্বর। একটু অনভিজ্ঞ, সাধারণ মধ্য-বিত্ত অল্প আয়ের জামাই—তবু সে-ই কত প্রিয়। কপালের ষড়যন্ত্রে এমন খচমচে জামাই তাঁর হলে তিনি কী বিপদেই পড়তেন। সোনার পুতুল শুধু সাজিয়ে রাখা ছাড়া আর তো কোন কাজে আসে না।

বিয়ের লগ্নের ঘণ্টাখানেক আগে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার এলেন। সই করে আইনসম্মত সরকারী বিয়ে হল। এরপরে শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানও হবে। পাত্র নাকি কেবল রেজেস্ট্রি করেই বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু অনাথ হালদারের ইচ্ছে মন্ত্রপড়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার। শাঁসালো শ্বশুরের ইচ্ছে হবু জামাই অগ্রাহ্য করতে পারে নি।

সই করার সময় মেয়েকে ভেতর থেকে নিয়ে আসা হল। দুপুর থেকে কলকাতার বিখ্যাত এক বিউটি পার্লারের দু'জন মহিলা তাকে যত্ন করে সাজিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যেশ্বরের মনে হল এত ঘষা-মাজা করা সত্ত্বেও তাঁর খুকি দেখতে বেশি সুন্দর। তাও তো সে এমন খোঁপা বাঁধতে জানে না, এমন সাজগোজও কখনও করে নি।

বিয়ের অনুষ্ঠান আর লোক খাওয়ানো মিটতে অনেক রাত হয়ে গেল। শেষ ব্যাচে খেতে বসেছিলেন রাজ্যেশ্বর। অনাথ হালদার নিজে একবার এসে দেখাশুনা করে গেলেন। তাঁর কাছে এসে বললেন—রাজ্যেশ্বরবাবু, ভাল করে খাচ্ছেন তো? যা লাগে চেয়ে নেবেন—

রাজ্যেশ্বরের খিদে ছিল না। বয়েস হয়েছে, সারাদিন পরিশ্রমের পর অসময়ে আর খেতে ইচ্ছে করে না। বললেন—আপনি ব্যস্ত হবেন না স্যার! আমি পেটভরে খাচ্ছি—

কালকের দিনটাও একটু আসবেন, কেমন? সন্ধ্যে নাগাদ মেয়ে-জামাই রওনা দেবে, জিনিসপত্রগুলো ঠিক করে গুছিয়ে পাঠাতে হবে। একটু দেখবেন।

আসব স্যার, নিশ্চয় আসব। সকালেই এসে পড়ব এখন—

রাজ্যেশ্বর জানেন না সমস্ত বিশ্বজগৎ সত্যি কারো পরিকল্পনা মত চালিত হয় কিনা, এই বিশাল পৃথিবীতে তাঁর মত অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র মানুষের দুঃখ বেদনার কোন দাম আছে কিনা, কিন্তু পরের দিন তাঁর জীবনে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। ঘটনাটা বাইরের কিছু নয়, অন্য কারো চোখে পড়বার মতও কিছু নয়। তবু রাজ্যেশ্বর এর ভেতর দিয়ে একচমকে গভীর এক জীবনসত্যের স্বরূপ দেখতে পেলেন।

সারাদিন কার্জে-কর্মে নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই। নিজে সব তদারক করে তিনটে ট্রাকে যৌতুকের মালপত্র বোঝাই দিয়ে রওনা করিয়ে দিলেন রাজ্যেশ্বর। সন্ধ্যেমুখো এরোপ্লেনের মত বিরাট কী বিলিতি গাড়ি চেপে মেয়ে-জামাই বিদায় নিয়ে গেল।

বাড়ি ঝিমিয়ে এসেছে। রাজ্যেশ্বরও খুব ক্লান্ত। এবার তিনি ফিরে গিয়ে একটু বিশ্রাম করবেন। অনাথ হালদারকে বলে যাওয়া দরকার।

শশী বেয়ারা বলতে পারল না সাহেব কোথায়। নিকুঞ্জ ড্রাইভারও বাবুকে দেখে নি। খুঁজতে খুঁজতে হলঘরের পাশে ছোট্ট স্টাডিতে ঢুকলেন রাজ্যেশ্বর। ঘরে আলো জ্বালা হয় নি। বুককেসের পাশে আরামকেদারার দিকে তাকিয়ে একমুহূর্তে রাজ্যেশ্বরের সমস্ত ধাঁধা কেটে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন তফাৎটা বহিরঙ্গ, ভেতরে সব এক। ডাইরেক্টর মিথ্যে কথা বলেন নি।

আরামকেদারার হাতলে মাথা রেখে সামান্য বেতনের গরীব কেরানীর মতই মেয়েকে বিদায় দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন বহুলক্ষপতি অনাথ হালদার। সামান্য মানুষের মতই।

নিঃশব্দ পায়ে ফিরে আসতে আসতে রাজ্যেশ্বর অনুভব করলেন, অন্তত এই মুহূর্তের জন্য তাঁর নামটা ভয়ানকভাবে সার্থক।

প্রান্তিক

ছেলে পড়িয়ে ফিরছিলেন সুখময়। রাত হয়েছে, পথঘাট নির্জন। রাস্তার দু'পাশে বৃটিশ আমলের বড় বড় গাছ। তার ডালপালার ফাঁকে আটকা পড়েছে ত্রয়োদশীর চাঁদ। দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে। এই একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলোতেই সুখময় হঠাৎ আবিষ্কার করেন তাঁর অস্তিত্ব দুটো ভাগে ভাগ করা। একটা দিনের, আর একটা রাতের। সারাদিন ইস্কুলে পড়িয়ে, রোলকল করে, সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে, বিকেলে তিনটে টিউশানি সারেন যে সুখময় দত্ত, সে অন্য কেউ হবে। কিন্তু রাত্তিরে এমন দু'একটি পরম মুহূর্তে সুখময় রক্তের ভেতরে উচ্চতর এক ব্যক্তিত্বের পদধ্বনি শুনতে পান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনেক দুঃখ দূর হয়ে যায়। যেমন ক্লাস টেন 'সি' সেকশনের জয়দেব ছেলেটা বড় অবাধ্য হয়েছে। অবাধ্য শব্দটা ব্যবহার করলে অবশ্য সমস্ত ঘটনার কিছুই প্রকাশ করা যায় না। ছেলেটা পাকা বদমাশ হয়ে উঠেছে। লুকিয়ে গাঁজা খায়। স্কুলের পুজোয় সে ছিল দলপতি। পুজোর

পরদিন সরস্বতী প্রতিমার পেছন থেকে একটা নিঃশেষিত কালী মার্কা বোতল পাওয়া গেল। ক্লাস টেনের ছেলেরা রাত্তির জেগেছিল। অনুপ মারের চোটে ফাঁস করে দিল জয়দেবের নাম। তখন স্কুলে হেডমাস্টার নেই, মধুসূদনবাবু ডেকে বকাবকি করলেন জয়দেবকে, বললেন—তাড়িয়ে দেবেন ইস্কুল থেকে। উত্তরে জয়দেব বলল—তাহলে স্যার রাস্তায় একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন। মধুসূদনবাবু ভালমানুষ লোক—ভয় পেয়ে চেপে গেলেন সমস্ত কিছু।

এখন ত্রয়োদশীর চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে কথাটা সুখময়ের মনে পড়ল। জয়দেব লেখাপড়া করুক বা না করুক, নেশাভাঙ করুক, তাতে তাঁর কি? কিন্তু তবু একটা অকারণ দুঃখ সুখময়কে বিমর্ষ করে রাখে। কেন জয়দেব এমন করে? তিনি নিজেও বহুদিন বুঝিয়েছেন—কোন ফল হয় নি।

ছোটবেলায় তিনি পড়তেন আনন্দ ঠাকুরের পাঠশালায়। প্রথম পাঠশালায় ভর্তি হবার দিনের কথা এখনো মনে আছে। নতুন কাঁচা বাঁশের বেড়ার দেয়াল, তলায় খেজুর পাতার চাটাই। সামনে আনন্দ ঠাকুরের গৌরবর্ণ রাগী মুখখানা আর জলচৌকির ডান পাশে মাটিতে পড়ে থাকা বেতটা। বেত ব্যবহার করবার বড় একটা দরকার হত না। পণ্ডিতের আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব ছিল—তাতেই কাজ হত। এখনও চোখবুজে মনঃসংযোগ করলে সুখময় সেই নতুন কাঁচা বাঁশের বেড়ার গন্ধ পান।

যখন তিনি ছেলে পড়িয়ে একা একা বাড়ি ফেরেন অথবা নিজের ছোট্ট ঘরটায় বসে চুপচাপ রান্না করেন, তাঁর মনের ভেতরে ভারি গলায় নামতা পড়ার মত করে কে বলে—সময় বদলে যাচ্ছে, সুখময়, যুগ পাল্‌টে যাচ্ছে।

সত্যিই যুগ বদলে গেছে। জয়দেব তাঁর নাতির বয়সী। ওর বয়সে তিনি স্কুলের করিডর দিয়ে হেডমাস্টারকে আসতে দেখলে আতঙ্কে নীল হয়ে যেতেন। এখন সে সমস্ত গল্পের বিষয়বস্তু হয়ে গেছে। সুখময় কেবল এক-জায়গায় স্থির, আর সময় এগিয়ে চলেছে দ্রুত লয়ে। সময় যেন এক জিপসী বুড়ো। কাঁধে পুরনো স্মৃতির তালিমারা ছেঁড়া থলে। হাতে ডাকের হরকরার মত ঘুন্টিদার লাঠি। ঝুনঝুন করে সবাইকে জানান দিতে দিতে চলেছে বুড়ো জিপসী। মাঠ-প্রান্তর, পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে সে পথ চলে। পায়ের নিচে পাথরে পাথরে ঠুকে জ্বলে ওঠে লাল-নীল আলোর স্ফুলিঙ্গ। খররৌদ্রে, নিঃসীম জ্যোৎস্নায় সে সমান নির্বিকার—এগিয়ে যায়, ঝুনঝুন শব্দ করে মিলিয়ে আসে লোকালোক পর্বতের ও-পারে। পেছনে পড়ে থাকেন সুখময়।

অনেক চেষ্টা করেও সুখময় মনের মত ছাত্র পান নি সারা জীবনে। ফার্স্ট-সেকেন্ড তো অনেকে হয়। কিন্তু একটি বুদ্ধিদীপ্ত মুখ? একজোড়া উজ্জ্বল চোখ? নাঃ, সে সব শুধুই স্বপ্ন।

কতদিন ক্লাসে গল্প করেছেন—বাবারা, গরম পড়ে আসছে। এখন যাযাবর পাখির দল ফিরে চলে যাবে সাইবেরিয়ায়, তিব্বতে। যাযাবর পাখি জানো তো? মাইগ্রেটরী বার্ড—শীত কাটাতে আসে, শীতের শেষে আবার উড়ে চলে যায় হাজার হাজার মাইল পথ। সেখানে এখন বরফ অল্প অল্প গলছে, বরফের চাদর ফুটো করে মাথা তুলছে দু'একটা গাছের চারা। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে দ্বীপে এখন বসন্ত এসে গেছে। শীতের শান্ত সমুদ্র একটু একটু করে আবার ফুলে

উঠছে। জোয়ারে এগিয়ে আসছে, ভাঁটায় ফেলে রেখে যাচ্ছে বেলাভূমির ওপর সাদা ফেনার রেখা। সন্ধ্যেবেলা নারকেল গাছের পাতায় সেখানে জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্‌ করে বাবারা। যেতে ইচ্ছে করে না তোমাদের?

সামনে কয়েকটি ভাবলেশহীন মুখ। সুখময়ের বর্ণনা তাদের মনে কোন রেখাপাত করে নি।

এমনি চলেছে বছরের পর বছর। এখন সুখময় ক্লান্ত।

ত্রয়োদশীর চাঁদ থেকে চোখ নামিয়ে নিজের ছোট্ট ঘরখানার দিকে পা চালালেন সুখময়। গিয়ে এখন রান্না করতে হবে স্টোভ জেলে, তারপর খাওয়া। ভাতে-ভাত দুটো ফুটিয়ে নেবেন এখন। আজ বেশি কিছু রান্না করতে ইচ্ছে করছে না।

মর্নিং মার্কেট ছাড়িয়ে গেলেন। এবার চৌমাথার মোড় পেরুলেই তাঁর আস্তানা। সে সময়, সেই নির্জন মুহূর্তে পথের ওপর দাঁড়িয়ে সুখময়ের হঠাৎ এক বিচিত্র অনুভূতি হ'ল।

মনে হ'ল কেউ যেন তাঁকে দেখছে।

সুখময় এদিক-ওদিক তাকালেন। কাছাকাছি কেউ নেই। ফাঁকা রাস্তা। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। তবু সুখময় স্পষ্টতই অনুভব করলেন কেউ কোথাও থেকে প্রখর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক তাকিয়ে আছে বললে ভুল হবে, কেউ যেন তাঁকে ডাকছে, কাছে যেতে বলছে।

এ ধরনের অনুভূতির কোন ব্যাখ্যা হয় না। যে ডাকছে সে কিভাবে ডাকছে, আর সুখময়ই বা সেটা কেমন করে বুঝতে পারছেন তা বোঝানো সম্ভব নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে সুখময় শরীরের প্রতি রোমকূপে উপলব্ধি করছেন সেই চৌম্বক আহ্বান।

বোধটাকে ঝেড়ে সুখময় এগুতে গেলেন, তখনই নজর পড়ল দোকানটার দিকে। এখানে দোকান কবে হ'ল? কালই এখান দিয়ে কি কাজে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন—কাল না পরশু? তখন তো এটা চোখে পড়ে নি! রাতারাতি এত বড়ো একটা দোকান গজিয়ে গেল?

নিবারণ মিষ্টান্ন ভান্ডার আর জ্যোতিষের লন্ড্রীর মধ্যে নতুন দোকানটা। যতদূর স্মরণ হয়—এখানটা ফাঁকাই ছিল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন সুখময়।

কোন সাইনবোর্ড নেই, ন্যাড়া দোকান। দরজার দু'দিকে দুটো কাঁচের শো-কেস। দরজায় তালা লাগানো নেই, পাল্লার ফাঁক দিয়ে সামান্য আলোর ইশারা। অর্থাৎ দোকানের মালিক এখনো দোকান পুরোপুরি বন্ধ করে বাড়ি যায় নি। ভেতরে কিছু করছে।

হঠাৎ সুখময়ের মনের ভেতরে সেই আশ্চর্য আহ্বান চতুর্গুণ তীব্রতার সঙ্গে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, যেন তিনি সেই নীরব আহ্বানের উৎসের খুব কাছাকাছি এসে গেছেন।

কে যেন সুখময়কে আদেশ করল—ওই দরজা ঠেলে ভেতরে যাও।

সুখময় কিছু না ভেবে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারের ও-পাশ থেকে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে উঠে বলল—আসুন সুখময়বাবু।

সুখময় ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলেন। অদ্ভুত দোকানটা! কি বিক্রি করে

এরা এখানে? তেমন কোন জিনিস তো দেখা যাচ্ছে না। কড়িকাঠ থেকে পেতলের শেকলে ঝোলান একটা মধ্যযুগীয় বাতিদান ঘরে আলো ছড়াচ্ছে। কিছু কাগজপত্র আর কাউণ্টারটা ছাড়া দোকানে আর কোন জিনিস নেই।

লোকটা মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়েই আছে। সুখময় কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন—আপনি আমার নাম কি করে জানলেন? এটা কিসের দোকান?

লোকটি সেই সুন্দর হাসি ফুটিয়ে রেখেই উত্তর দিল—আপনার নাম কেন জানব না? আপনার জন্যেই যে আজ অপেক্ষা করছিলাম।

—আমার জন্য?

—হ্যাঁ। আজ আপনার এখানে আসবার কথা ছিল।

সুখময় ভাবলেন তিনি নিশ্চয় পাগল হয়ে যাচ্ছেন। এসব কি কাণ্ড! চোর-জুয়াচোরের পাল্লায় পড়লেন না তো? আজকাল হাজার রকমের ঠগ-জোচ্চোর বাজারে ঘুরছে।

লোকটি বললো—না, ভয় করবেন না। এটা গুণ্ডার আড্ডা নয়। তাছাড়া আপনার পকেটে আছে মোটে দু'টাকা তিপ্পান্ন পয়সা। কি লোভে গুণ্ডারা আপনাকে ধরবে?

সুখময়ের মাথা ঘুরছে। লোকটা কি থট্-রিডিং জানে নাকি। পকেট হাতড়ে পয়সা-কড়ি যা ছিল বের করলেন। একটা দু'টাকার নোট, একটা আধুলি আর একটা তিন পয়সা। তিনি নিজেই জানতেন না তাঁর কাছে কতো আছে। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললেন—কি করে জানলেন আমি আসব?

—আমি আর কি করে জানব? আপনিই খবর দিয়েছিলেন?

—মানে?

—মানে এটা হলেও-হতে-পারত-র জগৎ। যা আপনি চান অথচ কিছুতেই পান না, এখানে তা পাইয়ে দেওয়া হয়। দেখুন তো এ ছবিটা আপনার কেমন লাগে?

একটা রঙীন ছবি এগিয়ে দিল লোকটি। সুখময় হাতে নিয়ে আলোর নিচে মেলে ধরলেন।

ধু-ধু মরুভূমির দৃশ্য। দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বালির সমুদ্র। ইস্পাতের মত ঝকঝকে আকাশে সূর্য জ্বলছে। সেই আদিগন্ত বালুকাসমুদ্রে চুপ করে দাঁড়িয়ে একটি উট। মুখটি তার আকাশের দিকে তোলা।

মুখ তুলে সুখময় বললেন—এর মানে?

লোকটি অন্তরঙ্গ স্বরে বলল—এমন জায়গায় আপনার যেতে ইচ্ছে করে না? প্রচণ্ড রৌদ্রে বালির ওপরে কাঁপছে তাপতরঙ্গ, হু-হু হাওয়া এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছে বালির স্তূপ। হাওয়ায় জেব্রার গায়ের মত দাগ পড়ে যাচ্ছে বালির ওপরে। তার মধ্যে দাঁড়িয়ে একটি উট। ইচ্ছে করে না এমন জায়গায় যেতে?

সুখময় বললেন—করে।

লোকটি বলল—সেজন্যেই আমাদের দেখা হয়েছে। যখনই না-মেটা-সাধের যন্ত্রণা আপনার মধ্যে বেড়ে উঠেছে, তখনই আমরা খবর পেয়েছি। আজ আপনি এখানে আসতেনই।

সুখময় কেমন সম্মোহিত হয়ে পড়ছেন লোকটির সুন্দর দুই উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে। একটা ঢোক গিলে তিনি বললেন—এখানে কি হয়?

লোকট মিষ্টি করে হেসে বলল—এখানে স্বপ্ন বিক্রি করা হয়।

সুখময়ের বড় ইচ্ছে হ'ল, তিনি বলেন—আমি একটা স্বপ্ন কিনবো। কিন্তু যাঃ! তাও কি বলা যায়? সে ভারি ছেলেমানুষী হবে।

কিন্তু বলবার দরকার হ'ল না। লোকটি মন পড়ে নিতে পারে। সুখময়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল—ঠিক আছে, আপনাকে একটি সুন্দর স্বপ্ন বিক্রি করা হ'ল। যথাসময়ে পেয়ে যাবেন।

—কতো দাম দিতে হবে? আমার কাছে তো বেশি পয়সা নেই।

—দাম? দাম তো আপনি আগেই মিটিয়ে দিয়েছেন আপনার জীবনের শত দুঃখকষ্ট আর ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে। নতুন করে কি দেবেন? স্বপ্ন কি পয়সা দিযে কেনা যায়? মূল্য আমরা পেয়ে গেছি। আচ্ছা, নমস্কার।

সুখময় যখন বেরিয়ে এলেন তখন ত্রয়োদশীর চাঁদ অনেকটা সবে গেছে পশ্চিমেব দিকে। কুড়ি-পঁচিশ পা হেঁটে একবার পেছন দিকে তাকালেন।

নিবারণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার আর জ্যোতিষের লণ্ড্রীর মাঝখানের এক চিলতে জমিটুকুতে রোজকার মত চক্‌চক্ করছে জ্যোৎস্না। খালি। কোনকালে সেখানে কিছু ছিল বলে মনে হয় না।

নিজের ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে মিটমিটে আলোটা জ্বাললেন সুখময়। খোলা দরজা দিয়ে আসা বাতাসে পায়ের কাছ থেকে একখানা পোস্টকার্ড উড়ে গেল টেবিলের পায়াব কাছে। তুলে নিয়ে দেখলেন ছোট ভাই রসময় লিখেছে শিমুরালি থেকে। ছেলের অন্নপ্রাশন, তিনি যেন অতি অবশ্য শনিবার বিকেলে উপস্থিত হন। নইলে রসময় নিজেই লোক পাঠিয়ে—ইত্যাদি। দরজার ফাঁক দিয়ে পিওন ফেলে গেছে চিঠিখানা।

পোস্টকার্ডটা টেবিলে পাতা খববের কাগজের নিচে গুঁজে স্টোভ জ্বেলে ভাত চাপালেন সুখময়। একটা ডিম আর একটা আলু ফেলে দিলেন তাতে।

যাবেন বই কি শিমুরালি, নিশ্চয় যাবেন। ছুটি পাওনা আছে অনেক, কখনো নেওয়া হয় না। সোমবার ছুটি নেওয়া যাবে। বহুদিন রসময়ের সঙ্গে দেখা হয় নি।

স্টোভ নিবিয়ে যখন খেতে বসলেন সুখময় তখন চাঁদ দিগন্ত স্পর্শ করেছে।

শনিবার দুপুরে পোস্ট-অফিস থেকে কষ্টার্জিত পঁচিশটি টাকা তুলে শিমুরালি রওনা দিলেন সুখময়। ট্রেনে চেপেই তাঁর ভারি ফূর্তি হ'ল। অনেক দিন বাদে ট্রেনে চড়া—প্রায় দেড় বছর বাদে। কখনো কোথাও যাওয়ার তো দরকার পড়ে না।

সট্‌সট্ পিছিয়ে যাচ্ছে ঘরবাড়ি, লেভেল ক্রসিং, চিমনির চোঙা। শ্যামনগরে পানাভরা পুকুরের ধারে কাদের ছোট্ট মেয়ে মুখে আঙুল পুরে অবাক হয়ে ট্রেনের দিকে তাকিয়ে।

মনে খুব আনন্দ। তাঁকে তাঁর প্রিয় একটি স্বপ্ন বিক্রি করা হয়েছে। সুখময় ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন। ব্যাপারটার অবাস্তবতা বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন

না। কেবলই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে যে একটা স্বপ্ন তাঁকে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। ওই দিগন্তের ও-পার থেকে যেন ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে তাঁর স্বপ্ন।

উঠোনে পা দিতেই রসময় দৌড়ে এসে পায়ের ধুলো নিল। ছেলে কোলে এলো রসময়ের বউ। গাঁয়ের মেয়ে, ভাসুরকে ছোঁবে না, দূরত্ব রেখে গড় হয়ে প্রণাম করল। অবাক চোখে চারদিকে তাকালেন সুখময়। অল্প দিনে রসময় বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। টালির ছাউনি দেওয়া ছিমছাম বাড়ি। সামনে একটু ফুলের বাগান। টালির ওপর লাউগাছ বেড়ে উঠেছে। পোষা হাঁস কাঠের বাক্স থেকে বেরিয়ে পুকুরের দিকে যাচ্ছে। বেশ আছে রসময়। ভগবান ওর ভাল করুন।

দাওয়ায় ফুল-তোলা কাপড়ের আসন পেতে বসেছেন সুখময়। গল্প হচ্ছে।

—বেশ গুছিয়ে বসেছিস রসো। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ছেলেটা বড় হলে বুড়ো বয়সে তোর আর দুঃখু থাকবে না—

হাত-পাখা নাড়তে নাড়তে রসময় বলল—বিয়েটা করলে না দাদা, একা একা পড়ে থাকো কোন্ মুলুকে। বিয়ে করলে সেবাযত্নটা পেতে।

—বিয়ে করলে তোরা কোথায় যেতিস? যখন বিয়ে করে ফুর্তি করবার বয়েস, তখন তোদের মানুষ করেছি। আমার চিন্তা কি? যদি অপারগ হই তো তোর এখানে এসে ঠেলে উঠবো। তুই দেখিস রসো, আমি মরবো তোর বাড়িতে। শেষ বয়েসে তাড়িয়ে দিবি না তো?

—চাকরি ছেড়ে কালই এসে পড়ো দাদা, এসে আমার সংসার ধবো। তবে তো বেঁচে যাই—

—বললি যে, এই যথেষ্ট। বুড়ো বয়সে ঠিক আসবো—তোর ভিটেয় মরবো—।

ক'দিন খুব আনন্দ হ'ল। মঙ্গলবার ফেরা হ'ল না, বুধবারও না। মাঠে মাঠে দুরন্ত অবাধ্য বালকের মত ঘুরলেন সুখময়। খররৌদ্র উপেক্ষা করে বসে রইলেন সাঁতরা দীঘির পৈঠায়। বহুদিন বাদে যেন আবার ছোটবেলা ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে পড়া ফাঁকি দিয়ে আম-জাম তলায় ঘুরে বেড়াবার দিন।

বৃহস্পতিবার কাজে যোগ দিলেন সুখময়। মাস্টারমশাইরা তাঁকে দেখে সবাই খুশি। কালীবাবু বললেন—কি ব্যাপার সুখময়? হঠাৎ ডুব দিলে যে? চোখ লাল কেন?

—শরীরটা ভাল না দাদা। সব ভাল?

ক্লাসে বসে বার বার মন এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছিল। খুব আনন্দ করা গেছে এ ক'দিন। আর যেন কাজে মন বসছে না। সারাজীবন অনেক কাজ করেছেন, এবার একটা লম্বা ছুটি নিলে বেশ হয়।

আজ যদি তিনি বিয়ে করতেন! রসময়ের মত ছোট্ট একটা বাড়ি, সামনে বাগান, শক্তসমর্থ জোয়ান একটা ছেলে।

ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে যায়। সময় ফুরিয়ে যায়। ছুটি হয়ে যায়।

ঘরে ফিরে আর টিউশনিতে যেতে পারলেন না সুখময়। তাঁর প্রবল জ্বর এলো। একলা ঘরের নিঃসঙ্গ বিছানায় শুয়ে তিনি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে এলেন।

ক্রমে বিকেল গিয়ে সন্ধ্যে এলো। সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত্তির। সুখময় জল খাবেন।

জলতেষ্টা পেয়েছে। কিন্তু জলের কুঁজোটা যেন বহু দূর; আর একটা মহাদেশের ও-পারে।

মাথায় বড্ড যন্ত্রণা। কেউ যদি একটু টিপে দিতো।

ঘরে অন্ধকার। কেবল জানালা দিয়ে ল্যাম্প-পোস্টের আলো কিছুটা এসে পড়েছে মেঝেতে। সেই আবছা অন্ধকারে জলের কুঁজোর অস্পষ্ট অবয়ব দূরে দেওয়ালের গায়ে আঁকা। সুখময় জল খাবেন। তাঁর জলতেষ্টা পেয়েছে। তাঁর শরীর এমন খারাপ কি? এক্ষুনি তিনি নিজে উঠবেন, কাঁচের গ্লাসে জল গড়িয়ে নিয়ে ঢেলে দেবেন গলায়। এক গ্লাস—দু' গ্লাস—তিন গ্লাস। জলধারা গলা বেয়ে নেমে যাচ্ছে বুকের দিকে। আঃ! কি তৃপ্তি!

এখন কত রাত? সাতটা? আটটা? ন'টা? আকাশে নিশ্চয় অনেক নক্ষত্র উঠেছে। এমন রাতেই তো ভবঘুরে স্বর্ণানুসন্ধানীরা ক্লান্ত শরীরে তাঁবু খাটায় দুই পাহাড়ের মধ্যের উপত্যকায়। গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের নির্জন পার্বত্য প্রদেশে অভ্রের কণা চমকে ওঠে নক্ষত্রের আলোয়। ট্রপিক্যাল অরণ্যের গভীরে রাতের স্তব্ধতা ছিঁড়ে কর্কশ স্বরে ডেকে ওঠে ধনেশ পাখি—বুসেরোস্ বাইকর্নিস্। অরণ্যের মাথায় ঝরে পড়ছে মান্না ডিউ—দেবতাদের উপভোগ্য মধু। স্বাতী তারা থেকে ঝরছে জল উন্মুখ ঝিনুকের বুকে। কানে বাজছে দূর থেকে ভেসে আসা আশ্চর্য সঙ্গীত!

সুখময়ের খুব জলতেষ্টা পেয়েছে। তিনি জল খাবেন।

ঘরের মধ্যে অন্ধকারে কে নড়ছে না? কে? কে ওখানে?

-আমি স্যার—

—কে তুই?

আমি জয়দেব।

—জয়দেব! তুই কেন এলি বাবা আবার?

—শুনলাম স্যার আপনার অসুখ, তাই এলাম। রাত্তিরে আপনার কাছে থাকবো।

—তোকে কে বলল আমার অসুখ? কে খবর দিল?

—আপনার অসুখ, আর আমি খবর পাব না? ভয় নেই স্যার, ভাল হয়ে যাবেন। আমি নিজে আপনার সেবা করব।

—আমি ভাল হয়ে গেছি। আমার আর অসুখ নেই।

কিসের একটা সমুদ্র ফুলে উঠেছে সুখময়ের বুকের মধ্যে। কি আনন্দ, কি তৃপ্তি!

মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জয়দেব বলছে—আমার ওপর রাগ করেন নি তো স্যার? আমি আপনার আশা পূর্ণ করব। আমি সেই জায়গায় যাব, যেখানে শীতের শেষে যাযাবর পাখিরা নীল হ্রদের জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে যায়। যেখানে এখন বরফের চাদর ফুটো করে মাথা তুলছে গাছের চারা। রাগ করেন নি তো স্যার?

সুখময়ের বুকের ভেতরে দৌড়ে যাচ্ছে ঘুণ্টিদার লাঠি হাতে এক বুড়ো জিপসী। লোকালোক পর্বতের ও-পারে মিলিয়ে আসছে তার শরীর। নাকে ভেসে আসছে আনন্দ ঠাকুরের পাঠশালার বেড়ার কাটা বাঁশের তাজা গন্ধ।

সুখময় বুঝতে পারলেন এই স্বপ্নই তাঁকে বিক্রি করা হয়েছিল। জীবনের

দুঃখকষ্ট আর ব্যর্থতার মূল্যে তিনি এ স্বপ্ন কিনে নিয়েছেন।

সেই নির্জন ঘরের অন্ধকারে রোগগ্রস্ত সুখময় আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে নড়াচড়া না করে সন্তর্পণে শুয়ে রইলেন। পাছে তাঁর স্বপ্ন ভেঙে যায়।

তমসো পরস্তাৎ

ট্রেন চলেছে। তুলো বসেছে জানালার পাশে। বাইরে কত কি দেখবার। যেমন মাঠের মধ্যে ওই যে যন্ত্রটা বিকট ভট্ ভট্ শব্দ করে চলেছে, ওটা দিয়ে কি হয়? ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুক্ষণ উড়লো যে পাখিটা, সেটা কি পাখি? বাবাকে জিজ্ঞাসা করবার জন্য মুখ ফিরিয়ে দেখলো, বাবা তারই মতো জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রয়েছে। মুখ গম্ভীর। মাঝে মাঝে কি যে হয় বাবার ' কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকে। মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটা খুলে আস্তে আস্তে কাচ দুটো রুমাল দিয়ে মুছে আবার চোখে দেয়। আঙুল দিযে ঠিক করে বসিয়ে নেয়। তখন ঠিক মনে হয়, বাবাকে যেন কেউ বকেছে। বাবাব কেন মনখারাপ হয় তা ভেবে পায় না তুলো। বিশেষ করে বাবা যখন মায়েব কথা বলে, তখনই এমন হয়।

তুলো মাকে দেখে নি। মার কথা তার মনেও নেই। কেবল তাদের শোবার ঘরে মায়ের যে বাঁধানো ছবিটা টাঙানো আছে, সেটার সামনে দাঁড়ালে যেন খুব আবছা আবছা কি মনে পড়ে। শীতের দিনে উলের সোয়েটারে মুখ ডুবিয়ে ধরলে যেমন আরাম হয়, তেমন একটা অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে মনে।

আর, সে জানে না কেন, নাকে ভেসে আসে দুধের গন্ধ।

বাবার চিবুকে হাত দিয়ে তুলো ডাকলো—বাবাই—

অনেক দূরের জগৎ থেকে নিমাই ফিরে এলো তার ছেলের পাশে। —কি রে?

—ওটা কি পাখি উড়ছিলো বাবাই?

—কোন্‌টা রে? দেখি নি তো খেয়াল করে—

—দেখো নি? উড়ছিলো তো গাড়ীর পাশে—

লাইনের পাশে অন্য দ্রষ্টব্য আসে। পাখির কথা চাপা পড়ে যায়।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো নিমাই। আর বোধহয় তিনটে কি চারটে স্টেশন, তারপর নামতে হবে। অনেকদিন থেকেই আসতে লিখছিলো নিরঞ্জন।—আয়, একবার ঘুরে যা এখানে। এসে দেখ, কেমন ফুলের বাগান করেছি। এককালে ফুল ভালোবাসতাম। ফুলই এখন আমার অন্ন যোগায়। বারো বিঘে জমিতে ফুল চাষ করি—চালান দিই কলকাতায়। দু'পয়সা আসে। স্বামী-স্ত্রীতে জমিয়ে বসেছি। দেখবি না আমার বাগান?

যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। কলেজের ছুটিতে ছেলেকে নিয়ে এখানে-ওখানে বেড়াতে যায় নিমাই। কিন্তু সে সময় নিরঞ্জনের কথাটা কিছুতেই মনে পড়ে না। পরে ছুটি ফুরিয়ে গেলে অফিসে ফিরে এসে কাজ করতে করতে এক একদিন হঠাৎ মনে পড়ে যায়—ঐ যাঃ, নিরু তো বলেছিলো যেতে ' দেখব একবার কেমন বাগান করেছে ও।

—চল্ তুলো, ওঠ্। এবার নামতে হবে—

ট্রেনের গতি মন্দীভূত হচ্ছে। এবার সেই স্টেশন—যেখানে নিরঞ্জন ফুলের বাগান করেছে বারো বিঘে জমিতে। যেখানে জমিয়ে বসেছে স্বামী-স্ত্রী। যেখানে তারা সুখে থাকে।

প্ল্যাটফর্মে তাদের ফেলে রেখে এগিয়ে গেল গাড়ি। বেলা পড়ে আসছে। নির্জন স্টেশন। দু'পাশে মাঠ আর ক্ষেত। চশমার কাচের পেছনে নিমাইয়ের চোখ শান্ত হয়ে এলো। তার কানে কানে পড়ন্ত বিকেলের হাওয়া ফিস্ ফিস্ করে বললো—সবার কি সব থাকে? সবার কি সব সয়? তবু তো তোমার তুলো আছে—

নিমাই বললো—চল্ খোকন, একটা রিক্শা ভাড়া করি।

স্টেশনের বাইরে পা দিতেই রিক্শা নিয়ে এগিয়ে এলো একজন।—যাবেন বাবু?

—গুহবাড়ি চেন? নিরঞ্জন গুহ? সেখানে যাব।

—খুব চিনি। বাগানবাড়ি তো? উঠুন বাবু।

বেশ জায়গায় বাড়ি করেছে নিরু। কেমন মাঠ, ধানক্ষেত। মাঝখানে তার-কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা নিরঞ্জনের বারো বিঘে জমি আর বাড়ি। কাছাকাছি লোকালয় নেই। যেদিকে তাকাও শুধু পড়ন্ত হলুদ রোদ্দুর উপুড় হয়ে প্রণাম করছে পৃথিবীকে।

আর কতো ফুল। চারদিকের বিস্তীর্ণ সবুজের সমুদ্রে নিরঞ্জনের বাড়িটা যেন একটা রঙীন দ্বীপ। ঠান্ডা বেশ পড়তে শুরু করেছে। সীজন ফ্লাওয়ার ফুটে বাগান আলো হয়ে আছে।

রিক্শাওয়ালাকে পয়সা গুনে দিল নিমাই, ডাক ভেসে এলো—নিমা-আ—ই।

ডোরাকাটা পায়জামা আর সাদা শার্ট পরা নিরু দৌড়ে আসছে। মুখেচোখে অকৃত্রিম খুশি। ভারি ভালো লাগলো নিমাইয়ের। একদম বদলায় নি তো নিরু, ঠিক সেইরকম আছে। দিলখোলা—প্রাণবন্ত, ছ'বছর হ'ল বিয়ে করেছে, এখনো দৌড়তে পারে। বুড়িয়ে যায় নি।

দু'হাতে নিমাইকে জড়িয়ে ধরলো নিরঞ্জন।—হ্যালো রোল নাম্বার ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান, এতদিন বাদে?

হাসতে হাসতে নিমাই বললো—তুই এখনো আমার রোল নম্বর মনে করে রেখেছিস! সেই কবে কলেজ ছেড়েছি!

—দোজ হ্যাপেন্ড্ টু বি দি বেস্ট ডেজ অব আওয়ার লাইফ! মানুষ ভোলে শুধু দুঃখকে। স্মৃতিই তো সম্পদ। এই বুঝি খোকন? বাঃ, কি নাম খোকন?

বাবার বাঁ হাত ধরে তুলো বললো—তথাগত।

—বাঃ। খাসা নাম তোমার। আয়, ভেতরে চল্।

সরু পথ দিয়ে বাড়ির দিকে এগুতে এগুতে নিরঞ্জন বললো—বউ গিয়েছে বাপের বাড়ি। তোর চিঠি আসার আগেই। নইলে এখন যেতে দিতাম না।

—তোর বাচ্চাকাচ্চা হবে?

নিরঞ্জন হাসলো—এখনো তো কোনো লক্ষণ দেখছি না।

বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে চা খেতে বলা হ'ল। চায়ে চুমুক দিয়ে নিরঞ্জন বললো—তারপর কেমন কাটছে বল্—

—ওই একরকম। দিন নেহাৎ বসে থাকবার নয় তাই কেটে যায়।

নিরঞ্জন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললো—সত্যি, মাঝে মাঝে তোর কথা ভাবি। তোর জীবনটা যেন কেমন হয়ে গেল। অঞ্জলি গিয়েছে কতদিন হ'ল?

—প্রায় তিন বছর।

—অসুখটা ঠিকমতো আর ধরা পড়ে নি, না?

কই আর? যে যা বলেছে, করেছি। লাভ কিছুই হ'ল না।

কিছুক্ষণ সব চুপ। নিরঞ্জন বলে—তোকে আর এক কাপ চা দিই?

—চা? দে একটু—

—ডোণ্ট লুজ হার্ট নিমাই। কথার কথা বলছি বলে ভাবিস না, জীবনে সার্থকতা আসবেই। কখন কিভাবে আসবে কেউ জানে না—কিন্তু আসবেই। তখন চিনে নিস-

—নিরু—

—বল্ –

—আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই কি গেছে?

টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিমাইয়ের কাঁধে হাত রাখল নিরঞ্জন। হেসে বললো—অতীতে সুখের দিন গেছে মানি, কিন্তু যে দিন আসছে তা যে দুঃখের একথা কে বললো?

বন্ধুর হাত ছুঁয়ে রয়েছে তার কাঁধ। নিমাইয়ের মনে হচ্ছিল কি এক আশ্চর্য বিশ্বাস আর আশার অনুভূতি নিরুর হাত থেকে ছড়িয়ে পড়ছে তার শরীরে—মনে। সে বললো সত্যি বলছিস নিরু? তুই নিজে বিশ্বাস করিস একথা?

উত্তরে নিরঞ্জনের হাতের চাপ বাড়ল নিমাইয়ের কাঁধে।

তুলো বারান্দা থেকে নেমে গিয়েছিল বাগানের মধ্যে। অজস্র ফুল ফুটে আছে রাতের আকাশে নক্ষত্রের মতো। সব ফুল চেনে না সে। অনেকদিন বাদে কলকাতার পায়রার খোপের মতো বাড়ি থেকে মুক্তি পেয়ে ভারি আনন্দ হয়েছে তার। ঘুরে ঘুরে ফুল দেখতে লাগলো সে।

ঐ ঝোপে একরকম ফুল ফুটেছে। এ ফুল সে চেনে। বাবা এনে মায়ের ছবির নিচে একটা ছোট টেবিলে ফুলদানিতে রেখে দেয়। কি যেন নামটা? বাবা বলেছিলো, এখন মনে পড়ছে না। রজনীগন্ধার মতো ডাঁটি, তার গায়ে বড় এলাচের মতো লেগে থাকে ফুলগুলো। নানা রকমের রঙ হয়—লাল, হলুদ, বেগুনী।

তুলো চেঁচিয়ে ডাকলো—বাবাই—

নিমাই তাকালো। বললো—কি বাবা?

—এই দেখ, সেই ফুল। তুমি আনো, না বাবা?

নিরঞ্জন বললো—তোর ছেলের ডাকনাম কি রে?

—তুলো।

—বেড়ে নাম। দুটো নামই ভালো। এখনো কবিতা-টবিতা লিখিস্?

—দূর। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়েছি। কবিতা লিখে নাম করার যুগ চলে গেছে। আজকাল সবাই লেখে, তাদের মধ্যে একজন হয়ে কি লাভ?

—তুলো আবার ডাকলো—এগুলো যেন কি ফুল বাবা?

—ও হলো অ্যান্টিরিয়াম। ভুলে গেছিস?

তুলো ততক্ষণে চলে গিয়েছে আর একটা ঝোপের কাছে। বেগুনি রঙের ফুলে ঢেকে আছে ঝোপটা। পাতা দেখা যায় না এত ফুল। ভালো করে দেখলো তুলো। প্রত্যেক ফুলে পাঁচটা করে পাপড়ি। চারটে শুধুই বেগুনি, আর একটায় গাঢ় বেগুনি দুটো করে ফুটকি। সব ফুলেই তাই। আশ্চর্য লাগলো তুলোর। এই অ্যাতো ফুল ফুটে আছে—সব ফুলেই সেই এক ব্যাপার! চারটে বেগুনি, একটায় আরও গভীর বেগুনি, দুটো চোখের মতো দাগ। কি করে হয়? আচ্ছা, একটা ফুলও তো অন্য রকম হতে পারতো? কিন্তু না, আগ্রহে ঝোপটা ঘেঁটে দেখলো তুলো। সব একরকম।

শুধু তাই না। চারদিকে তাকালো তুলো। রাশি রাশি নাম-না-জানা ফুল হাসছে চারদিকে, অজস্র—অপার। কতো বিভিন্ন রঙ—বিভিন্ন আকৃতি। কি করে হয়? পৃথিবীর সব ফুল একরকম নয় কেন?

বারান্দায় বসে নিরঞ্জন বলছিলো—আজ এসেছিস, ভালোই হয়েছে। আজ কি তিথি বল্ তো?

নিমাই মনে করতে পারলো না। কলকাতায় কে খোঁজ রাখে কবে কোন্ তিথি।

নিরঞ্জন বললো—আজ পূর্ণিমা। আমার বাগান খুব সুন্দর দেখায় জ্যোৎস্নায়। রাত্তিরে এখানে বসিস চেয়ার পেতে, ভাল লাগবে।

তুলো উঠে এলো বারান্দায়।—বাবাই?

—কি বাবা?

—ফুলে রঙ কি করে হয় বাবা?

—অ্যাঁ?

—ওই যে লাল, নীল, হলুদ সব ফুল আছে না? ওই রঙ কি করে আসে?

নিরঞ্জন হেসে বললো—তোর ছেলে তো বেশ ইন্‌কুইজিটিভ্! একটা কেক খাবে তুলো? এখানে এসো—

কেক খেতে তুলোর আপত্তি নেই। তবে লজ্জা বলে তো একটা জিনিস আছে। সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিমাই বলল—যাও তুলো, কাকু দিচ্ছেন। নিতে হয়, যাও—

নিরঞ্জন বললো—অ্যাই, কাকু কি? আমি তোর থেকে পুরো চার মাসের বড়ো। জ্যাঠামশায় বলতে বল ওকে—

কেক-এ কামড় দিয়ে তুলো বললো—বাবা—

—কি?

—ফুলে রঙ আসে কি করে?

নিমাই বিপদে পড়লো। ফুলে রঙ ধরার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা তারও ভালোভাবে জানা নেই। তাছাড়া যেটুকু জানা আছে তা একটি শিশুকে বোঝায় কি করে?

গলা ঝেড়ে নিমাই বললো—এই, মানে—ফুলের পাপড়িতে একরকমের রাসায়নিক পদার্থ থাকে, বুঝলে তো? তাকে পিগমেণ্ট বলে। তা আলো থেকে রঙ শুষে নিতে পারে। সূর্যের আলোয় যে সাতটা রঙ আছে, প্রিজ্‌মের মধ্যে

দিয়ে ভাগ করলে দেখতে পাবে, তা থেকে বিশেষ কোনো রঙ—

অর্ধভুক্ত কেক হাতে তুলো হাঁ করে শুনছে। সেদিকে চোখ পড়তেই নিমাই বুঝতে পারলো তার বক্তৃতায় ছেলের বোধোদয় হচ্ছে না।

—কি রে? বুঝতে পারছিস না?

তুলো অকপটে জানালো—না। সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ফুল তো সুন্দর, তার অন্তর্নিহিত রহস্যটি এতো কঠিন তা সে কি করে জানবে?

—আচ্ছা, এখন খেয়ে নে দেখি কেকটা, পরে বোঝাবো।

নিমাই ভাবলো—আমি ছেলেকে বোঝাতে পারলাম না। নিশ্চয় এর একটা সোজা আর সরল উত্তর আছে। সেটা কি? সেটা জানা থাকলে তুলোকে বোঝানো যেত। ছেলেটা ভোলেও না।

তুলো ভাবলো—বাবাটা যে কি কঠিন কঠিন কথা বলে! বাবা সব জানে, কিন্তু সোজা করে বোঝাতে পারে না।

গোধূলি গড়িয়ে গিয়েছে সন্ধ্যার চৌকাঠে। আবছা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে দিগন্ত, দূরে একা দাঁড়িয়ে থাকা প্রাকৃতিক কবিতার যতিচিহ্নের মতো অনুচ্চ মাটির ঢিবিটা। ডুবে যাচ্ছে নিরঞ্জনের বারো বিঘের বাগান।

আর পূর্বদিকে দিগন্তের বাধা ভেদ করে ঠেলে উঠছে উজ্জ্বল সোনালী রঙের পূর্ণিমার চাঁদ। এখুনি জ্যোৎস্নার খই ফুটবে ওই মাঠে—এই বাগানে।

নিমাই বলে—যা তো তুলো, আমার ব্যাগটা থেকে তোর চাদরখানা নিয়ে আয়। গায়ে জড়িয়ে বোস। ঠাণ্ডা পড়ছে।

দুই বন্ধু সিগারেট খায় বসে। অন্ধকারে সিগারেটের লাল আগুন রাত্রির ক্রুদ্ধ চোখের মতো জ্বলে ওঠে। ক্যাঁ—ক্যাঁ করে ডেকে প্যাঁচা উড়ে যায় মাঠের ওপর দিয়ে। বাবার কাছে ঘেঁষে বসে তুলোর কেবলই মনে হয়, বাবা বলতে পারলো না ফুলের রঙ কোথা থেকে আসে।

আটটার মধ্যে খেতে বসে যাওয়া গেল। ততক্ষণে চাঁদ উঠে এসেছে অনেকখানি। জ্যোৎস্নায় ধু-ধু করছে বাগান, মাঠ। টেবিলের ওপর হ্যারিকেন রেখে মুরগীর ঝোল আর ভাত পরিবেশন করে গেলো রামপদ, নিরঞ্জনের রাঁধুনী। খেতে খুবই ভালো লাগছিলো তুলোর। নিরঞ্জন একবার জিজ্ঞাসা করলো—ঝাল লাগছে না তো খোকন?

ঝাল একটু হয়েছিলো। কিন্তু তুলো বললো—না।

খাওয়া হলে নিরঞ্জন বললো—এখনই নিশ্চয় শুবি না? চল্, বারান্দায় বসে গল্প করা যাক।

—তুই গিয়ে বোস, আমি ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে আসছি।

ভরপেট খেয়ে তুলোরও চোখ লেগে আসছে। তাকে কাত করে শুইয়ে গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড়াতে লাগলো নিমাই।—ঘুমো তুলো, ঘুমোও তো বাবা আমার—

—বাবা, নিরঞ্জন জেঠুর বাগানে সেই ফুলগাছ আছে, তুমি মায়ের ছবির সামনে যে ফুল দাও—সেই ফুল। আমি দেখলাম—

—হ্যাঁ বাবা। আমিও দেখেছি। এখন ঘুমোও। একটা গল্প শুনবি?

—মা কোথায় গিয়েছে বাবা?

এ প্রশ্ন অনেকবার করা হয়ে গিয়েছে। নিমাই জানে কি বললে ছেলে খুশি হবে। সে বললো—মা রোজ রাত্তিরে তোমার কাছে আসে খোকন। তুমি তখন ঘুমোও। এসে তোমার কপালে চুমু খেয়ে যায়।

—একদিন আমি রাত্তিরে জেগে থাকবো বাবা, ঘুমোবো না। দেখবো কখন মা আসে।

নিমাইয়ের চশমা ঝাপসা হয়ে আসে। সে বলে—আচ্ছা, সে হবে। এখন ঘুমোও তো—

—একটা গল্প বলো বাবাই।

নিমাই ভেবেচিন্তে এক ধূর্ত শেয়াল আর বোকা বাঘের গল্প বলতে থাকে। একটু একটু করে ঘুম এসে যায় তুলোর। তার তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের মধ্যে দিয়ে দৌড়োয় এক ধূর্ত শেয়াল। খয়েরী রঙের শরীর, সোনালী রঙের ল্যাজ।

বাইরে এসে বসে নিমাই। নীরবে তার দিকে সিগারেট এগিয়ে দেয় নিরঞ্জন। কথা বলার কথা ছিলো, কিন্তু কথা হয় না। সময় এগিয়ে যায়। দুই বন্ধু বসে থাকে পরস্পরের উপস্থিতির গাঢ় অনুভূতির মধ্যে।

অনেক রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলো তুলোর। তখন অনেক—অনেক রাত। বাবা শুয়ে রয়েছে পাশে। ঘুমিয়ে আছে। বাবার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ কিছুক্ষণ শুনলো তুলো। হ্যারিকেনটা খুব কমিয়ে রাখা আছে টেবিলে। ঝিমঝিম করছে রাত্তির।

তুলো বুঝতে পারলো না তার ঘুম কেন ভাঙলো। রাত্তিরে সে কখনো জাগে না। চোখ বুজে একটু শুয়ে থেকে দেখলো ঘুম আর আসছে না। আস্তে আস্তে খাট থেকে নামলো সে।

জানালার গরাদের ছায়া নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে চাঁদের আলো। তুলো জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

বাইরে নিরঞ্জন জেঠুর বাগান। তাতে থই থই করছে চাঁদের আলো। বাঃ, কি সুন্দর লাগছে বাগানটা। বাবা বলেছিলো সাদা রঙের যে সব ফুল, তারা সব রাত্তিরে ফোটে। জেগে কাছে বসে থাকলে দেখা যায়। সে কখনো ফুল ফোটা দেখে নি। আজ দেখলে হয় না? সে কি চুপিচুপি চলে যাবে ঐ বাগানের ফুল ফোটা দেখতে?

কথাটা মনে হতেই কে যেন তাকে বার বার ডাকতে লাগলো বাইরে থেকে। এসো তুলো, এই বাগানে এসো। দেখে যাও কি করে ফুল ফোটে, ফুলের ঘুম ভেঙে যায় চাঁদের আলোর ছোঁয়ায়।

তুলো ফিরলো। বাবা ঘুমোচ্ছে। বাবার চশমা পড়ে রয়েছে টেবিলে। একটা ডাঁটি সোজা, একটা মোড়া। কেমন যেন করুণ ভঙ্গি চশমাটার পড়ে থাকার। ঠিক তার বাবার দুঃখের মতো।

দরজা খুলে বাইরে এলো তুলো। নেমে গেলো বাগানে। কেউ নেই কোথাও। শুধু ফুটফুট করছে চাঁদের আলো, ঢেউ খেলছে জ্যোৎস্নার। দু'হাত দিয়ে ফুলের ঝাড় সরাতে সরাতে এগিয়ে চললো সে। মনে কোনো ভয় নেই। কে যেন যাদুবলে তার মনের সমস্ত ভয় উড়িয়ে নিয়েছে একনিমেষে।

চারদিকে ফুল। ফুলের সঙ্গে কতো খেলা করলো তুলো। গন্ধ শুঁকলো

ফুলের। কি এক আশ্চর্য আনন্দে ছোটাছুটি করলো গাছের সারির মধ্যে। কে আজ আনন্দ মাখিয়ে দিয়েছে বাতাসে, আজ তুলো জেগে থাকবে। এমন ক'দিন জাগতে পারলেই নিশ্চয় মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে তার।

খেলতে খেলতে হঠাৎ কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো তুলো। বাঁদিকের ওই ঝোপটা নড়ে উঠলো না? সেই ফুলের ঝোপটা, যার বেগুনি পাপড়িতে দুটো করে চোখের মতো দাগ।

ভয় পেয়ে গেলো তুলো। বাবার কাছে শোনা সমস্ত ভূতের গল্প একসঙ্গে মনে পড়ে গেলো তার। কে ওই ঝোপে? সে এখন ফেরে কি করে? তাহলে তো ঝোপটার পাশ দিয়েই যেতে হয়।

তার শরীর অবশ হয়ে এলো ভয়ে। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

তখনই ঝোপের ভেতর থেকে কে একজন দাঁড়িয়ে উঠলো সোজা, তুলোর ভীত দৃষ্টির সামনে। পরনে পা পর্যন্ত লম্বা সাদা আলখাল্লার মতো কি পোশাক। বুক পর্যন্ত সাদা ধবধবে দাড়ি, মাথার চুল কাশ ফুলের মতো দেখাচ্ছে জ্যোৎস্নায়। চোখে তার বিরক্তির ছাপ। যেন তুলো এসে তার কাজে বাধা দিয়েছে বলে সে খুব রাগ করেছে।

কিন্তু তার দৃষ্টি তুলোকে দেখে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এলো। যেন সে বুঝতে পেরেছে এই শিশু তারই কাজের অংশীদার। প্রসন্ন চোখে সে তাকিয়ে রইলো তুলোর দিকে।

তুলোর মনের ভয় হঠাৎ আবার কোথায় চলে গেলো। কি সুন্দর চোখ লোকটার! যেন চোখ দিয়ে হাসছে। কে ও? কি করছিলো এতো রাত্তিরে ওই ঝোপের মধ্যে?

নির্ভয়ে তুলো কয়েক পা এগিয়ে গেলো লোকটার দিকে।

তখনই চোখে পড়লো জিনিসটা।

লোকটার এক হাতে একটা তুলি আর এক হাতে রঙের বাটি।

এক মুহূর্তে তুলোর কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। ওমা! সে বুঝতে পেরেছে, এই লোকটাই সারারাত ধরে রঙ করে বেড়ায় ফুলে ফুলে।

লোকটা হাসছে। জ্যোৎস্নার ভেতর জ্যোৎস্না হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে তার হাসি। তুলোও হাসছে। তুমি তো ভারি ভালো লোক। কতো কষ্ট করে রঙ করে বেড়াও বাগানে বাগানে।

আকাশের পরিধি যেন হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে। চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আকাশটা বাড়ছেই বাড়ছেই। লোকটার হাসিকে যেন ধরে রাখবার জায়গা নেই।

হঠাৎ তুলোর মনে পড়ে গেলো তার বাবার কথা। বাবা এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছে বিছানায়। বেচারী বাবা জানে না ফুলে কে রঙ করে যায়। বাবাকে জানাতে হবে।

ক্ষিপ্রপায়ে তুলো দৌড়োলো খবরটা দেবার জন্য।

ছোটবেলা থেকে অনেক জ্যোতিষীর কাছে শুনে এসেছি আমার হাতে নাকি প্রত্যক্ষ-দর্শন রেখা আছে, অলৌকিক প্রত্যক্ষণ হবার সম্ভাবনা আমার জীবনে খুবই প্রবল। শেষবার এক বন্ধুর বিয়ের দিন, সবাই তখন ওদিকে পাত পেড়ে বসে পড়বার জন্য ব্যস্ত, বন্ধুরই এক মামাশ্বশুর আমার হাত দেখে বলেছিলেন —পয়সাকড়ি, বিদ্যেবুদ্ধি, বিয়ে—এসব মামুলী কথা আর বলে কি হবে? সে মোটামুটি একরকম আছে। কিন্তু এ যে ভারি এক অদ্ভুত জিনিস রয়েছে আপনার হাতে, এ খুব কম দেখা যায়—

—কি বলুন তো?

—আপনার অলৌকিক প্রত্যক্ষণ হবার রেখা রয়েছে হাতে।

হেসে বললাম—মানে ভূত দেখতে পাবো?

আমি রসিকতা করে বলেছিলাম, কিন্তু প্রৌঢ় ভদ্রলোক সিরিয়াস চোখ তুলে আমার দিকে তাকালেন, বললেন—ভূতের কথা তো বলি নি। ভূত আর অলৌকিক কোন ঘটনা এক ক্যাটাগরীতে ফেলবেন না! হ্যাঁ, ভূতও হতে পারে, আবার এমন কোনো আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হতে পারে যা সম্পূর্ণ লৌকিক ধ্যানধারণার ঊর্ধ্বে। অসম্ভব উদ্ভট কিছু। শুধু ভূতই বা হবে কেন?

আমার রসিকতার মুড তখনো কাটে নি, বললাম—সে অবস্থায় মৃত্যু হবে না তো? ভূতে—আই মীন্, ভূতই হোক আর অসম্ভব উদ্ভট কিছুই হোক, তার সঙ্গে র‍্যাঁদেভু হওয়ার পরে ঘাড় মট্‌কে পড়ে থাকব না তো?

ভদ্রলোক তাঁর বিজ্ঞ, প্রসন্ন চোখ তুলে আমাকে দেখলেন আবার, তারপর শান্ত গলায় বললেন—বাবা, বিশ্বসংসারের আইন-কানুনগুলো মঙ্গলময় ঈশ্বরের সৃষ্টি, সে আইন মানুষের মঙ্গলের জন্যই কাজ করে। আপনাকে হত্যা করে ঈশ্বরের কি গৌরব? পুত্রকে হত্যা করে পিতার কি গৌরব? জগৎ-জুড়ে পাতা তাঁর কোলের মধ্যেই খেলা করছেন, আপনার ভালোমন্দও তাঁরই ওপর ছেড়ে দিন বাবা। তিনি কারো অমঙ্গল করেন না।

আলোচনা ক্রমে ভক্তিতত্ত্বের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে দেখে তাঁকে ছেড়ে ভোজের সন্ধানে উঠে যাই এর পরে।

ভদ্রলোকের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারের অবশ্য কিছুদিন বাদেই আমি প্রায় বিস্মৃত হই। আধুনিক দ্রুতগতি জীবনে বিশ্বাসের স্থান খুব কম। যেমন-তেমন করে খুব খানিকটা বেঁচে নেওয়াই বড় কথা। শরীর ও মনের কৃত্রিম তৃপ্তি যতটা পারা যায় ঠেসে জীবনের সিন্দুকে পুরে দেওয়া। মোমবাতি দুদিক দিয়ে একসঙ্গে জ্বালালে যে তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়, সে কথা ভাববার অবসর কোথায়? কাজেই পঞ্চাশোত্তীর্ণ বৃদ্ধের গম্ভীর ভক্তিমূলক বক্তৃতা যে ভুলে যাব, তাতে আর আশ্চর্য কি?

আমি কাজ করি এক বিলিতি বাণিজ্য-সংস্থায়। বড় কাজ। মাসের শেষে দুহাত ভরে মাইনে পাই। বিয়ে করি নি এখনো, বাবা-মাও সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেছেন। একা কোম্পানীর দেওয়া দামী ফ্ল্যাটে থাকি।

একদিন বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করল না। হোটেলে না, বারে না—কোথাও না। সেদিন আকাশ যেন বড্ড বেশি ঝুঁকে রয়েছে শহরের ওপরে। বাতাস ভারি ও গুমোট। আজ যাব না কোথাও।

পকেট থেকে চাবি বের করে ফ্ল্যাটের ইয়েল-লকে লাগাতে লাগাতে দেখলাম লেটার-বক্সে একটা সাদা খাম পড়ে আছে। গোল করে কাটা অংশ দিয়ে দেখা যাচ্ছে। ডান হাতে হাতলে মোচড় দিয়ে দরজা খুললাম, বাঁ হাতে তুলে নিলাম খামখানা।

ডিভানে হেলান দিয়ে খাম খুললাম।

একি! আশ্চর্য তো! এ কার চিঠি?

সাধারণ সাদা কাগজে কয়েক লাইন লেখা, বেশ ভালো হস্তাক্ষরে। ওপরে কোনো সম্বোধন নেই, নিচে কোনো নাম নেই। হাতের লেখা স্ত্রী কি পুরুষের, তাও বোঝবার উপায় নেই। লেখা রয়েছে—

> দীঘার টুরিস্ট লজে যাও। আজ থেকে চারদিনের মধ্যে ওখানে পরবর্তী নির্দেশ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তিন দিনের ভেতর পৌঁছনো চাই।

খামের ওপরের পোস্ট-মার্ক ভালো বোঝা যাচ্ছে না। রীতিমত রহস্যজনক চিঠি। ইংরিজি থ্রিলারে এধরনের কিছু ঘটনা পড়া যায় বটে। খামের ওপরে আমার নাম পরিষ্কার হরফে লেখা—কাজেই অন্য কারো চিঠি ভুল করে আমার কাছে চলে এসেছে, তাও সম্ভব নয়। ঠিকানাও তো আমারই।

অবশ্য এটা একটা ঠাট্টা বা ওই ধরনের কিছু হতে পারে। কিন্তু চার দিন পরে মোটেই পয়লা এপ্রিল পড়ছে না, এটা মধ্য আগস্ট—তাছাড়া অনেক ভেবেও আমি এমন কোনো বন্ধুর কথা মনে করতে পারলাম না, যে আমার সঙ্গে এরকম রসিকতা করতে পারে। যে চিঠিটা পাঠিয়েছে, তাকে কষ্ট করে এটা লিখতে হয়েছে, ডাক-টিকিট কিনে লাগিয়ে হেঁটে গিয়ে ডাক-বাক্সে ফেলবার পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু যে-ই পাঠাক, আমি নির্ধারিত দিনে দীঘা গেলে তার লাভ কি?

ভেবে ভেবে মস্তিষ্ক উষ্ণ হয়ে উঠলো। বইয়ের তাকের পেছনে লুকিয়ে রাখা স্কচের বোতল বের করে ডিক্যান্টারে তিন আঙুল পরিমাণ পানীয় নিয়ে কুলার থেকে জল ও ফ্রিজ থেকে আইস কিউব মেশালাম। খানিকটা পেটে যেতে মনে বেশ একটা বেপরোয়া ভাব এল। নিস্তরঙ্গ অফিস-জীবনে এ একটা নতুন উত্তেজনার খোরাক হল। কোম্পানীর সেল প্রোমোশনের প্রোগ্রাম ঠিক করে দেওয়া, ভোঁতামুখো ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের মিটিং-এ অনর্গল হেঁ হেঁ করা, পার্টিতে গিয়ে সুন্দরী মেয়েদের শ্যাম্পেন এগিয়ে দেওয়া এবং বেলুন ফাটানো—এসব পেরিয়ে এই প্রথম অন্য কিছু ঘটবে। অথবা ঘটবে কিনা তাই বা কে জানে, তবে উত্তেজনা পুষে রেখে দীঘা তো যাওয়া যাবে। হ্যাড্‌লী চেজ-এর নায়কের মতো লাগবে নিজেকে। দেখাই যাক না কি হয়।

ছুটি নিলাম ছ'দিনের।

চিঠি পাওয়ার পর তিনদিনের দিন বিকেলে অফিস থেকে ফিরে সুটকেশ গুছিয়ে নিলাম। পাজামা-পাঞ্জাবী, একজোড়া শার্ট-প্যান্ট, টুথব্রাশ ও মাজন,

সময় কাটাবার মত গা-ছমছমে বিলিতি নভেল—এইসব নিয়েই চলে যাবে। নিজের মোটর নিয়ে যাব, ড্রাইভার নেব না। অনেকদিন একা লম্বা পথ ড্রাইভ করি নি। দুপুরে আফজল মিস্ত্রিকে দিয়ে সার্ভিস করিয়ে নিয়েছি।

রাস্তা ভালো, রাত্তিরে বেরুতে আপত্তি নেই। রাত ন'টা নাগাদ কুকিং রেঞ্জের গ্যাস ওভেনে নিজেই গোটাকতক ফ্রেঞ্চ টোস্ট আর কফি করে নিলাম। মিক্সড ফ্রুট স্যালাডের একটা টিন কেটে পেটভরে খেলাম তারপর কফিতে সামান্য হুইস্কি মিশিয়ে সোফাতে বসলাম একটা সিগারেট হাতে।

রাত এগারোটায় আমি একদম তৈরি।

নীলরঙা মোটা জিনের আমেরিকান-কাট ট্রাউজার্স, হাল্কা বিস্কুট রঙের বুশ শার্ট, পায়ে নরম সোয়েড পরে নিলাম। ওয়ালেটে প্রয়োজনীয় টাকা। হাতে সুটকেশটা নিয়ে বেরুবার দরজার কাছে এসে আলো নেভাবার জন্য সুইচে হাত দিয়েও হাত সরিয়ে নিলাম। আবার শোবার ঘরে ঢুকে ওয়ার্ডরোবের গুপ্ত খোপ থেকে বের করলাম আমার প্রিয় পয়েন্ট টু টু লুগার অটোমেটিকটা। চেম্বারে ছ'টা কার্ট্রিজ ভরে সেফটি ক্যাচ নামিয়ে সুটকেশের বুক পকেটে রেখে দিলাম। ছ'টা কার্ট্রিজ তোয়ালেতে জড়িয়ে জামাকাপড়ের নিচে রাখলাম।

আলো নিভিয়ে বাইরে থেকে ফ্ল্যাটের দরজায় তালা দিয়ে বললাম—গুড বাই !

ভোর সাড়ে-পাঁচটায় দীঘা। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলে এসেছি। পথে একবার কেবল বোম্বে রোডের ধারে একটা চটিতে বসে মিনিয়েচার লিকার-ফ্লাস্ক থেকে সামান্য পান করেছি। আর থামি নি কোথাও। আস্তে আস্তে ড্রাইভ করেছি, নইলে আরো আগে আসতাম।

দীঘা এত ভোরে জাগেনি। বে-কাফের সামনে গাড়ি পার্ক করে বেলাভূমিতে গিয়ে নামলাম। আকাশে অল্প মেঘ রয়েছে, সমুদ্রও খুব শান্ত নয়। কয়েকটা জলপিপি এই ভোরেই তিরতির করে ক্ষিপ্রপায়ে কি খুঁজে বেড়াচ্ছে বালির ওপরে। আমার পায়ের শব্দে লাল কাঁকড়ার দল দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ছে গর্তে। একটানা চাপা গর্জন করছে সমুদ্র, কার বিরুদ্ধে যে তার শাশ্বত আক্রোশ!

পর পর দুটো সিগারেট খেলাম। সারারাত জেগে চোখ জ্বালা করছে। বালির ওপরে বসে চোখ বুজে রইলাম, ঠাণ্ডা বাতাসে আরাম ছড়িয়ে পড়ে শরীরে।

সাতটা বাজলো।

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে এগুলাম। সার্কিট হাউসের পাশ দিয়ে একটু গেলেই ঝাউবন পথের দু'পাশে। তারপরেই টুরিস্ট লজের অ্যারো সাইন। বাঁদিকে একটু উঁচু জমিতে বিরাট প্রাসাদের মত বাড়ি। পার্কিং বে-তে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকলাম।

রিসেপশন কাউণ্টারের পেছনে অত্যন্ত আনস্মার্ট ভঙ্গিতে হাই তুলছিল ক্লার্ক। কলকাতার কোনো ভালো তিনতারা হোটেল হলেও ওর চাকরি যেত।

বললাম—এনি অ্যাকোমডেশন ?

হাই চেপে তড়াক করে সোজা হয়ে বসে সে বলল—ইয়েস স্যার। ডাবল ?

—আমি একা আছি।

—তিনতলায় ভালো সিঙ্গল রুমও খালি আছে স্যার—

একটা লেজার ধরনের খাতা বের করে সে বলল—নামটা কাইণ্ডলি লিখে দিন স্যার, আর ঠিকানা। কবে চেক-আউট করবেন?

—পরশু। ভিড় কেমন?

—একদম নেই স্যার? অফ সীজন।

সে আমাকে একটা বাজে কলম দিল, লিখতে গেলে নিবে খচমচ করে, কাগজের আঁশ উঠে যায়। নাম সই করে অন্য কলামগুলো ভর্তি করছি, ক্লার্কটি ঝুঁকে পড়ে খাতা দেখে বলল—আপনি অম্বর সেন?

—হ্যাঁ, কেন?

—উই হ্যাভ এ মেসেজ ফর ইউ—

—চিঠি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। গতকাল একজন খামটা দিয়ে বলে গেলেন মিস্টার অম্বর সেনের এখানে চেক-ইন করবার কথা আছে। উনি এলে চিঠিটা যেন দেওয়া হয়।

—যে ক্লায়েণ্ট এখনো পেঁাছয় নি, যাকে আপনারা চেনেন না, তার মেসেজ রেখে দিলেন? যদি আমি না আসতাম?

অপ্রস্তুত হয়ে সে বলল—হ্যাঁ স্যার। ব্যাপারটা একটু আনইউসুয়াল। তবে আমি ভাবলাম হয়তো আত্মীয়-টাত্মীয় কেউ হবেন, আসবার কথা আছে জানেন, তাই—নইলে এমনিতে এরকম রিকোয়েস্ট এণ্টারটেইন করা হয় না।

—আপনি নিয়েছিলেন খামটা?

—হ্যাঁ।

—কে দিয়ে গেল? কেমন দেখতে?

কপালে হাত দিয়ে মনে আনবার চেষ্টা করতে করতে সে বলল—খুব দুঃখিত স্যার, এখন ঠিক মনে করতে পারছি না। দু'জন গেস্ট চেক-আউট করছিলেন, তাঁদের হিসেবপত্র বুঝে নিচ্ছিলাম। তরকারি সাপ্লাই করে যে লোকটা, সে দাঁড়িয়ে তাগাদা দিচ্ছিল। কাউণ্টারে হৈ-চৈ হচ্ছিল খুব। কে দিল তার চেহারা মনে করতে পারছি না।

—পুরুষ না স্ত্রীলোক?

—ভদ্রলোক স্যার। কিন্তু চেহারাটা একদম—

—নেভার মাইণ্ড। চিঠিটা দিন। আমাব কত নম্বর ঘর?

—আট নম্বর ঘর স্যার, তেতলায়। সুন্দর সী-প্যানোরামা পাবেন। এই যে চিঠি—

একজন বেলবয়ের পেছন পেছন তেতলায় গেলাম। ঘর খুলে বেড-শীট, পিলো-কেস ইত্যাদি বদলে সে সেলাম করে দাঁড়ালো। তার হাতে তখনো রঙের গন্ধ লেগে থাকা একখানা পাঁচ টাকার নোট ধরিয়ে দিতেই সে আকর্ণ হেসে প্রায় নাকে খৎ দেবাব ভঙ্গিতে আবার সেলাম করলো। বললাম—বাথরুম পরিষ্কার আছে?

—হ্যাঁ সাব। রোজ ঝাড়ু দেওয়া হয়। গেস্ট না থাকলেও।

—আমার এটাই তো বারান্দার শেষ ঘর, ওপাশেরটায় কে থাকে?

—কেউ না সাব। ফাঁকা পড়ে আছে। এখন সীজন খুব ভাল।

—ঠিক আছে তুমি যাও। দরকার পড়লে ডাকবো।

সে বিদায় নিলে জুতোপরা অবস্থাতেই পা ঝুলিয়ে বিছানায় শুলাম। রাত জেগে ড্রাইভ করেছি পিঠ টনটন করছিলো. ডানলোপিলোর নরম আশ্রয়ে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে দারুণ আরাম পেলাম।

চিঠিটা খুলে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখন খুলবো না। এখন আমার বিশ্রাম প্রয়োজন। এর ভেতরে আবার কি উত্তেজনার খোরাক রয়েছে কে জানে ' এই মুহূর্তে ব্যস্ত হতে পারব না।

জুতো খুলে জামাকাপড় বদলালাম। বাথরুমে গিয়ে দাঁত মেজে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে শরীর যেন একটু দুরস্ত হল। ঘরে ফিরে পাখা চালিয়ে বিছানায় শুয়ে একটা চিনার ধরিয়ে কিছুক্ষণ টানলাম। সিগারেট শেষ হলে উঠে সুইচ-বোর্ডে লাগানো বেলবাটনে চাপ দিয়ে বেল-বয়টার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম ড্রেসিং টেবিলের চেয়ারে বসে।

দরজায় নক হল।

বললাম—এস।

আকর্ণ হাসি।

—ব্রেকফাস্ট। টোস্ট মাখন মরিচ ডিম কফি।

—ডিমসেদ্ধ ?

—ডিমসেদ্ধ।

—স্যার—

—কি হল ?

—আমাদের রুম সার্ভিস নেই স্যার—

হাসলাম মনে মনে। বললাম—ঠিক আছে। এনে তো দাও, তোমার এ উপকার মনে রাখবো।

আকর্ণ হাসি।

মনে মনে ওর জন্য আমি একটা দশ টাকার নোট বরাদ্দ করে রাখলাম।

ব্রেকফাস্ট এনে টোস্টে মাখন লাগিয়ে ডিমে নুন-মরিচ দিয়ে খুব কাজ দেখাল লোকটা। যতই মনে মনে রাখি না কেন ও ঠিক বখশিশের গন্ধ পেয়েছে।

—সমুদ্রে স্নান করবেন না স্যার ?

বললাম —নাঃ। কাজে এসেছি, কাজ হলেই চলে যাবো।

লোকটা কেমন যেন কুতকুতে চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। কেউ এমন করে নিরীক্ষণ করলে শুকনো টোস্ট গিলতে অসুবিধে হয় বই কি ' ওর উদ্দেশ্য কি ?

উদ্দেশ্য একটু বাদেই বোঝা গেল। আমার খাওয়া হয়ে গেলে জিনিসপত্র ট্রে-তে তুলতে তুলতে সে বলল—সিঙ্গলরুমে আপনার অসুবিধে হবে স্যার, ডবল নিলেই পারতেন। ভাড়া এমন কিছু এদিক-ওদিক না—

—অসুবিধে হবে কেন ?

—আর কেউ আসবে না স্যার ?

আমি সোজা হয়ে উঠে বসে জ্বলন্ত চোখে তাকাই।—তুমি ভেবেছ কি ?

লোকটার খুব দোষ নেই। আমি গাড়ি নিয়ে ফুলবাবুটি সেজে একা এসেছি। অফ সীজন, এখন লোকে দীঘা আসে না। এসেই একখানা মুখবন্ধ খাম পেয়েছি।

মনে মনে বাকিটা ও আন্দাজ করে নিয়েছে।

আমি কড়া সুরে বলি—নিজের কাজ কর! আমাকে তুমি তেমন ভেবেছ নাকি?

সে কয়েকবার কি বলবার জন্য মুখ খোলে আর বন্ধ করে, তারপর আচমকা দম দেওয়া পুতুলের মতো বারবার হাত কচলাতে কচলাতে বলে—জানতাম স্যার জানতাম। চেহারা দেখেই বোঝা যায়—আমরা বুঝতে পারি। আপনি এমন হলে ভারি দুঃখ পেতাম স্যার।

চমৎকার ঘুঘু। দেখেও আনন্দ।

সে বিদায় নিতে দরজা বন্ধ করে হ্যাঙ্গারে টাঙ্গানো প্যান্টের পকেট থেকে খামটা বের করে বিছানায় বসে চিঠিটা খুললাম।

একই হস্তাক্ষর। একই কাগজ। বয়ান সমান সংক্ষিপ্ত।

> দীঘা পৌঁছনোর পরদিন রাত এগারোটায় জনপুট যাও।
> পৌঁছলে পরবর্তী নির্দেশ পাবে। একা যাবে।

ওপবওয়ালার মতো হুকুম। যেন পত্রলেখক জানে সে আদেশ করলে আমি মানতে বাধ্য। সে জানে আমি দীঘা আসবই এতটা স্থিরবিশ্বাস যে আমি এসে পড়বার আগেই এখানে চিঠি রেখে গিয়েছে। যদি আমি না যাই? যদি আমি না মানি তার আদেশ?

একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে একটা অদ্ভুত অনুভূতির নড়াচড়া টের পেলাম। কে যেন হৃদয়ের গভীর থেকে জানিয়ে দিল যেতে আমাকে হবেই। যেতে হয়।

বিকেলে আশাতীতরকম ভাল আবহাওয়া পেয়ে গেলাম। বেলা সাড়ে-চারটের পরে মেঘ কেটে দুরন্ত রোদ্দুর উঠলো। দুপুরে মিক্সড ফ্রায়েডরাইস আর মুরগীর কি একটা উদ্ভট নামের প্রিপারেশন খেয়ে ভরপেট তৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙ্গে দেখলাম রোদ লাল হয়ে এসেছে। চারদিকে কেমন একটা বিষণ্ণ স্তব্ধতা। একদম টুরিস্টের ভিড় নেই—এই সৈকত শহরকে লাগছে যেন এক পরিত্যক্ত জনপদ। ঘরে শুয়ে মনে হচ্ছিল যেন দম আটকে আসছে। একটা উড়ো চিঠির পেছন পেছন এই অফ সীজন-এ দীঘা এসে বুদ্ধিমানের কাজ করি নি তা এখন বুঝতে পারছি। আমি কলকাতার মানুষ কিঞ্চিৎ কলরব এবং দ্রুত জীবন ছাড়া বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পাই না।

অসহ্য মনে হতে জামাকাপড় পরে বেরুলাম। রিসেপশনের ছোকরা কায়দা-বাজ। মাথা ঝুঁকিয়ে বলল—গুড আফটারনুন স্যার।

—গুড আফটারনুন—

গাড়ি নিয়ে বীচে নামবার তালে ছিলাম একজন পুলিশ কনস্টেবল কোথা থেকে হাজির হয়ে নিষেধের তর্জনী প্রদর্শন করলো।

ব্রেক করলাম।

—আর যাবেন না। বীচে গাড়ি নামানো নিষেধ।

—কেন?

—বেলা চারটের পর আর গাড়ি নিয়ে প্লাই করতে দেওয়া হয় না।

চোয়াল শক্ত করে আবার বললাম—কেন?

লোকটাও চোয়াল শক্ত করল। বলল—নিয়ম। তাছাড়া এখনই জোয়ার আসবে।

তর্কাতর্কি করতে ইচ্ছে করল না। পরিবেশে এমন একটা ম্লান বিষণ্ণতা যে কোনোরকম বিবাদে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহী করে না। বললাম—ঠিক আছে যাব না।

নিজের কর্তৃত্বে খুশি হয়ে লোকটা চলে যাচ্ছিল. পেছন থেকে ডাকলাম—শুনুন।

পুলিশকে বোধহয় কেউ একবার দেখা হওয়ার পর আর ডাকে না। বিস্মিত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে সে বলল—কি? আমাকে বলছেন?

—জুনপুট এখান থেকে কত দূর?

—জুনপুট? কেন সেখানে কি?

এবাব চোয়াল শক্ত রেখেই গলায় সামান্য অথরিটি আনলাম—আমার প্রশ্নটা ছিল—জুনপুট এখান থেকে কত দূর?

লোকটা এবার ভড়কে গেল। আমার গলার স্বরে অথরিটির আঁচ পেয়ে পরিষ্কার বুঝল. আমি ভয় পাই নি. চাই কি ওর বিভাগের হর্তাকর্তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হতে পারি।

ড্রাইভিং সিটের জানালায় এসে এবার সে বেশ বিনীত গলায় বলল—তা প্রায় বত্রিশ-তেত্রিশ মাইল হবে।

—কিভাবে যেতে হয়?

—এখান থেকে সোজাপথে কাঁথি, কাঁথি থেকে আলাদা ছোট পিচঢালা রাস্তা গেছে জুনপুট অবধি। পথের মোড়ে সাইন আছে।

—কাঁথি থেকে কত দূর?

—পনেরো কিলোমিটারের মত হবে।

ছোট্ট করে 'থ্যাংক ইউ' বলে স্টার্ট দিলাম। সে ঝুঁকে পড়ে বলল—বীচে যদি নামতে চান তো যান একটু ঘুরে আসুন। এখন আমি আছি ডিউটিতে।

হেসে বললাম—না ভাই ঠিক আছে। নিয়ম মানাই উচিত।

বাঁদিকে মোড় নিয়ে সোজা এগুলাম। পথে লোক চলাচল কম। শেষবেলার মন খারাপ করে দেওয়া চাপা আলো জড়িয়ে ধরেছে পৃথিবীকে। একটা যেন কি হবে কি হবে ভাব। হোটেলগুলো অর্ধেক বন্ধ, বাইরে ইজিচেয়ার পেতে বসে থাকা ম্যানেজারের মুখে নৈর্ব্যক্তিক আলস্য। সবাই যেন জেগে জেগে ঘুমোচ্ছে।

সরকারী রিসেপশন নীলাচল চীপ ক্যান্টিন এসব পেরিয়ে গতি বাড়ালাম। একটু পরেই শহর ফুরিয়ে গেল। বাঁদিকে একটুকরো জমির ব্যবধান, তার ওপারে মাইলের পর মাইল চলেছে ঝাউবন। ফাঁকা প্রান্তরের মধ্যে ডানদিকে দিঘা হাউসিং এস্টেটের কয়েকটা বাড়ি। ব্যস। তারপরই দুদিকে আর কিছু নেই। আসন্ন সন্ধ্যার অলৌকিক আলোর মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে গাড়ি। এত নির্জন এত একা লাগছিল নিজেকে যে গা ছমছম ভাবটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

শহর থেকে মাইল চার-পাঁচ গিয়ে রাস্তা শেষ হয়ে গেল। পিচের রাস্তা শেষ হয়ে গিয়ে সামনে একটু উঠোনমত। উঠোনের মাঝখানে একটা ভাঙ্গা টিউবওয়েল অতীতের কর্মদক্ষতার স্মৃতিচিহ্নের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ও-পারে একসারি দোকানই সাধারণ পথের ধারে যেমন থাকে! তালপাতা বাঁশের

চাঁচারি ইত্যাদির বেড়া দিয়ে তৈরি। কয়েকজন কর্মহীন লোক বেঞ্চিতে বসে চা খাচ্ছে ও গল্পগুজব করছে। আমাকে দেখে তারা কিঞ্চিত চঞ্চল হয়ে উঠল।

গাড়ি থেকে নেমে তাদের কাছে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম—পথটা এখানে এমনভাবে শেষ হয়ে গেল কেন ভাই?

লোকটি খড়াক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল—আজ্ঞা জিলা মেদিনীপুর ওইখানে শেষ হয়ে গেল কিনা সেইজন্য।

-এটা কোন্ জেলা?

—বালেশ্বর।

—বর্ডার কোন্খানে?

—ওই টিউকল দেখছেন? ওইটেই বর্ডার। ওর এদিকে মেদিনীপুর। আপনার গাডি মেদিনীপুরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এতক্ষণে দেখলাম এরা র চা খাচ্ছে দুধ-চিনির বালাই নেই। ঘন কোকাকোলা রঙের লিকার। অবাক হয়ে বললাম—চায়ে দুধ দাও নি?

তারা আরও অবাক হয়ে বললে—চা কোথায়?

—গ্লাসে ও কি তাহলে?

—এ জিনিস তো—এ হল গিয়ে আপনার—

কি ব্যাপার? বলে না কেন? ফের বললাম—কি ওতে?

একজন গ্লাসটা আমার নাকের কাছে ধরে বলল—বাস নিন—

শুঁকলাম। জিনিসটা মদ। একরকমের কড়া দেশী মদ।

দোকানীকে বললাম—এমন খোলা জায়গায় বিক্রি করছ পুলিশে ধরবে যে!

—ধরবে না বাবু। আমার লাইছিন আছে—

পলিথিন শীটে মোড়া রেশন কার্ডের মত কি একটা সে আমাকে দেখালো। ফিরে আসবো এমন সময় একটা লোক আমার দিকে এগিয়ে এলো। পরণে মোটা ধুতি গায়ে উড়ানির মত কোনো অঙ্গাবরণ। হাতজোড় করে বলল—নমস্কার।

লোকটাকে আমার একটু ভদ্রগোছের ভিখিরি বলে মনে হয়েছিল। বয়েস বছর পঞ্চাশ হবে, রগের কাছে কয়েকটা চুল পাকা। এই শ্রেণীরই আর একটু চালু লোক কলকাতা শহরতলীর লোকাল ট্রেনের কামরায় 'ফ্রেন্ডস আই অ্যাম এ পুওর ইস্কুল টিচার' বলে ভিক্ষে চায়। শ্রদ্ধা হল না তবু নমস্কারটা ফেরত দিলাম।

—বাবু, আপনি কি পুজো দিতে এসেছেন?

—পুজো? কিসের পুজো?

—এখানে চন্দনেশ্বর শিব আছেন। ভাবলাম আপনি বোধহয় পুজোর কাজেই—

—আপনি কে?

—আমি চন্দনেশ্বর মন্দিরের পান্ডা।

—মন্দির কোথায়?

—মন্দির ওইদিকে কিছুদূরে বাবু, বালি পেরিয়ে যেতে হয়। এদিকে আসুন আমার সঙ্গে দেখাচ্ছি।

তার সঙ্গে দোকানগুলোর পেছন দিকে গেলাম।

সামনে ধু-ধু করছে বালিয়াড়ি। বেলা শেষ হয়ে আলো প্রায় নিভে এসেছে।

সেই ঝাপসা আলোয় যতদূর দেখা যায় কেবল উঁচু-নিচু অজস্র বালির ঢিপি ছাড়া আর কিছুই নজরে এল না। মাঝে মাঝে অবশ্য গোটাকতক তালগাছ নিঃসঙ্গভাবে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে ক্লান্তিকর একঘেয়েমী থেকে একটু মুক্তি দিচ্ছে। সেই বালির ও-পারে অনির্দেশ্য কোন এক দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে সে বলল—ওই মাঠটা পেরুলেই মন্দির আর বাঁদিকে সাহাবাজিপুর গ্রাম। যাবেন বাবু?

এক্ষুনি অন্ধকার নামবে। এখন এই বালি পেরিয়ে মন্দির দেখতে যাবার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই. আমি ভক্তও নই, বললাম—না হে, আমি পুজো দেবো না।

আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল—আপনি বর্ণহিন্দু?

—বটেই।

—তাহলে পুজো দেবেন না কেন?

—আমি বিশ্বাস করি না।

লোকটার মুখ দেখে মনে হল আমি তাকে গালাগাল দিয়েছি। দুঃখিত চোখে আমাকে দেখে নিয়ে মাটির দিকে চেয়ে সে বলল—এমন বলতে নেই। বিশ্বাস করি না বলা সোজা বলতে পয়সা লাগে না। কিন্তু বলা উচিত নয়। পৃথিবীতে এমন অনেক কিছু আছে যা প্রমাণ করা যায় না অথচ তা সত্য।

কিছু পয়সা দিয়ে একে বিদায় করা দরকার। ব্রাহ্মণ পাণ্ডা এমনি পয়সা দিতে গেলে হয়ত অপমানিত বোধ করবে নেবে না। তার ওপরে যা ভক্তলোক ' উপায় বের করতে হবে একটা।

বললাম—হাত দেখতে পারো?

চোখে চোখ রেখে সে বলল—পারি। জ্যোতিষ আমাদের পারিবারিক বিদ্যা।

আমি কিছু না বলে হাতটা তার সামনে বাড়িয়ে দিলাম। সে বলল—এদিকে আলোয় সরে আসুন।

দোকানের আড়া থেকে ঝোলানো হারিকেনের আলোয় সে এক মিনিট আমার করতলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর চোখ সেদিকে রেখেই বলল—কি রাশি?

বললাম—তুলা।

আর একটু দেখে আমার হাতখানা সে ছেড়ে দিল। তার মুখে-চোখে কি একটা পরিবর্তন হয়েছে, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি দেখলেন?

বালেশ্বর জেলার প্রান্তের অল্পশিক্ষিত গেঁয়ো পাণ্ডা ভেবেছিলাম সে গড়গড় করে কিছু বাঁধা বুলি বলে গিয়ে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করবে। কিন্তু এর রকম-সকম দেখে আমার শ্রদ্ধা হল। ময়লা ও আকিঞ্চিৎকর জামা-কাপড় পরে থাকলেও লোকটার ব্যক্তিত্ব আছে। সেটা আরো বুঝলাম এই কারণে যে আমার অজান্তেই দেখলাম আমি তাকে 'আপনি' সম্বোধন করতে শুরু করেছি।

সে বলল—আপনার পুজো দেবার দরকার নেই। আপনার এমনিতেই হবে।

একটু অবাক হয়ে বললাম—তার মানে?

আপনার হাতে প্রত্যক্ষদর্শন রেখা আছে—এমন থাকলে অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়।

—জানি। এটা কিছু নতুন কথা নয়, আগেও অনেক জ্যোতিষী আমাকে

বলেছে। কিন্তু তার জন্য পুজো দেব না কেন? দিতে বাধা কি?

—বাধা কিছুই নেই। মানুষ পুজো দেয় পুণ্যের জন্য, জগৎ যে অজ্ঞানা শক্তির হাতে চলছে তাঁর উদ্দেশ্যে পুজো নিবেদন করে। আপনার কররেখা বলছে সেই শক্তির মুখোমুখি আপনি হবেন। আপনার খুব অদ্ভুত হাত এরকম আগে কারও দেখি নি। গুরুর কাছে শিক্ষার সময় শুনেছিলাম কোটিতে একটা এমন হাত পাওয়া যায়। আমি এই প্রথম দেখলাম। আপনি ভাগ্যবান। কিন্তু—

লোকটা থতমত খেয়ে থেমে গেল। বললাম—কিন্তু কি?

—দেখুন দুটো বিরুদ্ধ শক্তি জগৎ পরিচালনা করে। একটা শুভ একটা অশুভ। যে যার নিজের প্রকৃতি ও কর্মফল দ্বারা নিজেই নির্ণয় করে সে কোনটির দ্বারা আকৃষ্ট হবে। আমি আপনার প্রকৃতি জানি না, ভগবানকে পেতে গিয়ে আপনার শয়তানের সঙ্গে না সান্নিধ্য ঘটে। সেটা মহাদুর্ভাগ্য।

চারদিকে ছত্রীসৈন্যের মত মুঠো মুঠো অন্ধকার নামছে। অচেনা জায়গায় এই সামান্য লন্ঠনের আলোয় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। বারবার মনে পড়ে যাচ্ছে এই দোকানের ঠিক পিছনের বিস্তৃত বালিয়াড়ি ও নির্জন প্রান্তর। কলকাতার মার্কারি আর্ক ল্যাম্প জ্বলা সন্ধ্যেয় দাঁড়িয়ে এই কথা বললে আমি কায়দা করে হেসে একে একটা কঠিন বিদ্রূপের বাক্য শোনাতে পারতাম কিন্তু এখানে যেন সবই বিশ্বাস করা যায়। পরিবেশ মনের ওপরে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।

চলে আসব কিভাবে বিদায় নেওয়া যায় ভাবছি এমন সময় লোকটা নিজে থেকেই বলল—যান আপনার দেরি করিয়ে দিলাম। একটা কথা বলি বলব কিনা তাই ভাবছিলাম। এখন দেখছি বলে দেওয়াই ভালো। যদি জ্যোতিষ কিছুমাত্র বুঝে থাকি তবে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি আপনার অলৌকিক অভিজ্ঞতা হবেই। শুধু তাই নয়—

আবার সে থামল। আমি বললাম—আর কি?

—সে অভিজ্ঞতা হবার আর বিশেষ দেরি নেই।

আমি তীক্ষ্ণ চোখে তার দিকে তাকালাম। সে চোখ নামাল না, বেশ দৃঢ়-গলায় বলল—আমি হলফ করে বলছি আর দেরি নেই।

ওয়ালেট বের করে তাকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দিলাম। সে তাকিয়ে দেখল তারপর বলল—নেব কিন্তু আজ নয়।

- কেন?

—আমার মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করার কারণ জন্মালে তারপর এইখানে এসে টাকাটা দিয়ে যাবেন আমি মাথা পেতে নেব। এটা আমার পাওনা টাকা। আমার নাম বলদেব ত্রিপাঠী। সাহাবাজি-পুরে সবাই আমাকে চেনে অনায়াসেই খুঁজে পাবেন।

ফিরে আসছি পেছন থেকে বলদেব বলল—আমি জানি খুব তাড়াতাড়িই আমাকে টাকা দেবার জন্য আপনাকে আসতে হবে।

পরদিন বিকেল থেকে নামলো অঝোরে বৃষ্টি, পৃথিবী যেন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সেই সঙ্গে ভেজা হাওয়ার প্রচন্ড দাপট। তেতলার কাচের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মেঘে ভারি হয়ে আকাশ ঝুলে পড়েছে সমুদ্রের ওপরে। ধোঁয়া

ধোঁয়া বৃষ্টিতে দিগন্তরেখা কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ আসা বাতাসের ধাক্কায় ঝনঝন করে উঠছে শার্সী। চা দিতে এসে বেয়ারা বলে গেল দুপুরবেলা রেডিওতে সাইক্লোনের সতর্কবাণী প্রচার করা হয়েছে। দূরে সমুদ্র ফুঁসছে ভয়ানক রাগে।

অথচ আজ আমার জুনপুট যেতেই হবে। যেতেই হবে। আমি জানি আমার কোনো উপায় নেই এড়াবার। যে ডেকেছে তাকে মানা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। যদি আজ রাস্তা ভেঙে যায়, যদি আজ বন্যায় ডুবে যায় পথঘাট, তবুও হেঁটে হেঁটে আমি ঠিক জুনপুটে পেঁাছে যাব।

আমাকে কি কেউ দূর থেকে সম্মোহন করছে? হিপ্নোটিজম এ্যাট এ ডিসট্যান্স? এ রকম তো হয় শুনেছি। কিন্তু আমি তো আমাতেই আছি। কোন মানসিক পরিবর্তনও অনুভব করছি না, বা কোনরকম ঘোর ঘোর ভাব।

এক ওই আকর্ষণটা ছাড়া।

নিবিড় এক টানে কে আমাকে টানছে, আমার দেহের সমস্ত স্নায়ু টানটান হয়ে আছে সে আকর্ষণে। যেতে আমাকে হবেই।

রাত ন'টায় রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। জিনের প্যান্টই নিলাম পরে। বেশি হুইস্কি খেলে গাড়ি চালাতে পারবো না, তবু একঢোক খেয়ে নিলাম। সুটকেশ খুলে বের করলাম রিভলবার আর কার্ট্রিজ কটা। চেম্বার তো ভর্তিই ছিল, বাকি-গুলো তোয়ালে থেকে আমার রুমালে জড়িয়ে নিলাম।

দরজায় চাবি দিয়ে নিচে নামছি, বেয়ারাটার সঙ্গে দেখা।

—বেরুচ্ছেন স্যার?

—হ্যাঁ, কাজ আছে।

সে কিছু বলল না, কিন্তু তার মুখ দেখেই বুঝলাম মনে মনে সে বলছে—হুঁ, জানতাম তুমি কত বড় সাধু। এই বৃষ্টিতে বেরুচ্ছে কি এমনি এমনি—শুধু এখানে নয়, এই যা—

লজের একজন বেয়ারা আমাকে ছাতা ধরে গাড়িতে দিয়ে গেল। লক খুলে গাড়িতে বসে প্রথমেই তেলের পরিমাণ দেখলাম। ইগনিশন সুইচ অন করতেই ফুলে ইণ্ডিকেটরের কাঁটা হাফ ট্যাঙ্কের মার্ক ছাড়িয়ে লাফিয়ে উঠে গেল।

নিশ্চিন্ত। অন্তত একশো আশি মাইল চলবে।

রিভলবার আর গুলি গ্লাভ চেম্বারে রেখে দিয়ে স্টার্ট দিলাম।

কি রাত্তির! বৃষ্টি একটু কমেছে বটে, কিন্তু এখনো ঝিরঝির করে পড়ছে খুচরো জলকণা। হেডলাইটের সামনে তারের জালের মত দেখাচ্ছে। রাত বেশি নয়, কলকাতার সিনেমা হাউসে এখনো রাতের শো ভাঙেনি, কিন্তু এখানে মনে হচ্ছে সমস্ত জগৎ যেন আজকের মত কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

রামনগর পেরিয়ে গেলাম। ঘুমন্ত রামনগর। কোথাও কি একটা মানুষও জেগে নেই আজ? আমিই বা পথে বেরিয়েছি কেন? সবাই যখন নিজের শয্যার পরিচিত পরিসরে সুষুপ্ত, আমি কেন তখন খ্যাপার মত অজানা পত্রপ্রেরকের আদেশ পালন করতে চলেছি এই দুর্যোগে? যে চিঠি দিয়েছে আমাকে সে কি নিজে আসবে আমার সঙ্গে দেখা করতে? সে কে? সে কি ভগবান? সে কি শয়তান? আমাকে দিয়ে তার কি প্রয়োজন?

স্লুইশ স্লুইশ শব্দ করে ওয়াইপার চলছে। আফজলের টিউনিং খুব সুন্দর পালকের মত উড়ে যাচ্ছে গাড়ি। কিন্তু স্কিড করবার ভয়ে বেপরোয়া চালাতে পারছি না। জলের ধারা অবিরাম গড়িয়ে পড়ে পিছন দিকের কাঁচটা ঝাপসা হয়ে আছে, কাছে ব্যাক-ভিউ মিরারে কিছু দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য কোন গাড়ি এলে আলো দেখা যাবে ঠিকই। অতএব ভয়ের কিছু নেই।

যতই দূরত্ব অতিক্রম করছি, কেবলই মনের মধ্যে বেড়ে উঠছে একটা অস্বস্তিকর বোধ। হোক রাত্তির, হোক ঝড়জলের তাণ্ডব, তবু কি একজন মানুষও দেরি করে বাড়ি ফিরতে গিয়ে আমার চোখে পড়ে যাবে না? একটা বাড়ির বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়েও ভেসে আসবে না একটু আলোর আভাস? এ কেমন মৃতের ভূমি অতিক্রম করে চলেছি আমি?

এর চেয়ে কত ভাল আমার মহানগর। ইঁট-কাঠের তৈরি বটে, কিন্তু সেখানে রয়েছে আলো, রয়েছে হোটেল—বার—অর্ধোলঙ্গ নর্তকীর বিলাস-বিভ্রম। সেখানে রয়েছে কাজ এবং কাজের পরে নাগরিক জীবনযাত্রার প্রাপ্তব্য সমস্ত সুখের প্রদর্শনী—যা আমার জন্য হাতের সামনে সজ্জিত হয়ে রয়েছে। কলকাতা ছেড়ে আসবার সময় হাঁপ ছেড়েছিলাম কিছুদিন বাইরে বেড়াবার সুযোগ পেয়ে। ভুল, ভুল! এখন স্পষ্ট অনুভব করছি ওই ইঁট-কাঠ-পাথর কতখানি মর্মে প্রবেশ করেছে। নগর পাকে পাকে জড়িয়েছে বটে, কিন্তু নগর ছাড়া আর চলবেও না।

কাঁথি। রাত সাড়ে দশটা।

সামনেই জুনপুটের রাস্তার নির্দেশক স্তম্ভ। এটা পেরিয়ে গিয়েও খেয়াল হতে পারত, কিন্তু কেউ তা হতে দিল না। ডানদিকে বাঁক নিলাম। সরু রাস্তা, পিচঢালা বটে, তবে দু'পাশে এ'টেল মাটির কয়েক হাত পরিসর মাত্র—তারপরেই বেশ নিচু নয়ানজুলি। সামান্য অসতর্ক হলে তার মূল্য বেশ চড়া দামেই দিতে হবে। এদিকে লোকালয় কম। পথেও কোন যানবাহন নেই। যতদূর নজর চলে আমার গাড়ির নতুন ব্যাটারীর তীব্র আলো রাত্রিকে দু'ভাগ করে চিরে রাস্তায় পড়েছে।

প্রায় চার কিলোমিটার পথ চলে এলাম। ইঞ্জিনের একঘেয়ে গর্জন শুনতে শুনতে বোধহয় একটু ঝিমুনি মত এসেছিল—যা ড্রাইভিং-এর পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। হঠাৎ দূরে পথের ওপরে একটা জিনিস দেখে আমি চমকে সোজা হয়ে বসে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং মুঠো করে ধরলাম।

আমার সামনে, বেশ খানিকটা আগে, দুটো লাল আলো পাশাপাশি জ্বলছে! আলো দুটো থেমে নেই, প্রায় আমার গতিতেই এগুচ্ছে সামনে।

অর্থাৎ কোন মোটর গাড়ির টেললাম্প।

কে চলেছে আমার আগে জুনপুটে? এত রাতে বিশেষ করে এই দুর্যোগের রাতে তার সেখানে কি প্রয়োজন? জুনপুটে সরকারী ফিশারীর একটা ছোট্ট অফিস আছে শুনেছি, ও গাড়িতে তার কোন অফিসার নেই তো? এত রাতে তার কি দায় পড়েছে পথে পথে বেড়াবার?

অথবা আমার সঙ্গে কোন যোগ আছে ওই আরোহীর? এইসব রহস্যময় চিঠির লেখকই চলেছে নাকি আমার সামনে?

এসব ভেবে কোন লাভ নেই। কাছাকাছি যাবার জন্য আমি গতি বাড়ালাম।

সামনের গাড়িটা বিকেলে হাওয়া খাবার মেজাজে মাঝারি গতিতে একটানা চলেছে, পথের ঠিক মাঝখান দিয়ে। হু হু করে আমি আধ মিনিটে কাছে এসে গেলাম।

অদ্ভুত তো! ঠিক যেন আমার গাড়িরই আর একটা সংস্করণ। এক রং, ছাদে লগেজ ক্যারিয়ার, পিছনের কাঁচের ভিতর থেকে ঠিক আমারই মত হালকা লাইলাক রংয়ের পর্দা লাগানো। আর—আর—ওকি! এমন মিলও হয়! কলকাতায় চালাবার সময় একদিন ট্রামের বাম্পারে লেগে পিছনের চাকার ওপরে বডিতে একটা লম্বা ঘসা দাগ হয়ে গিয়েছিল—সামনের গাড়িতেও ঠিক একই জায়গায় একই রকম একটা দাগ!

পিছনে পর্দা থাকায় কে গাড়ি চালাচ্ছে বোঝা সম্ভব নয়। ওভারটেক করবো বলে হেডলাইট জ্বালিয়ে-নিভিয়ে সিগন্যাল করলাম। পাশ দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় মুখটা দেখে নেব চালকের।

কোন ফল হল না। বারবার সিগন্যাল করছি, কিন্তু সামনের গাড়িটা আমাকে এগিয়ে যাবার জন্য একটুও জায়গা দিচ্ছে না। পথের ধারে একটুও নামা সম্ভব নয়। এঁটেল মাটির জমি, পিছলে গিয়ে গাড়ি কোথায় গড়িয়ে পড়বে কে জানে! হঠাৎই আমার খুব রাগ হয়ে গেল। তুমি ভেবেছ আমার চেয়ে ভাল গাড়ি চালাও তুমি? আচ্ছা দেখাচ্ছি। আমি সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুযোগ পাওয়া গেল। ডানদিকে রাস্তার ধারে কি কারণে বোধহয় সুরকি ফেলা ছিল। এখন সুরকি তুলে নিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু অনেকখানি জায়গা লাল হয়ে রয়েছে। এখানে গাড়ি নামালে চাকা স্কিড করবে না। বিদ্যুতবেগে ডানদিকের দুই চাকা রাস্তা থেকে নামিয়েই থার্ড-গীয়ারে গাড়ি দিয়ে গতি বাড়ালাম। সামনের গাড়ির চালকের কোন ব্যস্ততা দেখলাম না, সে একইভাবে চলেছে। যখন দুটো গাড়ি পাশাপাশি আমি রহস্যময় চালককে দেখবার জন্য বাঁদিকে তাকালাম।

এবং তাকিয়ে আমার জীবনের সবচেয়ে অবাক-করা অনুভূতিটি হল।

গাড়িতে কেউ নেই। চালক না, আরোহী না, কিচ্ছু না। একটা মোটরগাড়ি আপনা-আপনি চলেছে কোন অলৌকিক গন্তব্যের দিকে!

কোনরকমে ওভারটেক করে আমি রাস্তায় উঠে এলাম। টের পেলাম ঘাড় বেয়ে জামার ভিতরে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা ঠাণ্ডা ঘাম। শরীরের ওপর আমার আর কর্তৃত্ব নেই। নেহাৎ অভ্যাসের বশে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি।

দাঁতে দাঁত চেপে মনকে শক্ত করলাম। ভয় পেলে চলবে না। আমি তো ভুলও দেখে থাকতে পারি। হয়ত আলো-আঁধারিতে ঠিকমত ঠাহর করতে পারি নি। একথা মনে হতেই বুকটা যেন একটু হালকা লাগল। হ্যাঁ, তাই হবে। ড্যাশ-বোর্ডের মৃদু আলোয় চোখে ধাঁধা লাগা অসম্ভব নয়। তাছাড়া এমন বিপজ্জনক পথে ড্রাইভ করতে করতে এক মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে সঠিক দেখতে পাওয়া খুব কঠিন। আমারই ভুল হয়েছে নিশ্চয়—একটা আস্ত গাড়ি তো নিজে নিজে চলতে পারে না।

এবার গতি বাড়িয়েছিলাম। দেখতে দেখতে পিছনের গাড়ির হেডলাইট দূরে মিলিয়ে গেল। বেশি কিছু ভাববার আগেই দেখি জুনপুট এসে গিয়েছে। রাস্তা একটা ঢালু বেয়ে উঠেই আবার নেমে মাঠের মধ্যে মিশে গিয়েছে। এবড়ো-

খেবড়ো মাঠ, জল জমে আছে। মাঠের পরে ডাইনে ঝাউবন হেডলাইটের শেষ সীমায় দেখা যায়। সম্ভবত তার ওদিকে সমুদ্র। স্টার্ট বন্ধ করে দ্রুত হাতে সবগুলো কাঁচ তুলে দিয়ে রিভলবারটা পকেটে নিলাম। গাড়ি লক করে দৌড় দিলাম ঝাউবনের দিকে। পিছনের ওই ভূতুড়ে গাড়ি এসে পড়বার আগেই আমাকে দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে হবে। সে ব্যাপারে ঝাউবনই আদর্শ জায়গা। নইলে এই খোলা মাঠের মধ্যে হেডলাইটের আলোয় আমি অসহায়ভাবে স্পটেড হয়ে যাবো।

ঝাউবনে যখন পেঁছিলাম তখন বেদম হয়ে পড়েছি। ইস্কুল থেকে বেরুনোর পর আর এতটা একসঙ্গে দৌড়োই নি কখনো। আমিও পেঁছিলাম, পেছনের গাড়িটাও ঢালু থেকে উঠে এসে মাঠে নামলো।

হেডলাইট নিভতেই কিছুক্ষণ সব অন্ধকার, তারপর আস্তে আস্তে সেই অন্ধকার আবছা হয়ে ঝাউবনের সিলুয়েট ফুটে উঠলো। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। ঝোড়ো বাতাস সমুদ্রের দিক থেকে বইছে একটানা। ঝাউয়ের পাতায় যেন উদাস শোকগাথা বাজছে—শনশন, শনশন। একটু পাশে সরতে গেলাম, পায়ের নিচে মট করে শব্দ হল। গ্যাস-লাইটার জ্বালতে ভরসা হল না। কুড়িয়ে নিয়ে চোখের খুব কাছে এনে বোঝবার চেষ্টা করলাম।

জিনিসটা মানুষের হাতের হাড়!

এটা শ্মশান তাহলে!

নিজেকে বারবার তিরস্কার করছিলাম গোঁয়ার্তুমি করে এখানে চলে আসবার জন্য। কিন্তু এখন আর তা ভেবে লাভ নেই। এবার ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু ফিরতে গেলে আমাকে ওই ভূতুড়ে গাড়ির পাশ দিয়ে গিয়ে আমার গাড়িতে উঠতে হবে। ওটা অনেক এগিয়ে এসে থেমেছে। আর সেই রহস্যময় পত্রপ্রেরকেরই বা কি হল? আমাকে সে এখানে এই ঝড়ের রাতে খামোকা টেনে আনলো কেন? কি হবার কথা ছিল এখানে?

এমন সময় শুনলাম ভূতুড়ে মোটরগাড়ি আবার স্টার্ট নিল। যাক, ওটা চলে গেলে আমি এক্ষুণি দৌড়ে গিয়ে আমার গাড়িতে উঠবো।

সত্যিই দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা। যেই এসে থাকুক, এখন সে চলে গিয়েছে।

কিছুটা হাল্কা মন নিয়ে একটু সময় অপেক্ষা করলাম। তারপর ফেরবার জন্য পা বাড়াবো, ঝাউবনের প্রান্তে শব্দ শুনলাম—মচ্!

আমার ঘাড়ের রোঁয়া শিরশির করে উঠলো। চোরের মত সন্তর্পণে কেউ ঢুকছে ঝাউবনে। এর একটাই অর্থ হয়। কোনো অসম্ভব উপায়ে আমার চোখ এড়িয়ে ওই ভূতুড়ে গাড়িতে দু'জন মানুষ—অথবা যেই হোক—ছিল। একজনকে নামিয়ে দিয়ে আর একজন ফিরে গিয়েছে। যে নেমেছে, সেই আসছে এদিকে।

পকেট থেকে রিভলবার বের করে হাতে নিলাম। আগ্নেয়াস্ত্রের ঠাণ্ডা, বিশ্বস্ত স্পর্শ মনে যেন সামান্য আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। একটা সিগারেট খাবার জন্য বুক ফেটে যাচ্ছে। কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।

আমার থেকে সামান্য দূরে কে যেন নড়ল। সে এগিয়ে আসছে কাছে। যেন অন্ধকারের ভেতর কে এক জীবন্ত ছায়া নড়াচড়া করছে। সাবধানে শব্দ বাঁচিয়ে আমি একটা ঝাউয়ের গুঁড়ির আড়ালে সরে গেলাম। ভয়ে আমি কোনোদিকে

তাকাচ্ছি না, থরথর করে কাঁপছে সারা শরীর। হাওয়ার জোর আচমকা খুব বেড়ে উঠল, তার সঙ্গে ঝাউপাতার মর্মর। যেন অশরীরীরা মিলিত গলায় গাইছে এক অপার্থিব গান। অজানা আগন্তুকের পায়ের শব্দ এখন শুনতে পাওয়া সম্ভব নয় এর ভিতরে। বোঝার কোনো উপায় নেই কোন্ দিকে সে যাচ্ছে। রিভলবার শক্ত করে ধরে আছি, যদিও জানি না এটা কোন্ কাজে লাগবে।

এমন সময় আবার পায়ের আওয়াজ, আমার গায়ের একেবারে কাছে। গাছের গুঁড়ির ওপাশেই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত কাছে যে, আমি তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি। এমন কি অন্ধকারে ওপাশে হাত দিলে আমি তাকে ছুঁতে পারবো।

নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ বাজছে, যেন কে ঘণ্টা পিটছে কোথায়। কানের মধ্যে শোঁ শোঁ করে রক্ত চলাচলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি পরিষ্কার।

এমন সময়ে একটা কালো ছায়া গাছের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। একজন মানুষের ছায়া। আমি পকেট থেকে গ্যাস-লাইটার বের করে হাতে নিলাম। যাই থাকুক কপালে, আমি এর মুখ দেখব। কে এ?

এক পা সরে প্রায় আমার শরীর ছুঁয়ে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি, মুখোমুখি। আমি নিঃসীম আতঙ্ক খস্‌খসে গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম—এই। খবরদার!

এবং লাইটারটা সামনে ধরে বুড়ো আঙুল দিয়ে হুইলটা ঘোরালাম।

দপ্ করে বিঘৎপ্রমাণ লাফিয়ে উঠল আগুনের শিখা। সে আলোয় আমি যা দেখলাম, তাতে আমার হৃৎপিণ্ড যে তখনই থেমে গেল না, তার জন্যে আমি নিজেকে একজন অত্যন্ত সাহসী লোক বলে মনে করতে পারি।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে আর একজন 'আমি'! আমার এক হুবহু প্রতিচ্ছবি! নাকের ওপরে আঁচিল এবং কপালের কাটা দাগটা আমার।

থিরথির করে কাঁপছে লাইটারের শিখা। হাত ঘেমেছে, রিভলবারের বাঁট যেন পিছলে যাচ্ছে হাতের মুঠো থেকে। অন্ধকার ঝাউবনে, নির্জন এক সমুদ্রসৈকতে, ঝড়ের রাতে সামনে আলো ধরে আমি আমাকে দেখছি! সবই এক, কেবল মুখের ভাব ছাড়া।

কি দুঃখী সামনের ওই মানুষটি! ওর চোখের গভীরে হতাশা, সমস্ত মুখে, কপালে তিক্ত অভিজ্ঞতার ভাঁজ। চোখের নিচে অতিরিক্ত মদ্যপানজনিত কুৎসিত মাংসের পুঁটুলি। ওর পিঠ বেঁকে আছে অদৃশ্য বোঝার চাপে, চুলে পাক ধরেছে বিকৃত জীবনযাত্রার অত্যাচারে। ওর চুলের মধ্যে শহরের ধুলো। দেখলে মনে হয় বেঁচে থাকার চেয়ে মরে আছে বেশি করে।

হাওয়ার ঝাপটা এসে লাইটার নিভিয়ে দিল। প্রাথমিক অন্ধকারের ভাবটা কাটিয়ে উঠে দেখি সে নেই সামনে।

সমুদ্রের দিক থেকে কে যেন আমাকে ডাকছে আর্তস্বরে—বাঁচাও! বাঁচাও! ঝোড়ো হাওয়া বয়ে আনছে তার কণ্ঠস্বর। আমি দৌড়ে যাই সেদিকে। চওড়া বেলাভূমি পেরিয়ে দ্রুতপায়ে দৌড়ে যাই জলের কিনারায় যেখান থেকে ভেসে আসছে অলৌকিক আহ্বান। আমার পা ভিজিয়ে দিচ্ছে ছুটে আসা ঠাণ্ডা জলের ঢেউ, দূরে যেখানে ঢেউ ভাঙছে, সেখানে জলের মাথায় নেচে উঠছে নীলচে-সবুজ ফসফোরেসেন্স্। আর আমি এগুবো না, সাঁতার জানি না আমি, জলে

নামবো না কক্ষনো। অথচ জলের অনেক ভিতর থেকে কাতর ডাক এখনো ভেসে আসছে—বাঁচাও, বাঁচাও! আমার দ্বিতীয় সত্তা ডুবে যাচ্ছে ওইখানে জলের তলায়। আমি সাঁতার জানি না, তাই বোধহয় সে-ও না। মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি ভেসে ওঠবার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়েও সে একখণ্ড পাথরের মত তার ক্লিন্ন শরীর নিয়ে ডুবে যাচ্ছে। একজন দানব তার শহরের কারখানার ময়লা মাখা নোংরা চুলে ভর্তি মাথায় পা দিয়ে তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। এক্ষুনি সেখানে কয়েকটা বুদ্‌বুদ্‌ ছাড়া আর কিছু থাকবে না।

আমি অসহায়ের মত সেখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম আমি মারা যাচ্ছি। আমি যেন অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি কেন আমাকে এখানে আনা হয়েছিল। আমি সাঁতার শিখে নেবো, স্বচ্ছজলের উৎসমুখে ধুয়ে নেব আমার মলিন শরীর। তখন আমি সহজেই নিজের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারব। আমার চোখের নিচে থেকে উধাও হবে কুৎসিত মাংসপিন্ড, কপাল থেকে তিক্ততার ভাঁজ, রক্ত থেকে ব্যাধির বীজ। আমি নিরাময় হয়ে উঠবো, আমরা সবাই নিরাময় হয়ে উঠবো।

ক্লান্ত পায়ে গাড়িতে ফিরে গিয়ে স্টার্ট দিলাম। কাল সকালে একবার সাহাবাজিপুর গ্রামে যেতে হবে। সেখানকার বলদেব ত্রিপাঠী আমার কাছে দশটা টাকা পায়।

তিন অধ্যায়

প্রাগৈতিহাসিক

গ্রামবৃদ্ধ এসে আমাদের সবাইকে সাবধান করে দিয়ে গেল—রাত্তিরে সজাগ থেকো, সর্পগোষ্ঠীর লোকেরা আক্রমণ করতে পারে।

অবশ্য আমরা এটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। গত ফসল কাটার ঋতুতে সর্পগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের বিরোধ হয়েছিল। এমন কিছু ব্যাপার নয়, ঝগড়া মিটে যেতে পারত। ন্যাড়া পাহাড়ের নিচে বড় বটগাছটার তলায় মিটমাটের সভাও বসেছিল দুবার। কিন্তু ওদের গোষ্ঠীপতি লোকটা ভারি চোয়াড়ে, যেন যুদ্ধ করবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছে। কেবল বলে—নদীর ধার থেকে সব জমি আমাদের। আগে হটে যাও, তারপর অন্য কথা। নইলে মিটমাট কিসের?

গ্রামবৃদ্ধ সবার সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য সাতদিন সময় চেয়ে নিয়েছিল, কথা ছিল সাতদিন পর এই বটগাছের তলায় আবার দু'দলের লোকেরা আসবে। সেখানে আমরা আমাদের মতামত জানাবো। আজ বিকেলে সেই সাতদিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আমাদের দিক থেকে কেউ যায় নি কোনো খবর দিতে। সর্পগোষ্ঠীর লোকেরা নিশ্চয় খুব রেগে ফিরে গিয়েছে। আজ রাত্তিরে তারা একবার এই অপমানের শোধ নেবার চেষ্টা করবে হয়ত।

আমরা যা করেছি ভেবেচিন্তেই করেছি। নদীর ধারের সব জমি ছেড়ে দিলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে। অন্য সময়ে সর্পগোষ্ঠীর লোকেরা এমন প্রস্তাব করার সাহস পেত না—কিন্তু ওরা জানে আমাদের দলে পুরুষ কমে গিয়েছে। ওদের আক্রমণ ঠেকাবার ক্ষমতা নেই আমাদের। গতকাল সবাইকে ডেকে গ্রামবৃদ্ধ বলল

—তোমরা কি করবে ভাবছ? কাল উত্তর দেবার দিন—

উম্‌লা বলল—আপনি কি বলেন?

—আমার কিছু বলার নেই। জমি আমার একার নয় তোমাদের সবার। দলের ভেতরের বিরোধ হলে আমি পরামর্শ দিতাম—কিন্তু এ বাইরের বিপদ। তোমরা বল—

উম্‌লা বলল—জমি দেব না, আমরা লড়ব।

হেনু বলল—লড়বে সে খুব ভাল কথা, কিন্তু আমাদের যোদ্ধা কম তা ভেবে দেখেছ? লড়াই শুরু হবার আগেই আমরা কচুকাটা হয়ে যাবো। তার চেয়ে বরং যদি কিছু জমি ছেড়ে দিয়ে একটা রফা করা যায়—

গ্রামবৃদ্ধ হেনুর দিকে তাকিয়ে বলল—দেখ, আমি মানুষের লোভ জিনিসটাকে খুব ভাল করে চিনেছি। জমি ছেড়ে দিলে যদি ঝগড়ার একটা পাকাপাকি মীমাংসা হত, তাহলে আমি তা করতাম। কিন্তু তা হবে না। এ জমি দিতে রাজি হলেই ওরা আমাদের দুর্বলতা টের পেয়ে যাবে, তারপর বলবে—পাহাড়ের নিচেব জমি দাও। শেষে হয়ত গ্রামটাই চেয়ে বসবে।

—যুদ্ধ করলেই কি পাকাপাকি মীমাংসা হবে?

উম্‌লা বলল—না, তা হবে না। তবে সর্পগোষ্ঠীর লোকেরা বুঝতে পারবে আমাদের চাপ দিয়ে কিছু আদায় করা অত সোজা নয়।

গ্রামবৃদ্ধ চিন্তার ভঙ্গিতে কপালে আঙুল বোলাচ্ছিল, এবার সে বলল—অবশ্য আমাদের দু'দিকই চিন্তা করে দেখতে হবে। যুদ্ধ হলে লোকক্ষয় নিশ্চিত। এমনিতেই আমাদের সক্ষম পুরুষের সংখ্যা কমে এসেছে। এখন যুদ্ধ হলে তাব ফলাফলের দিকটাও তো ভাবতে হবে।

এমনি নানা আলোচনার শেষে ঠিক হল—যুদ্ধ হবে। উম্‌লা বলেছিল সে গিয়ে সর্পগোষ্ঠীর লোকেদের সিদ্ধান্তটা জানিয়ে আসবে, যেমন কথা ছিল। গ্রামবৃদ্ধ বাধা দিয়ে বলল—তুমি কি উন্মাদ? এ খবর দিতে গেলে ওরা তোমাকে সেখানেই হত্যা করবে। যুদ্ধ যখন হবেই তখন তা একটু আগে আরম্ভ করলে ক্ষতি কি? লাভের মধ্যে আমাদের একজন যোদ্ধা কমবে।

কথাটা ঠিক। উম্‌লা থেকে গেল।

আমি আর হেনু পরদিন চুপিচুপি দেখে আসতে গেলাম ওরা কি করে। পাহাড়ের ওপরে দুটো বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে উঁকি দিয়ে দেখলাম বটগাছটার তলায় সর্পগোষ্ঠীর দশ-বারোজন লোক জড়ো হয়েছে। নিজেদের মধ্যে তারা কি বলাবলি করছে আর মাঝে মাঝে হেসে উঠছে খুব জোরে। তারা ধরেই নিয়েছে জমি তারা পেয়ে যাবে। কেবল খবরটা পাওয়ার যা দেরি।

কিন্তু বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি শুকিয়ে এল। সূর্য ডুবে গিয়ে যখন পাহাড়তলীর উপত্যকায় ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে তখন ওরা বুঝতে পারল এদিক থেকে কেউ যাবে না। গোষ্ঠীপতির মুখ রাগে বেগুনী হয়ে উঠেছে, সে মুঠো করা হাত তুলে এদিকে তাকিয়ে আস্ফালন করতে লাগল। হেনু আমার গা টিপে আস্তে আস্তে বলল—চল, গ্রামে ফিরে গিয়ে খবরটা দিই গে—

সন্ধ্যের পর থেকেই গ্রামে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। কেউ মাপমত শরকাঠি কেটে একজায়গায় জড়ো করছে, কেউ বা শজারুর অস্ত্র দিয়ে বানাচ্ছে ধনুকের

ছিল। হেনু নরমুণ্ডের আকৃতির পাথর স্তূপ করে রাখছে গ্রামের সীমায়। শত্রু আসতে দেখলে প্রথমে এগুলো ছোঁড়া হবে। থুলিক আর উম্‌লা পাথরে ঘসে শরের লোহার ফলকগুলিকে তীক্ষ্ন আর উজ্জ্বল করছে। সর্বত্র বেশ উত্তেজনার ভাব।

কেবল গ্রামের উত্তর প্রান্তে নিজের ছোট্ট পাতার ঘরখানার সামনে অহুর শান্তভাবে চুপ করে বসে আছে। তাকে দেখলে মনে হয় না তার চারিদিকে একটা যুদ্ধের আয়োজন চলেছে। কিন্তু আমরা জানি অহুর অলস নয়, বরং ঠিক উল্টোটা। তার মাথায় সব সময়েই নানা অদ্ভুত বুদ্ধি খেলে। পাথরের টুকরো, লোহা, কাঠ—এসব দিয়ে সে প্রায়ই ছোটখাটো কাজের জিনিস বানিয়ে দেয় আমাদের। দেখার পর মনে হয়—কি সোজা! আমরাও পারতাম। কিন্তু অহুর ছাড়া বুদ্ধিটা প্রথমে কারো মাথায় আসে না।

আমি তার পাশে বসে বললাম—এতবড় একটা গোলমাল বাধতে চলেছে, আর তুমি এখানে গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছো?

অহুর হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিল—দাঁড়াও, একটু বাদেই চাঁদ উঠবে। এখন অন্য কথা বোলো না—

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—চাঁদ উঠবে তো কি হয়েছে?

একভাবে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থেকে অহুর বলল একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখছিল ক'দিন ধরে, জানো? চাঁদ যখন ওঠে, চারদিক জ্যোৎস্নায় ভরে যায়, সেই সময়ে একটা বিশেষ সুর গাইতে খুব ভাল লাগে। চেষ্টা করে করে সুরটা আমি তৈরি করেছি। আবার যখন আকাশে চাঁদ থাকে না, তখন এই সুরটা গাইলে তোমার চাঁদের আলোর কথা মনে পড়বেই। আশ্চর্য না?

—তা বটে। কিন্তু তুমি কি করে সুরটা পেলে? মানে, কিভাবে বুঝলে, কোন্ সুরের পর কোন্‌টা বসালে ওইরকম হবে?

—সে তো খুব সোজা। চাঁদের আলোয় বসে থাকলে মনের মধ্যে একটা কেমন যেন ভাব হয়। খুব ভাল লাগার একটা ভাব। নানা সুর লাগাতে লাগাতে যেই মনে তেমন ভাবটা জেগে ওঠে, তক্ষুনি বুঝতে পারি সুরটা পেয়ে গিয়েছি। বুঝতে পারলে না? আচ্ছা, মনে করো তোমার পায়ের এই জায়গাটা খুব চুলকোচ্ছে। যত যাই করো না কেন, কিছুতেই আরাম পাবে না যতক্ষণ না পায়ের ওইখানটা বেশ করে চুলকোচ্ছ।

এইসব কথা হতে হতে পূর্ব দিগন্তের ওপরে চাঁদ উঠে এল। চামড়ার তন্তু দিয়ে তৈরি এক ধরনের কি যন্ত্র বাজিয়ে অহুর গান গাইতে লাগল। সত্যিই অদ্ভুত সে গানের সুর! উৎসবের দিন আমরা সবাই এক জায়গায় হয়ে যে গান করি সে রকম নয়। অজানা একটা গুহায় ঢুকতে গেলে মনের ভেতর যেমন ভয় আর আনন্দের ভাব একই সঙ্গে হতে থাকে, অহুরের গান শুনতে শুনতে আমার তেমনি হতে লাগল।

কিছুক্ষণ বাদে গান থামিয়ে অহুর বাদ্যযন্ত্রটি সযত্নে সরিয়ে রেখে বলল—কাল দুপুরবেলা যদি আসো, তাহলে এই সুর তোমাকে আবার শোনাবো। শুনলেই তোমার চাঁদের আলোর কথা মনে পড়বে। হ্যাঁ, গোলমালের কথা কি যেন বলছিলে? কি হয়েছে?

—সর্পগোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া হচ্ছে জানো না? আজ রাত্রে তারা হয়ত আক্রমণ করবে—

আজ রাত্রে? অহুর একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে কি দেখল, বাতাসে কি শুঁকল, তারপর বলল মধ্যরাত্রির পরে হলে আজ আর আক্রমণ করতে পারবে না, আবার দু'দিন পরে—

—কেন?

—আজ মধ্যরাত্রিতে খুব ঝড়বৃষ্টি হবে। তার ভেতর যুদ্ধ হয় না, ভেজা জমি শুকোতে শুকোতে অন্তত দু'দিন। আমরা পাহাড়ের ওপর দিকে আছি। উপত্যকা থেকে পেছল জমি বেয়ে সর্পগোষ্ঠীর লোকেরা ওঠবার চেষ্টা করবে না।

এটা ভাল খবর। এক্ষুনি গিয়ে গ্রামবৃদ্ধকে জানানো দরকার। আমি উঠে পড়ছিলাম, কিন্তু অহুরের পরের কথাটা শুনে আবার বসে পড়তে হল।

অহুর যেন কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবেই বলল—আর দু'দিনের মধ্যে আমার যন্ত্রটাও হয়ে যাবে।

অহুরের দিকে ঝুঁকে পড়ে চাপা গলায় বললাম—কি যন্ত্র অহুর? কি হবে সেটা দিয়ে?

অহুর বলল—আমাদের পুরুষ কম, অস্ত্রশস্ত্রও তেমন নেই। বহুদিন আগে উল্কাখণ্ড থেকে সংগৃহীত লোহা দিয়ে গ্রামবৃদ্ধকে একখানা হাতিয়ার বানিয়ে দিয়েছিলাম। নদীর ওপারে প্রান্তরে যাবার পথ সর্পগোষ্ঠীর লোকেরা আটকে রেখেছে, নতুন লোহা সংগ্রহ করবার উপায় নেই। তীরের ফলা কি দিয়ে বানাবে?

কথার গতি বুঝতে না পেরে বললাম—তাই তো!

—শত্রু তাড়াবার আর একটা সোজা উপায় আছে।

বুঝতে পারলাম অহুরের মাথায় নতুন বুদ্ধি এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম—কি উপায়?

—পাথর ছুঁড়ে।

—পাথর ছুঁড়ে? তাতে কাজ হবে?

—কেন হবে না? একটা-দুটো নয়, তিন-চারদিক থেকে বৃষ্টির মত পাথর ছোঁড়া যায়?

—তাহলে হতে পারে বটে। কিন্তু আমাদের লোক কই?

অহুর বলল—বেশি লোক কি দরকার? এদিকে এস—

তার পাতার কুটিরের পেছনে পড়ে আছে যন্ত্রণা। দেখেই আবার মনে হল—এঃ, আমার মাথায় কেন এলো না? এত সোজা!

কিন্তু বরাবরই অহুর জিতে যায়।

গাছের ডাল টেনে ধরে হঠাৎ ছেড়ে দিলে সাঁই করে আগের অবস্থায় ফিরে যায়, এই ব্যাপারটা দেখেই তার যন্ত্র বানিয়েছে অহুর। কাঠের চৌকোণো কাঠামোর ওপরে লম্বা আর মোটা একটা গাছের ডাল শক্ত করে বাঁধা। ডালটার ওপরদিকে বড় কাঠের বাটি রয়েছে। সেই বাটিতে কুড়ি-পঁচিশটা বড় পাথর রেখে ডালের মাথাটা জোর করে টেনে আচমকা ছেড়ে দিলে এক-একবার অতগুলো পাথর শত্রুর ওপরে গিয়ে পড়বে। গোটাচারেক এমন যন্ত্র গ্রামের সীমানা বরাবর বসিয়ে দিলে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আর কারুকে উঠে আসতে হবে না।

যন্ত্র দেখানো হয়ে গেলে খুশিমনে অহুর বলল—চল, গ্রামের মধ্যে থেকে কয়েকজন লোককে ডেকে এনে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই। সবাই মিলে খাটলে কালকের মধ্যে আরো তিনটে তৈরি হয়ে যাবে।

যুদ্ধের আগে প্রথা অনুযায়ী আজ রাত্তিরে নাচ হবে, দেবতার অনুগ্রহ চাওয়া হবে। গ্রামের মাঝখানে খোলা জায়গায় সবাই জড়ো হয়েছে। একটা চওড়া কালো পাথরের ওপর হরিণের ছাল পেতে গ্রামবৃদ্ধ বসে। সেখানে গিয়ে বিনা ভূমিকায় অহুর তার যন্ত্রের কথা বলে চার-পাঁচজন লোক চাইল।

নতুন আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝতে গ্রামবৃদ্ধের দেরি হল না। আনন্দে উত্তেজনায় সে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—অহুর ! তোমাকে আর নতুন করে কি বলব ? তুমি আমাদের গোষ্ঠীর গর্ব। সর্পগোষ্ঠীর পাজি আর লোভী লোকগুলো এবার টের পাবে কাদের সঙ্গে তারা লাগতে এসেছে। তোমার যা বুদ্ধি তাতে

অসহিষ্ণুভাবে গ্রামবৃদ্ধকে থামিয়ে দিয়ে অহুর বলে উঠল—কিন্তু এসব বানাতে আমার একটুও ভাল লাগে না। এর চেয়ে গান বাঁধতে ভাল লাগে। ক্ষেতে জল দেবার জন্য গত বছর একটা যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছিলাম মনে আছে ? সেটা তৈরি করে এর চেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছিল। লোক মারবার যন্ত্র বানিয়ে আবার আনন্দ করবার কি আছে ? এ ব্যাপারটা মাথায় এসেছিল, তোমাদের কাজে লেগে গেল—এই পর্যন্ত। তাছাড়া তোমরা আমার আপন লোক। তোমাদের জন্য কিছু করাও তো দরকার—নইলে ভাল সবাই মারা পড়তে।

জোর পায়ে হেঁটে অহুর ফিরে চলল নিজের কুটিরের দিকে। কিছুদূর গিয়ে পেছন ফিরে বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য না করেই সে বলল—সর্পগোষ্ঠীর লোকেদের খামোকা পাজী আর লোভী বলে গাল দিয়ে লাভ কি ? এখন আমাদের লোক কমে গিয়েছে বলে আমরা এসব ভাল ভাল কথা বলছি। দশ বছর আগে, যখন আমাদের অনেক পুরুষ ছিল, তখন আমরা ঈগলগোষ্ঠীর জমি কেড়ে নিই নি ? বেকায়দায় পড়ে শান্তির কথা বলে লাভ নেই, বরং যুদ্ধ যাতে না হয় সেই চেষ্টা করা উচিত।

সেবার সর্পগোষ্ঠীর লোকেরা যুদ্ধে জিততে পারে নি।

অহুর অনেক বছর বেঁচেছিল। খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছিল শেষদিকে। সবাই তাকে বলেছিল গোষ্ঠীপতি হবার জন্য। সে রাজি হয় নি।

মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়ে বসতাম। কখনো বিকেলে, কখনো রাত্তিরে। পাহাড়ের কালো পাথরের গায়ে সাদা খড়িমাটির টুকরো দিয়ে দাগ কেটে কি একটা গণনাপদ্ধতি সে বের করেছিল। জীবনের শেষদিকে তাই নিয়েই মেতে ছিল অহুর। জিনিসটা জটিল, চেষ্টা করেও বুঝতে পারি নি। এই প্রথম তার বুদ্ধির কোনো একটা পরিচয় পেয়ে মনে হয় নি—আমরাও পারতাম। এই প্রথম মনে হয়েছিল অহুর আমাদের সবার চেয়ে অনেক বড়—অন্যরকম।

একদিন সে আমাকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখিয়েছিল। একটা বিঘৎখানেক লম্বা, চ্যাটালো পাথর। তার ওপরে চিংড়ি মাছের মত কি প্রাণী খোদাই করে আঁকা আছে। বললাম—তুমি তৈরি করেছ ?

—না।

—তাহলে ?

—এটা আমি স্নান করতে গিয়ে নদীতে পেয়েছি, জলের তলায় ডুবে ছিল। কারো তৈরি নয়, বুঝলে? নদীর ধারের পলিমাটিতে প্রাণীটা আটকে পড়ে মারা গিয়েছিল। তার শরীর পচে মিশিয়ে গিয়েছে। রোদ্দুরে পুড়ে, শুকিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে পলিমাটি। ছাপটা রয়ে গিয়েছে।

পাথরটা হাতে নিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলাম। অহুর বলল—সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো? আমি লক্ষ্য করে দেখেছি এমন কোনো প্রাণী আজকাল আর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজেছি। আমার মনে হয় পৃথিবীতে চিরকাল ঠিক এমনটা ছিল না, গাছপালা অন্যরকম ছিল, অন্যরকম প্রাণী ছিল। সব বদলাচ্ছে, কেবল বদলাচ্ছে। একদিন হয়ত আমরাও থাকব না। কারো শরীর পলিমাটির ওপর ছাপ হয়ে থেকে যাবে—ভাবলে কেমন লাগে, না? আকাশের নক্ষত্রের দিকে তাকাও, ওগুলো কি? কতদূরে রয়েছে ওরা? আমাদের সঙ্গে কি একটা যোগ আছে যেন ওদের। এতকিছু নিয়ে ভাবার আছে, জানার আছে- তবু আমরা কেবল যুদ্ধ করি দুর!

তারপর চর্মতন্তুর বীণা বাজিয়ে অহুর নক্ষত্রদের নিয়ে তৈরি একটা গান গাইতে লাগল। রাত গভীর হতে লাগল।

সমসময়

সমুদ্রের ধারে হলুদ বেলাভূমির ওপর খেলা করছে একটি সাত-আট বছর বয়েসের শিশু। ভেজা বালি নিপুণ হাতে সাজিয়ে সে একটি সুন্দর বাড়ি তৈরি করছে। কিছুদূর থেকে শুরু হয়েছে নারকেল গাছের সারি। ঘননীল আকাশ, হলুদ বালি, সবুজ গাছ আর সামনে প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম বিস্তার— সব মিলিয়ে দৃশ্যটি ভারি সুন্দর। ক্রীড়ারত বালকের মূর্তি দৃশ্যটিকে সম্পূর্ণতা দান করেছে।

এ দ্বীপের ওপর দিয়ে বিমানে উড়ে গেলে কেবলমাত্র নিবিড় গাছপালা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাওয়া যাবে না। মার্কুয়েসাস গোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি অতি ছোট দ্বীপ এখানি, প্রায় বিষুবরেখার ওপরে। নীল মীনে করা গয়নায় একটুকরো পান্নার মত।

দ্বীপের আসল রূপ কিন্তু একেবারে অন্যরকম। এর মাটির নিচে রয়েছে কংক্রিটের তৈরি বিশাল বিশাল ঘর, সেইসব ঘরে সারিবদ্ধ আই সি বি এম ক্ষেপণাস্ত্র আকাশমুখো দাঁড়িয়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে সামান্য বোতামের চাপে উড়ে যাওয়ার অপেক্ষায়। পশ্চিমী কোনো এক শক্তিধর রাষ্ট্রের গোপন ঘাঁটি এই দ্বীপ। মাত্র দশ-বারোজন কর্মচারী এখানে থাকে—তাদের পরিবার নিয়ে। প্রথম দিকে অবশ্য পরিবার নিয়ে আমার অনুমতি ছিল না, কিন্তু আপাতশান্তিময় এই দ্বীপে যারা থাকে তাদের কাজ করতে হয় ভয়ানক স্নায়বিক চাপের মধ্যে— পরিবার সঙ্গে থাকতে পেলে সে চাপ কিছুটা কমে।

ছেলেটির ঘর তৈরি প্রায় শেষ হয়ে এল। অলস দুপুরে মাথার ওপরে নারকেল গাছের পাতায় মৃদু মর্মরধ্বনি তারও ওপরে সাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে বাণিজ্যবায়ুর স্রোতে। ছেলেটি ঘামছে রোদ্দুরে।

জর্জ—জর্জ-ই-ই-

বছর চল্লিশ বয়েসের একজন, শক্তসমর্থ চেহারার লোক বেলাভূমির ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি দাঁড়িয়ে উঠে কপালের ওপর থেকে চুলের গোছা সরিয়ে বলল—কি বাবা? খাবার সময় হয়ে গিয়েছে?

টিমোথি ওয়েস্ট কাছে এসে বালির ঘরটার চারদিকে ঘুরে দেখে বলল—বাঃ, বেশ বানিয়েছিস তো! তা, দরজা জানালা করিস নি কেন?

ঘরের যে আবার দরজা-জানালা থাকা প্রয়োজন সেটা জর্জ ভুলে গিয়েছিল। এবার খেয়াল হওয়ায় সে বলল—এ মা! তাই তো। দাঁড়াও দরজা করে দিচ্ছি—

টিমোথি বলল -আমিও হাত লাগাই আয়—

মিনিট পনেরো বাদে জর্জ একটু পেছনে সরে এসে সমস্ত জিনিসটা দেখে বলল—এবার বেশ সুন্দর হয়েছে, না বাবা?

–হুঁ। চল, এবার যাই। উঃ, রোদ্দুর যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে।

—আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে বাবা। ভাবো, আমাদের ইস্কুলের মাঠটায় এখন বরফ পড়ছে। বোর্ডিং হাউস থেকে ক্লাসে যাবার পথটা হাটু অবধি বরফে চাপা পড়েছে। এখানে কেমন রোজ রোদ্দুর ওঠে। আমার শীত একটুও ভাল লাগে না—

তারপর জর্জ বাবার দিকে তাকিয়ে অভিমানের গলায় বলল—বাবা, এবার কিন্তু আমি এক সপ্তাহ বেশি থেকে যাবো। তুমি রেক্টরকে চিঠি লিখে দেবে।

বেচারা জর্জ। টিমোথি আদর করে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল - কিন্তু বাবা, সামনের টার্মে তোমাকে যে খুব ভাল ফল করতে হবে, স্কুলে না গেলে কি হয়?

জর্জ খুব বাধ্য ছেলে, সে ম্লানমুখে চুপ করে রইল। ছেলের হাত ধরে টিমোথি সৈকত পেরিয়ে গাছপালার মধ্যে এসে ঢুকল। কড়া রোদ্দুরের পর এখানে বেশ ছায়া। গাছের পাতায় বাতাস বেধে ঝিরঝির শব্দ। কিছুদূর হেঁটে মাটির তলায় নামবার কংক্রিটের দরজা, তার ভেতর দিয়ে নেমে গেলে আর রোদ্দুর নেই, আলো নেই, ছুটে যাবার জায়গা নেই। লম্বা লম্বা করিডর, হলঘর, থাকবার কোয়ার্টার, দোকানপাট সবই রয়েছে মাটির তলার এই বসতিতে। সভ্যতার কেন্দ্র থেকে দূরে থাকবার ব্যাপারটাকে পুষিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রাচুর্য দিয়ে। নামমাত্র দামে খাবারদাবার উৎকৃষ্ট মদ—প্রমোদের নানা উপকরণ একমাত্র জনবিরলতা ছাড়া নগরজীবনের সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই।

ফাইবার গ্লাসের পাল্লা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই নাকে ভেসে এল ডিমভাজার খিদে-জাগানো গন্ধ।

টিমোথির দিকে তাকিয়ে জর্জ বলল—বাবা, মা আজ নিজের হাতে রান্না করছে!

জর্জের কাছে বিস্ময়াবহ বলে মনে হলেও টিমোথি বেশ মনে করতে পারে তার মা রোজ নিজে রান্না করতেন। বাবার ছিল পুরনো আসবাবপত্র বিক্রি করবার ব্যবসা। সারাদিনের শেষে বাবা বাড়ি ফিরে ফায়ারপ্লেসের পাশে প্রিয় আরামকেদারায় বসলে মা এককাপ কফি করে নিজে নিয়ে আসতেন। কফিতে প্রথম চুমুক দিয়ে তৃপ্তিতে বাবার গলার 'আঃ' শব্দটা যেন এখনো শোনা যায়। সেই

উষ্ণ ঘরের কোণ, বাবা পাইপ মুখে সান্ধ্য দৈনিক পড়ছেন, ব্রুটাস গোল হয়ে শুয়ে পায়ের কাছে, মায়ের উলের কাঁটার খট্‌খট্‌ শব্দ—ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগের কি সুন্দর সন্ধ্যেগুলো! নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় ঘেরা।

বদল হতে আরম্ভ করেছিল তারও আগে থেকেই, কিন্তু হঠাৎই পরিবর্তনের গতি বেড়ে উঠে ভাসিয়ে নিয়ে গেল পুরানো যা কিছু। মা যকৃত-এর ক্যান্সারে সামান্য ভুগেই মারা যান, দিনবদলের কষ্ট পেতে হয় নি। বৃদ্ধ অ্যান্টনি ওয়েস্ট একা একটি ওল্ড এজ হোম-এ এখনো বেঁচে রয়েছেন। দু'তিন বছরে একবার তাঁকে দেখতে যাবার সুযোগ হয় টিমোথির। শেষবার গিয়ে তাই মনে হয়েছিল—বাবা আর বেশিদিন বাঁচবে না। চোখে ভাল দেখতে না পেলেও বাবার শরীর বেশ শক্ত আছে। কিন্তু বাবার আসলে বাঁচবার ইচ্ছেটাই ভেতর থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে। অ্যাম্‌ফোরা তামাকের কৌটো, কিছুটা অস্ট্রেলিয়ান চীজ আর একগুচ্ছ কার্নেশান ফুল দিয়ে টিমোথি বাবার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখল বৃদ্ধ দোতলায় নিজের ঘরের বারান্দায় চুপ করে বসে আছেন। সে গিয়ে কাছে দাঁড়াতে অ্যান্টনি ওয়েস্ট ভুরু কুঁচকে তাকালেন, চিনতে পারলেন না বোধহয়।

ঝুঁকে পড়ে সে বলল—বাবা, আমি টিম। আমি এসেছি।

—ও।

টিমোথি তার আনা জিনিসগুলো বাবাকে দিল। বৃদ্ধ কেমন যেন নিস্পৃহভাবে সেগুলো একটু নাড়াচাড়া করে পাশের ছোট টেবিলটায় নামিয়ে রাখলেন।

কেউ কোনো কথা বলছে না। এ জায়গাটাই বা কেমন? এটা মানুষ থাকবার জায়গা না সমাধিকক্ষ?

কথা শুরু করবার জন্য টিমোথি বলল—তুমি তামাক ভালবাসো বলে অ্যাম্‌ফোরা তামাকের কৌটো অনেক খুঁজে নিয়ে এসেছি। আজকাল তো পাওয়াই যায় না—

—হ্যাঁ, বেশ ভাল তামাক। আমি খাবো'খন।

আবার নীরবতা।

হঠাৎ পেছনে ঘরের মধ্যে খুটখাট করে কি আওয়াজ হতেই এতক্ষণে বৃদ্ধের মধ্যে যেন কিছুটা প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেল, চেয়ারের হাতল মুঠো করে ধরে অর্ধেক ফিরে কি দেখার চেষ্টা করে বললেন—ওই! ওই আবার এসেছে—

টিমোথি ব্যস্ত হয়ে বলল—কি বাবা?

—ইঁদুর। কিচ্ছু রাখবে না, সব কেটে দেবে!

—এখানে ইঁদুর আছে নাকি?

বৃদ্ধ যেন জীবনের সবচেয়ে জরুরী প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন। উষ্ণ গলায় বললেন—অজস্র। অজস্র—আমার উলের মোজা কেটে দিয়েছে, আমাকে যে খাবার দিয়ে যায় তা রোজ খেয়ে ফেলে। রাত্তিরে গায়ের ওপর দিয়ে দৌড়ে যায়—

—আচ্ছা, আমি দেখছি—একটা লাঠি বা কিছু—

অ্যান্টনি ওয়েস্ট বললেন—তুই পারবি না। ওরা অনেক আর ভারি চালাক। আমার পুরনো সবকিছু কেটে একেবারে—

টিমোথি একটু ইতস্তত করে বলল—বাবা, আমি বরং একটা উলের মোজা কিনে তোমাকে দিয়ে যাই। নইলে—

বৃদ্ধ শূন্যদৃষ্টিতে রেলিং-এর ওপারে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—ওটা তোর মা আমাকে বুনে দিয়েছিল।

পুরনো বাড়িটার ঘরগুলো খুব ঠাণ্ডা। টিমোথির মনে হল বাবার একটা ভাল ওভারকোট দরকার। মাপ দিয়ে বানানো অনেক ঝামেলা, তার চেয়ে রেডিমেড কিনে নেওয়া সুবিধের। বৃদ্ধের ইচ্ছা-অনিচ্ছা কোনোটাই পরিষ্কার বোঝা যায় না। টিমোথি একবার বলতেই তিনি রাজি হলেন।

কিন্তু তোমাকে যে একবার যেতে হবে বাবা, নইলে মাপ ঠিকমত হবে না।

আমি? কিন্তু আমি তো আজকাল আর বেরুই না-

—আমার সঙ্গে চলো, আমি ঠিক নিয়ে যাবো।

বৃদ্ধ বললেন—পারবি?

–ঠিক পারবো। চলো –

পথে বেরিয়ে লোকের ভিড়ে, যানবাহনের উচ্চকিত কর্কশ শব্দে অ্যান্টনি একেবারে দিশাহারা। কিছুতেই ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নামবেন না। বারবার পা ফেলে আবার পিছিয়ে আসেন। চোখে দেখতে পান না, মনে হয় পৃথিবীর যাবতীয় উৎপাত অট্টশব্দে ঘিরে ধরেছে।

রাস্তা পার হতে হবে যে, ওপারে দোকান।

—এত আওয়াজ কেন বল দিকি? এত লোক কোথায় যায়?

টিমোথি বলল—এদিকে এসো, হাত ধরো। পুলিশ হাত দেখিয়েছে, এইবার পার হয়ে যাই

ওভারকোট পেয়ে বৃদ্ধ আজ সন্ধ্যেবেলা এই প্রথম খুশি হলেন। কোট গায়েই দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন।

—টুইডের, না রে?

—হ্যাঁ, বাবা। টুইড।

আবার সেই স্বজনহীন, ঠাণ্ডা, কবরখানার মত বাড়িটা। বাবাকে পেঁৗছে দিতে দোতলায় উঠল টিমোথি। ঘরে ঢুকে বাবার গা থেকে কোটটা খুলে দেয়াল থেকে হ্যাঙার নিয়ে টাঙিয়ে রাখতে গেল।

—ওই যাঃ।

চমকে পেছন ফিরে সে দেখল অ্যান্টনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি দেখছেন।

-কি হয়েছে বাবা?

ইঁদুর। তার দেওয়া চীজ কতটা খেয়ে গেছে পাজীরা!

আধখোলা ব্রাউন পেপারের মোড়কে চীজের টুকরোটার ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত।

ওয়ার্ডরোবের পেছনে খাটের নিচে ইঁদুরের পায়ের শব্দ।

অনুজ্জ্বল, কম পাওয়ারের বাতির আলোয় ভুতুড়ে দেখাচ্ছে ঘরটা। বাবা দুঃখিত মুখে দাঁড়িয়ে আছেন।

কান্নার আবেগ গলা অবধি উঠে এল টিমোথির। হঠাৎ মনে পড়ল সেই ওদের উষ্ণ বসবার ঘর, ব্রুটাস কুকুর, মায়ের উলবোনা।

বাবাকে তার কিছু বলবার নেই। কোনো সান্ত্বনা দেবার নেই।

সে যখন চলে আসছে, বাবা পেছন থেকে ডাকলেন -শোন্।

—কি বাবা?

—ওভারকোটটা তুই নিয়ে যা–

—সে কি বাবা! কেন?

—ইঁদুরেরা কেটে দেবে। নতুন জিনিসটা—ভাল টুইডের তুই নিয়ে যা—

ওঃ, তার দমবন্ধ হয়ে আসছে! এখান থেকে বেরুতে পারলে সে প্রাণভরে খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচবে।

—না বাবা, ওটা রাখো। দরকার হলে আবার কিনে দেবো।

—আবার দিবি? আচ্ছা, তবে থাক।

বারান্দার মোড় ফেরবার সময় সে তাকিয়ে দেখল বাবা স্থির হয়ে মাথাটা সামনে ঝুঁকিয়ে চেয়ারে বসে আছেন।

খাওয়ার টেবিলে গরম ডিমভাজা এল, সঙ্গে ঠান্ডা মুরগীর মাংস আর ফিঙ্গার চিপস্। ঢাকনা দেওয়া একটা পাত্র নামিয়ে রাখতে রাখতে রুথ বলল—এতে কি বলো তো?

টিমোথি আন্দাজ করার ভঙ্গিতে পাত্রটার দিকে তাকিয়ে রইল।

রুথ হেসে বলল—ফ্রুট স্যালাড্, নিজে করলাম–

টিমোথি বলল—খুব মায়ের কথা মনে পড়ছে, জানো? উনি নিজের হাতে রান্না করতেন। তুমিও মাঝে মাঝে কোরো।

—ভাল হয়েছে?

—হুঁ। নিজেরা করলে অন্যরকম খেতে হয়।

বিকেলে মেঘ করেছিল, সন্ধ্যেবেলা সেই মেঘ গাঢ় হয়ে এলো প্রচণ্ড ঝড়। অবশ্য মাটির তলার এই বসতিতে ঝড়ের গর্জন পৌঁছয় না। আজ টিমোথির ছুটির দিন, রাত্তিরের খাওয়ার সময় অবধি সে ছেলের সঙ্গে বই পড়ে কাটাবে বসে ঠিক করল।

একটা রঙীন ছবিওয়ালা বই দু'জন মিলে পড়বার কথা আছে, কাজের চাপে হয়ে উঠছিল না।

বই পড়ার মাঝখানেই ফোন এল।

বিরক্ত টিমোথি উঠে ফোন ধরল। ছুটির দিনে ঝামেলা ভাল লাগে না। নিশ্চয় কেন্দ্রীয় অফিস থেকে কেউ ডাকছে।

—টিম্?

—বলছি।

—এখুনি একবার এসো। রেড এলার্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

ওপারে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার শব্দ।

টিমোথি যখন রিসিভার নামিয়ে রাখল তখন তার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে।

রেড এলার্ট! ছোট্ট অথচ ভয়াবহ দুটি শব্দ। এই নির্জন দ্বীপে বসবাস-কারী সকলেই জানে মাটির তলায় সদাপ্রস্তুত ক্ষেপণাস্ত্রগুলো কেন রয়েছে, জানে এক একটি ওয়ারহেডে কি ভয়াবহ বিধ্বংসী শক্তির পে-লোড রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানে যে, যুদ্ধটা হবে না। এটা যেন একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। যে সংঘর্ষে কোনো পক্ষই জিতবে না তেমন সংঘর্ষ বাধিয়ে লাভ কি?

সেই ম্যানহাটন প্রজেক্ট, হিরোসিমা—আর আজ!

রেড এলার্ট ঘোষণা করা হল তাহলে! কত পণ্ডিত আর রাজনীতিবিদের জল্পনা-কল্পনা, ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হয়ে গেল!

রেনকোটখানা গায়ে দিয়ে বেরুতে যাবে, রুথ এসে কাছে দাঁড়াল।

—কি হল? কোথায় যাচ্ছ এই সময়ে?

অনেকগুলি বছর কাটল, কিন্তু রুথের ঠোঁটের কোণের সুকুমার ভঙ্গি এখনো ঠিক সেরকমই আছে। হাতের 'স্পর্শে' পুরানো উত্তাপ, দৃষ্টিতে আশ্রয়।

টিমোথি সস্নেহে হাত রাখল রুথের কাঁধে।

—রুথ, আমাকে একটু অপারেশন চীফের কাছে যেতে হবে উনি ফোন করেছিলেন। আমি—আমি এক্ষুনি ফিরে আসবো—

দরজা খুলে করিডরে পা দেওয়ার মুখে রুথ আলতো হাত রাখল টিমোথির হাতে।—কি হয়েছে টিম? বলে যাবে না?

একমুহূর্ত ভাবল টিমোথি। লুকিয়ে লাভ কি? বলতে তো হবেই। তবে ফিরে আসবার পর বললেই ভাল হত।

রুথের পেছনে ঘরের মধ্যে বিছানায় চিত হয়ে বইয়ের ছবি দেখছে জর্জি। বইটায় সূর্যমুখী ফুল আঁকা।

ঘড়ি দেখল টিমোথি। তিন মিনিট আগে ফোন এসেছিল। আরো পাঁচ মিনিট সে এখানে থাকবে। তাতে যা হবার হোক। হয়তো—হয়তো একসঙ্গে পাঁচ মিনিট থাকবার সুযোগ আর কখনো আসবেই না।

দরজা বন্ধ করে আবার ভেতরে ফিরে এল টিমোথি। বিছানায় এসে চুপ করে বসল। রুথ সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

জর্জির বইয়ের মলাটে সূর্যমুখীর গুচ্ছ।

সোজা রুথের চোখে তাকাল টিমোথি। রুথ, চীফ জানালেন রেড এলার্ট ঘোষণা করা হয়েছে।

কথাটার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে রুথের সময় লাগল কয়েক সেকেন্ড তারপর আস্তে আস্তে তার মুখ থেকে সমস্ত রঙ চলে গেল।

সে বলল—না। তারপর হঠাৎ খুব জোরে চিৎকার করে আবার বলল 'না'।

জর্জি অবাক হয়ে বই ফেলে উঠে এসে মাকে জড়িয়ে ধরেছে। তার চোখে ভয়ের ছায়া দেখে টিমোথি দুজনকে দু'হাতে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল ভয় নেই বাবা, কোনো ভয় নেই।

—রেড এলার্ট কি বাবা?

টিমোথি আদর করে ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—একটা যুদ্ধ বাধতে পারে বুঝলি? মানে, 'বাধবেই' যে তার কোনো মানে নেই—তবে আমাকে এক্ষুণি কণ্ট্রোল রুমে চলে যেতে হবে।

—কারা যুদ্ধ করবে বাবা?

—কিছু লোক আছে যারা মনে করে যুদ্ধ করা দরকার, তারাই যুদ্ধ বাধাবার হুকুম দেয়—

—তাদের যুদ্ধ তুমি লড়বে কেন?

এ প্রশ্ন সভ্যতার শুরু থেকে বিভিন্ন কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। কি এর উত্তর?

জোর করে উঠে দাঁড়িয়ে টিমোথি বলল—আমি চট্ করে ঘুরে আসছি। রুথ, জর্জ—তোমরা কোনো কারণেই বাইরে যাবে না। মনে রেখো কোনো কারণেই না

বাইরে শন্শন্ হাওয়া বইছে, সঙ্গে ছুঁচের মত বৃষ্টির কণা। আকাশের দিকে তাকালে কিছু নেই। আকাশজুড়ে মৃত্যুর মত কালো একখানা পর্দা। ওই আকাশ বেয়েই কি এই মুহূর্তে ছুটে আসছে মৃত্যুদূত? একটা ক্রুজ মিসাইলের ফ্লাইট টাইম কত? আট, দশ, পনেরো মিনিট? তারপর? তারপর কি হবে কেউ জানে না।

রেনকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল টিমোথি।

বিদ্যুতের চকিত আলোয় বাঁদিকে বেলাভূমির ওপরে কালোমত ওটা কি দেখা যায়?

জর্জের বালি দিয়ে তৈরি বাড়িটা। সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠেছে। জলের ধাক্কায় ভিত ধ্বসে কাত হয়ে আছে বাড়িটা। একটু বাদেই ভেঙে পড়বে। বেচারা অনেক খেটে বানিয়েছিল।

সে যখন বেরিয়ে আসছে, জর্জ পেছন থেকে ডেকে বলেছিল—ভালই হবে যুদ্ধ হলে আমাকে তাহলে এখনই ইস্কুলে ফিরতে হবে না। আমি তোমাদের কাছেই থাকবো।

অনাগত

ঝকঝকে আলোয় ধোয়া এক সকালে বিশাল আন্তনাক্ষত্রিক যানটি নিঃশব্দে পৃথিবীর ওপরে নেমে এল।

চারদিক বরফে ঢাকা। আকাশে পাখি নেই, মাটিতে গাছ নেই, প্রাণের চিহ্নবিহীন শুভ্র তুষারমরুতে দু'একটি বহু প্রাচীন উঁচু বাড়ি বা লৌহময় স্থাপত্য বিগত সভ্যতার শেষ নিদর্শন হিসেবে বরফের চাদর গায়ে বিস্তৃত রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শুকনো বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মত শব্দ করে বইছে।

মহাকাশযানটির পাশের দিকে ধাতুর পাল্লা সরে গিয়ে একটা দরজার মত ফাঁক দেখা দিল, সেখান দিয়ে ভেসে বরফের ওপর নেমে এল তিনটি প্রাণী। তাদের কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট অবয়ব নেই—তিনটি নীলচে-সাদা খুব উজ্জ্বল আলোর গোলক বলা যেতে পারে।

প্রাণী তিনজন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করল। এই সংলাপে বাতাসে কোনো শব্দের কম্পন জাগে না—কেবল চিন্তার প্রক্ষেপটুকু ঘটে। একটি প্রাণী বলল—স্থপতি, যথেষ্ট সময় তো গেল। এ গ্রহের আবহাওয়া এবার জীবনকে লালন করবার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। বরফটা গলিয়ে দাও।

স্থপতি উত্তর দিল—দেব। কিন্তু জীবনবীজের নতুন পরিকল্পনা ঠিকভাবে ঝাড়াই করে নেওয়া হয়েছে তো? নইলে আবার সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হবে। এই গ্রহটি বিকশিত হতে বড় সময় নিচ্ছে। কতবার এলুম বল তো?

জীববিজ্ঞানী বলল—অসহিষ্ণু হচ্ছ কেন? আমাদের ইতিহাসটা ভাবো তো। সেই অগণ্য যুগ আগে উত্তরভাদ্রপদ নীহারিকার এক সৌরমণ্ডলে এককোষী প্রাণী হিসেবে যাত্রার শুরু। তারপর কোটি কোটি প্রজন্মের প্রান্তে আজ আমাদের শরীরের প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। কেবল জীবনীশক্তিটুকু প্রকাশিত। কে জানে বিবর্তনের এই শেষ ধাপ কিনা। তুমি সামান্য দেড়-দু'লক্ষ বছরেই ধৈর্য হারাচ্ছ? কৃত্তিকা নক্ষত্রের চতুর্থ গ্রহের কথা স্মরণ কর, সেখানে আটবার নতুন জীবনের বীজ বপন করতে হয়েছিল।

তৃতীয় প্রাণীটি ইতিহাসবেত্তা। সে বলল ঠিক কথা। বিবর্তনের গতি সবার সমান নয়। তবে এই গ্রহের প্রাণীরা কিছু বেশি ভুল করছে। অত্যন্ত খুব সাবধানতার সঙ্গে এদের জীবনবীজের ছক করা হয়েছিল, তবু কী করে যে এর মধ্যে আত্মহননের সংকেত ঢুকে যায়—

স্থপতি বলল -ঠিকই। চমৎকার গ্রহটির কি দশা করেছে দেখ। উন্নত অস্ত্র যুদ্ধ, পরিবেশ নিয়ে খেলা- সমস্ত আবহাওয়া এমন বদলে গেছে যে এই নিরক্ষ অঞ্চলেও এত বরফ। গ্রহটির অক্ষ অন্তত দশ ডিগ্রী বাঁকাতে হবে।

ইতিহাসবেত্তা বলল- কোনো প্রাণীর স্বাভাবিক বিকাশে হস্তক্ষেপ করা যদিও নিয়ম নয়, তবু ঘটনার গতি দেখে এ গ্রহে কিছুদিন বাদে বাদে কয়েকজন বিশেষ পুরুষকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তাদের কথা কেউ শোনে নি। নিজেদের স্বার্থ অনুযায়ী সবাই তাদের বাণীর সুবিধামত ব্যাখ্যা করে নিয়েছিল।

জীববিজ্ঞানী এতক্ষণ চুপ করে এদের কথা শুনছিল, এবার সে বলল— আর দু'একবারের বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে না। এই সৃষ্টিচক্র শেষ হয়ে আসছে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তসীমায় কয়েকটি নীহারিকা নিভে যেতে শুরু করেছে। সময় নেই।

ঐতিহাসিক সামান্য হাসলো -কে বলল সময় নেই? নতুন সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আবার সময় শুরু হবে। এইরকমই তো চলছে—

-কিন্তু আমরা—

—আমরা থাকবো না। তাতে কি? অন্য পরিদর্শক আসবে। তারা থাকবে। এবার চল হে স্থপতি, তোমাকে তো আবার ফিরে এসে কাজ শুরু করতে হবে।

তিন টুকরো মেঘের মত ভেসে তারা উঠে গেল নক্ষত্রযানের দিকে। যানে প্রবেশের মুখে তিনজন থেমে একবার পেছন ফিরে তাকাল।

দিগন্ত থেকে দিগন্ত অবধি বরফ পড়ে আছে প্রাচীন গ্রহটির বুকে। সূর্যকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, কিন্তু রৌদ্রে কোনো তাপ নেই। গ্রহের অক্ষকে বাঁকিয়ে যাবে। সরাসরি সূর্যের আলো আসবার ব্যবস্থা করতে হবে। বরফ গলে যাবে, আবার সৃষ্টি হবে সমুদ্র আর নদী। জীববিজ্ঞানীর কৌশলে আবার আসবে প্রাণ সার্থকতার দিকে নতুন যাত্রা। ভয় কি? সময় অনেক আছে।

স্থপতি মুগ্ধ চোখে বরফের ওপর আলো পড়ে রামধনু তৈরি হয়েছে তাই দেখছিল। সে বলল—আচ্ছা ঐতিহাসিক, তুমি তো অনেক, অনেক পুরনো খবর রাখো। এই সমস্ত জগৎ-ব্যাপারটা কি করে চলছে বলতে পারো? এই যে আমরা ঘুরে ঘুরে কাজ করে চলেছি, কার নির্দেশে? কে করাচ্ছে? এই যে সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হচ্ছে, নীহারিকা জন্মাচ্ছে আবার নিভে যাচ্ছে বিশ্বের সুদূরতম

প্রান্তে, গ্রহে গ্রহে প্রাণ বিকশিত হচ্ছে, ফ‍ুল ফ‍ুটছে—কার পরিকল্পনায় ?

ঐতিহাসিক স্পষ্টতই বিব্রত বোধ করল। খ‍ুব আস্তে আস্তে সে বলল—জানি না ভাই, সত্যিই জানি না। হয়তো আমাদের বিকাশ তদারক করার জন্য পরিদর্শকেরা রয়েছেন, তারও ওপরে আবার অন্য কেউ। দৃশ্যমান বিশ্বেরই বা কতটুক দেখেছি আমরা ? শ্রদ্ধাবান হও, বিশ্বস্ত হও। পরম জানা বলে কিছ‍ু নেই, পরম জানায় পৌঁছনো যায় না।

পৃথিবী অপেক্ষায় রইল, তারা ফিরে গেল নক্ষত্রলোকে।

মতঙ্গাশ্রমে শবরী

সেদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে জাগ্রত হয়ে শবরী কুটিরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। ভগবান মরীচিমালীর প্রভাব এখনো মতঙ্গবনকে স্পর্শ করে নি। কেবলমাত্র উদয়াচল প্রান্তে সামান্য লোহিতাভা আসন্ন দিনের সূচনা করছে। মাতৃদ‍ুগ্ধতৃপ্ত গোবৎসের মত কয়েকখণ্ড শ‍ুভ্র মেঘ ঋষ্যমূক পর্বতের ক্রোড়ে শয়ন করে রয়েছে। প্রভাতের স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে মৃদ‍ু চন্দনের গন্ধ।

কুটির ত্যাগ করে শবরী মৃদ‍ু পদবিক্ষেপে অদূরবর্তী পম্পা সরোবরের তীরে এলেন। শান্ত, নিস্তরঙ্গ পম্পার জলে বিম্বিত হয়েছে প্রভাতী তারার ছবি। দেবতাদের স্মরণ করে হ্রদের জলে ম‍ুখ প্রক্ষালন করলেন শবরী। শীতল জলের স্পর্শে শরীরে রোমাঞ্চ জাগে, মন প্রফ‍ুল্ল হয়। সঙ্গে আনা শ‍ুচিবস্ত্র পরে পূর্বাস্য হয়ে শবরী ইন্দ্রাদি দশদিকপালের স্তব করলেন, পৃথিবীতে যেখানে যত জীব আছে তাদের মঙ্গলকামনা করলেন, পূজা করলেন মাতঙ্গ ম‍ুনি ও তাঁর প্রয়াত শিষ্যদের। মনে মনে কামনা করলেন—হে জগৎসংসারের কারণস্বরূপ দেবাদিদেব ! বহ‍ুদিন তপস্যা করলাম, তব‍ু তোমাকে চিনতে পারলাম না। কঠোর পরিশ্রমে ঋষিদের সেবা করেছি, সাহায্য করেছি যজ্ঞান‍ুষ্ঠানের। মেঘাবৃত আকাশের মধ্যে একটিমাত্র দৃশ্যমান তারকার মত এই সংশয়াচ্ছন্ন জীবনে তুমিই ছিলে একমাত্র আলোর উৎস। সারাজীবনের দ‍ুশ্চর সাধনাতেও তোমার প্রকৃত পরিচয় আমার সামনে প্রকট হল না। বেশ, এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তাই হোক। দ‍ুরপনেয় তমসার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাক তোমার স্বরূপ। আজ এই পবিত্র আশ্রম চিরতরে ত্যাগ করে আমি যাত্রা করব অনন্তের পথে। যেখানেই থাকো, আশীর্বাদ করো যেন আমার যাত্রা স‍ুগম হয়। আমার আত্মাকে তুলে দিলাম তোমার মঙ্গলময়ের হাতে।

প্রার্থনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যোদয় ঘটল। পম্পার জলে কে যেন মায়াবলে গলিত স‍ুবর্ণ ঢেলে দিয়েছে। নির্ভয়ে বিচরণকারী মৃগযূথ জলপান করতে আসছে সরোবরে। মন্থর বাতাসে হিল্লোলিত হচ্ছে শরবন। শবরীর মনে হল কি এক আনন্দের প্রত্যাশায় যেন পম্পার সমগ্র পশ্চিম তীরের অরণ্য, পর্বত ও প্রকৃতি দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে। এখানে আজ যিনি আসবেন তাঁর সংবাদ কি এরা পেয়ে গিয়েছে ?

কল্পব্যাপী তপস্যার অন্তে মতঙ্গাশ্রমের সিদ্ধ মহর্ষিগণ তাঁকে বলেছিলেন—শবরী, আমাদের পৃথিবীবাসের কাল শেষ হয়েছে। আমরা অগ্নিপ্রবেশ করে

দিব্যধামে গমন করব। তুমি তার আয়োজন করো।

কাতর হয়ে শবরী বললেন—আর্যগণ! অনন্যমনা হয়ে আজীবন আপনাদের সেবা করেছি, এই তপোবনের পরিচর্যা করেছি। এই আমার সম্পূর্ণ জগৎ। আপনারাই আমার একমাত্র আরাধ্য। আপনারা দিব্যধামে প্রস্থিত হলে একাকিনী আমি এই শূন্য আশ্রমে কিসের প্রত্যাশায় জীবনধারণ করব? আমাকে আপনাদের সঙ্গী করে নিন—

মতঙ্গের এক প্রধান শিষ্য বললেন—ভগিনি! বিচলিত হয়ো না। তোমার কর্ম শেষ হতে সামান্য বাকি। কিছুদিনের মধ্যেই ইক্ষ্বাকুকুলতিলক রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণের সঙ্গে এই আশ্রমে পদার্পণ করবেন। এই দুই ভ্রাতা স্বয়ং বিষ্ণুর অংশ, এঁদের দর্শনে শত অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তুমি যথাসাধ্য আতিথ্যদান করবে। তারপর তোমার মুক্তি।

ঋষিরা প্রাত্যহিক হোমযজ্ঞাদি করলেন, বনপুষ্প অঞ্জলিতে নিয়ে উপহার দিলেন প্রত্যক্‌স্থলীর বেদীতে, নতুন বল্কল ধারণ করে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করে দিব্য বিমানে স্বর্গারোহণ করলেন।

শবরী আজন্ম তপশ্চারিণী এবং তপোবনের প্রশান্তিতে অভ্যস্ত। কিন্তু ঋষিরা প্রগত হবার পর যে নিঃসীম একাকীত্ব তাকে গ্রাস করল তা তিনি পূর্বে কখনো কল্পনাও করেন নি। যে পম্পাতীর সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে গভীর নিশীথকাল পর্যন্ত মধুর সামগান, যজ্ঞে আহুতিদানের মন্ত্রোচ্চারণ এবং বেদের ব্যাখ্যার শব্দে মুখরিত থাকত, সেই স্থান এখন মরুবৎ নির্জন। ঋষ্যমূক পর্বতের দিক থেকে বয়ে আসা শীতল বাতাস আশ্রমের বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়ে করুণ স্বরে বয়ে যায়। অপরাহ্নের অলস মুহূর্তগুলি হ্রদের জলে ভ্রাম্যমাণ সারসের ক্রেঙ্কারধ্বনিতে নির্জনতর হয়ে ওঠে। আকাশপথে সূর্যের স্থান-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অদূরে পর্বতের গায়ে আলোক এবং ছায়ার বিচিত্র খেলা চলে। শেষে দিনান্তে দিনকর অস্তমিত হলে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে আশ্রমকাননে। পূর্বের মত বনস্থলী আর ঋষিদের সমবেত কণ্ঠের সন্ধ্যাবন্দনায় মন্দ্রিত হয়ে ওঠে না। একাকিনী শবরী কুটিরদ্বারে বসে তাকিয়ে দেখেন নিশার নেত্রের মত খদ্যোতের দল জ্বলছে নিবছে তমসার পটে। এইসব নিভৃত নির্জন, বিষণ্ণ প্রহরে তাঁর মনে পড়ে যায় প্রায় বিস্মৃত শৈশবে শেষবারের মত দেখা জননীর স্নেহার্দ্র মুখ, শৈশবের অর্থহীন ক্রীড়ার প্রিয় সঙ্গিনীদের। আজ এই স্বজনহীন বিশাল চরাচরে তিনি একা পার্থিব জীবনের শেষ ক'টি মুহূর্তের গণনায় রত। কোথায় গেলেন সেই স্নেহময়ী জননী? আজ যেন তাঁর কথাই বড় বেশি করে মনে আসছে। হঠাৎ মনে হচ্ছে হয়তো বা আজীবন দুরূহ তপশ্চর্যার চেয়ে জননীর স্নেহের মূল্য কিছুমাত্র কম ছিল না। আর একবার তাঁর মুখখানি দেখা যায় না?

কুটিরের পাশে একটি বৃক্ষে কোনো নিশাচর পাখি ডানা ঝটপট করে উঠল! শবরী তখন রাত্রির আহার করবার জন্য নবোদ্গত কদলীপত্রে একটি পাকা রসাল এবং একটি অমৃতফল নিয়ে বসেছিলেন। তাঁর মনে হল যেন বা শুষ্কপত্রের ওপর কার পদশব্দ। নিরুদ্ধশ্বাসে তিনি প্রশ্ন করলেন—কে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃক্ষ থেকে একটি শুক পাখি নেমে এসে তাঁর সামনে

বসল। প্রণাম করে বলল—মা, আমি এক পরিব্রাজক পক্ষী। লবণ, দধি, স্বাদু ও ক্ষীর সমুদ্রেরও পরপারে বিচিত্র সব দেশ আমি ভ্রমণ করেছি। বর্তমানে বয়সের ভারে আর ভ্রমণ করতে পারি না, তোমার কুটিরসংলগ্ন এই বৃক্ষে বাস করি। তুমি একা থাকো মা, আমি প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা এসে তোমার সঙ্গে গল্প করে যাব।

শবরী আদর করে শুক পাখিটিকে একটি অমৃতফল খেতে দিলেন। পাখি তৃপ্ত করে খেল। শবরী প্রশ্ন করলেন—তুমি বহুদর্শী, পৃথিবীতে বিচিত্র ব্যাপার কি কি দেখেছ?

শুক বলল- মা, বাল্যকাল থেকেই পবনের বরে আমি সর্বত্র গমন করতে পারি। আকাঙ্ক্ষা ছিল জগৎব্যাপারের সীমা প্রত্যক্ষ করব। কিন্তু আজীবন ভ্রমণ করেও আমি জগতের সীমা খুঁজে পাই নি। কত কি অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি ' জানো মা, ইক্ষু সমুদ্রের পরপারে রয়েছে এক সুরম্য বিশাল গৃহ। গরুড় সেখানে বাস করেন। তার পাশে এক পর্বতশৃঙ্গ থেকে মন্দেহ নামে রাক্ষসরা সারারাত্রি ঝুলে থাকে, সূর্যোদয় হলেই তারা গতপ্রাণ হয়ে সমুদ্রে পতিত হয়, আবার নিশাকালে প্রাণ পেয়ে পর্বতশৃঙ্গে আশ্রয় করে।

কোনোদিন বা শুক বলে জলোদ সাগর থেকে উদ্‌গত ভয়ঙ্কর হয়মুখের কথা, যেখানে সমুদ্রস্থ আগ্নেয়গিরি থেকে নিরন্তর বাড়বানল নির্গত হচ্ছে। কখনো বলে দক্ষিণ সমুদ্রের অঙ্গারকা রাক্ষসীর কথা, যে ছায়া দ্বারা আকর্ষণ করে প্রাণীদের ভোজন করে।

শবরী বৃত্তান্ত শুনে বিস্ময়বোধ করেন। শুক বলে—কেন মা, তোমার নিকটেই যে ঋষ্যমূক পর্বত, তাও এক বিস্ময়। ব্রহ্মার বরে ঋষ্যমূকের শিখরে নিদ্রাগত হয়ে স্বপ্নে যে ব্যক্তি যা ধনসম্পদ এবং ঐশ্বর্য দেখে, জাগ্রত হয়ে সেই সমুদয় ঐশ্বর্য সে লাভ করে।

সকালে শুক বৃক্ষের আশ্রয় থেকে খাদ্যের সন্ধানে উড়ে যায়। বনে বনে ভ্রমণ করে অপরাহ্ণে আবার ফিরে আসে। একদিন সন্ধ্যায় শবরীর কাছে এসে শুক বলল—মা, আজ খাদ্যান্বেষণে আমি ক্রৌঞ্চারণ্যে গিয়েছিলাম। সেখানে এক অদ্ভুত ঘটনা দেখে এলাম। ক্রৌঞ্চারণ্যে দনু নামে এক রাক্ষস ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের শাপে বিকৃতদর্শন কবন্ধরূপে বাস করত। আজ রাম ও লক্ষ্মণ নামে দুই ভ্রাতা দনুকে বধ করে তার শাপমোচন করেছেন। আমি পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে এই ঘটনা দেখলাম।

শবরী শুনেই চমকিত হয়ে বললেন—শুক, তাঁরা কোন্‌দিকে গেলেন দেখেছ কি?

- হ্যাঁ মা। তাঁরা এই মতঙ্গাশ্রমের দিকে আসছেন। গতি দেখে মনে হল দু'-তিনদিনের মধ্যে এসে পৌঁছবেন।

নিশ্বাস মোচন করে শবরী বললেন—শুক, এই তপোবনে আমার দিন ফুরিয়ে এল। ঋষিরা বলে গিয়েছিলেন রাম আর লক্ষ্মণ এখানে এলে তাঁদের পরিচর্যা করবার পরই আমার মুক্তি হবে। আমার প্রতীক্ষা বোধকরি সমাপ্ত হতে চলেছে।

শুক পাখির চোখ বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠল। সে বলল—মা, তোমার মত আমিও জগতে একা। অল্পবয়সী পাখিরা আমার মত স্থবিরের সংসর্গ বাঞ্ছনীয় বলে

মনে করে না। তুমি চলে গেলে একা আমার দিন কি করে কাটবে?

এর কি উত্তর শবরী দেবেন? তিনি ভাল করেই জানেন একাকীত্ব কাকে বলে। বন্ধুহীন, একক এই পাখিটির জন্য তিনি গভীর মমতা অনুভব করলেন। কিন্তু তাঁকে তো চলে যেতেই হবে।

গতকাল সন্ধ্যাবেলা শুক বিষণ্ণমুখে শবরীর কাছে এসে বসল। শবরী বুঝলেন সে কি সংবাদ নিয়ে এসেছে, তবু নিজে কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। একটু পরে শুক বলল—মা, রাম-লক্ষ্মণ মতঙ্গাশ্রমের প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। আগামীকাল দ্বিপ্রহরে এই স্থানে পৌঁছবেন মনে হয়। অতিকায় একটি পনস বৃক্ষের নিচে তাঁদের বিশ্রামরত দেখে এলাম।

শবরী গভীর চিন্তায় মগ্ন রইলেন, কথা বললেন না।

একটু পরে শুক আস্তে আস্তে বলল—মা, আজ আমাকে ফল দেবে না?

এখন চতুর্দিকের এই সূর্যকরোজ্জ্বল অরণ্যানী, ঋষ্যমূক পর্বতের প্রতিবিম্ব-ধারী পম্পার শান্ত নীল জল, তৃণাচ্ছাদিত মনোরম আশ্রমপ্রাঙ্গণ দেখে শবরীর মনে হল—আজ রাম আসবেন, তাই প্রকৃতি যেন নূতন সজ্জা পরেছেন। রাম-লক্ষ্মণের সেবায় নিবেদন করার জন্য সুপক্ক ফলের সন্ধানে নিকটবর্তী সহকার বৃক্ষের কাছে গিয়ে দেখলেন তার শাখায় উদাস হয়ে বসে আছে শুক।

—এ কি শুক! তুমি আজ খাদ্য আহরণে যাওনি?

মাথা নিচু করে শুক বলল—না মা, আজ আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

ফল সংগ্রহ করে এনে কুটিরে রাখলেন শবরী। পম্পার জলে নেমে পদ্মবন থেকে পত্রপুট তৈরি করে আনলেন। এতে তিনি রাম আর লক্ষ্মণকে তৃষ্ণার জল এনে দেবেন। পরে রামের পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্য যখন পুষ্পচয়ন করছেন, দেখলেন, অকস্মাৎ বনের প্রতিটি পুষ্প, পত্র ও পল্লব যেন হৃদ্‌স্পন্দনের তালে তালে স্পন্দিত হতে শুরু করেছে।

শবরী বুঝতে পারলেন মতঙ্গাশ্রমে মহাপুণ্যবান কারো আগমন ঘটেছে, যাঁর পায়ের স্পর্শে শিহরিত হচ্ছে পত্রপুষ্প। মুখ তুলে তিনি দেখতে পেলেন অরণ্যপথে রাম আসছেন। নবদূর্বাদলশ্যাম গাত্রবর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু, আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্র, দৃষ্টিনন্দন তাঁর অবয়ব। আশ্রমপ্রাঙ্গণে এসে রাম দাঁড়াতেই শবরী দ্রুত অগ্রসর হয়ে দুই ভাইয়ের চরণবন্দনা করলেন। রাম দক্ষিণহস্ত তুলে বললেন —স্বস্তি। বোধহয় আপনিই শবরী? দিব্যধামে গমনের পূর্বে দনু আপনার কথা আমাদের বলে গিয়েছিল। আপনার সব মঙ্গল তো? তপস্যায় কোন বিঘ্ন নেই?

প্রৌঢ়া শবরী করজোড়ে বললেন—রঘুনন্দন! আপনি যে অনুগ্রহ করে আমাকে দেখা দিলেন, এতেই আমার তপস্যার সিদ্ধিলাভ হল।

শবরী দুই ভাইকে যত্ন করে নিয়ে গিয়ে নিজের কুটিরের মধ্যে বসালেন। আহৃত ফলমূল দিলেন খেতে, পর্ণপুটে জল এনে দিলেন পম্পা সরোবর থেকে। আহারান্তে তৃপ্ত রাম বললেন—চারুভাষিণী! আপনি বহুদিন এই আশ্রমে বাস করেছেন। আপনার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করুন।

অবনতমুখী শবরী বললেন—আর্য! আমি সামান্যা ব্রহ্মচারিণী। এই

আশ্রমের বাইরে কখনো পদার্পণ করি নি, জাগতিক অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আমার নিতান্তই অল্প। কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার সম্প্রতি লব্ধ একটি অনুভূতির কথা জানাতে ইচ্ছা করছে।

রামচন্দ্র স্মিতমুখে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

শবরী বললেন এই আশ্রম থেকে ঋষিগণ যখন দেহত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন তখন আমার মনে বিষম খেদ উপস্থিত হয়েছিল। আজন্ম নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করেছি, গুরুসেবা করেছি, যথাশাস্ত্র ধর্মপালনেও ত্রুটি করি নি। কিন্তু কই, আমার তো ঈশ্বরলাভ হল না! ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিদের কাছে ঘোর তমসার পরপারে যে আদিত্যবর্ণ পুরুষের কথা শুনেছি, যাঁকে জানলে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাঁর প্রসাদ তো জীবনে নেমে এল না! বড় কষ্টে ছিলাম।

রাম তাঁর বিশাল দুই চোখ তুলে বললেন—এখন কি মনে হচ্ছে আর্যা?

সামান্য ইতস্তত করে শবরী কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললেন—জানি না এ কথা বলা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হচ্ছে কিনা, কিন্তু ঋষিগণ প্রস্থান করার পর যে প্রশান্ত একাকীত্বের মধ্যে কাটিয়েছি, তা আমাকে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ দিয়েছে। এখন আমার মত ভিন্ন।

--কি রকম?

--আমার জীবন বোধহয় একেবারে বৃথা নষ্ট হয় নি রঘুনন্দন। সাফল্য অসাফল্য, বন্দিত্ব বা মুক্তি সবই তো দৃষ্টিকোণের পার্থক্য মাত্র। একাকী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তিত হল, অনুধাবন করলাম এতদিন ভ্রান্ত অন্বেষণে ফিরেছি। ঈশ্বর কি একখণ্ড শিলা, যে তাঁকে প্রত্যক্ষ করব? তাঁর সৃষ্টি থেকে কি তিনি পৃথক যে তাঁকে যজ্ঞবেদীতে আবির্ভূত হতে দেখব? যুগব্যাপী বনবাসকালে দেখেছি পূর্বাচলে আশ্চর্য সুন্দর অরুণোদয়, পম্পার জলে পূর্ণচন্দ্রের রৌপ্যময় প্রতিবিম্ব, দেখেছি ঋতুচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বনস্থলীকে নব নব বেশধারণ করতে। স্বপ্নে বিস্মৃত প্রিয়জনকে দেখে হেসে উঠেছি, জলপানরত হরিণ আমার পদশব্দে সচকিত হয়ে তাকিয়েছে—তার চোখে দেখেছি পবিত্র সারল্য। রাত্রিতে প্রস্ফুটিত পুষ্পের সুগন্ধে আশ্রমকাননের পরিবেশ যখন মন্থর হয়ে উঠেছে, তার মধ্যে অনুভব করেছি ঈশ্বরের উপস্থিতি। এই তো পাওয়া, রঘুনন্দন! এই পৃথিবীর প্রতিটি তৃণে, প্রতি ধূলিকণায় তিনি আছেন। আমি অন্ধ, মূঢ়, তাই এতদিন বুঝতে পারি নি।

রাম উৎফুল্লমুখে করজোড়ে বললেন—ধন্য! আপনারই প্রকৃত ঈশ্বরলাভ হয়েছে। আপনি আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

প্রতিনমস্কার করে শবরী বললেন—এবার আমাকে অনুমতি দিন।

চন্দন ও উদুম্বর কাষ্ঠের অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করে শবরী সেই কুণ্ড তিন-বার প্রদক্ষিণ করলেন, তারপর ইষ্টনাম উচ্চারণ করে হাসিমুখে অগ্নিতে প্রবেশ করলেন।

এতদিনে মতঙ্গাশ্রম প্রকৃতই জনহীন হয়ে গেল।

রামের ত্বরা রয়েছে, তিনি দনুর পরামর্শে ঋষ্যমূকে সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করতে যাবেন। অগ্নিকুণ্ডকে নমস্কার করে তিনি লক্ষ্মণের সঙ্গে পম্পার পশ্চিম তীর ধরে ঋষ্যমূকের দিকে প্রস্থান করলেন।

কেউ লক্ষ্য করল না, রাম চলে যেতেই নিকটের বৃক্ষশাখা থেকে একটি বৃদ্ধ স্থবির শুকপাখি উড়ে এসে অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দিল।

পড়ে রইল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি পর্ণকুটির, প্রত্যক্‌স্থলীতে উৎসর্গীকৃত কিছু পুষ্প এবং আশ্রমের ধূলিতে রামের পদচিহ্ন।

মতঙ্গাশ্রম প্রকৃতই নির্জন হয়ে গেল।

শান্তা

উচ্চাবচ পথে শিবিকার সারি চলেছে অযোধ্যার দিকে। নিদাঘমধ্যাহ্নের আলস্য-জড়িত তন্দ্রালু প্রহর নির্জনতর হয়ে উঠেছে বাহকদের তালবদ্ধ সম্মিলিত 'হু-হুম্-না' ধ্বনিতে। সেই শব্দে এবং শিবিকার দোলায় প্রত্যেক আরোহীরই সামান্য নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে। কেবল সারির মধ্যভাগে একটি সুন্দর স্বর্ণখচিত শিবিকায় শান্তা এলায়িত ভঙ্গিমায় উপাধানে ভর দিয়ে বসে। হাতে তাঁর একটি তালপত্রের ব্যজনী। গ্রীষ্মবোধ হলে সেটি আন্দোলিত করে স্বস্তি পাবার চেষ্টা করছেন। তাঁর দৃষ্টি শিবিকার আবরণীর অবকাশ দিয়ে বাইরের ঊষর প্রান্তরে নিবদ্ধ।

একই শিবিকাতে শান্তার সম্মুখে বসে তাঁর একান্ত পরিচারিকা সুরমা। সে তাকিয়ে রয়েছে শান্তার মুখের দিকে।

সযত্নকৃত প্রসাধন রাজকুমারীর চোখের গভীর ক্লান্তিকে গোপন করতে পারে নি। তাঁর সমস্ত অবয়বে, দৃষ্টিতে, উপাধানের ওপর বাম হাতটি রাখার করুণ ভঙ্গিতে হতাশা আর জীবনের প্রতি বীতস্পৃহা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। বিশাল যে দুই নয়নের খ্যাতি অঙ্গরাজ্য অতিক্রম করে সমতট কিংবা প্রাগ্‌জ্যোতিষ অবধি পৌঁছে সেখানকার কবিদের নবতর কাব্যরচনার প্রেরণা দান করেছিল সেই চক্ষুদ্বয় মলিন দর্পণের মত নিষ্প্রভ।

সুরমা বলল—প্রিয় সখি, অযোধ্যা আর বেশি দূর নয়। এবার একটু হাসো, একটু প্রাণবন্ত হও। মুখের যা দশা করেছো, দশরথের মহিষীরা ঠিক অনুধাবন করবেন তুমি সুখী নও। তাতে তোমার পিতার অবমাননা হবে –

চকিতা হয়ে বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে মুখমার্জনা করলেন শান্তা। সত্যি, তাঁরা অতিথি হয়ে চলেছেন দশরথের রাজধানীতে, তাঁর আচার-ব্যবহারের কোনো বৈলক্ষণ্য লোকাপবাদের জন্ম দিতে পারে। সে জনশ্রুতি পিতা লোমপাদের কানে পৌঁছলে তিনি মর্মাহত হবেন।

সুরমার দিকে তাকিয়ে শান্তা বললেন—তুই তো জানিস সুরমা, আমি কি ইচ্ছে করে অমন করি? আমার যে ভেতর থেকে সব শুকিয়ে গিয়েছে—

-প্রিয় সখি, সব কি মনের মত হয়? আমাদের সবচেয়ে নিবিড় সম্পর্ক আমাদের নিজের দেহের সঙ্গে। নিজের দেহটাই কি নিজের মনোমত হয়? এই যে আমি কুরূপা, আমি কি তার জন্য মুখ ম্লান করে থাকি? এ বিধির নির্দেশ—

—বিধাতার নির্দেশ জেনেই তো কখনো অভিযোগ করি নি।

—অভিযোগ করো নি বটে, কিন্তু মনের মধ্যে গ্লানি পোষণ করে রেখেছো। আচ্ছা, সত্যি কি স্বামীকে তুমি—

শিউরে উঠে শান্তা বললেন—ছিঃ, ও কথা বলিস নে সুরমা। আমি আর্যকন্যা, স্বামী আমার পরমারাধ্য দেবতা, তিনি ছাড়া আমার আর কি আছে বল? ওঁর সম্বন্ধে কোনো বিরূপ কথা শোনাও পাপ।

—তাহলে? তাহলে তোমার মনে আনন্দ নেই কেন?

শান্তা চুপ করে রইলেন। এ কথার কি উত্তর দেবেন তিনি? নিজেই তো ভাল করে জানেন না এর উত্তর।

দিগন্তে কোনো একটি গ্রাম দেখা দিয়েছে। জনপদের চিহ্নরূপে পথের পাশে দু'একটি সহকার তরু, ইতস্তত ভ্রাম্যমান কয়েকটি গৃহপালিত পশু। দিগন্তলগ্ন কুটিরশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলে বসে রইলেন শান্তা।

শিবিকার সারি এগিয়ে চলল অযোধ্যার দিকে।

বেশ কিছুদিন পূর্বের কথা।

অঙ্গদেশ সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ এক রাজ্য। মহাপরাক্রমশালী নৃপতি লোমপাদেব শাসনে প্রজারা আনন্দেই আছে।

কিন্তু দৈব কারো করায়ত্ত নয়। শান্তিতে পূর্ণ অঙ্গরাজ্যের ওপর ঘনিয়ে এল দুর্ভাগ্যের কৃষ্ণচ্ছায়া। পরপব কয়েক বৎসব বৃষ্টি হল না, সারা দেশেব কৃষিযোগ্য ভূমি নীরস, পতিত হয়ে রইল দীর্ঘদিন। আনুষঙ্গিক বিপদরূপে এল মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ। লোমপাদ বিষণ্ণ হয়ে দৈবজ্ঞ পণ্ডিতদেব আহ্বান কবলেন।

দৈবজ্ঞেরা গণনা করে বললেন—রাজন্, আহাবে-বিহারে, প্রমোদে ও বিলাসে মানবের বহু ত্রুটি ঘটে। সে ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত করতে দেবগণ মানুষেব জীবনে দুর্বিপাক প্রেরণ করেন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

সম্প্রতি লোমপাদ প্রজাপালনের চেয়ে ব্যসনে অধিক মনোযোগ নিয়োগ করে-ছিলেন। ব্রাহ্মণদের এই পরোক্ষ ভর্ৎসনা তাঁকে আঘাত করল। কিন্তু ধীমান নৃপতি এ ইঙ্গিত প্রাপ্য বলে মাথা পেতে নিয়ে প্রশ্ন করলেন—কারণ নির্দেশ করলেন, এবার নিরসনের পথ নির্দেশ করুন।

প্রধান দৈবজ্ঞ বললেন—মহীপাল, মহর্ষি বিভাণ্ডকের ঋষ্যশৃঙ্গ নামে তপোরত এক মহাতেজা পুত্র আছেন। শিশুর মত তাঁর চিত্ত সরল। আজন্ম তিনি পিতার কাছে অরণ্যে প্রতিপালিত। তপস্যার দ্বারা তিনি ত্রিভুবন জয় করবার ক্ষমতা রাখেন। ঋষ্যশৃঙ্গকে যদি অঙ্গদেশে আনতে পারেন তাহলে এই দুর্বিপাক কেটে যাবে।

আনবার উপাযও তাঁরা বলে গেলেন।

লোমপাদ উত্তম আহার্য, পানীয়, মূল্যবান বস্ত্র ইত্যাদি দিয়ে কয়েকজন বারবিলাসিনীকে প্রেরণ করলেন ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসার জন্য। পণ্যা রমণীরা এ ধরনের কর্মে অভিজ্ঞ, তারা বিভাণ্ডকের অরণ্যাশ্রমে গিয়ে তপোরত ঋষ্যশৃঙ্গের সামনে মধুর নৃত্যগীতাদি আরম্ভ করল। কার্যবশত বিভাণ্ডক সে সময় আশ্রমে ছিলেন না। নিষ্কলুষচিত্ত ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রী-পুরুষের প্রভেদ বুঝতেন না—এমন আহার্যও তিনি কখনো আস্বাদ করেন নি, এমন মধুর গীতও শ্রবণ করেন নি। মায়াবিনীরা যখন তাঁকে অঙ্গরাজ্যে আগমনের আমন্ত্রণ জানালো, পিতার

প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা না করেই তিনি সম্মত হয়ে সঙ্গে চললেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গদেশের সীমানায় পদার্পণ করা মাত্র কৃষ্ণবর্ণ জলদরাশিতে আকাশ সমাচ্ছন্ন হয়ে প্রবল বারিপাত শুরু হল। লোমপাদ স্বয়ং এসে পাদস্পর্শ করে ঋষ্যশৃঙ্গকে অভ্যর্থনা জানালেন। রাজঅতিথিশালায় পরম সম্মানে কিছুদিন কাটালেন ঋষ্যশৃঙ্গ।

লোমপাদ দূরদর্শী নৃপতি। অতিথি চিরকালের নয়, একদিন না একদিন তাঁকে ছেড়ে দিতেই হবে। ঋষ্যশৃঙ্গ ফিরে গেলে আবার অনাবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হবে কিনা তার স্থিরতা কি? আতিথ্যকে স্থায়ী করার বাসনায় তিনি একটি কূটনৈতিক প্রস্তাব করলেন।

স্বীয় কন্যা শান্তাকে বিবাহ করবার জন্য লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গকে অনুরোধ করলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গ তখন অতিথিশালায় রাজকীয় ভোগসুখের আস্বাদ পেতে আরম্ভ করেছেন। লঘু প্রমোদের পঙ্কে তিনি নিমজ্জিত। এ ছেড়ে আবার সেই কঠোর তপস্যা? আবার অরণ্যচারী জীবনের ক্লেশবরণ?

ঋষ্যশৃঙ্গ সম্মত হলেন। বিবাহ হয়ে গেল।

কিন্তু শান্তার অনুমতি নেবার কথা কেউ ভাবে নি। বিবাহের প্রসঙ্গে পিতার ইচ্ছাই শেষ কথা, কন্যার অনুমতি আবার কে কবে নিয়েছে? আর এমন মহাতেজা জামাতা, কন্যার আপত্তিই বা হবে কেন?

শান্তা রক্তমাংসের নারী, উপরন্তু রাজকন্যা। প্রথম যৌবনের মদির প্রহরগুলিতে শান্তা স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বর্ণসজ্জায় ভূষিত এক কান্তিময় রাজকুমারের বাহুতে যার অমিত শক্তি, তরবারিতে ক্ষিপ্র বিদ্যুৎ। পরিবর্তে তিনি স্বামীরূপে পেলেন এক তপঃকৃশ মৃদুস্বভাব স্বল্পবাক যুবককে কিছুকাল পূর্বেও যে নারী-পুরুষের প্রভেদ বুঝত না।

সরলস্বভাব অনভিজ্ঞ স্বামী বাসররাত্রিতে একবার স্পর্শও করল না তাঁকে। শান্তাই নির্লজ্জের মত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—আর্যপুত্র আমাকে কি আপনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন নি?

চমকিত হয়ে ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—না না, সে কি কথা রাজকুমারী! তোমার রূপে বনের পশুও হিংসাবৃত্তি ত্যাগ করে। তা নয়—

—তবে? আজকের এই রাত্রি কি আর প্রত্যাগমন করবে? আপনি আমাকে একবারও সম্ভাষণ করলেন না। কেন আর্যপুত্র?

ঋষ্যশৃঙ্গ পুনরায় অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। প্রাসাদের দ্বারে যামঘোষ মধ্যরাত্রির ঘণ্টাধ্বনি করছে। গম্ভীর সেই শব্দে তাঁর অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল অরণ্যের নিভৃতে পর্বতের সানুদেশ থেকে পতনশীল জলপ্রপাতের মন্দ্রধ্বনি। মনে পড়ে গেল পিতা বিভাণ্ডকের অরণ্যাশ্রম, নিবিড় পল্লবজালের অবকাশে দৃশ্যমান দীপ্ত নীলাকাশ, শান্তিতে তৃণভোজনরত নিরীহ চিত্রল হরিণদের। মনে পড়ে গেল আশ্রমের প্রগাঢ় শান্তি, ফেলে আসা তাঁর অসমাপ্ত তপস্যা।

এই প্রথম ঋষ্যশৃঙ্গ অনুধাবন করলেন তিনি ভুল করেছেন। এই নাগরিক কোলাহলে পূর্ণ উদ্দেশ্যহীন অগভীর জীবন তাঁর নয়। একান্ত মনন এবং কঠিন তপস্যার মাধ্যমে জীবনের গভীরতর রহস্য উদ্ঘাটন করবার জন্য তাঁর জন্ম। সেই

সম্ভাবনার দ্বারেও তিনি নীত হয়েছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই বিশ্বরহস্যের স্বরূপ তাঁর সামনে উন্মোচিত হত। লোমপাদকে কি দোষ দেবেন? নিজের সাময়িক বিভ্রম এবং চিত্তচাঞ্চল্যের ফলেই আজ তাঁর এই বন্ধন। এ শৃঙ্খল তিনি নিজেই হাস্যমুখে বরণ করেছেন। অন্য কারো দোষ নেই।

বাসররাত্রি শেষ হয়ে গেল। শান্তার কবরী থেকে একটি পুষ্পও চ্যুত হল না; মর্দিত হল না কণ্ঠে প্রলম্বিত জাতিপুষ্পের মাল্য। তনুদেহ শিহরিত হল না আশ্লেষের রসে।

রাজজামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ অন্যমনে ভ্রমণ করেন প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে, উদাসীন বসে থাকেন শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত প্রমোদবাটিকায়। কখনো কখনো অকৃত্রিম উৎসাহে প্রমোদের প্রবাহে ভেসে যাওয়ার প্রচেষ্টা করেন।

বৃথা। সব বৃথা।

ভক্তের মনে নিরন্তর জাগরূক ইষ্টনামের মত তাঁর হৃদয়ে এসে পৌঁছতে থাকে অসমাপ্ত তপস্যার আহ্বান। কিন্তু আর তো ফিরে যাওয়া যায় না। তিনি স্বেচ্ছায় বিবাহ করেছেন, শান্তার প্রতি তাঁর কর্তব্য রয়েছে।

একদিন গভীর রাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে শান্তা দেখলেন ঋষ্যশৃঙ্গ শয্যায় নেই। দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত পশ্চাতে রেখে তিনি গবাক্ষের সামনে দণ্ডায়মান। শান্তাও নীরবে স্বামীর পশ্চাতে এসে দাঁড়ালেন।

গবাক্ষের মধ্য দিয়ে নৈশাকাশের একাংশ দৃশ্যমান। চন্দ্রহীন রাত্রিতে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটে উঠেছে আকাশের পটে। মধুঋতু আর দূরে নয়, চরাচরে শান্তিপ্রদ দক্ষিণপবন প্রবাহিত। তমসাময়ী রাত্রির আশ্চর্য সুন্দর স্তব্ধতা, দয়িতের নৈকট্য শান্তাকে বিহ্বল করল। ঋষ্যশৃঙ্গের বাহুতে করস্পর্শ করে প্রশ্ন করলেন—কি দেখছেন আর্যপুত্র?

সহসা করস্পর্শে বিস্মিত ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন -ওঃ, তুমি! কি দেখছিলাম জিজ্ঞাসা করছো? এসো, আমার পাশে এসে দাঁড়াও। ঐ দেখ আকাশে দিগন্তের কাছে প্রজ্বলন্ত কালপুরুষের অগ্নিসংকেত। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করো, মর্মরশব্দে মুখরিত তরুশ্রেণী, কলস্বনা প্রবাহিনী, নগরের সুপ্ত জনজীবন। এই আকাশ-বাতাস, এই জীবন আর ওই দূরতম তারকার একটি নিবিড় সংযোগসূত্র রয়েছে বলে আমার ধারণা। সবেরই মধ্য দিয়ে সৃষ্টির অন্তিম উদ্দেশ্য প্রকাশিত। বিচ্ছিন্ন হলে আর সৃষ্টির অর্থ কি?

শান্তা চুপ করে রইলেন। তিনি কি এমন অনুপম মধুরাত্রিতে এই নীরস আপ্তবাক্য শুনতে চেয়েছিলেন? তিনি এসব বোঝেন না।

এর কিছুদিন পরে দশরথ এসে তাঁদের অযোধ্যায় যাবার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। পুত্রকামনায় তিনি অশ্বমেধ এবং পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করাতে চান, এবং এ যজ্ঞের ভার দিতে চান ঋষ্যশৃঙ্গকে। লোমপাদ সম্মত হয়ে কন্যা ও জামাতাকে পাঠিয়েছেন অযোধ্যার দিকে।

গ্রাম নিকটবর্তী হলে বাহকদের প্রধান শান্তার শিবিকার সমীপবর্তী হয়ে করজোড়ে বলল—মা, বাহকেরা ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত। এই গ্রামে কোনো উদ্যানের ছায়ায় সামান্য বিশ্রাম করে আহারাদি সারলে ভাল হয়।

শান্তা অনুমতি দিলেন।

গ্রামে প্রবেশের মুখেই বনস্পতি পরস্পর জড়িত হয়ে দণ্ডায়মান। তার শীতল ছায়ায় শিবিকা নামিয়ে বাহকেরা কিছুদূরে সরে গিয়ে চিপিটক, দধি ও গুড় সহযোগে আহারে প্রবৃত্ত হল।

শিবিকা থেকে বেরিয়ে শান্তা সুরমাকে বললেন—চল্ সুরমা, আমরা ওই গাছটার নিচে গিয়ে বসি।

একটি বটবৃক্ষের শিকড়ের ওপর তাঁরা গিয়ে বসলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুরমা দাঁড়িয়ে উঠে বলল—প্রিয় সখি, তোমার স্বামী এদিকে আসছেন। আমি শিবিকায় ফিরে গেলাম।

সুরমা দ্রুত সরে গেল। ঋষ্যশৃঙ্গ এসে দাঁড়ালেন কাছে।

স্বামী-স্ত্রী কেউ কোনো কথা বলছেন না। বৃক্ষপল্লবে বাতাস মর্মরশব্দে উদাস সংগীত বাজাচ্ছে। অলস অপরাহ্ণে একটি নির্জন পাখির ডাকে বিবিক্ত হয়ে উঠেছে।

ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার পাশে বসলেন। একবার তাকালেন স্ত্রীর সুন্দর, আয়ত দুই চোখের দিকে। সহসা সস্নেহে বললেন—শান্তা, আমাকে ভুল বিচার কোরো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

অধোমুখে, নম্রস্বরে শান্তা বললেন—জানি আর্যপুত্র।

—আমি চেষ্টা করছি। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বোধহয় আমার দেবার নেই।

পূর্ববৎ ধীরস্বরে শান্তা বললেন—তাও জানি আর্যপুত্র।

শান্তা বুঝতে পারলেন জীবনটা এইভাবেই কাটবে। যোগী ভর্তার পরিমিত প্রেম, রাজপুরীর শতেক প্রমোদ, পিতার শূন্যগর্ভ সান্ত্বনা—কি মিথ্যা ও অর্থহীন অস্তিত্ব! যে মূল্যবান মণিখণ্ড তাঁর প্রাপ্য ছিল তার পরিবর্তে মূল্যহীন এক মৃন্ময় ক্রীড়নক নিয়ে সারাজীবন সুখী নারীর অভিনয় করে যেতে হবে।

অপরাহ্ণ গাঢ় হল। বাহকেরা বিশ্রামান্তে পুনরায় যাত্রা শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। শান্তা উঠে দাঁড়ালেন। কালক্ষেপ সমীচীন নয়। সম্মুখে দীর্ঘপথ বাকি।

শিবিকার সারি চলতে আরম্ভ করল অযোধ্যার দিকে।

নির্জন পাখিটি তখনো আকুল স্বরে ডেকে চলেছে।

সরমা

অপরাহ্ণ গাঢ় হয়ে এল।

সরমা বৈকালী কেশবিন্যাসে রত ছিলেন। নগরীর পশ্চিমদ্বার থেকে ভেসে আসা সন্ধ্যাবন্দনার সুর শুনতে পেয়ে চমকে বাতায়নপথে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন সূর্যের রক্তগোলক প্রায় দিগন্ত স্পর্শ করেছে। সমুদ্রের জলে তার উদ্ভাসিত স্বর্ণচ্ছটা। হঠাৎই এই দিনাবসানের ক্লান্ত, করুণ মুহূর্তটির সঙ্গে সরমা নিজের জীবনের এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পেলেন। তাঁর তো সমস্তই রয়েছে—তবু আজ এই লঙ্কাপুরীতে তাঁর মত নিঃসঙ্গ কে?

ছায়াচ্ছন্ন উদ্যানবীথিকার মধ্যে দিয়ে সরমা চললেন অশোকবনের দিকে।

লংকাপতি দশানন তাঁকে নিয়োগ করেছেন সীতার সঙ্গিনীরূপে। ব্যক্তিগত, প্রয়োজনের কিছু সময় ব্যতীত দিনের প্রায় সবটাই ব্যয় হয় সীতার কাছে। যদিও সরমা জানেন সীতার কোনো অপরাধ নেই, রাবণ তাঁকে বলপ্রয়োগ করে নিয়ে এসেছেন রামের প্রতি বৈরসাধনের উদ্দেশ্যে, তবু সীতার দর্শনমাত্রই তাঁর মনের গভীরে ক্রোধের উদ্রেক হয়। লংকার আসন্ন সর্বনাশের জন্য, তাঁর বর্তমান অবস্থার জন্য প্রকারান্তরে এই নারীটিই দায়ী।

রাবণ কৃপণ নন। অবসর বিনোদনের জন্য বহু ব্যয় করে অশোকবনকে সাজিয়েছেন। স্থানে স্থানে মণিময় মণ্ডপ, মরকতশ্যাম কুঞ্জবনের নিবিড় ছায়ায় ময়ূরেরা ভ্রাম্যমান। তীক্ষ্ণ ক্রেংকারধ্বনি উদ্যানের শান্তিকে সছিদ্র করে তুলছে। এরই মধ্যে একটি শিংশপা বৃক্ষের নিচে সীতা বসে রয়েছেন। তাঁকে বেষ্টন করে তুমুল কোলাহল করছে করালদর্শনা রাক্ষসীর দল। সরমাকে আসতে দেখে তারা সামান্য ব্যবধানে সরে বসল বটে, কিন্তু একেবারে স্থানত্যাগ করল না।

সরমা বললেন—বৈদেহি, আমি এসেছি। দ্বিপ্রহরে সম্যক ক্ষুধার সঙ্গে আহার করেছিলেন তো? আশা করি বিশ্রামের কোনো ব্যাঘাত হয় নি?

সরমাকে দেখে সীতার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তিনি বললেন—এস ভগ্নী। তুমি যতক্ষণ থাকো, ততক্ষণ এই বন্দীদশা তবু কিছুটা সহনীয় হয়। ক্ষুধা? না, ক্ষুধা ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দনকে আর একবার দেখব এই আশায় দেহটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, কাজেই সামান্য আহার করেছি। আর বিশ্রাম? এই অমানুষী ভয়ঙ্করীর দল কি আমাকে বিশ্রাম করতে দেয়?

সরমা বিরক্ত হয়ে অদূরে উপবিষ্টা রাক্ষসীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—বিকটা, সীতা লংকাপুরীর অতিথি। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক—তিনি আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। ওঁকে বিরক্ত করা আমাদের উচিত নয়।

সরমা রাবণের ভ্রাতৃবধূ। সাধারণ অবস্থায় তিনি লংকায় সর্বজনমান্য। কিন্তু বর্তমানে বিভীষণের প্রতি রাবণের মনোভাব কারো অজানা নেই। বিকটা উদ্ধত কণ্ঠে উত্তর দিল—আমরা কেউ সীতাকে কিছু বলি নি।

—কিন্তু ইনি তো সেই রকম বলছেন।

—উনি কেন কাঁদছেন কি করে বলব। আমি কেবল ওঁর আঙুলগুলি দেখে বলেছিলাম দারুচিনি ও তেজপত্র সহযোগে দধিপাক করে খেতে ভাল লাগবে।

দুর্মুখী বলল—আর আমি বলেছিলাম যে আভরণহীনা সুন্দরীকে পুষ্পহীন বৃক্ষের মত দেখায়। সীতার দুই কর্ণ ভেদ করে দুটি ভেক ঝুলিয়ে দিলে বেশ মানাবে।

সরমা তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সীতাকে বললেন—দেবি! এরা কাণ্ডজ্ঞানহীনা, এদের বাক্যে কর্ণপাত করবেন না।

মাথার ওপরে গাছের শাখায় কি একটি পাখি ডেকে উঠল। সীতা একবার ওপরের দিকে তাকালেন, তারপর পরিধেয় বসনের প্রান্ত আঙুলে জড়াতে জড়াতে বললেন—সরমা, কবে আমার মুক্তি হবে বলতে পারো? এই নিশাচরীদের দল, বাতাসে ভেসে আসা রক্তের গন্ধ—উঃ, মাঝে মাঝে মনে হয় এসবই বুঝি স্বপ্ন, বুঝিবা জনস্থানের কুটিরে গৃহকর্ম শেষ করে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখনই জেগে উঠে দেখব বেলা শেষ হয়ে এসেছে, বনশীর্ষে রক্তিম রৌদ্রের আভাস—স্বামী, দেবর

খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে আমাকে ডাকছেন। কবে আবার ফিরে যাবো সরমা?

—এ কথার কি উত্তর দেব দেবি? আপনার বন্দিত্ব বা মুক্তি কোনোটাই আমার ইচ্ছাধীন নয়।

অকস্মাৎ অদূরে ব্যাঘ্রগর্জনের মত শব্দ উত্থিত হল। সীতা চমকে উঠলেন, মাথার ওপরে বৃক্ষশাখা থেকে গায়ক পাখিটি উড়ে গেল। রাক্ষসীর দল সমবেত কণ্ঠে হেসে উঠল। সরমা বললেন—ভয় পাবেন না, লঙ্কায় বিশেষ করে এই অশোকবনে হিংস্র প্রাণী নেই। ওটি ত্রিজটার নাসিকাগর্জন—

পেছনে তাকিয়ে সীতা দেখলেন বৃক্ষকাণ্ডের অপর পাশে একটি লোলচর্মা বৃদ্ধা রাক্ষসী নিদ্রামগ্ন। তারই নাসিকাগহ্বর থেকে এমন শব্দ নির্গত হচ্ছে বটে।

হঠাৎ দুর্মুখী ত্রাসসূচক শব্দ করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল—এ কি! স্বয়ং রাবণ এদিকে আসছেন! অসময়ে মহারাজ কেন—

দু'একজন ব্যতীত প্রায় সব রাক্ষসীই বৃক্ষান্তরালে অন্তর্হিত হল। সরমা দৃঢ়ভাবে সীতার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন। সীতার প্রতি তাঁর যে সবিশেষ প্রীতির ভাব ছিল এমন নয়, কিন্তু তিনি জানতেন বিভীষণ সীতার কোনো ক্ষতি চান না। স্বামীর প্রতি ভালবাসা এবং জন্মভূমির প্রতি কর্তব্যবোধ—এই দুইয়ের মধ্যে সরমা এক বিষম দ্বন্দ্বের দোলায় দোলায়িত হচ্ছিলেন।

রাবণ এসে সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর দুই চোখ ঘোর রক্তবর্ণ। মাত্র দ্বিপ্রহরে তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। একটি মহিষ, দশটি ময়ূর, প্রচুর পরিমাণে ঘৃতপক্ক তণ্ডুলের সঙ্গে কয়েক কলস উত্তম সুরা পান করে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। সুরার প্রভাবে তাঁর পদদ্বয় টলটলায়মান। কর্কশ স্বরে তিনি বললেন -বৈদেহি! আশা করি এতদিনে তুমি মনস্থির করে উঠতে পেরেছ? বল কবে আমার অঙ্কশায়িনী হবে?

সীতা উত্তর না দিয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

রাবণ বিকট হাস্য করে বললেন—বিরূপা রমণীর মন ফেরানোতেই যথার্থ পৌরুষের পরিচয়। তোমার এই অনীহাও বেশিদিন থাকবে না। কেন সুন্দরী, আমাকে এত বিমুখতা প্রদর্শনের কারণ কি? তাকিয়ে দেখ, এই মণিমুক্তাখচিত লঙ্কাপুরীর আমি অধীশ্বর। দেবতাদের বরে আমি কামচারী- ব্যোমচারী সকলেরই অজেয়। আমাকে বরণ করে সুখী হও।

আবেগে রাবণ এক পা এগিয়ে এলেন।

পানোন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়; সুরা পানে রাবণের চেতনা আচ্ছন্ন হয়েছে—হয়ত তিনি একটা অবিবেচনার কাজ করে ফেলবেন, এই ভেবে সরমা তাঁকে বাধা দেবার জন্য অগ্রসর হয়ে এলেন। ক্রোধে এবং ঘৃণায় রাবণের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। সরমার দিকে ফিরে তিনি তীব্র স্বরে বোধহয় ভর্ৎসনা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই সীতা নিচু হয়ে মাটি থেকে একটি ঘাস তুলে নিজের এবং রাবণের মধ্যে রেখে বললেন—বৈশ্রবেয়, শুনেছি তুমি অজেয় বীর, ত্রিভুবন তোমার ভয়ে কম্পমান। এক অরক্ষিতা নারীকে মর্দিত করার মত বল অন্তত তোমার আছে তা প্রমাণ করার দরকার হবে না। কিন্তু শুনে রাখো, আমিও দশরথের স্নুষা, রামের জায়া, আমার কেশাগ্রমাত্র স্পর্শ করলে অচিরাৎ তোমার এই সাধের লঙ্কাপুরী শ্মশানে পরিণত হবে। যদি সাহস থাকে, এই

তৃণখণ্ড অতিক্রম করে এদিকে এসো—

অপমানে রাবণের চক্ষু ঘূর্ণিত হতে লাগল। কিন্তু তিনি সীতাকে ধরবার জন্য আর কোনো আগ্রহ দেখালেন না। কেবল অবরুদ্ধ ক্রোধে সজোরে একবার ভূমিতে পদাঘাত করলেন। তারপর সরমার দিকে তাকিয়ে বললেন—স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করছ, না? তোমার এত সাহস, তুমি ভ্রাতৃশ্বশুরের কর্মে বাধা দিতে যাও। এসবই তোমার বিশ্বাসঘাতক স্বামীর থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা—

সরমা মাটির দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন—আমার স্বামী বিশ্বাসঘাতক নন, তিনি আপনার এবং সমগ্র লঙ্কাপুরীর মঙ্গল কামনা করেন। তিনি বীর।

—আর আমি বীর নই?

—আপনিও বীর। কিন্তু রক্ষরাজ, সীতাকে এভাবে বন্দী করে রাখায় আপনার বীরখ্যাতি ক্ষুণ্ণ হবে।

উদ্গত কটুবাক্য দমন করে রাবণ বললেন—সীতাকে বন্দী করে এনেছি সত্য, কিন্তু তাঁর প্রতি কোনো অসৌজন্য প্রকাশ করি নি।

—এইমাত্র আপনি তাঁকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলেন।

—সে সাময়িক উত্তেজনাবশত। তারপরেই বিবেকবোধ জাগ্রত হওয়ায় আত্ম-সংবরণ করেছি—

—শুধুই বিবেক কি?

রাবণ গর্জন করে বললেন—সরমা, আপন অধিকারের সীমা লংঘন কোরো না!

স্বামীনিন্দায় সরমা আন্তরিক ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শান্ত গলায় তিনি বললেন—বিদ্যুন্মালিনীর কাহিনী আমি জানি রক্ষরাজ।

রাবণ হঠাৎ ফুৎকারে নির্বাপিত প্রদীপের মত দমে গেলেন। পূর্ব প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে বললেন—লঙ্কা ধ্বংস হলে যারা খুশি হবে তাদের তালিকার প্রথমদিকে তোমার নাম রাখলাম সরমা। এর চেয়ে তীব্র ধিক্কারের ভাষা আর আমার নেই।

ঘনায়মান সন্ধ্যায় রাবণের মূর্তি বনান্তরালে মিলিয়ে গেল।

সরমা সীতার পাশে বেদীর ওপর উপবেশন করলেন। তাঁর পা কাঁপছিল, দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল না। ত্রিভুবনবিজয়ী ভাশুরের সঙ্গে এমন দুর্বিনীত আচরণ আগে কখনো করেন নি। স্বামীনিন্দা না শুনলে হয়ত আজো করতেন না। তাঁর শক্তি নিঃশেষিত হয়েছিল।

রাবণকে চলে যেতে দেখে রাক্ষসীর দল এখান-ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আবার একত্র হল। বিকটা বলল—ধন্য! শুনেছিলাম লঙ্কার নারীরা প্রয়োজনে পুরুষের কর্ম করতে পারে। আজ তার প্রমাণ চাক্ষুষ করলাম। ভাশুরের সঙ্গে সমান তেজে কি তর্ক! বাব্বা!

ধান্যমালিনী বলল—তাও অমন ভাশুর! যাকে বলে একটা আস্ত ব্যাটাছেলে! আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি কিনা? তোরা তো জানিস ভাই, আমাকে মহারাজ কয়েক রাত্রি অনুগ্রহ করেছিলেন। বাবা, কি তেজ!

রাক্ষসীরা অতঃপর ধান্যমালিনীর কাছ থেকে অনুগৃহীত রাত্রিগুলি সম্পর্কে গোপন সংবাদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সীতা প্রশ্ন করলেন—বিদ্যুন্মালিনীর কাহিনী কি ভগ্নী?

সরমা সামান্য ইতস্তত করে উত্তর দিলেন—মৈথিলী, রাবণের কাছ থেকে তোমার সত্যকার ভয় কিছুই নেই। যতক্ষণ তুমি ইচ্ছাপূর্বক ধরা না দিচ্ছ সে তোমাকে স্পর্শও করবে না। সৌজন্যবশত নয়, নিজের মঙ্গলের জন্য। একবার এক নির্জন স্থানে বিদ্যুন্মালিনী নামে এক পরমাসুন্দরী গন্ধর্বকন্যাকে একা পেয়ে রাবণ বলপূর্বক তাকে গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সেই গন্ধর্বকন্যা রাবণকে অভিশাপ দেয়—কোনোদিন কোনো রমণীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করলে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। এই অভিশাপের ভয় না থাকলে সে এতদিন চুপ করে থাকত না।

তাদের কথা বলতে দেখে প্রঘসা নামে এক রাক্ষসী বলল কি গো, তোমাদের এত গোপন কথা কি হচ্ছে? রাবণের বদলে বিভীষণকে পছন্দ করার পরামর্শ দিচ্ছ নাকি?

সরমা মুখ ঘুরিয়ে বললেন—ছি ছি!

অজামুখী বলল- দুঃখের কিছু নেই। রাবণের যা মনোভাব আজ দেখলাম তাতে সে শীঘ্রই তোমাদের দু'জনকে প্রাতরাশের জন্য খণ্ড খণ্ড করতে আদেশ দেবে—

রাবণের গর্জনে এবং রাক্ষসীদের কোলাহলে ত্রিজটার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। সে এতক্ষণ দুই পা ছড়িয়ে বসে বিরসমুখে জৃম্ভণ ত্যাগ করছিল। রাক্ষসীদের বাড়াবাড়ি করতে দেখে বলল—ওরে, তোরা সীতা আর সরমাকে কিছু বলিস না, যা সরে গিয়ে নিজেদের কাজ কর—

প্রঘসা বলল তুমিও দেখছি ওদের দলে গেলে। রাম কি তোমাকেও ভজিয়েছে নাকি?

—না রে, আমি একটা বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখেছি, মনটা খারাপ হয়ে আছে।

ত্রিজটা স্বপ্ন দেখেছে শুনে রাক্ষসীদের মুখ শুষ্ক হয়ে গেল। ত্রিজটার স্বপ্ন প্রায় সবই সত্যে পরিণত হয় বলে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। এই তো কিছুদিন আগে ত্রিজটা জলোচ্ছ্বাসের স্বপ্ন দেখেছিল, তার কয়েকদিন বাদেই দক্ষিণ সমুদ্র থেকে পর্বতসমান ঢেউ ছুটে এসে সমস্ত লংকা ডুবিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল।

লম্বিতস্তনী নামে এক বয়স্কা রাক্ষসী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল—কি দেখলে ত্রিজটা?

ত্রিজটা তর্জনী আর মধ্যমা কপালে স্পর্শ করে কি ভাবল, তারপর গাঢ় কণ্ঠে বলল—দেখলাম হাজার অশ্বযোজিত রথে রাম-সীতা বসে আছেন। তাঁদের কণ্ঠে দিব্যগন্ধী ফুলের মালা। হাত বাড়িয়ে তাঁরা চন্দ্র-সূর্য স্পর্শ করলেন। দেখলাম রাবণের মস্তক মুণ্ডিত, গলায় করবীর মালা, পরনে কৃষ্ণ বসন। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তিনি তৈল পান করতে করতে অশ্বতর বাহিত রথে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেছেন। দেখলাম দেবী নিকুম্ভিলার মন্দিরে অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে, সেই আগুনের ওপর আকাশ থেকে রক্তবৃষ্টি হচ্ছে।

নিজের স্বপ্নের ভয়াবহতায় ত্রিজটা নিজেই ভীত হয়ে চুপ করল। কাছেই কোনো গাছের ডালে একটি পেচক ডেকে উঠল কর্কশ স্বরে।

লম্বোদরী বলল—আর কিছু? আর কিছু দেখনি?

স্পষ্টতই কিছুক্ষণ দ্বিধা করে ত্রিজটা বলল—আর দেখলাম লঙ্কার সিংহাসনে রাজা হয়ে বসেছেন বিভীষণ, তাঁর মাথায় শ্বেতচ্ছত্র। পাশে রানী হয়ে সরমা।

তারপর হঠাৎ বৃদ্ধা রাক্ষসী বয়েসের ভারে ন্যুব্জ মেরুদণ্ড সোজা করে ঋজু হয়ে বসে স্বপ্নোত্থিতের চোখে চারদিকে তাকিয়ে বলল—আমি লঙ্কার নারী, আমি জন্মভূমির সর্বনাশ কামনা করি না। কিন্তু তোমরা দেখে নিও, আমার স্বপ্ন মিথ্যা হবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে ত্রিজটার গলা মিশে গেল। স্তব্ধতা।

আস্তে আস্তে সরমা উঠে দাঁড়ালেন। সন্ধ্যা হয়েছে, নিজের গৃহে ফিরতে হবে।

সেই রাত্রিতেই বিভীষণ তাঁকে বললেন—সরমা, আমি রামের শিবিরে চলে যাচ্ছি। তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

সরমা জানতেন এ হবে। তবু চমকে উঠে বললেন—আজই? এখনই?

– আজই। এখনই।

কান পেতে থাকলে বুঝি বা বহুদূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের কল্লোল শুনতে পাওয়া যায়। নারকেল গাছের পাতায় বাতাসের হাহা স্বর।

—যাবে?

সরমা মুখ তুলে বললেন—না। তুমি একাই যাও।

তুমি একা এখানে থেকে যাবে? আমাকে ছাড়া?

—একা কেন স্বামী? এই তো আমার জন্মভূমি, আমার স্বর্গ। এখানে আমার আত্মীয়রা রয়েছেন, আমার সখীরা রয়েছে। একা কেন?

বিভীষণের মুখ ম্লান হয়ে গেল, তিনি বললেন—তুমিও আমাকে ত্যাগ করলে সরমা? তোমার ভালবাসা থেকেও তবে আমি বঞ্চিত হলাম?

সরমার ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে, ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে ওই চিরপরিচিত হাস্যমুখ মানুষটির বুকের আশ্রয়ে নিজেকে মিলিয়ে দেন। কিন্তু—

অশ্রু দমন করে তিনি বললেন—তুমি কল্পনাও করতে পারো না আমি তোমাকে কতটা ভালবাসি। আর ত্যাগ করার কথা বলছ? আমাদের বন্ধন যে বিবাহের বন্ধন, স্বামী। মৃত্যু ছাড়া তো কেউ আমাদের আলাদা করতে পারবে না। তুমি যা ধর্ম বলে মনে করছ, তা করো। কিন্তু অচিরেই যুদ্ধ শুরু হবে, লঙ্কায় আমার আপন মানুষেরা বিপন্ন। এদের ছেড়ে আমি যেতে পারি না।

একটু চুপ করে থেকে বিভীষণ বললেন—তাহলে যাই সরমা?

—যাও। জয়ী হয়ে ফিরো। তোমার স্ত্রী, এই পরিচয়ে যেন আমি গর্ব অনুভব করতে পারি।

বিভীষণ দ্বারের কাছে গিয়ে একবার ফিরে তাকালেন, তারপর গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

গভীর রাত্রিতে শয্যায় সরমা একা। নিদ্রাহীন প্রহরে মাঝে মাঝে উঠে গেলেন বাতায়নের কাছে, দেখলেন কিভাবে সারারাত ধরে নক্ষত্রেরা অবস্থান পরিবর্তন করছে। ঘুম আসে না।

তিনি একা। ভেতরে বাইরে একা।

লঙ্কার মানুষেরা মনে করে তিনি স্বামীর, স্বামী মনে করেন তিনি লঙ্কার।

স্বামীর ব্যথিত মুখখানা সরমা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন।

রাত কেটে যেতে থাকে। ঘুম আসে না। কান পেতে থাকলে শোনা যায় দূর থেকে ভেসে আসা সমুদ্রের গর্জন আর নারকেল গাছের পাতায় পাতায় বাতাসের হাহা স্বর।

ওখানে অমঙ্গল

বাড়িটা দেখে প্রথমেই আমার বুকের ভেতর ভয়ের শব্দ বেজে উঠেছিল। দুটো পাথুরে ঢিবি দু'দিক থেকে এসে যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই হাড়গোড় ভাঙ্গা প্রাণীর মত বাড়িটা পড়ে আছে। রেলগাড়ি থেকে যখন নামি, তখনই বেলা গিয়েছে। এদিকে আমি একেবারেই নতুন, আগে আসি নি কখনো। কোথায় যাবো কোথায় থাকবো কিছুই ঠিক নেই। লোকজনের সঙ্গে পরিচয় করে একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে তিন-চার দিনের জন্য। কাজেই স্টেশনের পাশে কয়েকটা ভাঙ্গাচোরা রিক্সা দেখতে পেলেও হেঁটে আসাই সমীচীন বলে মনে করেছি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে দেখতে দেখতে শহর ফুরিয়ে গিয়ে আবার ঢেউ-খেলানো লালমাটির মাঠে পড়লাম। সেই মাঠেই পড়ন্ত আলোয় ধ্বংসস্তূপটা নজরে এলো। বিরাট বড় বাড়ি, কিন্তু প্রায় সবটাই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অর্ধেকটা কোনরকমে এখনো মাথা তুলে রয়েছে বটে, তবে দেখে আর বেশিদিন থাকবে বলে ভরসা হয় না। বিহার ও মধ্যপ্রদেশের সীমানায় ছোট দেহাতী শহর। অর্থাৎ কিছুটা দেহাত এবং কিছুটা শহর। এখানে এত বড় বাড়ি কারা কি সখে করেছিলেন বোঝা মুস্কিল। বিসন্নতা ও মানুষের সাময়িক দম্ভের প্রতি মহাকালের উৎকট ব্যঙ্গের প্রতিমূর্তির মত বাড়িটা পড়ে আছে। কিন্তু এসব দেখে আমি ভয় পাই নি। ভাঙ্গা ও পোড়ো বাড়ি তো জীবনে আরো কতই দেখেছি, তবু এটা যেন সবার থেকে আলাদা। তাকালে অকারণেই বুকের ভেতরে শিরশির করে ওঠে। যেন ওখানে অমঙ্গল, যেন ওখানে কি একটা হবে।

আমি যে কোম্পানিতে চাকরি করি, তারা মানুষের প্রয়োজনীয় নানারকম ভোগ্যপণ্য তৈরি করে থাকে। আমার কাজ হল দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ক্রেতাদের রুচি লক্ষ্য করে বেড়ানো। এবার আমাকে বিহার সার্কেলে পাঠানো হয়েছে এখানকার মফস্বলের ক্রেতারা কি কি সৌখীন জিনিস পছন্দ করে তাই দেখবার জন্য। আজ ট্রেন থেকে এখানে নামবার কথা নয়, পরের জংশন স্টেশন পর্যন্ত টিকিট করা ছিল। কিন্তু ভাগ্য মানুষকে বোধহয় অমোঘ আকর্ষণে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। ট্রেন এখানে যখন থামল বাইরের প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে শেষবেলার মনখারাপ করে দেওয়া রোদ্দুরে কিসের হাতছানি দেখেছিলাম জানি না, কিন্তু সুটকেশটা নিয়ে তক্ষুনি নির্জন প্ল্যাটফর্মের লাল কাঁকরে লাফিয়ে পড়লাম।

যদি না নামতাম, যদি চলেই যেতাম পঞ্চাশ মাইল দূরের জংশনে, তাহলে হয়ত আজ এ কাহিনী বলার কোনো প্রয়োজনই হত না। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। আমি নামলাম।

শহর ফুরিয়ে গিয়েছে দেখে ওই পোড়ো বাড়িটার কাছ থেকে আবার ফিরলাম। আচ্ছা এখানকার লোকেরা সব মরে গেছে নাকি? রাস্তায় বিশেষ লোক নেই—বিকেল হয়েছে অথচ কেউ বেড়াতে বের হয় নি। বাচ্চারা রাস্তায় খেলছে না—যা কিনা বিহারের মফস্বলে একটি অতি সাধারণ দৃশ্য। সমস্ত কিছুই যেন কেমন থমকে আছে। ঘনবসতি নেই, ছাড়া ছাড়া বাড়িগুলোতে কি উনুনে আঁচ দেয় নি? কোনো বাড়ির মাথায় ধোঁয়া দেখছি না। এরা কি রাত্রিরের রান্না সবাই ও-বেলা করে রাখে? ব্যাপার কি? যেন এক নিদ্রিত পুরীর ভেতর দিয়ে হাঁটছি কোন্ অজ্ঞাত গন্তব্যের দিকে।

বেশিদূর যাবার আগেই ডানদিকে একটা দোতলা বাড়ি, বিহারী ছাঁদের। জানালা-দরজার বিশেষ বালাই নেই, একখানা দেয়াল যেন কে তুলে রেখেছে রাস্তার পাশে। তবে বিত্তবান লোকের বাড়ি নিঃসন্দেহে, কারণ এসব দেশে এমন দোতলা বাড়ি করবার মত মানুষ কম। বাড়ির সামনে কে একজন চারপাই পেতে তার ওপরে বসে আছে মাথা নিচু করে। ঝিমোচ্ছে বোধহয়। এ শহরের ঘুমন্ত মেজাজের মতই দেখাচ্ছে ওকে। এই কি একটা ঘুমোবার সময়? বিশাল বলীবর্দের মত স্বাস্থ্য সামনে ঝুঁকে আছে, কাঁধের পেশীগুলো ফুলে আছে মোটা দড়ির মত। রাত নেমে আসছে, অচেনা জায়গায় আর হাঁটাহাঁটি করতেও ভাল লাগছে না। হুট করে এখানে নেমে পড়ার জন্য এখন মনে একটু অনুতাপই হচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে ডাকলাম—ভাইসাহাব!

প্রথমে কোনো সাড়া নেই, তারপর লোকটা আস্তে আস্তে মাথা তুলে আমার দিকে তাকাল। উঃ! কি কদাকার মুখ! আমরা ঠিক যে অর্থে বীভৎস বলি, তা নয়—গঠনের দিক দিয়ে তার মুখ হয়ত মোটামুটি চলনসই। কিন্তু সমস্ত চেহারায় তার যেন কি এক নোংরামী, শয়তানি আর কদর্যতা মাখানো। যেন এইমাত্র খুন করে এসে হাতের রক্ত ধুয়ে ফেলে সাধু সেজে বসেছে। ঈষৎ লাল দুই চোখ, সেদিকে তাকালে মনে হয় শুধু চোখ দিয়ে বুকের একেবারে ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

লোকটা কথা বলছে না, কেবল শীত-ঘুম-ভাঙ্গা সাপের মত ঠান্ডা নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছি। কি করা উচিত এখন? চলে যাব উত্তরের আশা না রেখে? কতক্ষণ এইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়? লোকটা কি কালা? শুনতে পাচ্ছে না আমি কি বলছি?

অন্ধকার নেমে আসছে। অচেনা জায়গায় সন্ধ্যা বড় বিষণ্ন লাগে। এখানে আশ্রয় যে পাবো না, লোকটার হাবভাব থেকে তা বুঝতে পারছি। তাহলে আর বৃথা কেন দাঁড়িয়ে থাকা? আমার এখন চলে যাওয়াই উচিত। এ শহরও যেন কেমন অপার্থিব রহস্যের আবরণে মোড়া। থাকব না এমন জায়গায়, বরং স্টেশনে গিয়ে দেখি রাত্তিরে কোনো গাড়ি পাওয়া যায় কিনা জংশনের দিকে।

প্রকৃত অবস্থাটা অনুভব করলাম চলে আসতে গিয়ে।

আমি নড়তে পারছি না!

কে যেন আমার পা দুটো সজোরে চেপে ধরেছে মাটির সঙ্গে, তাদের ওপরে আর আমার কোনো কর্তৃত্বই নেই। হাত-পায়েও যেন কেমন বল হারিয়ে ফেলেছি, কমে আসছে মনের জোর। কি হবে আজ আর অন্য কোনো আশ্রয়ের সন্ধানে

ছুটোছুটি করে? খামোকা পণ্ডশ্রম। কেমন সুন্দর এই সন্ধ্যে, এই ছোট শহর। কথা বলছে না বলেই কি ও খারাপ লোক? হয়ত বেচারী কানে শুনতে পায় না! মিছিমিছি ভয় পাচ্ছি আমি।

এই রকম ভাবছি, সেই সময় লোকটা কথা বলে উঠল—জী?

তাহলে ও কালা নয়, শুনতে পায়। কথাও বলতে পারে। তাহলে চুপ করেছিল কেন?

বললাম—আমি বিদেশী, আজকের রাতটা এখানে থাকতে পারো কি?

আপাদমস্তক আমাকে একবার দেখে নিয়ে ঠোঁট চাটল লোকটা লোভী জন্তুর মত, তারপর চারপাই ছেড়ে উঠে বলল—জরুর, আইয়ে।

অতবড় ষাঁড়ের মত চেহারার ভেতর থেকে মিহি খুনখুনে আওয়াজ বের হচ্ছে! চোখ বুজে শুনলে মনে হবে বারো বছরের ছেলের গলা। শুনলেই কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে ওঠে। ঠোঁট চাটল কেন লোকটা? রাত্তিরে কেটে খাবে নাকি আমাকে?

সে বলল হমার নাম সুরযপ্রসাদ।

—বেশ নাম। আপনি কথা বলছিলেন না কেন?

—আপনাকে দেখছিলাম।

—আমাকে! আমার মধ্যে দেখবার কি আছে?

—আছে, আছে। মানুষকে দেখতে বড্ড ভাল। তাই দেখি।

বলে কি লোকটা? পাগল-টাগল নয় তো? এতক্ষণ চোখ দিয়ে দেখছে, এরপরে না কামড়ে চেখে দেখতে চায়! না, এ ভাল জায়গা নয়, আমি এখানে থাকব না।

সুরযপ্রসাদ আমাকে নিয়ে যাবে বলে বাড়িতে ঢোকবার পথে পা বাড়িয়েছিল থেমে পড়ে বললাম—আমি যাবো না।

অবাক হয়ে সে বলল—কাহে?

—না, আমি চলে যাবো। আমার একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে।

সাপের মত হিস্ হিস্ শব্দ করে হাসতে লাগল সে, বলল—ডরিয়ে গেলেন? এ হেঃ, এ হেঃ—ডরাবার কুছু নাই।

পৌরুষে আঘাত লাগল, বললাম—ডরাবার কি আছে? সে সব কিছু না। ঠিক আছে, থাকবো আমি। বলুন কোথায় যেতে হবে।

হায়! তখনো যদি ফিরতাম! বোকার মত আত্মাভিমানের ঝোঁকে গোঁয়ার্তুমি না করতাম। কিন্তু ওই যে কথা রয়েছে, নিয়তি কেন বাধ্যতে! নিয়তিই টানলো আমাকে।

নির্জন বাড়ির সরু, অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে আমাকে দোতলায় নিয়ে এলো সুরযপ্রসাদ। একদিকে টানা বারান্দা, তার ধারেই সারি সারি সাত-আটখানা ঘর। কেউ আলো জ্বালে নি, সাঁঝের প্রদীপ দেখায় নি। বাড়িতে মেয়েরাও কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে। আমরা ওপরে এলাম, কিন্তু সচকিত হয়ে কেউ সরে গেল না দরজার পাশে, বেজে উঠল না হাতের চুড়ির সলজ্জ রিন্‌ঝিন্ শব্দ। কোথাও কিছু নেই, কেবল বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘনিয়ে আসছে মৃত্যুময় তামসী রাত্রির ছায়া। আচমকাই যেন আশ্চর্য একটা দমবন্ধ করা অনুভূতি গলার কাছে চেপে

ধরল। সম্ভব হলে তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দৌড় দিতাম, কিন্তু পৌরুষের প্রশ্ন!

বারান্দার একেবারে অপর প্রান্তের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে শেকল নামিয়ে দরজা খুলল সুরযপ্রসাদ, বলল—চলুন ভেতরে।

ভেতরে ভয়াবহ অন্ধকার! বললাম—আলো জ্বালেন নি কেন? আপনার পরিবারের অন্যেরাই বা কোথায়?

আবার সেই অমানুষিক শব্দহীন হাসি হাসলো সুরযপ্রসাদ—বত্তি দে রহা হুঁ।

-তা তো দেবেন, বাড়ির লোক?

—আয়গা কাঁহাসে? সাদি নেহি কিয়া, বালবাচ্চা নেহি হ্যায়—

অত্যন্ত যুক্তিসম্মত কথা। বিয়ে না হলে বাচ্চা আসবে কোথা থেকে? জিজ্ঞাসা করলাম—একদম একা থাকেন? খারাপ লাগে না?

-মুঝে আদত হো গয়া হ্যায়। চলিয়ে অন্দর।

ঘরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে একটা মোমবাতি বের করে জ্বালালো সে। ম্লান হলুদ আলোয় ফুটে উঠল একটা বাজে ছুতোরের তৈরি জগদ্দল পাথরের মত ভারি খাট, তার ওপরে ময়লা বিছানা। মোটা মোটা পায়াওয়ালা একখানা টেবিল একদিকে একটা আলনা। ব্যস, আর কিচ্ছু নেই ঘরে। ভেতরে পাক খাচ্ছে শুধু একটা ভ্যাপসা সোঁদা গন্ধ, বহুদিন বন্ধ থাকার পরে কোনো ঘর খুললে যেমন গন্ধ পাওয়া যায়।

টেবিলের ওপরে মোম গলিয়ে ফেলে বাতি আটকাবার চেষ্টা করছে সুরযপ্রসাদ। বললাম—শহর ছাড়িয়ে টিলার ধারে একটা বড় ভাংগা বাড়ি দেখলাম। ও রকম জায়গায় অতবড় বাড়ি কার?

—আমার।

-আপনার! ভাঙ্গা পড়ে আছে কেন?

—ও আমার পূর্বপুরুষের বাড়ি, ঠাকুরদার ঠাকুরদা বানিয়েছিলেন। এখন কেউ থাকে না, তাই ভেঙে পড়ে আছে।

—থাকে না কেন?

- কে থাকবে? মানুষ তো আমি একা। অতবড় বাড়িতে আমার কোনো দরকার নেই যে আবার সারিয়ে নেবো। তাছাড়া ও বাড়ির সবটা আপনি ঠিক বুঝতে পারেন নি। বিরাট বাড়ি ওটা। উপরসে মালুম পাওয়া যায় না, মাটির নিচে ভি বহোৎ কামরা আছে।

—মাটির নিচের ঘর দিয়ে কি হোত?

—ভগবান মালুম, পুরানা জমানামে লোকের সখই এ রকম ছিল। বাড়ির ওপরটা ভেঙে গেলেও মাটির নিচের ঘরগুলো ঠিকই আছে। তবে তা দিয়ে আর কার কি কাম হবে?

আমাকে বিশ্রাম করতে বলে সুরযপ্রসাদ চলে গেল। সে বিদায় নিতেই কিছুটা স্বস্তি ফিরে এল মনে। জামাকাপড় বদলে নোংরা বিছানার চাদরটা সরিয়ে তোষকের ওপরেই একটু গা এলিয়ে দিতে যাচ্ছি হঠাৎ কানে এল একটা আওয়াজ। কিচ্‌কিচ্‌ করে কি একটা জন্তু যেন কোথায় ডাকছে। মনে হল পাশের ঘর থেকে

আসছে শব্দটা।

গৃহস্বামীর অনুমতি না নিয়ে বাড়ির মধ্যে চলাফেরা করা ঠিক নয়, কিন্তু শব্দটার উৎস জানবার জন্য মনে ভয়ানক কৌতূহল জাগল। টেবিল থেকে মোমটা তুলে নিয়ে পাশের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এই ঘরের ভেতর থেকেই আসছে শব্দটা। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে শেকল নামিয়ে দরজা খুললাম।

ভেবেছিলাম না জানি কি জিনিসই চোখে পড়বে। কিন্তু ও হরি! এ যে দেখি একটা গলায় চেন বাঁধা বাঁদর বসে কি ফল খাচ্ছে আর ওই রকম আওয়াজ করছে। একা মানুষ সুরযপ্রসাদ—অবিবাহিত। সঙ্গী হিসেবে এইটাকে পুষেছে আর কি!

শেকল তুলে দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম।

সময় যায়। রাত দশটা।

এই সময় এসে খেতে ডাকল সুরযপ্রসাদ। একতলার বারান্দায় মোটা দুখানা আসন বিছিয়ে খাবার জায়গা হয়েছে। না, আতিথ্য ভাল লোকটার। হাতেগড়া মোটা মোটা আটার রুটি, ঝিঙের তরকারি, আলুর ভাজি আর খাঁটি দুধের ঘন ক্ষীর। পরিতৃপ্তি করে খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম—কাউকে তো দেখছি না কাজের লোক। এই রান্না করলো কে?

—আমি নিজেই করেছি, লোক কি দরকার?

—আপনি একটা বাঁদর পুষেছেন দেখলাম, পশুপাখির সখ আছে নাকি

—জী। একা থাকি. কোনো একটা চিঁড়িয়া থাকলে ভাল লাগে।

খাওয়া হয়ে গেলে আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। সুরযপ্রসাদ নতুন একটা মোমবাতি দিয়েছে। সেটা না ধরিয়ে রেখে দিয়েছি টেবিলে। রাতে লাগতে পারে। এটা তো ফুরিয়ে এসেছে।

বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে মনে হল—ঐ যাঃ! ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু খিল লাগাই নি। একবার ভাবলাম—যাই, উঠে খিলটা লাগিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু সমস্ত শরীরে সারা দিনের ক্লান্তি নেমে এসেছে বন্যার ঢলের মত। কে আবার উঠে দরজার খিল দেয়? দূর! তাছাড়া চোর যদি আসেই, আমার নেবেটা কি? পয়সা-কড়িও বিশেষ কিছু নেই সঙ্গে। আচ্ছা, সুরযপ্রসাদ লোকটা বোধহয় সত্যি খারাপ নয়। হাবভাব একটু কেমন কেমন বটে, তা সে অনেকের অমন বেয়াক্কেলে ব্যবহার হয়—আমি দেখেছি। মানুষ তো ভালই, বেশ যত্ন করে খাইয়েছে। এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

আচমকাই জেগে গেলাম। রাত কত হয়েছে কে জানে! মোমবাতিটা জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে নিভে গেছে। গাঢ় অমাবস্যার মত অন্ধকার চারদিক। হাতঘড়িটা যে দেখব তারও উপায় নেই। একবার ভুল করে পুরীতে হাতঘড়ি বাঁধা অবস্থায় সমুদ্রে স্নান করতে নেমে পড়েছিলাম, নোনা জল ঢুকে ডায়ালের লুমিনাস পেন্ট নষ্ট করে দিয়েছে, নইলে অন্ধকারেও দেখা যেত।

অন্ধকার যেন ছুরি দিয়ে কাটা যায়। আলকাতরার মত গায়ে লেগে গিয়ে যেন চটচট করছে, পাথরের মত বুকে চাপ দিচ্ছে অন্ধকার। তাকিয়ে থাকলে আরো কষ্ট, যদিও এই নিবিড় আলোকহীনতায় তাকানো যা চোখ বুজে থাকার

মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তবু চোখ বন্ধ করে থাকলে 'তাকালে আলো দেখতে পাবো'—এইরকম একটা বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় মনে।

চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করবো, এমন সময় একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনলাম—ক্যাঁচ্।

কিসের শব্দ ওটা? প্রথমে বুঝতে পারলাম না, তারপরে একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই বুক হিম হয়ে এল।

বিকেলে সুরযপ্রসাদ যখন আমাকে ওপরে নিয়ে এল, তখনই লক্ষ্য করেছিলাম এ ঘরের দরজাটা খোলবার সময়ে ক্যাঁচ্ করে শব্দ করে। কব্জায় তেল না দেবার ফল। তাহলে এই অন্ধকারে আমাকে ঘুমন্ত ভেবে কেউ কি দরজা ঠেলে ভেতরে আসবার চেষ্টা করছে? যদি তাই হয়, তবে আমার রাতের অজানা অতিথি খুব চালাক—একেবারে অনেকখানি খুলে ফেলছে না। প্রথমত, তাতে যদি আমি জেগে থাকি, উঠে বাধা দিতে পারি। দ্বিতীয়ত, যদি জেগে না থাকি, তবে জেগে যেতে পারি। একটু একটু করে পাল্লা ফাঁক করছে সে। অনেকক্ষণ ধরে জেগে জেগে শুনলাম মাঝে মাঝেই ক্যাঁচ্ ক্যাঁচ্ করে শব্দ হচ্ছে।

বিকেলের মত সেই শারীরিক অনড়তা হঠাৎ যেন আবার ফিরে এল। একটু চেষ্টা করলেই টেবিলের ওপর থেকে মোমবাতি আর দেশলাই নিয়ে আলো জ্বালানো যায়—কিন্তু কাজটা করে কে? শরীরে কে যেন ভারহীন চাপ দিয়ে আমাকে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরে রেখেছে। দূর থেকে কেউ কি সম্মোহন করছে নাকি আমাকে? নইলে আমার নিজেরই হাত-পায়ের ওপরে আমার জোর নেই কেন?

শব্দটা আর হচ্ছে না। তার মানে দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে এবং যে খুলেছিল সম্ভবত সে এখন ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে।

কি ভয়াবহ অনুভূতি! আমি চিৎ হয়ে দু'হাত দিয়ে দু'পাশে বিছানা আঁকড়ে ধরে অন্ধকারেই চোখ মেলে শুয়ে রয়েছি। আর ঘরের মধ্যে এক অজানা এবং অদেখা উপস্থিতি!

যে এসেছে সে কি করছে এতক্ষণ? আক্রমণ করার হলে তো করতে পারে। আমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, বাধা দেবার ক্ষমতা নেই।

হঠাৎ মনের মধ্যে একটা বোধ জেগে উঠল। কেন জাগল বলতে পারি না। মনে হল যে এসেছে সে এই অন্ধকারেও আমাকে দেখতে পাচ্ছে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না বটে, কিন্তু সে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টির অস্ত্রে আমার শরীরকে ব্যবচ্ছেদ করে ভেতরের যন্ত্রপাতি অবধি দেখে নিচ্ছে!

আমি যেন বেঁচে নেই, আমি যেন মৌলিক উপাদানে বিভক্ত হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গিয়েছি কবেই। কেবল আমার চেতনাটা শুয়ে আছে অজানা এক শহরে অজানা মানুষের অচেনা বিছানায়, আর শূন্যপথে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছে সহস্র অমঙ্গলপূর্ণ দৃষ্টির ছুঁচ। কে এসেছে ঘরে? কে?

এবার খুব অস্পষ্ট হলেও নির্ভুলভাবে শুনতে পেলাম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। বড় হাঁড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিলে নিজের কানে যেমন শোনা যায়, তেমনি। তাহলে ভ্রম নয়, মায়া নয়, আমার ভীতিকাতর মনের ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ নয়—সত্যি কেউ এসেছে ঘরে। ঐ শব্দই তার অমোঘ প্রমাণ। যেন

মানুষ নয়, বিশাল দেহ কোনো জন্তুর শ্বাস টানার আওয়াজ।

শব্দটার মধ্যে কেমন একটা পাশবিকতা লুকিয়ে আছে। বোঝানো যায় না, কিন্তু বোঝা যায়।

অন্তহীন অন্ধকারের ভেতর সঙ্গীহারা আমি ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠছি। একি মর্মান্তিক অস্বস্তি, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, অথচ সে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ ঘরের এককোণে টিপ্‌টিপ্‌ করে একটা ছোট্ট নীল আলোর বিন্দু জ্বলে উঠল। জ্বলছে-নিভছে। নতুনতর কোনো বিভীষিকা ভেবে আমার হৃৎপিণ্ড প্রথমে লাফিয়ে গলার কাছে উঠে এসেছিল। তারপরেই চিনতে পারলাম জিনিসটাকে।

একটা জোনাকি!

হে ঈশ্বর! সামান্য একটা জোনাকি কি আশারই না সঞ্চার করলো আমার মনে। হোক না তুচ্ছ পতঙ্গ, তবু এই মুহূর্তে ও জীবিত প্রাণীদের জগৎ থেকে আমার কাছে একমাত্র প্রতিনিধি। প্রাণপণে চোখ ঠিকরে জোনাকিটার দিকে চেয়ে রইলাম। ওটাই এখন যেন আমার একমাত্র ভরসা।

উড়তে উড়তে বাঁদিক থেকে ডানদিকে যাচ্ছে পোকাটা টিপটিপ করে জ্বলছে মৃদু ও স্নিগ্ধ নীল আলো। আমি চোখ রেখেছি ওর ওপরে। হঠাৎ ঘটল একটা আশ্চর্য ঘটনা।

বাঁদিকে সরে আসতে আসতে জোনাকির আলোটা হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, চার কি পাঁচ সেকেণ্ড হবে বোধহয়, আরো খানিকটা বাঁদিকে আবার জ্বলে উঠল জোনাকির আলোকিত পুচ্ছ। মানে মাঝখানে তার গতিপথের কিছুটা আমি দেখতে পাই নি।

কেন?

দুটো কারণ হতে পারে। এক, জোনাকির আলো মাঝে মাঝে সামান্য সময়ের জন্য নিভে যায়, তারপর ফের টিপ্‌টিপ্‌ করে জ্বলতে-নিভতে থাকে। এটা সে-রকম কিছু হতে পারে। আর নয়তো—

নয়তো ওই জায়গাটাতেই সে দাঁড়িয়ে আছে যাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তার আড়াল দিয়ে যাবার সময়েই জোনাকিটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। যাক, যদি দ্বিতীয়টাও সত্যি হয়, তবু একটা সান্ত্বনা পাচ্ছি যে, সে অলৌকিক বা অপার্থিব কিছু নয়। তার বাস্তব কারণ আছে।

জোর করে মনকে ব্যাপৃত করলাম অন্য চিন্তায়। অবস্থার ওপরে কর্তৃত্ব করতে হবে আমাকে—তাছাড়া কোন পন্থা নেই। যে-ই ঘরে এসে থাকুক না কেন, এতক্ষণ যখন আমাকে আক্রমণ করে নি, তখন ধরেই নেওয়া যেতে পারে আমার কোনো ক্ষতি করবার ইচ্ছে অন্তত এই এক্ষুনি তার নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে রবীন্দ্রনাথের কি একটা কবিতা আবৃত্তি করে গেলাম। জীবনের সবচেয়ে মজার দিনগুলো মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। এদিকে সমস্ত শরীর ঘামে ভেসে যাচ্ছে।

কখন ঘরের মধ্যে থেমে গিয়েছে সেই পাশবিক নিঃশ্বাসের শব্দ, মনের ওপর থেকে নেমে গিয়েছে পাথরের গুরুভার। ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করেছি, ঘরে সে আর নেই। আপাতত আমি বিপন্মুক্ত।

সমস্ত দেহে মনে মুক্তির নির্মল নিঃশ্বাস! শুধু শুয়ে শুয়েই একজন মানুষ এত ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে, তা কে জানতো! আস্তে আস্তে আমার চেতনা ঢলে পড়ল নিদ্রার কোলে।

কখন সকাল হয়েছে; কখন দেখি সুরযপ্রসাদ এসে ডাকছে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে—বাবুজী, উঠিয়ে। চায় নহি পিয়েঙ্গে?

ঘুম ভেঙ্গে মনে পড়ে গতরাত্রের অমানুষী অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু এখন সকালের আলোয় ভয়ের একটা টুকরো পড়ে নেই কোথাও। কেবল সুরযপ্রসাদের দুই চোখে যেন কি শয়তানি হাসি! অথবা হয়ত আমার মনের ভুল।

যাক, আমার তাতে কি? আমি এখনই জামাকাপড় পরে সুটকেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব, ট্রেন ধরে দু'ঘণ্টার মধ্যে চলে যাবো পরের বড় শহরে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই কলকাতায়। সিনেমা—হোটেল—বন্ধুবান্ধব, কোথায় তখন থাকবে গতকাল রাত্তিরের স্মৃতি? হাসুক গে সুরযপ্রসাদ।

ও নিজেই চা এনেছিল বড় কাচের গ্লাসে। চা খেয়ে শার্ট পড়ছি সুরযপ্রসাদ বলল—এখনি যাচ্ছেন নাকি?

—হ্যাঁ, সকালে কোনো ট্রেন নেই?

—আছে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম যাওয়ার আগে আপনাকে আমাদের আদি বাড়িটার ভেতরে একবার ঘুরিয়ে দেখাব। পুরনো জিনিস দেখতে ভাল লাগে না আপনার? যাবেন?

লোভ হল। যে যুগ চিরদিনের জন্য চলে গিয়েছে আর ফিরে আসবে না, তার ফেলে যাওয়া নিদর্শন দেখতে বড় ভাল লাগে। কলেজে পড়বার সময় বন্ধুরা মিলে কত ঘুরেছি গৌড় শুশুনিয়া চন্দ্রকেতুগড়ে। একবার গেলে মন্দ হয় না। এই দিনের আলোয় সুরযপ্রসাদ আমার কি করবে? ওর স্বাস্থ্য অবশ্য খুবই ভাল তবে আমিও নিতান্ত দুর্বল নই। তাছাড়া গতকাল রাত্তিরে যখন সম্পূর্ণ অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করবার সুযোগ ছিল সে সময়ে না করে এখন উজ্জ্বল দিবালোকে তা করবার কোনো অর্থ হয় না। যাব, নিশ্চয় যাব ওর সঙ্গে।

বললাম—চলুন যাব।

বেরুলাম। পাথুরে দেশ, সূর্য উঠতে না উঠতেই পাথর তেতে উঠেছে। মাটি থেকে ঝাঁঝ ভেসে আসছে। তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি শহরের প্রান্তসীমা ছাড়িয়ে। সুরযপ্রসাদ তাদের বংশের অতীত গৌরবের গল্প করতে করতে চলেছে। তার বলার ভঙ্গি একঘেয়ে শুনতে শুনতে বিরক্তি আসে।

বাইরে থেকে সুরযপ্রসাদের পৈতৃক বাড়ি যতখানি ধ্বংসস্তূপে পরিণত বলে মনে হয় ব্যাপার আসলে অতদূর নয়। বাইরের দিকে সবগুলো ভেঙ্গে গেলেও ভেতর-মহলের কয়েকখানা বড় ঘর এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক খসে পড়া কড়িবরগা-ইঁট-চুন-বালি পেরিয়ে সেখানে পেঁছিলাম। বাববাড়ির ভগ্নস্তূপের ভেতর থেকে এখানে-ওখানে মাথা তুলেছে বট-অশ্বত্থের চারা। হস্তপদভগ্ন পাথরের বিবসনা নারীমূর্তি হাতে ধরা পাথরের ঝারি দিয়ে এখনো যে কাকে জল দেবার ভঙ্গি করছে কে জানে! সমস্ত পরিবেশটা থেকে যেন একটা চলে যাওয়া দিনের দীর্ঘশ্বাস ভেসে উঠে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাতাস গরম হচ্ছে। ঘুরে ঘুরে দেখছি গরম হাওয়া এসে লাগছে গায়ে।

সুরযপ্রসাদ একঘেয়ে বকবক করে আমাকে বুঝিয়ে যাচ্ছে কোন্‌টা তাঁদের বৈঠকখানা ছিল, কোন্‌খানে হত বাঈজীর নাচ আর কোন্‌টাই বা ছিল তার রাগী প্রপিতামহের গোসলখানা। ওর কথা শুনতে মোটেই ভাল লাগছে না কারণ আমি এসব ওদের বংশের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে দেখছি না। জায়গাটার প্রাচীনত্ব—এখানে যে একদিন মানুষ সুখে-দুঃখে কাটিয়ে গিয়েছে সেই কথা ভেবে আমার ভাল লাগছে।

ট্রেন ধরতে হবে। ফিরবো ফিরবো করছি এমন সময় সুরযপ্রসাদ বলল—চলুন এবার আপনাকে মাটির নিচের ঘরগুলো দেখাই।

—সেখানে কি?

—কিছু না। এখানে ছিল আমাদের তোষাখানা। একবার দেখে যাবেন না? চলুন—

ভাঙগা ইঁট-কাঠ-বরগা পেরিয়ে অন্দরমহলের অটুট ঘরগুলো পেরিয়ে কোথা কোথা দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল—সুরযপ্রসাদ। এক জায়গায় একসার সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নিচের দিকে সেখানে দাঁড়িয়ে সে বলল—এখান দিয়ে নামতে হবে।

ও-ই আগে নামলো। আমি পেছনে। একতলা সমান নামবার পর একটা পাথরের চওড়া বারান্দায় এসে সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল। আবছা অন্ধকার ঘিরে আছে জায়গাটাকে এই দিনের বেলাতেও। চোখে অন্ধকার সয়ে গেলে তাকিয়ে দেখলাম এটা বারান্দা নয়, একটা পাথরের গোল চাতাল। চারদিকে খুপরির মত অনেক ঘর। মোটা মোটা গরাদ দিয়ে তৈরি তাদের দরজা। ঘরগুলোর ভেতরে নিবিড় অন্ধকার।

সুরযপ্রসাদ বলল—এই হচ্ছে তোষাখানা। ওই সব ঘরে থাকত মোহরের কলসী, টাকার থলে আরো কত কিছু। এসব শ'-দেড়শ' বছর আগেকার কথা। আজ আর তার কিছু অবশিষ্ট নেই। দেখেন কখনো তোষাখানার ভেতর দেখতে কেমন হয়?

—না তো।

—যান তাহলে একটায় ঢুকুন।

ভেতরে বড় অন্ধকার। সুটকেশে টর্চ ছিল বের করে হাতে নিলাম তারপর ঢুকে পড়লাম একটা কুঠুরিতে।

পেছনে ঝনাৎ করে লোহার দরজা বন্ধ হবার শব্দ। তালা বন্ধ করার শব্দ।

এক সেকেন্ড লাগল প্রকৃত অবস্থা বুঝতে। পাক খেয়ে ফিরে এসে আছড়ে পড়লাম লোহার গরাদের ওপরে। বন্ধ। চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেই দরজা। পাগলের মত টানতে লাগলাম গরাদ ধরে—খুলে দে শয়তান খুলে দে! খুলে দে!

বাইরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে দন্তুর হাসি হাসছে সুরযপ্রসাদ।

—বহু চিড়িয়া পুষেছি মানুষ পুষি নি কখনো। বড্ড সখ ছিল। তা ভগওয়ান আজ মিলিয়ে দিলেন। ইঃ হিঃ হিঃ চিল্লাও—বহোৎ চিল্লাও। ইধার কি আদমী আছে যে শুনবে?

গরাদে মাথা ঠুকছি ক্ষ্যাপার মত চিৎকার করছি যা মুখে আসছে গালাগাল

দিচ্ছি সুরযপ্রসাদকে। সে শান্ত হয়ে শুনছে। বলছে—বাঃ! তেজী চিড়িয়া তুই। খুব লড়াকু! লড়ে যা লড়ে যা! যতই চিল্লাবি ততই তো মজা! মুর্দা পুষে কি লাভ?

রাগে জিঘাংসায় ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছি। কিন্তু কিছু করবার নেই। নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে তাব পোষা জানোয়ার খেপিয়ে মজা দেখছে সুরযপ্রসাদ।

অনেকক্ষণ মজা দেখে চলে গেল সে।

এ ঘরে একটা ঘুলঘুলি আছে। সম্ভবত বাড়ির পেছনদিকে মাঠে জমি বরাবর রয়েছে সেটা। নোট বই-এর পাতায় এই ঘটনা লিখে খামে ভবে সেটা দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছি আমি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায়, তবে পুলিশ এনে আমাকে উদ্ধার কোরো। নইলে এই শেষ। বিদায়!

হতভাগ্য
প্রকাশ সোম

সন্ধ্যা। সুরযপ্রসাদ সিদ্ধি খাচ্ছে বসে। ঘরে ঢুকলো কুদর্শন একজন লোক। সুরযপ্রসাদ বলল—কি খবর বংশী?

বংশী একটা সাদা খাম এগিয়ে দিল। সুরযপ্রসাদ হাতে নিয়ে খুলল সেটা। ভেতরে দশ-বারোটা নোট বই-এর পাতায় লেখা।

—ওর ঘরের ঘুলঘুলির বাইরে পেলি? পড়েছিস?

—হাঁ কর্তা, একটু-আধটু বাংলা জানি।

শান্তমুখে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে কাগজগুলো উড়িয়ে দিল সুরযপ্রসাদ। সিদ্ধির গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল—দানাপানি ঠিকঠাক দিয়ে যাস। ভারি লড়াকু চিড়িয়া। বহোৎ লড়ে যাবে।

যূপবদ্ধ

বাথরুমের তাকে দাড়ি কামানোর সাবান খুঁজতে খুঁজতে অমরেশ চেঁচামেচিটা প্রথম শুনতে পেলেন। অনেক মানুষের গলার আওয়াজ। কারা যেন বাড়িব সামনের গলি দিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। চিৎকার করছে। চিৎকার করে কাকে কী বলছে। ভাষাটা দেহাতি হিন্দী।

পরনে গামছা, হাতে ভেজা ব্রাশ, অমরেশ বাইরের দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সামনেই কোমরসমান নিচু পাঁচিল, তার ওপাশে লুঙ্গি আর ময়লা চেক জামা পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটাকে চেনা চেনা মনে হল, কিন্তু কোথায় দেখেছেন অমরেশ ঠাহর করতে পারলেন না। গলিটা একটু এগিয়ে একটা পোড়ো জমিতে শেষ হয়েছে। সেখানে কচু, আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের কাছে দু'জন লোক নিচু হয়ে দু'হাতে গাছ সরিয়ে কী যেন দেখছে।

চেক জামা পরা লোকটা অমরেশের দিকে তাকিয়ে বলল—ভাল আছেন বাবু? রাম রাম—

রাম রাম অথবা নমস্কার কোন্‌টা বলা উচিত হবে ঠিক করতে না পেরে অমরেশ বললেন—তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি বাপু?

লম্বা লম্বা হলদে দাঁত বের করে হেসে লোকটা বলল—চিনতে পারলেন না বাবু? আমি তো বিশুয়া, রেলগেটের ওপারে ভাঙ্গি মহল্লায় থাকি। দু'মাহিনা আগে আপনার পায়খানার ট্যাঙ্কি সাফা করে দিয়ে গেলাম।

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা বিশুয়া, এখানে হল্লা কিসের?

আবার হলদে দাঁত বের করে বিশুয়া বলল—কিছু না বাবু। শুয়ার—

অবাক হয়ে অমরেশ বললেন—শুয়োর? তার মানে?

—রাত্তিরে মহল্লায় খানাপিনা আছে বাবু, পবব আছে। দুটো শুয়ার মারা হবে। তবে একটা শালা পালিয়ে এসে ওই জঙ্গলে ছিপে আছে। আবে রামু, আপনা বাঁয়ে দেখ্ বুরবাক কাঁহকা, উধার জঙ্গল হিল রহা হ্যায়—

এরপর আবার একটা সোরগোল উঠল। 'উয়ো ভাগতা হ্যায়' বলে রামু লাফিয়ে পড়ল কচুবনে, পেছন পেছন বিশুয়া এবং তার সঙ্গী। মোটা মোটা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে জঙ্গল তোলপাড় করে ফেলল তিনজনে। অমরেশ সরে এসে আবার বাথরুমে ঢুকলেন।

আজকাল চোখের জোর কমেছে, বাথরুমের দরজা বন্ধ করলে আলো কমে যায়। সেজন্য একটা পাল্লা ফাঁক করে রেখে দেওয়ালে আঁটা আয়নায় দেখে দেখে দাড়ি কামাচ্ছিলেন অমরেশ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন—বাইরে কিসের গোলমাল হচ্ছে গো! দেখতে পেলে কিছু!

থুতনির খাঁজে কামাতে কামাতে কথা বলা মুশকিল, তবু কায়দা করে অমরেশ বললেন—গোলমাল কিছু না। ওরা শুয়োর ধরছে—

—শুয়োর ধরছে মানে? কারা ধরছে?

—ওই রেলগেটের ওপারে বস্তি আছে না? সেখান থেকে এসেছে। ওদের কী পরব আছে আজকে, খাওয়াদাওয়া হবে।

—এখানে শুয়োর আসবে কোথা থেকে?

—বস্তি থেকে পালিয়ে এসে ওই কচুবনে লুকিয়ে আছে, তাই খুঁজছে—

সুমিত্রা পরিশীলিত স্বভাবের মহিলা। চড়া রঙের শাড়ি পরেন না, নিয়মিত রেডিওতে সকাল সাতটা চল্লিশে রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন, জীবনানন্দের বেশ কিছু কবিতা মুখস্থ আছে, যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' পড়েছেন এবং মহিলাদের বিভিন্ন পত্রিকার চিঠিপত্রের স্তম্ভে নানান সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকেন। তিনি দুঃখিত স্বরে বললেন—ইস্, ধরে তো শুয়োরটাকে মেরে ফেলবে!

অমরেশের দাড়ি কামানো হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘসতে ঘসতে বললেন—তা ফেলবে। তবে এখানে মারবে না, অন্য কোথাও—

পীড়িত মুখে সুমিত্রা চুপ করে রইলেন। ব্যাপারটা অমরেশেরও খারাপ লাগছিল। কিন্তু ধাঙড়পাড়া থেকে কিছু লোক এসে তাদের হকের শুয়োর ধরে নিয়ে যাবে, এতে তাঁর আর কী করার আছে?

স্নান সেরে বেরিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে শুয়োরের তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনতে পেলেন অমরেশ। তার মানে প্রাণীটা ধরা পড়েছে। এতক্ষণ মনের মধ্যে একটু ক্ষীণ আশা ছিল—ব্যাটারা জঙ্গলের ভেতর হয়তো শুয়োরটা খুঁজে পাবে না। কিন্তু ওই ক'টা মাত্র কচু আর কালকাসুন্দের ঝোপ, বেড়াল বা কুকুর হলেও

কথা ছিল, শুয়োরের মতো বড় জন্তু লুকোবে কী করে? ধরা পড়েছে নির্ঘাৎ।

দু'গালে আলতো চাপড়ে আফটার-শেভ লোশন লাগিয়ে আবার বারান্দায় এলেন অমরেশ। প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও দৃশ্যটা তাঁকে চমকে দিল।

নোংরা কাদামাখা স্লেটরঙা একটা শুয়োরকে তাঁদের বাড়ির ঠিক সামনেই কাত করে পেড়ে ফেলেছে বিশুয়ার দল। রামু সামনে পা'দুটো শক্ত করে ধরে আছে। বিশুয়া পেছনের পা চেপে ধরতে চাইছে, কিন্তু তাগড়াই চেহারার শুয়োরটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে চলেছে বলে সুবিধে হচ্ছে না। বিশুয়া কাছে দাঁড়িয়ে থাকা তৃতীয় সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল—রস্‌সি কাহা বে?

—গাড়িমে হোগা সায়েদ—

—গাড়ি লে আ গলিমে। জলদি যা--

সুমিত্রা তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অমরেশ একটু বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললেন–তুমি আবার এলে কেন? যে জিনিস সহ্য করতে পারো না সেটা না দেখলেই নয়? যাও, ভেতরে যাও—

নিষ্ঠুরতার একটা আশ্চর্য আকর্ষণ আছে। খুবই খারাপ লাগছে যদিও, তবু সরে যাওয়া যায় না। লোকে পয়সা দিয়ে টিকিট কিনে সিনেমায় মারামারি দেখতে যায়, ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে পথ-দুর্ঘটনায় মৃত মানুষের তালগোল পাকানো দেহ দেখে আসে। সুমিত্রা মুখে বিতৃষ্ণা ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মনুষ্যেতর প্রাণীরা ষষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করতে পারে। এতক্ষণ বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টার পর শেষ অবধি ধরা পড়ে শুয়োরটা বিকট চিৎকারে গলির বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছে। বিশুয়া মাঝে মাঝে পেটে চড় মেরে জন্তুটাকে থামাবার চেষ্টা করছে। চিৎকার আরও বেড়ে যাচ্ছে তাতে।

ঠিক এই সময়েই বইখাতা হাতে দীপা মোড় ঘুরল। আজ বুধবার খুব ভোরে উঠে দীপা প্রফেসরের বাড়ি গিয়েছিল পড়তে। ওর সামনে এই ব্যাপারটা না ঘটলেই ভাল হত। কতদিন তো দীপা দেরি করে বাড়ি ফেরে, আজই বা এমন ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে আসবার কী দরকার ছিল? আর এই লোকগুলোও যেন কী! তিন-চারজন জোয়ান মরদ মিলে কী যে হাত-কাড়াকাড়ি খেলছিস! নিয়ে যা না বাপু তাড়াতাড়ি করে—

দীপা একটু দূর দিয়ে ঘুরে, শেষ কয়েক পা প্রায় দৌড়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ল। অমরেশ এবার বেশ একটু জোর দিয়ে স্ত্রীকে বললেন—যাও তো, দীপাকে নিয়ে ভেতরে যাও। কী দেখছ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

বিশুয়ার সঙ্গী কোথা থেকে একটা রিক্সা টেনে এনে গলির মধ্যে ঢুকিয়েছে। রিক্সার পাদানিতে গোল করে পাকানো অনেকখানি নাইলনের দড়ি।

বিশুয়া জিজ্ঞাসা করল—রস্‌সি মিলি?

সঙ্গী বলল—ইয়ে তো বা—

তারপর সবাই মিলে শুয়োরটার চার পা একজায়গায় করে বাঁধার কাজে লেগে গেল। জন্তুটার পেটে হাঁটু দিয়ে চেপে বসে আছে স্বয়ং বিশুয়া, বাকিরা ঠ্যাংয়ে দড়ি জড়াচ্ছে। এরা শুয়োর কী করে মারে অমরেশ তা জানেন। সেই বীভৎস প্রতিক্রিয়ার কথা মনে পড়ায় তাঁর গা কেমন করে উঠল। এখনই এত চেঁচাচ্ছে, বিকেলে ভোজের প্রস্তুতির সময়—না, অমরেশ ওকথা ভাববেন না।

রিক্সার পাদানিতে শুয়োরটাকে ফেলে তার গায়ের ওপর পা দিয়ে দু'জন বসল। একজন হ্যান্ডেল আর সিটের পেছন ধরে গাড়ি টানতে লাগল। অপরজন হেঁটে চলল পাশে পাশে। মোড়ের ওধারে তাদের গলার আওয়াজ মিলিয়ে এল।

অমরেশ মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘরে ঢুকতে যাবেন, রাস্তার ওপারে সতেরো নম্বর বাড়ির দরজা খুলে প্রৌঢ় কর্তা বেরিয়ে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে অমরেশকে বললেন--কী কাণ্ড বলুন তো মশাই? ভদ্রপাড়ার মধ্যে এসব ব্যাপার -ছি ছি! শুয়োরটা কী বিশ্রী চিৎকার করছিল শুনেছেন? চোখের সামনে এমনভাবে প্রাণীহত্যা—নট ডিসেণ্ট। কেউ একটা কথাও বলল না। দেশের নৈতিক মান কোথায় নেমে গিয়েছে বুঝতে পারছেন?

অমরেশ কখনও কোনওরকম বাদপ্রতিবাদের ভেতর যান না, আজ হঠাৎ বলে ফেললেন--আপনিও তো আর একটু আগে বেরুলে পারতেন।

যারা অপরের পেছনে লাগতে চায় কিংবা মামলা-মোকদ্দমা করতে চায়, সেইসব দুষ্টু লোকেরা গুরুজনস্থানীয় সতেরো নম্বরের কর্তার কাছে কুপরামর্শ নিতে আসে। খোঁচা খেয়ে হজম করার পাত্রই তিনি নন। ভদ্রলোক প্রায় তেড়ে উঠে বললেন—আপনি তো প্রথম থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আপনার নিজের রেস্‌পনসিবিলিটি নেই?

অমরেশ বুঝলেন কথা বাড়বে। তিনি বাড়ির মধ্যে চলে এলেন। সতেরো নম্বরের কর্তা ভদ্রপাড়ায় অমরেশের বসবাস যোগ্যতা সম্বন্ধে ক্রোধী মন্তব্য প্রকাশ করে চলেছেন। সকাল পেরিয়ে বেলা বাড়ছে।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাকে কি এখন খেতে দেব?

—না, একটু বাদে দাও। আজ সাড়ে দশটা নাগাদ বেরুলেও চলবে।

—কেন গো? অফিসের দেরি হয়ে যাবে না?

—যাবার সময় ম্যাকনীল অ্যান্ড ম্যাগার থেকে একটা কোটেশন নিয়ে যেতে হবে। বারোটার আগে সে কোম্পানির সেল্‌স ম্যানেজারকে পাওয়া যাবে না—

আজ দিন শুরু হয়েছিল মোলায়েম আমেজ নিয়ে। অভ্যেসমত অমরেশ খুব ভোরে উঠেছেন। তাকিয়ে দেখেছেন বাড়ির পাশে পরশপিপুল গাছের পাতায় কাঁপছে সকালের স্নিগ্ধ হাওয়া। একটা কাক সরু একখানা কাঠি মুখে নিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এ ডাল থেকে ও ডালে। বোধহয় বাসা বাঁধবে। এই সময়টা ভারি সুন্দর। সূর্যের তাপ বাড়তে শুরু করে নি, বাঁচবার জন্য দৈনিক দৌড় শুরু হয়ে যায় নি, জেগে ওঠে নি পৃথিবীর বণিকসমাজ। মানুষ হিসেবে নিজের প্রকৃত পরিচয়টা এইসময়ে অনুভব করা যায়।

তারপরেই সুর কেটে গেল বিশুয়ার দলের আগমনে। অবশ্য এসব অসুন্দর ব্যাপার না থাকলে পাশাপাশি সৌন্দর্যকে ঠিকভাবে উপভোগ করা যায় না। তবু শুয়োরটার কথা ভাবলে খারাপ লাগছে। এই চমৎকার পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বিচরণ করবার আজই ওর শেষ দিন। অসহায় প্রাণীদের কত কষ্ট!

ভেতরের বারান্দায় ডাইনিং টেবিলে বসে জলখাবার খাচ্ছে দীপা। ভোরবেলায় কেবল এককাপ চা আর দুটো বিস্কুট খেয়ে পড়তে গিয়েছিল। সিগারেট ধরিয়ে অমরেশ মেয়ের কাছে এসে বসলেন। কত বড় হয়ে গিয়েছে দীপা। এতদিন যেন ভাল করে খেয়াল করেন নি। এবার ওর বিয়ের ব্যবস্থা দেখতে হবে। সামনের

বছর পার্ট-টু' পরীক্ষা—তারপরই বিয়ে দিয়ে দেবেন। পঁচিশ হাজারের একটা ইনসিওরেন্স পলিসি সামনের বছরেই ম্যাচিওর করছে। তার সঙ্গে কিছু ধার, ওর মায়ের যা গয়না আছে তার থেকে কিছু নিয়ে—দেখা যাক। ভাল পাত্র পাওয়াই তো আসল সমস্যা। ওপর থেকে সবাই ভদ্রলোক, সবাই ভাল বংশের ছেলে। তারপর বিয়ে হয়ে গেলে একটু একটু করে গুণ প্রকাশ হতে শুরু করে। কেউ ড্রাগের নেশায় বুঁদ, কেউ বা মাইনের টাকা এনে পাড়ার বৌদির হাতে দেয়, কেউ বা রাতে বাড়ি ফেরে না। কারও আবার এই সমস্ত গুণ একসঙ্গে আছে। মেয়ের বিয়ে মহা সমস্যা।

দীপা বলল—বাড়ির সামনে থেকে শুয়োরটাকে ধরে নিয়ে গেল, পাড়ায় কেউ কিছু আপত্তি করল না কেন বলো তো? এত বিচ্ছিরি লাগে! ওইভাবে চারপা বেঁধে—আর কী চেঁচাচ্ছিল। শুনেছো?

না শুনে আর উপায় কি। পাড়ার সকলে শুনেছে। মেয়ের কথায় নিজেকেও তিরস্কৃত বিবেচনা করে অমরেশ বললেন—আমারও খুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু একটা কথা ভাব, ওই লোকগুলোকেও তো খেয়ে বাঁচতে হবে?

—ওরা বাজার থেকে মাংস কিনে খাক।

—মেরি আঁতোয়ানেতের মতো কথা বলিস না। বাজারে মাংসের দাম জানিস? তাছাড়া বাজারেও তো মাংসওয়ালা পশুটাকে মেরেই মাংস বিক্রি করে। হপ্তায় দু'দিন মাংস না হলে তোর চলে না। মাংস খাওয়া ছাড় তাহলে—

কলেজে ঢোকার পর থেকে দীপার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন এসেছে। এখন সে অনেক নির্ভীকভাবে নিজের মতামত দিয়ে থাকে। সে বলল—তোমাব ও যুক্তি খাটে না। যে কোনও ভাবে প্রাণীহত্যাই অন্যায় তা মানছি, কিন্তু বাজারে ব্যাপারটা ঘটে চোখের আড়ালে। এরকম রাস্তার ওপরে নয়।

অমরেশ বললেন—ওরাও রাস্তার ওপরে মারে নি। এখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে মাত্র।

সুমিত্রা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের দু'জনের কথা শুনছিলেন। সংসারের কাজ এবেলার মতো চুকেছে। সারাদিন রান্নাঘরে কাটানোয় সুমিত্রা বিশ্বাসী নন। ভাত, ডাল, একটা ভাজা আর মাছের ঝোল গ্যাসে করতে আর কতক্ষণ লাগে? ওবেলার জন্য তরকারিও করা আছে, হিমির মা এসে সন্ধ্যেবেলা কেবল রুটিটা করে দেবে। সারা দুপুর তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ইতিহাস পড়বেন। স্বামীকে লক্ষ্য করে সুমিত্রা বললেন—জীবনে কোনও কিছুই তো ঠিকঠাক করলে না, বন্ধুবান্ধব জোগাড় করে অন্তত একটা পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি তো গড়তে পারো? গ্র্যাণ্ট সাহেবের নাম শুনেছ?

থতমত খেয়ে অমরেশ বললেন—না। কে সে?

সদ্য অধীত বিদ্যা প্রয়োগ করতে পারার গর্বে উদ্ভাসিত মুখে সুমিত্রা বললেন—কোলস্‌ওয়ার্দি গ্র্যাণ্ট। পুরনো কোলকাতার ইতিহাস পড়ে দেখো। ভারতের প্রথম পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির প্রেসিডেণ্ট। ওইরকম একজন সাহেবও যদি এখনকার দিনে থাকত—

—দিল্লিতে এই ধরনের কী একটা দপ্তর আছে শুনেছি। তবে এতবড় দেশে তারা একা আর কী করবে?

—সরকারের পশুপালন দপ্তরে একটা চিঠি লিখলে হয় না?

পথে ঘুরে বেড়ানো প্রাণীদের ঘাতকের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য পশুপালন দপ্তরের কোনও কর্মসূচি আছে কিনা অমরেশ জানেন না। আমতা আমতা করে বললেন—তার চেয়ে বরং খবরের কাগজে চিঠি লেখা যেতে পারে। তাতে ধরো জনমতও গঠিত হবে।

সুমিত্রা বললেন—আজ দুপুরে মহিলা সমিতিতে আমি এ নিয়ে আলোচনা করব। জল খেয়ে দীপা গ্লাসটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বলল—সে তোমরা যাই করো না কেন, আজ এই জন্তুটার প্রাণ নিতান্তই গেল।

কথাটা সত্যি। আজ সন্ধ্যেবেলা বিশুয়াদের ভোজ কিছুতেই আটকে থাকবে না।

অমরেশ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—মাঝে মাঝে মানুষ জন্ম পেয়েছি বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে। তোরা তো আধুনিক মেয়ে, কিছুই মানিস না। কিন্তু হিন্দুধর্মে বলে বহুবার নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে তবে মানুষরূপে পৃথিবীতে আসা যায়। চিন্তার স্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা, চেতনার ব্যাপ্তি—এসব মানুষ ছাড়া আর কোন্ প্রাণী ভোগ করতে পারে? ভাব দেখি, মানুষ না হয়ে শুয়োর হলে হয়ত আজ আমাকেই ওরা পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যেত। সন্ধ্যের দিকে শিককাবাব হয়ে যেতাম—

সুমিত্রা রেগে বললেন,—একদম আজেবাজে কথা বলবে না!

অমরেশ হেসে বললেন—হিন্দু নারীর সংস্কারে ঘা লেগে গেল, না? সত্যি, আমাদের প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। অথচ দুনিয়ার বেশিরভাগ লোক এই দুর্লভ মানুষজন্ম অবহেলায় ফুঁকে উড়িয়ে দেয়।

এই সময় কলিং বেল টিং টাং করে বেজে উঠল বাইরে যাবার প্যাসেজে। একই সঙ্গে সজোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ।

সুমিত্রা বললেন—দেখ্ তো দীপা কে এল—

দরজা খুলে ফিরে আসতে আসতে দীপা বলল—জীবনকাকু এসেছেন। বলছেন দীঘায় ঘর বুক করা হয়ে গিয়েছে। আজই নাকি যাবার কথা—

জীবন লাহিড়ী দেয়ালে ছাতা হেলান দিয়ে রেখে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন—হোল ফ্যামিলি ইন ওয়ান প্লেস! কিসের কনফারেন্স হচ্ছে শুনি?

অমরেশ বললেন—এসো জীবন, বোসো। সকালে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল পাড়ায়। একটা শুয়োরকে তাড়া করে ক'জন লোক—

হাত তুলে বাধা দিয়ে জীবন লাহিড়ী বললেন—শুনে ফেলেছি। সতেরো নম্বরের বুড়ো এখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রিভুবন উদ্ধার করে যাচ্ছে। তার খপ্পরে পড়েছিলাম। পুরো ঘটনা আদ্যোপান্ত শুনিয়ে তবে ছাড়ল। তুমিও নাকি একটা ইয়ে—

—বুড়ো বলল বুঝি?

—বলল।

অমরেশ বললেন—যাক গে, যেতে দাও ওসব। বউ আর মেয়েকে মানুষ হিসেবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বোঝাচ্ছিলাম—

পাঞ্জাবির বোতাম খুলে বুকের ওপর ফুঁ দিতে দিতে জীবন লাহিড়ী বললেন—যা নেই তাকে কি আর বক্তৃতা দিয়ে 'আছে' করা যায়?

—সিরিয়াস বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করবে না। পশু বলেই শুয়োরটা প্রতিবাদ করতে পারল না। একটা মানুষকে কেউ ওভাবে ধরে নিয়ে যেতে পারে?

—পারে বইকি। মানুষের ক্ষেত্রে ওর চেয়ে আরও অনেক অবিচার হয়।

—সেরকম হলে সমাজে ঝড় ওঠে, খবরের কাগজে গরম গরম সম্পাদকীয় বেরিয়ে যায়। শুয়োরের জন্য কেউ তা করবে? ওকথা বোলো না জীবন, মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে? আজ নয়, পঁয়ত্রিশ বছর আগে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে ডালটনগঞ্জ বেড়াতে গিয়ে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলাম। একটা ছোট টিলার ওপর বিকেলবেলা দাঁড়িয়ে চারদিকের মুক্ত প্রান্তর দেখে মনে হয়েছিল—শেকলটা শুধু মনের, পায়ে কোনও বেড়ি নেই। মানুষ যতদূর ইচ্ছে চলে যেতে পারে, যতদূর ইচ্ছে—

জীবন লাহিড়ী বললেন—বেশ, না হয় তোমার কথাই ঠিক। এখন যা বলতে এসেছি বলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। সুমিত্রা বউঠান আর দীপা অনেকদিন থেকে বেড়াতে যাবার কথা বলছিল। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক দীঘায় নতুন হোটেল খুলেছে, তার হোটেলে দুটো ঘর বুক করে দিয়েছি। আমার বউও যাবে। দীঘা যাবার একটা নতুন বাস হয়েছে জানো তো? বেলা একটায় চিড়িয়ামোড়ে আসে, সেইটে ধরব। তোমার আজ আর অফিস গিয়ে কাজ নেই, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—

সচমকে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে অমরেশ বললেন—সর্বনাশ! তার কি আর উপায় আছে? তোমার বউঠান আর দীপা বরং যাক, আমি থাকি। ফার্মে অডিট চলছে, এখন ডুব দিলে সেকশন অফিসার আর আস্ত রাখবে? হাত-পা বাঁধা রে ভাই, হাত-পা বাঁধা—

ব্রজভূষণের বিশ্বাসপ্রাপ্তি

কিশোরীদের মেসে সম্প্রতি এক ভয়ানক নাস্তিক এসে ভর্তি হয়েছেন। ভদ্রলোকের বয়েস বছর চল্লিশ, মধ্য কোলকাতার কোনো এক কলেজে বিশুদ্ধ গণিত পড়ান। রোগা, ফর্সা চেহারা—দাড়ি গোঁফ সব নিপুণভাবে কামানো। ঝক্‌ঝকে চোখে যুক্তির ইস্পাত মাঝে মাঝেই তর্কের আলোয় চমকে উঠছে। নাম ব্রজভূষণ চক্রবর্তী। ছুটিছাটার দিন বিকেলে কিশোরীর মেসে আমাদের জমাট আড্ডা বসে, মুড়ি আর তেলেভাজা সহযোগে দুনিয়ার যত অসম্ভব গল্পের আদানপ্রদান হয়। ব্রজভূষণ আসার পর আমাদের সে আড্ডা একেবারে মাটি হবার যোগাড়। অন্ধকার পাড়াগাঁর পথে হাঁটতে গিয়ে পাশের জঙ্গলে সাদামত কিছু নড়তে দেখার ব্যাপারটা চিরন্তন ভৌতিক ঘটনা, যে কোনো আড্ডায় কেউ না কেউ এমন একটা গল্প বলবেই। এর থেকেই পরবর্তী আসল গল্পগুলো আসতে শুরু করে। আমরাও নির্বিবাদে শুনে যাই। যখন কলেজের ছাত্র, অধ্যাপক মশাই কোলরিজের 'রাইম অফ দি অ্যানসেণ্ট ম্যারিনার' পড়াতে গিয়ে উইলিং সাস্‌পেনশন্‌ অফ ডিজবিলিফ-এর কথা বলেছিলেন। সেই মানসিকতা খাটিয়েই এসব গল্প শুনি, অন্তর থেকে বিশ্বাস করি

বলে নয়। আড্ডায় আজকাল এমন গল্প শুরু হলেই ব্রজভূষণ চক্রবর্তী বলেন—দূর মশাই! ওসব হল পিওর হ্যালুসিনেশন—ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। গাঁজাখুরি গল্প শুনে আর ছোটবেলা থেকে কতগুলো অমূলক কুসংস্কার মনে পুষে রেখে আমাদের এই দশা হয়েছে। এমন দেখতে চাই বলেই এমন দেখি।

কিশোরী বলে—তাহলে ব্যাখ্যার অতীত বলে কিছু নেই?

—না, নেই। মুখে নিজেদের যতই যুক্তিবাদী বলে প্রচার করি না কেন, মনের গভীরে আমাদের একটা আদিম সত্তা আছে—সেটা হাঁচি-টিকটিকি অমাবস্যা বারবেলা সবই মানে। এই সত্তাই আমাদের ব্যাখ্যা খুঁজতে বাধা দেয়।

—আপনার ক্ষেত্রে সেটা কাজ করে না?

মৃদু হেসে ব্রজভূষণ বলেন—করতো। যুক্তিবাদী চিন্তা দিয়ে, চর্চা দিয়ে সে সত্তাকে আমি জয় করেছি।

নলিনাক্ষ ভট্ট ওধার থেকে বলে উঠলেন—তার মানে আপনি বলতে চান কঠিন পরিস্থিতিতে পড়লে আপনি ঈশ্বরকে ডাকেন না? প্রাণান্তকর ব্যাধি হলে মা-কালীর কাছে স'পাঁচআনা পুজো মানত করেন না?

তক্তাপোশে পাতা শীতলপাটির ওপর শরীরের উর্ধ্বাংশ এলিয়ে দিয়ে ব্রজভূষণ বললেন—সাধারণত করি না। তবে মিথ্যা বলব না, তেমন তেমন টাইট কর্ণারে পড়লে কখনো-সখনো যে অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক কাজ করে ফেলি না তা নয়। এই তো গত বছরই দেশের বাড়িতে মেয়ের জ্বর হল। একদিন দুপুরে হঠাৎ জ্বর উঠে গেল একশো ছয় ডিগ্রী। বাড়িতে কান্নাকাটি চলছে, মেয়ে বুঝি আর বাঁচে না। এ সময়ে ডাক্তাররা বরফজলে স্নান করিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে বরফ পাবো কোথায়? ভেজা গামছা দিয়ে মেয়ের গা মুছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমার মনের অবস্থা ভাবুন! ওই জ্বর বেশিক্ষণ থাকলে ব্রেনের সেল চিরকালের জন্য ড্যামেজ হয়ে যাবে। অথচ কিছুই করার নেই। এই সময়ে আমার মেজকাকিমা বললেন—ব্রজ, পরেশকে বল, পীরবাবার দরগা থেকে দৌড়ে জলপড়া নিয়ে আসুক। কোনো ভয় নেই, পীরবাবার দয়ায় সব ঠিক হয়ে যাবে—

এখন স্বীকার করতে লজ্জা হয়, কিন্তু তখন আমি সাহস বজায় রাখতে পারি নি। কাকিমার কথা মেনে নিয়ে খুড়তুতো ভাই পরেশকে জলপড়া আনতে পাঠাই—

নলিনাক্ষ ভট্ট বললেন—তবেই দেখুন, আপনিও আসলে বিশ্বাস করেন।

ব্রজভূষণ বললেন—আদৌ নয়। ওটা স্বাভাবিক হিউম্যান রিঅ্যাকশন, সেরিব্রাল ফাংশান নয়।

—কিন্তু জলপড়ায় মেয়ে সেরে তো উঠল?

—সেরে উঠল, তবে জলপড়ায় নয়, নিজের সিস্টেমের কেরামতিতে—

—আপনি প্রমাণ করতে পারেন জলপড়ায় কোনো কাজ হয় নি?

নিজের বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গের হাসিটা দিয়ে ব্রজভূষণ বললেন—না, পারি না। কিন্তু আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে, জলপড়াতেই অসুখ সেরেছিল?

নলিনাক্ষ ভট্ট চটে উঠে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আমি বললাম—তর্ক থাক। ব্রজবাবু, আমি আপনাকে এমন একজন মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারি, যাঁর ক্ষমতা দেখলে আপনার অবিশ্বাস হয়ত আর থাকবে না।

যাবেন ?

ব্রজভূষণ বিদ্রূপ-বঙ্কিম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—কোনো বাবাজি-টাবাজি বুঝি ? ছোটবেলায় গাছ থেকে পড়া কিম্বা জলে-ডোবা দুর্ঘটনার কথা হাত দেখে বলে দেবেন ? নাকি আগামী চৈত্রে যে ফাঁড়াটা আছে তার জন্য শ্বেত বেড়েলার মূল মাদুলি করে পরতে বলবেন ?

ভদ্রলোকের রূঢ়তায় মনে ব্যথা পেলেও হেসে বললাম—না, বাবাজি নয়, গৃহী সাধক। তিনি আপনার কাছে পয়সাও চাইবেন না, মাদুলিও বিক্রি করবেন না—

—প্রথমে করবেন না। তারপর আমার বিশ্বাস জন্মে গেলে একদিন মহা-মৃত্যুঞ্জয় কবচ বানাতে দুশো টাকার যজ্ঞ করতে বলবেন। এসব বুজরুকি আমার খুব জানা আছে মশায়—

এবার একটু কড়া সুরেই বললাম—ব্রজবাবু, আমি যাঁর কথা বলছি তাঁকে আপনি চেনেন না। অনর্থক একজন অজানা মানুষের নামে অপবাদ দিচ্ছেন কেন ? সাধকদের মধ্যে কেউ কেউ ভণ্ড থাকতে পারে, তা বলে কি সবাইকে অবিশ্বাস করা উচিত ?

আমার কড়া সুরে বিন্দুমাত্র না দমে ব্রজভূষণ বললেন—অর্থাৎ এই সাধক-বাবাজি আমার কাছে একটা আননোন কোয়াণ্টিটি, এঁকে তাই আমার বেনিফিট্ অফ ডাউট দিতে হবে, কেমন ? ঠিক আছে, চলুন—একবার আলাপ করেই আসা যাক। কোথায় যেতে হবে ?

বললাম—আজই বিকেলে চলুন না—

—আজই ? কোলকাতায় নাকি ?

—কোলকাতায়। বিকেল পাঁচটা নাগাদ তৈরি হয়ে থাকবেন, আমি এসে নিয়ে যাবো। কিশোরীও যাবে নাকি ?

কিশোরী এতক্ষণ চুপ করে আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার নিরাসক্ত ভঙ্গিতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বলল—যাবো বইকি, নিশ্চয়ই যাবো। ব্রজবাবু যুক্তি দিয়ে থই পাচ্ছেন না, এ জিনিস না দেখলে চলে ?

ব্রজভূষণ কিশোরীর দিকে একবার অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন।

বেলা হয়েছিল। তখনকার মতো বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় ফিরলাম।

কিশোরী আর ব্রজভূষণকে নিয়ে বিকেল পাঁচটার পর যখন তারানাথের বাড়ির দরজায় হাজির হলাম, তখন আকাশে মেঘ ঘনিয়ে এসে টুপটাপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তারানাথ আর আমাদের মধ্যে কেমন একটা বৃষ্টির যোগ আছে। চড়চড়ে রোদ্দুরে ভরা দুপুরে ঠিক করলাম বিকেলে তারানাথের বাড়ি যাবো। বিকেলে বেরুবার সময় ঠিক দেখি আকাশ কালো, ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। তারানাথের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বৃষ্টি নামে।

বাড়ির দরজার ওপর টাঙানো বিবর্ণ সাইনবোর্ডটা দেখে ব্রজভূষণ মুখের একটা তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক ভঙ্গি করলেন।

কড়া নাড়তে তারানাথের মেয়ে চারি ওরফে চারুপ্রভা এসে দরজা খুলে দিল। বললাম—ভাল আছ চারি ? বাবা বাড়িতে আছেন ?

চারি মেয়েটি সুদর্শনা। খুব ফর্সা বা খোদাই করা চোখ-মুখ না হলেও আর

পাঁচটা মধ্যবিত্ত মেয়ের থেকে চারি একটু আলাদা। পনেরো-ষোলো বছর বয়সে শরীরে যৌবনের আগমন সূচিত হলে সব মেয়েকেই কিছু পরিমাণে শ্রীমণ্ডিতা বলে মনে হয়, কিন্তু চারির সৌন্দর্য অন্যরকম।

সে শান্ত এবং ধীর। বড় বড় চোখের ওপর তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ। অচপল আর সংযত হাবভাব তাকে একটা এমন অনন্য মহিমা দান করেছে, যেটা ব্যক্তিত্বের প্রভা হিসেবে তার উপস্থিতিকে সব সময় ঘিরে থাকে। এতটুকু মেয়ের পক্ষে ব্যাপারটা সম্ভ্রমজনক। প্রথম যখন তারানাথের বাড়িতে আসি তখন চারির পাঁচ-ছ' বছর বয়স। চোখের সামনে মেয়েটাকে বড় হতে দেখে ইদানীং একটু শঙ্কিত হয়ে উঠেছি। নববর্ষার জলে পুষ্ট মালতীলতার মতো বেড়ে উঠেছে চারি. তারানাথ এখনো এর বিয়ের উদ্যোগ করছ না কেন?

আমাকে আর কিশোরীকে দেখে চারির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—কাকাবাবু মধ্যে অনেকদিন আসেন নি যে? আসুন—

—কাজে ব্যস্ত ছিলাম মা। আমরা বসি, তুমি বাবাকে ডেকে দাও—

ব্রজভূষণ শিক্ষিত লোক। আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত তাঁর শাণিত শরবর্ষণ একটু বেশি প্রখর হয়ে পড়লেও তার ভেতর কোনো হীনতা ছিল না। চারির উপস্থিতিতে তিনি কোনো কথা বলেন নি, এবার সে বেরিয়ে যেতে চারদিকে তাকিয়ে বললেন—এই তাহলে গ্রেট ম্যানের ঘর?

তারানাথের বসবার ঘরের সাজসজ্জা গৃহস্বামীর সাম্প্রতিক অবস্থা-বিপর্যয়কে প্রকট করে তুলেছে। চটা-ওঠা এবড়ো-খেবড়ো সিমেন্টের মেঝে, নড়বড়ে তক্তাপোশে জীর্ণ শীতলপাটি, প্রায় এক যুগ চুনকাম-না-হওয়া দেওয়ালে নোনাধরা দাগ। পাল্লায় কাচভাঙা আলমারিতে বোঝাই অজস্র পুরনো পঞ্জিকা।

কিশোরী দুঃখিত গলায় বলল—ভালো মানুষের ধনীও হতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই ব্রজভূষণবাবু—

কথাটা বলে ফেলেই ব্রজভূষণ বোধহয় লজ্জিত হয়েছিলেন। তিনি বললেন—না, মানে—আমি কথাটা ঠিক সে অর্থে—আমি বলছিলাম যে—

এমন সময়ে তারানাথ বাড়ির ভেতর থেকে বসবার ঘরে এসে ঢুকল।

—এই যে, তোমরা এলে তাহলে! এতদিন ছিলে কোথায়? ইনি কে?

আমরা যথাবিধি ব্রজভূষণের সঙ্গে তারানাথের পরিচয় করিয়ে দেবার পর কিশোরী বলল—আজ কিন্তু আমরা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি।

তারানাথ একটু অবাক হয়ে বলল—উদ্দেশ্য? কি উদ্দেশ্য?

—আমাদের ব্রজবাবু যুক্তি দিয়ে যা প্রমাণ করা যায় না, তা বিশ্বাস করেন না। পরলোক, আত্মা, ঈশ্বর—কিছুই না। তাই—

তারানাথ হেসে বলল—সে তো ওঁর নিজস্ব ব্যাপার। তার জন্যে হঠাৎ আমার কাছে এলে কেন?

এবার আমি বললাম—দেখুন, পৃথিবীতে সত্যিই নাস্তিক মানুষ অনেক আছেন। তাঁদের সবাইকে বিশ্বাসী করে তোলা আমাদের ব্রত নয়। কিন্তু ব্রজবাবু আমাদের বন্ধু, আর আপনিও আমাদের ঘনিষ্ঠ। তাই সুযোগটা ছাড়লাম না। আপনি যদি আমাদের একটু সাহায্য করেন—

—না ভাই, আমি কি করব? আমি কিছু জানি না—

—না, মানে যদি অন্তত ওঁর জীবনের এমন কিছু ঘটনা বলে দেন যা অন্য কারো জানবার কথা নয়, বা ওইরকম কিছু—

তারানাথের এই ঘরে বসে এমন ঘটনা আমরা অনেক ঘটতে দেখেছি। কিন্তু আজ তারানাথ নিতান্ত কঠোর। কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারলাম না। লজ্জিত মুখে বসে রইলাম।

ব্রজভূষণ বললেন—আপনাদের বিব্রত হবার কোনো কারণ নেই। বিশ্বাস ব্যাপারটা এক ধরনের ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থা। সামাজিক, শিক্ষাগত এবং পারিবারিক বিশেষ আবেষ্টনী এটাকে গড়ে তোলে। সেই অকারণ বিশ্বাসের ফলে এই ভদ্রলোকের ওপর আপনারা এমন কিছু অবাস্তব গুণ আরোপ করেছেন যার অস্তিত্ব কেবল আপনাদের মনেই। দোষটা আমাদের নয়, ওঁরও নয়। অল্পবয়েস থেকে কার মানসিকতা কিভাবে গড়ে উঠছে তার ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে।

তারানাথের দিকে তাকিয়ে ব্রজভূষণ বললেন—মার্জনা করবেন, আমি এর দ্বারা আপনার প্রতি কোনো কটাক্ষ করি নি। কারো যদি কোনো অলৌকিক ক্ষমতা না থাকে—না থাকাটাই স্বাভাবিক—তবুও তাঁর সৎ এবং ভালো মানুষ হতে বাধা নেই। আপনাকে শ্রদ্ধা করার জন্য এঁরা কয়েকটি অতিরিক্ত গুণ আপনার ওপর আরোপ করেছেন, কিন্তু সেজন্য আপনি দায়ী নন—

অমায়িক হেসে তারানাথ বলল—সে তো ঠিকই। ঠিকই তো—

আমরা মরমে মরে গেলাম। যারা কোষ্ঠীবিচার করাতে কিম্বা হাত দেখাতে আসে তাদের তারানাথ মাঝে মাঝে দু'একটা আশ্চর্য কাণ্ড দেখিয়ে অবাক করে দেয়। তার এই বৈঠকখানায় বসে সে জিনিস এই ক'বছরে কতবার দেখেছি। আজ আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও তার নিরুত্তাপ ব্যবহার আমাদের নিদারুণ অপ্রস্তুত করল।

তারানাথ একজন সাধারণ মানুষ এবং তার ভেতরে কোনো বিশেষ ক্ষমতা নেই—এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে ব্রজভূষণ তারানাথের সঙ্গে নানান সাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ জুড়ে দিলেন। আমাদের ইচ্ছে ফলবার আর কোনো আশা নেই দেখে হতাশ হয়ে বললাম—আমাদের কথা তো রাখলেন না, অন্তত একটু চা খাওয়ান—

তারানাথ বলল—চায়ের কথা বলবো ভাবছিলাম, কিন্তু তোমাদের এই বন্ধুটির হয়তো সময় হবে না। সেজন্যই আগে বলি নি—

ব্রজভূষণ অবাক হয়ে বললেন—আমার? আমার সময় হবে না কেন? মানে, চা খাবো বলে বলছি না—কিন্তু আমার তো এখন কোনো কাজ নেই—

তারানাথ শান্তভাবে বলল—কাজ কখন আসে তা কি আগে থেকে বলা যায়? চা করতে বলি তাহলে?

ব্রজভূষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—বলুন।

বাড়ির ভেতরে চা করতে বলে এসে তারানাথ ভাঙা আলমারির পাল্লা খুলে মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা একতাড়া সাদা কাগজ বের করল। সমাগত ভক্ত-শিষ্যদের সঙ্গে বসে হস্তরেখা বা কোষ্ঠীবিচার করবার সময়ে তারানাথ এর থেকে কাগজের স্লিপ নিয়েই হিসেবনিকেশ করে, ব্যবস্থাপত্র দেয়। একটুকরো কাগজে কি লিখে ভাঁজ করে একখানা খামে পুরে গঁদের আঠা দিয়ে খাম বন্ধ করল তারানাথ,

তারপর ব্রজভূষণের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি তো শিক্ষিত ব্যক্তি, অধ্যাপনা করেন। আপনাকে একটা কথা দিলে রাখবেন আশা করি?

ব্রজভূষণ একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলেন—কথা দিলে অবশ্যই রাখব। কিন্তু কি কথা দিচ্ছি সেটা আগে জানা দরকার—

—নিশ্চয়ই। এই মুখবন্ধ খামটা আমি আপনাকে দিচ্ছি, আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন পরে রবিবার বিকেলে এটা নিয়ে আপনি আমার এখানে আসবেন। আপনাকে শুধু কথা দিতে হবে যে, এর মধ্যে আপনি এ খাম খুলবেন না। ঠিক আছে?

ব্রজভূষণ না-বোঝার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—কেবল এই? খামটা নিয়ে যাবো, আবার পনেরো দিন পরে আপনার কাছে নিয়ে আসবো?

—এবং এর ভেতরে সেটা খুলবেন না।

—বেশ। কিন্তু কেন?

তারানাথ হেসে বলল—কারণ কি একটা থাকতেই হবে? মনে করুন না, একজন বৃদ্ধের অনুরোধে একটা অকারণ কাজ করছেন।

খামটা হাতে নিয়ে ব্রজভূষণ বললেন—ঠিক আছে। পনেরো দিন পরে এটা নিয়ে আমি আপনার কাছে আসবো।

কি হচ্ছে বুঝতে না পারলেও কিশোরী আর আমি তখন কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। কিশোরী বলল—সেদিন কিন্তু আমরাও আসবো।

তারানাথ বলল—আসবে বইকি। তোমরা না এলে ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

এমন সময় চারি একখানা খাবার থালায় চারটে চায়ের পেয়ালা এনে আমাদের সামনে তক্তাপোশের ওপর রেখে গেল।

পেয়ালা হাতে নিয়ে সবে চুমুক দিতে যাচ্ছি, হঠাৎ বাইরে থেকে কে ডাকল—ব্রজভূষণবাবু এখানে আছেন নাকি?

পেয়ালা নামিয়ে রেখে বিস্মিত হয়ে ব্রজভূষণ বললেন—এখানে আমাকে কে খোঁজ করতে এল?

কিশোরী বলল—আমি দেখছি।

একটু পরেই তার সঙ্গে ভেতরে ঢুকলো রমেন। সে কিশোরীদের মেসের একজন মেম্বার।

ব্রজবাবু বললেন—আরে! আপনি এখানে? কি ব্যাপার?

রমেন বলল—ব্রজবাবু, আপনি একবার মেসে চলুন। কিশোরী এখানে গল্প করতে আসে জানি, আজ দু'জনে একসঙ্গে বেরুলেন—ভাবলাম এখানে হয়তো পাওয়া যাবে। তাই—একবার চলুন আমার সঙ্গে—

তার মুখের ভাব দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রজভূষণ বললেন—কি হয়েছে রমেনবাবু? কোথায় যাবো আপনার সঙ্গে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমেন বলল—আপনি বেরিয়ে আসবার একটু পরেই আপনার একখানা টেলিগ্রাম এসেছে। আমিই সই করে নিয়েছি।

ব্রজভূষণ ব্যগ্র হয়ে বললেন—কি, কি আছে টেলিগ্রামে?

—আপনার মায়ের খুব অসুখ। টেলিগ্রাম করেছে আপনার ছোট ভাই।

ব্রজভূষণের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তক্তাপোষ থেকে পা নামিয়ে ব্যস্ত হয়ে

চটিতে পা গলাতে গলাতে বললেন—সে কি! মায়ের অসুখ! আমার তো তাহলে এখনি রওনা দিতে হয়। ও কিশোরীবাবু, আপনার কাছে তো ঘড়ি আছে, একবার দেখুন দেখি—সওয়া সাতটার গাড়ি ধরতে পারবো কি? রমেনবাবু, সত্যি করে বলুন, খারাপ কিছু নয় তো? মা আছেন তো?

—না না, সে-সব কিছু নয়। চলুন, গিয়ে তো নিজের চোখেই টেলিগ্রাম দেখবেন।

ঘড়ি দেখে কিশোরী বলল—খুব তাড়াতাড়ি করলে হয়তো গাড়িটা পেতে পারেন। এক কাজ করুন, একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নিন এখান থেকেই। মেসে গিয়ে চট করে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন, তারপর ওই গাড়িতেই একেবারে ইস্টিশন চলে যাবেন—

ব্রজভূষণ তারানাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—এভাবে হঠাৎ চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত—ভাল করে পরিচয় করার সুযোগ হল না। ফিরে এসে বরং একদিন আপনার কাছে—এখন গিয়ে ভাল খবর পেলেই বাঁচি।

তারানাথ বলল—ফিরেই কিন্তু আসবেন একদিন। পনেরো দিন বাদে আপনার তো আসার কথাই রয়েছে। আজ আপনার চা খাওয়াও হল না—

খেতে গিয়েও নামিয়ে রাখা চায়ের পূর্ণ পেয়ালার দিকে তাকিয়ে ব্রজভূষণ বললেন—হ্যাঁ, আজ আর সময় হল না। সামনের দিন বরং—

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গিয়ে ব্রজভূষণ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তারানাথের দিকে তাকালেন।

তারানাথও ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি নিয়ে ব্রজভূষণের দিকে তাকিয়ে আছে।

সত্যিই ব্রজবাবুর চা খাওয়ার সময় হল না।

কিশোরী তাড়া দিল—চল হে, চলুন ব্রজবাবু। এরপর আর ট্রেন ধরতে পারবেন না।

মেসে আসবার পথে ঘোড়ার গাড়িতে ব্রজভূষণ কয়েকবার আপন মনেই বললেন—কোইন্সিডেন্স। কোইন্সিডেন্স—

ব্রজভূষণকে আমরা দু'একজন সঙ্গে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম। কথা রইল, গিয়েই ওখানকার সংবাদ জানিয়ে উনি আমাদের চিঠি দেবেন।

দিনসাতেক বাদে দেশ থেকে ব্রজবাবুর চিঠি এল। তাঁর মায়ের সন্ন্যাস রোগের আক্রমণ হয়েছিল, বাঁচবার কোনো আশাই ছিল না। যাই হোক, এখন তিনি অনেকটা সামলে উঠেছেন। তাঁকে আর একটু সুস্থ করে ব্রজবাবু ফিরবেন।

আরো এক সপ্তাহ কাটল। রবিবার সকালে কিশোরীর মেসে গেলাম ব্রজভূষণ ফিরেছেন কিনা খবর নিতে।

না, ব্রজবাবু ফেরেন নি। আর কোনো চিঠিও আসে নি।

কিশোরী বলল—আজ বিকেলে কিন্তু আমাদের তারানাথের বাড়ি যাবার কথা। এদিকে ব্রজবাবু তো এসে পৌঁছলেন না। কি করবে?

—বিকেল অবধি দেখ। উনি না এলে আমরাই অন্তত যাই।

—বেশ। আমি তাহলে আর এখানে আসব না, সরাসরি তারানাথের বাড়ি চলে যাবো। তুমিও ওখানেই চলে যেও—

বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা দু'জনেই মট্‌স লেনে গিয়ে হাজির হলাম।

তারানাথ বৈঠকখানা ঘরে বসে তামাক খাচ্ছিল, আমাদের দেখে বলল—এস, এস। ভাবছিলাম তোমাদের এত দেরি হচ্ছে কেন।

—আপনার মনে ছিল আজ আমাদের আসার কথা?

—মনে ছিল। বোসো জমিয়ে। চা খাবে?

হেসে বললাম—আজ আবার বাধা পড়বে না তো?

তারানাথও হেসেই বলল—না, আজ আর বাধা পড়বে না।

কিছুক্ষণ বাদেই চারি এসে চা দিয়ে গেল। এর মধ্যে ব্রজবাবুর মা যে ভাল আছেন, সে কথা আমরা তারানাথকে জানিয়ে দিয়েছি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম—একটা কথা বলি। একটু হয়তো অনধিকারচর্চা হয়ে যাবে, রাগ করবেন না। চারির তো বিয়ের বয়েস হল, ওর বিয়ের জন্য চেষ্টা করছেন না কেন?

প্রশ্নটা শুনে তারানাথ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। ইতিমধ্যে কিশোরী পাসিং শো-এর প্যাকেট বের করে তারানাথের সামনে রেখেছে। তার থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাতে ধরাতে অন্যমনস্ক ভাবেই তারানাথ বলল—মনে করার কিছু নেই, তোমরা ঠিকই বলেছো। মেয়ের বয়েস হচ্ছে, বিয়ে তো দিতেই হবে। তাছাড়া তোমরা চারিকে ছোটবেলা থেকে দেখছো, তোমাদের অধিকার আছে বইকি—

খানিকক্ষণ চুপ করে সিগারেট টেনে তারানাথ বলল—চারির বিয়ের জন্য খোঁজখবর করার একটা অসুবিধে আছে।

শুনে একটু থমকে গেলাম। চারি বেশ সুন্দরী মেয়ে, তার বংশগৌরবও ভাল। হাতের কাজেও সে নিপুণা। এ মেয়ের বিয়েতে কি অসুবিধে থাকতে পারে?

ছাইদানি হিসেবে ব্যবহৃত নারকেলের মালায় সিগারেটের দগ্ধাবশেষ গুঁজে দিয়ে তারানাথ বলল—ব্যাপারটা তোমাদের খুলেই বলি, গল্পের মতো লাগবে শুনতে। শুনবে নাকি?

অবশ্যই শুনবো। গল্পের লোভেই তো এখানে আসা।

চারি এসে একখানা পেতলের রেকাবিতে পান আর মশলা রেখে গেল। আজ সে একটা হলুদ তাঁতের শাড়ি পরেছে, টান টান করে চুল বেঁধেছে, কপালে খয়েরের টিপ। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, এর চেয়ে বেশি সাজ কোথা থেকে করবে? কিন্তু তাতেই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে চারিকে। বললাম—হ্যাঁ রে, আজ এত সেজেছিস যে? কোথাও যাবি নাকি?

সে লজ্জিত মুখে মাথা নেড়ে বাড়ির ভেতরে পালিয়ে গেল।

তারানাথ বলতে শুরু করল—

আমার প্রথম যৌবনের ঘটনা তো তোমাদের কিছু কিছু বলেছি। সে-সব বড় আশ্চর্য দিন গিয়েছে। সংসারে মন নেই, বৈষয়িকতায় মন নেই, একটানা কোথাও বেশিদিন থাকতে ইচ্ছে করে না। ঘুরে ঘুরে বেড়াই গ্রামে-গঞ্জে, বনে-পাহাড়ে। একবার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বাংলা দেশ আর বিহারের সীমানায় একটা ছোট্ট গ্রামে রাত্তিরের আশ্রয় নিয়েছি—গ্রাম বলতে দশ-বারোটা খোড়ো চালের বাড়ি মাত্র। গ্রামের প্রান্ত থেকেই শুরু হয়েছে পাহাড় আর জঙ্গল। এক গোয়ালার বাড়ি থেকে মাটির ভাঁড়ে সেরখানেক দুধ কিনে কাছের পাহাড়টার ওপর চলে গেলাম রাত কাটাবো বলে। গাঁয়ের মোড়ল অবশ্য বলেছিল তার বাড়ি থাকতে.

কিন্তু বাড়ির আরামই যদি চাইবো তাহলে আর পথে বেরিয়েছি কেন?

পাহাড়ের ঢালুতে ঘন জঙ্গল। তবে বিহারের দিকে যেমন হয়, বড় বড় গাছ আছে অনেক, কিন্তু গাছের নিচে বাংলা দেশের মতো ঝোপঝাড় নেই। একেবারে তকতকে পরিষ্কার। সেখানেই একটা চৌরস পাথরের ওপর আস্তানা গাড়লাম।

ক্রমে রাত্তির গভীর হতে লাগল। সঙ্গে দেশলাই ছিল, শুকনো কাঠকুটো যোগাড় করে আগুন জেবলে দুধটা জবাল দিয়ে খেয়ে নিলাম। কিটকিট করে একধরনের পোকা ডাকছে বনের মধ্যে, ঝিরঝিরে বাতাস বইছে সন্ধ্যে থেকে। বোধহয় সেইজন্যেই মশা নেই আদৌ। রোজ রাত্তিরে কিছুক্ষণ ধ্যানের অভ্যেস করেছিলাম। কোনো বিশেষ দেবতার মূর্তি কল্পনা বা মন্ত্রজপ নয়, এমনি চোখ বুজে পদ্মাসনে বসে মনকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করতাম। ঘণ্টা দুই-তিন পাথরের টুকরোর ওপরে বসে মনকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্তর্মুখী চেতনার স্রোতে যুক্ত করলাম। যখন ধ্যান শেষ করে চারদিকে তাকালাম. তখন নিশ্চয় মধ্যরাত্রি পার হয়ে গিয়েছে। আকাশে চাঁদ নেই, কিন্তু বনের মধ্যে চুঁইয়ে আসা অজস্র নক্ষত্রের স্নিগ্ধ আলো জ্যোৎস্নার অভাব পূর্ণ করেছে। নিচে গ্রামের বাড়িগুলোতে আলো নিভে গিয়েছে অনেকক্ষণ। দেহাতে এত রাত্তিরে কেউ জেগে থাকে না। কান পেতে থাকলে মাঝে-মধ্যে দু'একটা কুকুরের ডাক শোনা যায়। কি সুন্দর শান্তি ছড়িয়ে আছে পরিবেশে! আমি কবি নই, এসব বর্ণনা যে কাব্য করে দিচ্ছি তা ভেবো না। মাথার নিচে পুঁটলিটা দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লাম পাথরের ওপর। শাল আর সেগুনের বনে বাতাস লেগে কেমন একটা উদাস বাজনার মতো শব্দ হচ্ছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রের ভিড়। কবেকার কি সব কথা যেন আবছা আবছা মনে পড়ে যায়। অথচ পুরোপুরি মনে আসে না। গতজন্মের স্মৃতি কি? হবেও বা—

সারারাত ওই অরণ্যের মধ্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থেকে এক স্বর্গীয় শান্তি নেমে এল আমার মনে। এটাকেই আমি আশ্চর্য অভিজ্ঞতা বলছিলাম। ওই নির্জনতা, ওই রহস্যময় রাত্রি, নক্ষত্রের দল যেন আমাকে সৃষ্টির আদিম মুহূর্তে নিয়ে গেল। এই আকাশ-অরণ্য-মাঠ-নক্ষত্র আর বিশ্বজগৎ তৈরি হবারও আগের সময়ে যখন সমগ্র সৃষ্টিটাই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রয়েছে। দৈবী আনন্দে মন ভরে উঠল। মনে হল—কিছুই তো কিছু নয়। ঐশ্বর্য, খ্যাতি, ক্ষমতা—কিছুই তো আমাকে এই আনন্দের সন্ধান দিতে পারবে না। আমি সেই পাথরের ওপর শুয়েই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—আমার কিচ্ছু হবে না। অন্তত সাধারণ মানুষ বা এমন কি সাধু-সন্ন্যাসীরাও যাকে 'কিছু হওয়া' বলে তা আমার জীবনে হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যে আনন্দ বুকের ভেতর অনুভব করলে পৃথিবীর আর সবকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়, সেই আনন্দের এক চমক দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন। বাকি জীবনটা তারই সন্ধানে ব্যয় করেছি। নইলে সাধনার মাধ্যমে যাঁদের দেখা পেয়েছি, তাঁরা আমাকে ভোগ এবং ঐশ্বর্যের চরম বর দিতে পারতেন। কিন্তু সে প্রার্থনা আমি করি নি। এবার নিশ্চয় তোমরা প্রশ্ন করবে, যার জন্য অন্য সব পার্থিব কামনার বস্তু ত্যাগ করলাম সেই আনন্দের সন্ধান পেয়েছি কিনা। না, পরিপূর্ণভাবে পাই নি। চলার পথের বাঁকে কখনো কখনো এমনি পাহাড়ের

চূড়ায়, কিম্বা আঁকাবাঁকা নদীর ধারের মহাশ্মশানে রাত কাটাতে কাটাতে পরম সত্যের আনন্দময় সংগীতের একটুকরো ভেসে এসেছে মনে—তাতেই জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে।

মনের এই অবস্থাতেই প্রথম মধুসুন্দরীর দেখা পাই। সে গল্প তো তোমরা জানো। ঘুরতে ঘুরতে একজন সিদ্ধপুরুষের সন্ধান পেয়েছিলাম। পাহাড়ের গুহায় থাকেন, গুহার পাশেই বনের মধ্যে তাঁর সিদ্ধাসন—পঞ্চমুণ্ডীর। সাধুজী প্রায়ই অনেক রাত অবধি পঞ্চমুণ্ডীর আসনে বসে থাকতেন। একবার যেন দূর থেকে সাধুজীকে দেখেছিলাম মাঝরাতে একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে কথা বলতে। একটু অবাক হয়েছিলাম। ক'দিনের সাহচর্যেই যতদূর বুঝেছিলাম, সাধুজীর চরিত্র অত্যন্ত পবিত্র এবং নির্মল। তবে ওই মেয়েটি কে? অত রাতে সে কেন আসে, দিনের বেলা যখন আসার সুযোগ আছে?

এর কিছুদিন বাদে সাধুজী কয়েকদিনের জন্য শিষ্যবাড়ি গেলেন। আমি একা রইলাম গুহার আস্তানায়। প্রথম রাতেই কি মনে হল কি জানি, সিদ্ধ আসনের শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য পঞ্চমুণ্ডীর আসনে গিয়ে বসলাম। সেই রাত্তিরেই, আসনে বসে থাকা অবস্থাতেই আমি মধুসুন্দরী দেবীর দেখা পাই। একটু একটু করে সমস্ত বনভূমি ভরে উঠল আশ্চর্য দেবধূপের গন্ধে, পৃথিবীর কোনো চেনা সুবাস সে নয়। কেমন যেন নেশা-নেশা মনে হতে লাগল। তারপরই অরণ্যের একাংশ আলো করে মধুসুন্দরী দেবী আবির্ভূতা হলেন। সে ত্রিভুবন-বিজয়ী রূপ মানুষের হয় না! কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। যাই হোক, এর কিছুদিন পরে আমি সাধুজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। উনিই বলেছিলেন—'যাঁকে দেখেছ, তিনি মধুসুন্দরী দেবী। অনেক ভাগ্য থাকলে ওঁর দেখা পাওয়া যায়। তুমি যদি ওঁর সাধনা করতে চাও তাহলে আমি তার মন্ত্র এবং প্রক্রিয়া বলে দিচ্ছি। কিন্তু আমার এখান থেকে তোমাকে চলে যেতে হবে। এক আসনে দু'জন সাধকের স্থান হয় না।'

সাধুজীর কাছ থেকে চলে এসে বরাকর নদীর ধারে এক শালবনে আস্তানা গাড়ি। দীর্ঘ সাধনার পর একদিন সাধুজীর নির্দেশমতো অমাবস্যার রাত্রিতে আঙট কলাপাতায় পোড়া শোল মাছের নৈবেদ্য দিয়ে হোম করে পূর্ণাহুতি দিই। এর কয়েকদিন বাদে গভীর রাতে মধুসুন্দরী দেবী দেখা দেন। গুরু বলে দিয়েছিলেন, দু'ভাবে দেবীকে লাভ করা যায়—ভার্যারূপে অথবা কন্যারূপে। কন্যারূপে চাইবার বয়েস সেটা নয়। ফলে এর পরের তিন-চার মাস দেবী আমার জীবন অলৌকিক মাধুর্যে ভরে দিয়েছিলেন। শরীরী প্রেম নয়, আসঙ্গলিপ্সা কতক্ষণ আর থাকে? শরীরী কামনার অনেক ঊর্ধ্বের ভালবাসার সন্ধান পেয়েছিলাম সেই দিনগুলিতে।

কিন্তু এ আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হল না। বাড়ির লোক আমার সন্ধান পেয়ে বরাকর নদীর ধারের সেই শালবন থেকে জোর করে আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আমি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। খুঁজতে খুঁজতে বাড়ির লোকেরা যখন আমাকে আবিষ্কার করে, আমি নাকি তখন বনের মধ্যে বসে আপনমনে বিড়বিড় করছি। আমার চুল বড় বড় হয়ে তাতে জট পড়ে গিয়েছে, লম্বা নখের নিচে কালো মাটি। জামা-কাপড় শতছিন্ন। সত্যি সত্যি দড়ি দিয়ে বেঁধে আমাকে

ফিরিয়ে আনা হয়। সেই বাঁধন ছিঁড়ে শেষবারের মতো বরাকর নদীর চরে দেবীর সঙ্গে দেখা করি। তিনি বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার আর কখনো দেখা হবে না। বললাম—কেন দেবী?

—বাড়ি ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই তোমার বিয়ে হবে। জীবনে দ্বিতীয় নারী এলে আর আমার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়।

—আমি বিয়ে করব না।

দেবী হাসলেন।—অসম্ভব। ভবিতব্য কেউ খন্ডাতে পারবে না। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে।

আমি আকুল হয়ে বললাম—তাহলে? আর কখনো নয়? কোনোদিনও নয়?

দেবী অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন—আমাকে একবার পেলে চিরতরে কেউ হারায় না। আবার আমাদের দেখা হবে—তবে এভাবে নয়, এই রূপে নয়—

—তবে? কিভাবে দেখা হবে বলে দিন দেবী।

—এখন জেনে তোমার লাভ নেই। সময় হলে নিজেই বুঝতে পারবে—

তারপর বনের মধ্যে গভীর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি চললাম। তুমি পালিয়েছ বুঝতে পেরে বাড়ির লোকেরা তোমাকে ধরতে আসছে। তোমাকে কিছু ক্ষমতা দিলাম। ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে কোনোদিন অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না। আর সময় নেই, চলি—

দেবী অন্তর্হিতা হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম বনের ভেতর দিয়ে কয়েকটা লণ্ঠনের আলো এগিয়ে আসছে। মনে একটা হাল ছেড়ে দেওয়া হতাশার ভাব, নিবিড় ক্লান্তি। আর পালাবার চেষ্টা না করে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে রইলাম। লোকেরা এসে চিৎকার করে উঠল—এই যে! এখানে বসে আছে!

একজন এসে আমার হাত ধরল। কে যেন বলল—বাতাসে কিসের গন্ধ হে? বেশ গন্ধটা—

আমার হাত বাঁধবার জন্য ওরা দাড়ি নিয়ে এসেছিল। বললাম—বাঁধতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি। ভয় নেই, আর পালাবো না।

বাড়ি ফিরলাম। পরের দিন সকালে গাঁয়ের কেষ্ট নাপিত এসে আমার দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে চুল কেটে দিল। বেশ কিছুদিন আমার মনের কোনো প্রকৃত ক্রিয়া ছিল না—খেতে হয়, নইলে প্রাণ থাকে না—তাই দু'বেলা খেতে বসি। ঘুম আসে না, তবু জোর করে ঘুমোবার চেষ্টা করি। কারণ জেগে থাকলে একটা তীব্র ক্ষতির বোধ বুকের মধ্যে হাহাকার জাগিয়ে তোলে। কি অমূল্য জিনিস চিরকালের জন্য হারিয়েছি, আর তা কখনো ফিরে পাব না। আবার ঘুমোলে স্বপ্নের ভেতরে ভেসে ওঠে বরাকর নদীর ধারের সেই বালির চর—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় অভ্রের কুচি চমকে উঠছে। আলোয়-ছায়ায় মেশা সেই শালবন, উদাস হাওয়া করুণ বাজনা বাজাচ্ছে তার পাতায় পাতায়। কিন্তু শূন্য সেই অরণ্য আজ নিষ্প্রভ, চাঁদের আলো সেখানে ভাল করে খুলছে না। কারণ দেবী আর নেই।

মনে তিক্ত অতৃপ্তি নিয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠতাম।

এই মানসিক অবস্থার ভেতর আমার বিয়ে হয়ে গেল। বিবাহের কোনো

অনুষ্ঠানই আমার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারল না। আবিষ্ট মানুষের মতো যে যা বলল করে গেলাম। পাত্রী আগে থেকেই ঠিক ছিল, আমাদের গ্রামেরই মেয়ে। আমার জীবনে সবই অদ্ভুত, পাত্রী নির্বাচনের ব্যাপারটাও সাধারণভাবে ঘটে নি। ছোটবেলায়, তখন আমার বারো-তেরো বছর বয়েস, সাঁতার কাটতে খুব ভালবাসতাম। নদীতে গিয়ে ঘণ্টাখানেক সাঁতার দিয়ে স্নান না করলে তৃপ্তি হত না। বর্ষার নদীতে গেরুয়া জলের ঢল নামত, কুটো পড়লে দু'খানা হয়ে যায় এমনি স্রোত। এমন এক বর্ষাকালে মনেব সুখে জলে ঝাঁপিয়ে স্নান করছি, হঠাৎ পাড় থেকে সম্মিলিত কণ্ঠের একটা চিৎকার উঠল। সবাই আঙুল দিয়ে নদীর মাঝখানে কি যেন দেখাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি প্রখর স্রোতের টানে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে অসহায়ভাবে ভেসে চলে যাচ্ছে। ওই টানের মুখে হাতিও ভেসে চলে যাবে। কেউই মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য জলে নামতে সাহস করছে না। তখন অল্প বয়েস, মৃত্যুর পরোয়া করি না। দুই হাত্তা সাঁতার দিয়ে এগিয়ে মেয়েটির চুলের গুছি চেপে ধরলাম। এরপর আর ওই ভয়ানক স্রোতের বাধা কাটিয়ে কিছুতেই ফিরে আসতে পারি না। একা হলে কোনো অসুবিধেই হত না। কিন্তু এক হাতে মেয়েটিকে ধরে রেখেছি—ছেড়ে দিলেই সে ডুবে যাবে। একসময় তো এমন হল, মনে করলাম মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাই। পারলাম না। অতি কষ্টে এক হাতে জল কেটে পাড়ের কাছে এলাম। আর সমস্তক্ষণ গ্রামের একদল লোক ঘাটে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে আমাকে উৎসাহ এবং নানারকম পরামর্শ দিয়ে গেল। কে একজন একটা ধুতি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। তবে তার আর দরকার ছিল না, তখন আমি পায়ের নিচে জমি পেয়ে গিয়েছি।

যাকে বাঁচালাম সে আমাদের গ্রামের হরিদাস ভট্টাচার্যের মেয়ে। এই ঘটনার বছর দুই পরে হরিদাস ভট্টাচার্য কথায় কথায় আমার জ্যাঠামশায়কে বলেছিলেন—আমার মেয়েটাকে তো তারানাথ বাঁচালো, এবার আপনারা ওকে পায়ে স্থান দিন—

অবাক হয়ে জ্যাঠামশাই বললেন—তার মানে?

—আজ্ঞে, আমি তারানাথের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করছি। সে আমার মেয়ের প্রাণ রক্ষা করেছে, শাস্ত্রমতে তার প্রাণের মালিক এখন সে-ই। বিধাতাই এ যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন।

জ্যাঠামশাই তখনকার মতো ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন বটে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এসব মজাদার কথা চাপা দিয়ে রাখা কঠিন। কিছুদিনের মধ্যেই গ্রামের লোকেরা এ নিয়ে নানারকম আলোচনা করতে শুরু করল। কেউ বলল—হরিদাসের আক্কেল দেখেছ! ফাঁকতালে মেয়েটাকে পার করবার তালে আছে। আবার কেউ বলল—ঠিকই তো বলেছে। তারানাথের উচিত মেয়েটাকে বিয়ে করা। মনুসংহিতাতে স্পষ্ট এরকম নির্দেশ দেওয়া আছে—

আসলে এমন হলে বেশ একটা মজা হয়। গ্রামের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে দু'পাঁচদিন হৈচৈ করবার মতো কিছুই কখনো ঘটে না। আমার বিয়েটা ঘটিয়ে দিতে পারলে সবাই মিলে একটু আমোদ করা যায়।

এর ফলে সত্যি কিছু হত কিনা কে জানে, কিন্তু এবারে বাড়ির লোকেরা আমাকে ধরে আনার পর হরিদাস ভট্টাচার্য নতুন উদ্যমে এসে আমার জ্যাঠামশাইকে পাকড়াও করলেন। বিয়ে দিলে আমার পায়ে বেড়ি পড়বে, আমি আর পালাতে

পারবো না, এমন একটা ধারণা বাড়ির সকলের ছিল। এদিকে জ্যাঠামশাইয়ের বয়েস হয়েছে, ঘুরে ঘুরে পাত্রী দেখে বেড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ চট করে বিয়েটার ব্যবস্থা না করলে আমি আবার পালিয়ে যেতে পারি। কাজেই সব দিক বিবেচনা করে জ্যাঠামশাই হরিদাস ভট্টাচার্যকে কথা দিলেন। তাঁদের বংশ ভাল, মেয়েটিও দেখতে শুনতে ফেলনা নয়—বিয়েতে আপত্তি হবার কোনো কারণ ছিল না। জ্যাঠামশাই প্রথম দিকে যে ইতস্ততঃ করছিলেন, তার কারণ তাঁর ধারণা ছিল যে শ্বশুরবাড়ি দূরে না হলে জামাইয়ের যথেষ্ট আদর হয় না। অবশ্য এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

তোমরা হয়ত ভাবছ চারির বিয়ের সঙ্গে এ গল্পের সম্বন্ধ কি ? সম্বন্ধ আছে। সে কথায় আসছি। মনোযোগ দিয়ে শুনে যাও।

যন্ত্রচালিতের মত বিয়ে করলাম, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি আমার কোনো টান জন্মালো না। সত্যি বলতে কি, প্রথম চার-পাঁচ মাস তার দিকে ভাল করে তাকিয়েও দেখি নি। রাত্তিরে বৈঠকখানা ঘরে একটা চাদর আর বালিশ নিয়ে আলাদা শুতে যেতাম। দিনের বেলা ভেতরবাড়িতে আদৌ ঢুকতাম না, পাছে কথা বলতে হয়।

গ্রামের ছোট্ট গন্ডীর মধ্যে এসব কথা চাপা রাখা কঠিন। আস্তে আস্তে লোকেদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হয়ে গেল। তারানাথ বৌয়ের কাছে ঘুমোয় না কেন ? এর মধ্যে নিশ্চয় কোনো রহস্য আছে। অনেকে বলতে লাগল—তারানাথ আবার বিয়ে করবে।

একদিন রাত্তিরে যথারীতি বৈঠকখানা ঘরে শুয়ে আছি, গরমে কিছুতেই ঘুম আসছে না। হঠাৎ মনে হল ভেতর-বাড়িতে যাবার দরজায় কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে তাকে ভাল দেখা যাচ্ছে না—তবে বুঝতে পারছি স্ত্রীলোক, কারণ কাপড়ের খস্‌খস্‌ আর চুড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বললাম—কে ? কে ওখানে ?

উত্তরে দরজার আড়াল থেকে এক ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এসে আমার খাটের পাশে দাঁড়াল। আবছা অন্ধকারে ঠাহর করে দেখলাম—আমার স্ত্রী।

কথা বলতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বিদায় করতে গেলেও তো দু-একটা কথা না বলে উপায় নেই। জিজ্ঞাসা করলাম—কি চাও ?

খুব মৃদু গলায় সে বলল—তুমি ঘরে শুতে যাও না কেন ?

বললাম—আমার একটা ব্রত আছে। জানো তো আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলাম।

উত্তরে সে বলতে পারত—ব্রত থাকলে বিয়ে করে আমার জীবন নষ্ট করলে কেন ? বিয়ে না করলেই পারতে—

কিন্তু কোন অভিযোগ না করে সে বলল—কাল থেকে ঘরে শুতে যেও। আমি কথা দিচ্ছি তোমার ব্রত নষ্ট করবো না। লোকেরা পাঁচরকম কথা বলছে। এসব কথা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই সে ফিরে চলে গেল।

বিবেচনা করে দেখলাম আমার স্ত্রীর কথার যৌক্তিকতা রয়েছে। নিজের চিত্তের দৃঢ়তা রক্ষা করার দায়িত্ব আমারই। ঘনিষ্ঠতা করার থেকে নিজেকে নিশ্চয় বিরত রাখতে পারব। কিন্তু আলাদা শোবার মত নাটকীয় কান্ড করে পারিবারিক

সুনাম নষ্ট করতে যাই কেন? এরপর গ্রামের নিন্দুকেরা নানান খারাপ কথা রটাবে। পরের রাত্তির থেকে নিজের ঘরেই শুতে লাগলাম।

রক্তমাংসের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়বেই। দেহধারণ করলে স্বয়ং ঈশ্বরকেও সংস্কারের অধীনতা মানতে হয়। আমার তখন অল্প বয়েস, পাশে তরুণী নবপরিণীতা স্ত্রী। ব্রত খুব বেশিদিন থাকল না।

আমাদের সেকালে নিয়মকানুন অন্যরকম ছিল। আজকাল বৌরা সাজগোজ করে স্বামীর সঙ্গে বায়োস্কোপ দেখতে যায়, কথায় কথায় তর্ক করে, চটুল রসিকতা করে। হালফ্যাশানের বিবিরা বিলেতফেরত স্বামীকে নাম ধরেও ডাকছে খবর পাই। আমাদের সময়ে বৌয়েরা স্বামীদের প্রকৃত শ্রদ্ধা করত, বিনা তর্কে তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করত। আমার স্ত্রী তার ব্যতিক্রম ছিল না। রোজ সকালে উঠে সে আমাকে প্রণাম করে দিনের কাজ শুরু করত। একদিন ভোরবেলা সে আমাকে প্রণাম করছে, লক্ষ্য করলাম তার হাতের অনামিকা মাঝের আঙুলের চেয়ে সামান্য বড়।

ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত। সাধারণত মধ্যমার চেয়ে অনামিকা কখনোই বড় হয় না। লক্ষে একজন মানুষের এমন হতে পারে। লক্ষণশাস্ত্রসার গ্রন্থে এ বিষয়ে কি যেন একটা পড়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই পরিষ্কার মনে করতে পারলাম না। পাছে আবার সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাই, এই ভয়ে আমার পুঁথিপত্র বাড়ির লোকেরা লুকিয়ে ফেলেছে—চাইলেও দেবে না। কাজেই অনামিকা বেশি লম্বা হলে সেটা কিসের লক্ষণ তা আমি স্থির করতে পারলাম না। জিনিসটা আস্তে আস্তে মনের তলায় ডুব দিল।

এর অনেক বছর পরের কথা। তখন আমি পুরোদস্তুর সংসারী হয়ে পড়েছি। চারিরও জন্ম হয়েছে, তার বয়েস বছরচারেক হবে। নৌকো করে এক শিষ্যবাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছিলাম। সঙ্গে চারি রয়েছে। আমাকে সে একদণ্ডও চোখের আড়াল করতে চাইতো না। পরের দিনই দুপুরে ফিরে আসবার কথা, ভাবলাম—মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই, বেড়াতে পেলে খুশিই হবে এখন—

দুপুরে খাওয়াদাওয়া করে রওনা দিয়েছিলাম। স্রোতের মুখে তরতর করে নৌকো ছেড়ে বিকেল চারটের ভেতর অনেকখানি রাস্তা পার হয়ে এলাম। শিষ্যবাড়ি আর ঘণ্টাদুয়েের পথ। এমন সময় উত্তর-পশ্চিম কোণে কাজলের দাগের মত একটু মেঘ দেখা দিল। আমরা প্রথমে কেউ গ্রাহ্য করি নি, কিন্তু মাঝি বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ, তার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। সে বলল—ঠাকুরমশায়, ঝড় উঠবে বলে মনে হচ্ছে। নৌকো কি পারে নেব?

হেসে বললাম—মেঘ এখনো বহু দূরে। তাছাড়া ও মেঘে ঝড় নাও হতে পারে। এসব অচেনা জায়গায় নৌকো ভিড়িয়ে লাভ কি বাবা? তার চেয়ে একটু টেনে চল্, আর কতটুকুই বা পথ?

কিন্তু সেই মেঘের রেখা দেখতে দেখতে এগিয়ে এসে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলল, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হল তুমুল ঝড়। শান্ত নদী মুহূর্তে সংহার-মূর্তি ধারণ করল। নবীন মাঝি পাকা লোক, তাই তক্ষুনি নৌকো ডুবে গেল না বটে, কিন্তু আর বেশিক্ষণ যে ভেসে থাকবে এমন ভরসাও করতে পারলাম না। এখন পারের দিকে নেবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কারণ নদীতে উত্তাল ঢেউ

উঠেছে—নৌকো মাঝির নির্দেশ মানছে না।

হঠাৎ একটা ভয়ানক বাতাসের ঝট্‌কা এল, নৌকো একদিকে কাত হয়ে ছলাৎ করে অনেকখানি জল উঠে পড়ল খোলে। দাঁতে দাঁত চেপে উল্টোদিকে সমস্ত শরীরেব শক্তি দিয়ে হাল ঠেলে ধরে নবীন মাঝি বলে উঠল—আর বুঝি নৌকো বাঁচে না ঠাকুবমশায়!

আমার মনের অবস্থা ভেবে দেখ। নিজের জন্য ভাবি না—যত ঝড়ই হোক, আমি ঠিক সাঁতার কেটে পারে চলে যাব। কিন্তু এই উত্তাল নদীতে চারিকে একহাতে ধরে সাঁতার কাটা সম্ভব নয়। ওকে ফেলেও নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারব না। দু'জনকেই হয়ত আজ ডুবে মরতে হবে।

এইসব ভাবছি, চারি হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলল—বাবা, তুমি ভয় পেয়েছ?

বললাম—আমার জন্য নয়, তোমার জন্য ভয় পাচ্ছি মা—

—আমার তো ঝড় দেখতে খুব ভাল লাগছে বাবা। কেমন বড বড় ঢেউ—

শিশুকে আর কি বোঝাব? বললাম—ঝড় না থামলে বড় বিপদ মা—

আর একটা দমকা এল, আবার কিছুটা জল উঠল খোলে। আমার মুখ পাংশু হয়ে গিয়েছিল। চারি বলল—ঝড়ের জন্য ভয় পাচ্ছ বাবা? ঝড় এখুনি থেমে যাবে।

বোকা মেয়ে। এখুনি শুরু হয়েছে, এ ঝড় কি সহজে থামবার?

কিন্তু ছই-এর বাইরে তাকিয়ে চারি বলল—ওই দেখ বাবা, ঝড় থেমে যাচ্ছে—

অবাক হয়ে দেখলাম আকাশে গভীব কালো মেঘের স্তব ছিন্নভিন্ন হযে গেছে, বাতাস পড়ে এসেছে। বড় বড় ঢেউ আর উঠছে না। আস্তে আস্তে যেভাবে ঝড় কমে তেমন নয়, একমুহূর্তেই যেন বাতাসের প্রকোপ কমে গেল। নবীন মাঝিও ঘর্মাক্ত শরীরে পরিস্থিতির এই আকস্মিক পরিবর্তনে অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে।

যাই হোক, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিরাপদে শিষ্যবাড়ি পেঁাছে গেলাম।

কিন্তু ঘটনাটা আমি ভুলতে পারলাম না। এর কয়েকদিন বাদে আমার স্ত্রীর জ্বরমত হল, চারির শোবার ব্যবস্থা হল আমার বিছানায়। আমি বসে বসে লণ্ঠনের আলোয় এক আত্মীয়ের কোষ্ঠী তৈরি করছি, পাশে চারি ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তখন অনেক হবে। হঠাৎ দেখি আলো একটু একটু করে কমে আসছে। বাড়ির পুরনো কাজের লোক হারাধনের ওপর খুব রাগ হল, সে নিশ্চয় আজ সন্ধ্যেবেলা লণ্ঠনে তেল ভরে নি। যাক, একদিক দিয়ে ভালই হল। আর রাত না জেগে শুয়ে পড়া যাক। কাগজ-কলম তুলে রেখে বাতিটাকে সরাতে যাব, মনে হল সেটা বেশ ভারি। খালি লণ্ঠন এত ভারি কেন? লণ্ঠনটা তুলে নেড়ে দেখি তাতে তেল ভর্তি। আশ্চর্য ব্যাপার তো! তেল যদি থাকবে তাহলে আলো নিভে যাচ্ছে কেন?

অবাক হয়ে বসে রইলাম। চোখের সামনে তেলভর্তি বাতি একটু একটু করে নিভে গেল।

ঘর অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা ব্যাপার উপলব্ধি করে আমার গা ছমছম করে উঠল। তাহলে কি এতদিন পরে আবার—

ঘরের বাতাসে দেবধূপের স্বর্গীয়, পবিত্র সুবাস!

চারির মাথার কাছে খাট আর দেওয়ালের মধ্যে যে জায়গাটুকু, সেখানটা ধীরে ধীরে হাল্কা নীল আলোয় ভরে উঠল। আর সেই আলোর মধ্যে ফুটে উঠল মধুসুন্দরী দেবীর ভুবনমোহিনী মূর্তি। তিনি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে আমি কি যেন বলতে গিয়েছিলাম। দেবী আঙুল তুলে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—বলেছিলাম আর একবার দেখা হবে। আজ এসেছি। কিন্তু এই শেষবার। আজকের পরে আমাকে চাক্ষুষ আর কখনো দেখতে পাবে না।

হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছি, দু'চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ছে। দেবী হেসে আবার বললেন—দুঃখ কোরো না। আগেই তো বলেছি, আমাকে একবার পেলে কেউ চিরতরে আর হারায় না। তুমি বুঝতে পারো নি? আমি তো তোমার কাছেই আছি। দেখ, তাকাও—

দেবী তর্জনী তুলে ঘুমন্ত চারির দিকে নির্দেশ করলেন।

সেদিকে তাকিয়ে আমার গা শিউরে উঠল!

এ তো চারি নয়, আমার মেয়ে নয়! মধুসুন্দরী দেবী ছোট্ট মেয়ের রূপ ধরে শুয়ে রয়েছেন! সেই অবয়ব, সেই অনিন্দ্য দেহকান্তি—কেবল আকৃতি শিশুর মত।

দেবী বললেন—কন্যারূপে তুমি আমাকে পেয়েছ। এ দেবাংশী মেয়ে। আমার শক্তির কিছু অংশ আমি ওর মধ্যে সঞ্চারিত করেছি। সবটা দিই নি, কারণ তাহলে কষ্ট পেত—সংসার করতে পারত না। ওকে যত্ন আর আদরে রেখো—

বললাম—আপনি এ কি দায়ে ফেললেন আমাকে! এ মেয়ে আমি কি করে মানুষ করব? কুঁড়েঘরে কি আগুন রাখা যায়?

—তোমার কোনো চিন্তা নেই। সুখে-দুঃখে মেয়ে ঠিক বড় হয়ে উঠবে। ওর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হবার কারণ নেই, সম্বন্ধ আপনাআপনি হয়ে যাবে। তবে সতেরো বছর বয়েস পূর্ণ হবার আগে তা হবে না।

নতজানু হয়ে দেবীকে প্রণাম করে শেষ প্রশ্ন করলাম—এমন কেন করলেন দেবী?

মধুসুন্দরী দেবী বিষণ্ণ হেসে বললেন—তুমি যেমন আমার জন্য সাধনা করেছিলে, তার ফলে আমিও তোমাকে প্রার্থনা করেছিলাম। প্রকৃত সাধক পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু প্রণয়ীরূপে তো আর সম্ভব নয়, তাই কন্যারূপে তোমার-আমার দু'জনের সাধ মেটালাম।

আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল অপার্থিব স্নিগ্ধ নীল আলো। মিলিয়ে গেল ধূপের ঘ্রাণ।

ইহজীবনে সেই আমার মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে শেষ দেখা।

একটু থেমে তারানাথ বলল—তোমরা বোধহয় এটাকে গল্প হিসেবেই নিলে। কিন্তু বিশ্বাস কর, এ ঘটনা সত্যি আমার জীবনে ঘটেছিল। মেয়ের বয়স চোখের সামনে বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু দেবীর নির্দেশ অমান্য করবার সাহস আমার নেই। তাঁর অংশে যদি সত্যি মেয়ের জন্ম হয়, তাহলে তিনিই ওর ব্যবস্থা করবেন।

অবশ্য আজই—

তারানাথের কথার মাঝখানেই ঘরে ঢুকলেন ব্রজভূষণ চক্রবর্তী।

আমরা সবাই কথা থামিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ব্রজভূষণ ক্লান্তভাবে হেসে বললেন—দুপুরের ট্রেন ফেল করে এই বিপত্তি। বিকেলের ট্রেন ধরে এইমাত্র এসে পৌঁছিলাম। মেসেও যাই নি, সটান এখানে চলে এসেছি—

তারপর তারানাথের দিকে তাকিয়ে বললেন—আমি কথার মূল্য রাখার খুব চেষ্টা করি। পনেরো দিন পরে আজ দেখা করবার কথা ছিল। দেখুন, কত কষ্ট করে এসেছি।

তারানাথ বলল—বসুন, বসুন। বিশ্রাম করুন। আপনার মা ভাল আছেন তো?

—মা ভালো আছেন। তাঁকে সুস্থ করে তুলে তবে আসছি। কিন্তু আমার একটা খুব জরুরী কথা আপনাকে বলবার আছে—

—কি কথা?

ব্রজভূষণ মুখ নিচু করে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন, তারপর তারানাথের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বললেন—আমার মত বদলেছে। পৃথিবীর সব ঘটনাই যুক্তির আলোয় বিচার করা যায় না। সত্যিই ব্যাখ্যার অতীত অনেক কিছু জীবনে ঘটে। গতবার যখন আসি, তখন মনের মধ্যে অবিশ্বাস আর আপনার সম্বন্ধে ভুল ধারণা নিয়ে এসেছিলাম। এজন্য আপনার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি—

তারানাথ হেসে বলল—ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন দেখি না। আপনি আপনার সৎ বুদ্ধিমত কাজ করেছিলেন। নিজের বিশ্বাসকে অনুসরণ করা অন্যায় নয়। সে যাই হোক, এখন আপনার মতের পরিবর্তন কি করে হল সেটা যদি বলেন তাহলে শুনি—

ব্রজভূষণ বললেন—সেদিন মায়ের অসুখের খবর পেয়ে দেশের স্টেশনে গিয়ে যখন নামলাম তখন রাত প্রায় এগারোটা। গাড়ি অনেক লেট ছিল। গ্রামের দিকে এগারোটা মানে অনেক রাত। গাড়িঘোড়া কিছুই পাওয়া সম্ভব নয়। সেদিন বেশ দুর্যোগ ছিল, মনে আছে নিশ্চয়? বুঝতে পারলাম বাড়ি পর্যন্ত কয়েক মাইল রাস্তা এই দুর্যোগে পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতে হবে। দুর্গা বলে স্টেশন থেকে বেরিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

দেশের স্টেশন থেকে বাড়ি যাবার দুটো রাস্তা আছে। একটা পথ মাঠের ওপর দিয়ে, বনজঙ্গল ভেঙে, নদী পেরিয়ে গিয়েছে। রাস্তাতে কাদা-জল ধানক্ষেত আছে, ঘন দুর্যোগে যাবার পক্ষে আদৌ ভাল নয়। নদীর ওপরে নড়বড়ে একটা কাঠের সাঁকোও পেরুতে হবে। অন্য পথটা ভাল, ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের পিচঢালা রাস্তা বরাবর গ্রাম অবধি চলে গিয়েছে। কিন্তু ও-পথে গেলে প্রায় তিন মাইল বেশি ঘুরতে হয়। মানে গ্রামে পৌঁছতে আমার আরো ঘণ্টাদেড়েক বেশি লাগবে। তখন মায়ের জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ঠিক করলাম সংক্ষেপের রাস্তাতেই যাবো, একটু কাদা-জল পড়বে বটে—কিন্তু সে আর কি করা যাবে?

কি ভয়ানক পথ! গাঢ় অন্ধকারে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকে উঠে অন্ধকারকে যেন আরো গাঢ় করে তুলছে। দু'দিকে ধানের ক্ষেত, মাঝখানে পেছল আলের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে চলেছি। মাথার

উপর ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই। এর মধ্যে আবার হাত ফসকে কাদায় পড়ে টর্চটা গেল নিভে। কত ঝাঁকানি দিলাম, কিছুতেই আর জ্বলল না।

কোনোরকমে বাড়ি পৌঁছলাম। মাঝখানে নদীর ওপর কাঠের পুল পার হবার সময় সত্যি একটু ভয় করেছিল। ছোট্ট, সরু নদী, কিন্তু বর্ষায় তার রূপ হয়ে ওঠে ভয়ংকর। কাঠের পাটাতনের নিচে দুরন্তবেগে ছুটে চলা জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। একবার পা ফসকালে আর দেখতে হবে না।

যাই হোক, বাড়ি পৌঁছে ডাক্তার-বদ্যি করে মাকে একটু সুস্থ করে তুললাম। দিন ছয়-সাত বাদে সকালবেলা বাইরের ঘরে বসে আছি, এমন সময় পাড়ার মুরুব্বি শ্যামলাল চাটুজ্যে দেখা করতে এলেন। কিছুক্ষণ একথা-সেকথার পর তিনি বললেন—তোমার মত মাতৃভক্ত ছেলে দেখলেও আনন্দ হয় বাবা। মায়ের জন্য ওই ঝড়জলের রাতে আসা—বাব্বাঃ! তার আগের তিনদিন থেকেই আমাদের এখানে কি বৃষ্টি! অতখানি ঘুরে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের রাস্তায় আসতে কষ্টও খুব হয়েছে নিশ্চয়। তবু মা বলে কথা—

বললাম—না শ্যামলাল কাকা, আমি ও-পথে আসি নি। মায়ের জন্য বড্ড ব্যস্ত হয়েছিলাম কিনা, তাই সোজা পথেই চলে এসেছি—

শ্যামলাল চাটুজ্যে অবাক হয়ে বললেন—নদীর পথে?

—হ্যাঁ, কেন?

—নদী পার হলে কিভাবে?

একটু অবাক হলাম। শ্যামলাল কাকা গ্রামের পুরনো মানুষ, তিনি কি জানেন না যে, নদীর ওপর সাঁকো আছে? বললাম—কেন, নদীর ওপরে তো কাঠের পুল আছে।

শ্যামলাল চাটুজ্যে বললেন—আছে নয়, ছিল। তুমি তো এলে রবিবার রাত্তিরে? তার দু'দিন আগেই শুক্রবার বিকেলের ঝড়ে ওই সাঁকো ভেঙে পড়ে গিয়েছে। তোমার নিশ্চয় কোনো ভুল হচ্ছে বাবা, তুমি ঘুরপথেই এসেছ। তখন মায়ের অসুখের চিন্তায় তোমার মন ব্যস্ত হয়ে ছিল—সেজন্য মনে করতে পারছ না—

যতই মন ব্যস্ত থাকুক, এ ধরনের ভুল মানুষের হতে পারে না। কিন্তু শ্যামলাল কাকা কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন দেখে আমি আর কথা বাড়ালাম না। এরপর হয়ত উনি আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবেন। কথা ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ পাড়লাম।

দুপুরের খাওয়া সেরে বাড়ি থেকে বেরুলাম নদীর ধারে যাবো বলে। প্রায় মাইল আড়াই পথ, তবে আজ ক'দিন বৃষ্টি থেমে যাওয়াতে মাঠঘাট শুকিয়ে এসেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম।

সত্যিই নদীর ওপর কাঠের সাঁকোটা নেই। এপারে যেখান থেকে পুল শুরু হয়েছিল, সেখানে কয়েকটা বাঁধুনির কাঠ পড়ে আছে মাত্র।

আশ্চর্য! আমি কি তবে বাতাসে হেঁটে নদী পার হয়েছিলাম?

নদীর ধারেই মাঠে কয়েকজন চাষী ক্ষেতে কাজ করছে। তাদের একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—হ্যাঁরে, এ সাঁকো কবে ভেঙেছে বলতে পারিস?

সে বলল—কেন পারবো না কর্তা? গেল শুক্কুরবারে রাত্তিরে ঝড় হল না?

সেই ঝড়েই তো ভাঙল। কি হুড়মুড় বিকট শব্দ আজ্ঞে—

লোকটি সবিস্তারে পুল ভাঙার গল্প শুনিয়ে গেল। আমার কিন্তু তখন কানে আর কিছুই ঢুকছে না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে।

এই আমার ঘটনা। এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে আমি জানি না, কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, আপনার কাছে এসে আমার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত—

ব্রজভূষণ থামলেন। তারানাথ নির্বিকার, ব্রজভূষণের কাহিনী শুনে তার বিস্ময়বোধ হয়েছে বলে মনে হল না।

—আপনাকে একটা মুখবন্ধ খাম দিয়েছিলাম, সেটা আজ নিয়ে আসার কথা ছিল। এনেছেন কি?

—আজ্ঞে, এনেছি।

—এর মধ্যে খোলেন নি তো?

ব্রজভূষণ দুঃখিত কণ্ঠে বললেন—চক্রবর্তীমশাই, আমি কথার মানুষ।

—বেশ। এবার খামটা খুলে দেখুন দিকি ভেতরের কাগজে কি লেখা আছে।

ব্রজভূষণ বুকপকেট থেকে খাম বের করে ছিঁড়লেন। ভেতরে তারানাথের হাতে লেখা সেই কাগজের স্লিপ। তাতে কি লেখা তখনো জানি না, কিন্তু সেটা পড়ে ব্রজভূষণের মুখভাব যেন কেমন হয়ে গেল। বিহ্বল চোখে সে তাকিয়ে রইল তারানাথের দিকে।

কিশোরী ব্রজভূষণের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিয়ে পড়ল, তারপর নিঃশব্দে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখলাম গোটা স্পষ্ট হস্তাক্ষরে তাতে লেখা—নদীর ওপর সাঁকোটা কিভাবে পার হয়েছিলেন?

ব্রজভূষণ আবেগরুদ্ধ গলায় বললেন—তাহলে—তাহলে আপনিই কি—

তারানাথ বলল—না, আমি নই। আমার ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করেছিলাম যাতে আপনার জীবনে বিশ্বাসের শান্তি নেমে আসে। তিনিই যা করবার করেছেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেদিন আপনি মায়ের কাছে পেঁছিতে পারবেন না—

ব্রজভূষণ জিজ্ঞাসা করলেন—কি করে বুঝলেন?

তারানাথ উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

ব্রজভূষণ আবার বললেন—থাক, আমি জবাব চাই না। কিন্তু আমার একটা প্রার্থনা রয়েছে, তা আপনাকে পূরণ করতে হবে—

তারানাথ বলল—বলুন।

—দেশে আমার এক ভাগ্নে রয়েছে। আই. এ. পাস। খুব শান্ত আর সচ্চরিত্র ছেলে—গ্রামের জুনিয়ার হাই স্কুলে পড়ায়। এবার গিয়ে দেখি তার বিয়ের সম্বন্ধ খোঁজা হচ্ছে। আপনার মেয়েকে সেদিন দেখে গিয়েছিলাম, ভারি পছন্দ হয়েছিল। বোনের কাছে আপনার মেয়ের কথা বলায় তিনি রাজি হয়েছেন। আমার তো মেয়ে দেখাই আছে, আর কেউ দেখবে না। সামনের মাসেই সতেরোই কি আপনি বিয়ে দিতে পারবেন? আমাদের কোনো দাবি নেই, শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে পাঠাবেন—

ব্রজভূষণের হাত জড়িয়ে ধরল তারানাথ, বলল—আমি কন্যার পিতা, আমার আর কি আপত্তি থাকতে পারে? যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই মঙ্গল—

আমাদের দিকে ফিরে তারানাথ বলল—দেখলে? দেবীর কথা কেমন ফলে

গেল? তোমাদের বলা হয় নি, আজ চারির জন্মদিন। আজ ওর বয়েস সতেরো বছর পূর্ণ হল। তোমাদের বৌঠান পায়েস রেঁধেছেন, একটু একটু খেয়ে যেও—

দেবীর প্রসঙ্গ বুঝতে না পেরে ব্রজভূষণ তাকিয়ে আছেন দেখে তারানাথ বলল—আপনাকে একটা গল্প বলব। আজ নয়, আর একদিন—

চারি আমাদের জন্য পায়েস নিয়ে এল বাটি করে। আজকে তার বিশেষ সাজ করার মর্ম এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। তারানাথ ব্রজভূষণকে দেখিয়ে বলল—এঁকে প্রণাম কর মা, ইনি তোমার—মানে গুরুজন আর কি। এঁদেরও কব—

আমাদের মজা লাগছিল। ঠিক সতেরো বছরের জন্মদিনেই চারির বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

চারি ভেতরে যেতে তারানাথ বলল—বছর তিনেক আগে এক সাধুর কাছে লক্ষণশাস্ত্রসাব বইখানা পেয়েছিলাম। অঙ্গুলিসংস্থান অধ্যায় খুলে দেখি লেখা আছে—কোনো জাতিকার যদি অনামিকা মধ্যমার চেয়ে লম্বা হয়, তবে তার দেবাংশী এবং তেজস্বী কন্যার জননী হবার সম্ভাবনা। সবই মিলে গেল, কি বল?

তারপর ব্রজভূষণের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল—সেদিন আপনার চা খাওয়া হয় নি। এখন একটু চা করতে বলি?

তুমি আছো

আজ বোধহয় শুক্লপক্ষের একাদশী। জানালার বাইরের পৃথিবীটা চাঁদের মায়াময় জ্যোৎস্নায় রূপকথার রাজ্যে পরিণত হয়েছে। সপ্তপর্ণীর পাতায় বাতাসের মৃদু শিহরণ, সে বাতাসে অজানা লতাপাতার একটা মিশ্র সুগন্ধ। এমন সুন্দর রাত্রিতে আমার ঘুম আসে না, শহরে নিত্যদিনের কোলাহল আর ভয়ানক বাস্তবতার আড়ালে জীবনের যে না-দেখা স্বপ্নময় রূপ লুকিয়ে থাকে, এই নৈশ প্রহরে রাত্রিচর পাখির সুদূরাগত ডাকে স্বপ্নিল মুহূর্তে সেই জগৎটা প্রত্যক্ষ মূর্তি পরিগ্রহ করে ফুটে ওঠে। এ কি ঘুমিয়ে নষ্ট করবার সময়? তাছাড়া আমাব তো কাজ রয়েছে—বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়া জ্যোৎস্নার দৈবী আভায় উদ্ভাসিত তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার কাজ।

কে জানে এখন ঠিক কত রাত। টেবিলের ওপর হাতঘড়ি রয়েছে, কিন্তু থাক—অখণ্ড নিরবধি কালকে কৃত্রিমভাবে চিহ্নিত করে কি লাভ? মহাবিশ্বের নক্ষত্র-খচিত অনন্ত শূন্যতায় সূর্যের উদয়ও নেই, অস্তও নেই। সেখানে কোথায় দিন, কোথায় রাত্রি? তবু এই নিতান্ত পার্থিব ফাঁকিটুকু ভারি সুন্দর লাগে। বৈজ্ঞানিক সত্য যেমনই হোক, এমন রাত্রি তো মিথ্যে নয়, এই জ্যোৎস্না তো সত্যি সত্যিই ফুটেছে।

তুমি কি কোনো স্বপ্ন দেখছ? ঘুমের ভেতর তোমার ঠোঁটের কোণে হাসি কেন? অথবা তুমি কি বুঝতে পেরেছ আমি তোমার দিকে তাকিয়ে রয়েছি? আমরা তো একসঙ্গে কাটালাম অনেকগুলো বছর, এই দীর্ঘ সময়ে কতকিছু নষ্ট হয়ে যায়—বসন্ত ফুরিয়ে গ্রীষ্ম এসে পড়ে, উজ্জ্বল রঙ বিবর্ণ হয়ে আসে, কিন্তু তোমার মুখের পরিচিত হাসি এখনও অম্লান। আজকের জ্যোৎস্নার সঙ্গে তোমার হাসি মিশে গিয়ে যেন সুন্দর একটি গীতিকবিতার সৃষ্টি করেছে। তুমি ঘুমোও, আমি দরজা খুলে একটু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই।

রাতজাগা পাখিটা উদাস গলায় ডেকেই চলেছে, ডেকেই চলেছে। সভ্যতার খরস্পর্শ থেকে দূরে এই পাহাড় আর অরণ্যের নির্জনতায় আকাশের নক্ষত্ররা অনেক বেশি উজ্জ্বল। বাংলোর সামনে উঠোন, তারপরেই ঢালু জমি নেমে গিয়েছে বহু নিচে। ওদিক থেকে আবার ঠেলে উঠেছে পাহাড়। উঠোনের মাঝখানটা খালি, ধারে ধারে বড় বড় গাছ। মাঝে মাঝে জেগে ওঠা এলোমেলো হাওয়ায় হালকা শব্দ করে শুকনো পাতা সরে সরে যাচ্ছে, যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কার হেঁটে আসার শব্দ। ঐ যে মুচুকুন্দ চাঁপার গাছটা, পঁচিশ বছর আগে যেটার তলায় ফুল কুড়িয়ে তোমার মাথায় গুঁজে দিয়েছিলাম। আরো দুশো বছর এই গাছ দাঁড়িয়ে থাকবে তোমার-আমাব ভালবাসার স্মৃতি হয়ে। সময় তো আসলে কিছু নয়, তার প্রবাহও নেই, স্থিতিও নেই—আমরাই কেবল দুটো ঘটনার ব্যবধানের নাম রেখেছি সময়। আমবা চলি, সময় কোথাও পালিয়ে বেড়ায় না।

চৌকিদার বারণ করেছিল রাত্তিরবেলা দরজা খুলে বাইরে বেবুতে। এখনো নাকি এ অরণ্যে বাঘের যথেষ্ট উপদ্রব। শুনে মনে মনে হেসেছিলাম—ও বেচারা কি ভেবেছে আমি যেখানে থাকি সেই শহরে হিংস্র জন্তু নেই? আছে, এবং তাদের নখ ও দাঁত বাঘের চেয়ে কম তীক্ষ্ন নয়। সরল চৌকিদারকে সে কথা বলে লাভ নেই, ওর সারাজীবন কেটেছে প্রকৃতির কাছাকাছি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর লোভ থেকে দূরে। বললেও ও বুঝতে পারবে না সে কি ভয়ঙ্কর জায়গা! সেখানে মানুষ প্রত্যেকদিন পেটভরে মানুষের মাংস খায়। সে মাংস খুব সস্তায় বিক্রি হয় শহরে, তুলনায় ব্রয়লার মুরগীর দাম অনেক বেশি। তবে চৌকিদারকে এসব কথা আমি জানাবো না, নিজের পরিচিত জগতের স্বস্তিতে ও আশ্বস্ত জীবন যাপন করুক। আমার প্রথম যৌবনের মধুরতম কয়েকটি দিনের ও সাক্ষী, বিয়ের পরেই তোমাকে নিয়ে যখন এখানে আসি, ওই চৌকিদার তখন চল্লিশ বছরের বলিষ্ঠদেহী মানুষ। এবারও, এতদিন পরেও, আমাকে দেখেই সে চিনতে পেরেছে। প্রথমে খুব খুশি হয়ে কথাবার্তা বলছিল লোকটা, পুরনো দিনের প্রসঙ্গ তুলে অনেক গল্প করছিল। তারপর বিকেল থেকে কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। সেই হাসিখুশি স্বতস্ফূর্ততা আর নেই, দূর থেকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। কি যে হল চৌকিদারের!

এখনো চার-পাঁচদিন খুব সুন্দর চাঁদের আলো থাকবে। এই ক'টা দিন আমি এখানেই থেকে যাবো ভাবছি। তোমার কি মত? গত পনেরোটা বছর শুধুই ব্যবসা করেছি আর টাকা জমিয়েছি, এবার ছুটি, এবার তোমার সঙ্গে মুক্তমনে চাঁদের আলোয় বসে গল্প করার প্রহর। অথবা কথা বলারই বা কি প্রয়োজন? দু'জনে বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে পাশাপাশি বসে থাকবো পরস্পরের হাত ছুঁয়ে। টাকা জমাবাব চেষ্টাও তো এইজন্যেই করেছিলাম, যাতে ভবিষ্যতের দিনগুলোতে সবরকমের দায়িত্ব আর বোঝা থেকে মুক্ত হয়ে তোমার সঙ্গে কাটাতে পারি। সেদিন এবার এসেছে।

বড় কষ্ট পেয়ে মানুষ হয়েছিলাম, সে তো তুমি জানো। বাবা-মা মারা গেলেন আমার ভাল করে জ্ঞান হবার আগেই। মামাবাড়িতে অনাদরে একপাশে পড়ে থেকে বড় হয়েছি। কোথায় যেন শুনেছিলাম—মামার অন্ন কখনো পরান্ন হয় না। জানি না সত্যি সত্যি তেমন মামা কোথাও পৃথিবীতে আছে কিনা, আমার মামাবাড়ির স্মৃতি একান্তই বেদনা আর বঞ্চনায় পূর্ণ। আমার যখন ন'বছর বয়েস তখনই

মামীমা বাড়ির চাকর ছাড়িয়ে দিলেন। আড়াল থেকে তাঁকে বলতে শুনেছি—ওকে তো সারাজীবনই খাওয়াতে হবে। হলই বা একটা পেট, একজনেরই কি খাওয়া-পরার খরচ আজকাল কম নাকি? তা থাকছে যখন, আমাদের সংসারের একটু কাজে লাগুক। আমরা তো আর পর নই—

মামাবাড়িতে গরু ছিল। দুটো বড় বড় মুলতানী গরু। খুব ভোরে উঠে সেই গরু দুটোর পরিচর্যা করতে হত। গোয়াল পরিষ্কার করে, উঠোনে বঁটি পেতে বিচুলি কুচিয়ে, বালতিতে জল নিয়ে তাদের স্নান করিয়ে তবে পর্ব শেষ। আমার খুব ভয় করতো, অতবড় গন্ডারের মত চেহারার গরু, দশ বছরের ছেলেকে মানবে কেন? কাছে গেলেই শিঙ নেড়ে তেড়ে আসতো। গোয়ালের কাজ শেষ হলে বাজারে যেতাম। বাজার থেকে ফিরলে মামিমা আধঘণ্টা ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হিসেব নিতেন। আমি জানি, এক একদিন গোপনে মামাকে দেখতে পাঠাতেন—আমি জিনিসের দর ঠিক বলেছি কিনা। কিন্তু ঈশ্বর সাক্ষী, খুব লোভ হলেও বা খিদে পেলেও (তখন প্রায় সারাদিনই পেটে খিদে থাকতো) কখনো বাজারের টাকা থেকে পয়সা সরিয়ে কিছু কিনে খাই নি। কেমন যেন মর্যাদায় বাধতো। আমরা বড়রা অনেক সময়েই বুঝি না, ছোটদের মর্যাদা এবং আত্মসম্মানজ্ঞান খুব প্রখর থাকে। বরং বয়েস বাড়তে শুরু করলে সেটা ক্রমেই কমে যায়। এইসব কাজ ছাড়াও সারাদিন মামা আর মামিমার খুচরো ফরমাস খাটতে হত। অতিথি বা আত্মীয়স্বজন এলে তাদের দেখাশুনো করা থেকে রাত্তিরে বিছানা করে মশারী খাটিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমাকেই করতে হত। তবে একদিন এই অতিথিদের মধ্যে একজনই আমার ভাগ্য বদলে দিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বোধহয় মামার কিরকম দাদা হতেন। ছোট ছোট করে চুল ছাঁটা, বছর ষাটেক বয়েস, মুখচোখ দেখলেই মনে হয় বেশ রাগী লোক। আপ্যায়নের বহর দেখে বুঝেছিলাম মামা-মামিমাও এঁকে সমীহ করে চলেন। রাত্তিরে তাঁর বিছানা করে মশারী খাটাচ্ছি, তিনি বললেন—কতদিন এখানে কাজ করছো?

মনের ভেতর ভারি দুঃখ হল। বললাম—আমি তো এখানে কাজ করি না—

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন—কাজ কর না? তার মানে?

ঢোঁক গিলে বললাম—আমি এখানে থাকি। এটা আমার মামাবাড়ি।

ভদ্রলোকের মুখ দেখে বুঝলাম—তিনি খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। আমার দিকে কয়েকমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললেন—মামাবাড়ি? কালীচরণ তোমার কে হয়?

—মামা।

—আপন মামা?

—হ্যাঁ।

তিনি উঠে এসে আমার কাঁধে দুই হাত রেখে বললেন—তোমার মায়ের নাম কি বল তো?

কতদিন পরে কেউ আমাকে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করল। প্রায় তো ভুলেই গিয়েছিলাম তাঁর নাম। বললাম, অমিতা। তিনি বেঁচে নেই—

আমার মাথার ওপর দিয়ে ভদ্রলোক উদাসদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, তারপর চোখ নামিয়ে বললেন—আমি জানি তিনি বেঁচে নেই। তাঁকে আমি

চিনতাম। তুমি ইস্কুলে যাও না? কি পড়?

এর উত্তর দিতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। কাজেই চুপ করে রইলাম।

—পড়তে ইচ্ছে করে? স্কুলে ভর্তি হবে?

উৎসাহে আমার বুকের ভেতরে কেমন করে উঠল, বললাম—খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু পড়বার যে অনেক খরচ, কে দেবে?

মানুষটি বললেন—হুঁ। তোমার নাম কি?

—প্রিয়ব্রত। ডাকনাম খোকন।

—খোকন, যাও তো কালীচরণকে গিয়ে বল আমি তাঁকে ডাকছি।

এবার আমি একটু ভয় পেলাম। ইনি আমাকে সহানুভূতি দেখাচ্ছেন বটে এবং তা আমার ভালও লাগছে। উপকার করার উৎসাহে মামাকে কি বলবেন কে জানে, তারপর ইনি বিদায় নেবার পর মামা-মামি আমাকে আস্ত রাখবেন না। আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম—মামাকে কিছু বলবেন না, আমি ইস্কুলে পড়তে চাই না—

মানুষটির চোখ করুণায় স্নিগ্ধ হয়ে এল, তিনি অভয় দেবার ভঙ্গিতে বললেন—ভয় নেই, যাও—কালীচরণকে ডাকো—

মামাকে ডেকে দিয়ে বাইরে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ওঁদের কথা শুনতে লাগলাম। ভদ্রলোক বললেন—ভূমিকা না করে সোজা প্রসঙ্গে আসছি। প্রিয়ব্রত অমিতার ছেলে? আমার ধারণা ছিল তুমি তাকে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াচ্ছ—

অকস্মাৎ জেরার মুখে পড়ে মামা শুকনো গলায় বললেন—না, ঠিক তা নয়. মানে—এখনো তো যথেষ্ট বড় হয় নি, একা বোর্ডিং-এ থাকতে পারবে কিনা, তাই—

—তাই ভাগ্নেকে দিয়ে বাড়ির চাকরের কাজ করাচ্ছ?

মামা আমতা আমতা করে বললেন—না না, সে কি কথা! চাকরের কাজ কি বলছেন বড়দা! ঘরের ছেলে যেমন ঘরের কাজ করে, তেমনি ওই টুকটাক কিছু—আমি তো নিজের ছেলের সঙ্গে ভাগ্নের তফাৎ করিনে—

—বটে! তা প্রিয়ব্রত কি জানে ওর বাবা ওর জন্য কুড়ি হাজার টাকা তোমার কাছে রেখে গিয়েছিলেন? সে টাকায় ওর ভরণপোষণ আর পড়াশুনো হয়ে যাবে বলেই মনে হয়। টাকাটা এতদিনে সুদেও নিশ্চয় কিছু বেড়েছে!

মামা থতমত খেয়ে বললেন—অ্যাঁ? টাকা? মানে সে টাকা তো—

ভদ্রলোকের গলার স্বর পালটে গেল, কঠিনভাবে তিনি বললেন—কালীচরণ, এতবড় অন্যায় কোরো না। আমি সব বুঝতে পেরেছি। এ নিয়ে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ভয়ানক নিন্দে হবে। অবশ্য লোকনিন্দার ভয় তুমি কোনোকালেই কর না; কিন্তু তোমার চালানী মালের ব্যবসার জন্য আগামী আরো দশ বছর আমার ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হবে। আমাকে সবাই চেনে, বিশ্বাস করে। আমি জামিন থাকি বলেই তুমি সব জায়গায় ধার পাও, বাকিতে মাল আনতে পার। যদি মহাজনদের কাছে গিয়ে বলি তুমি আসলে কি চরিত্রের লোক, নিজের মৃত বোনেব গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করে ভাগ্নেকে বঞ্চিত করছ, তাহলে কাল থেকে কোনো মহাজন তোমাকে আর বাকি দেবে মনে করেছ?

মামা চুপ করে রইলেন।

—টাকা আছে তো? না গেছে?

মামা ভাঙা গলায় বললেন—কিছু আছে।

—কত আছে?

—তা হাজার দশেক।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ, ওই টাকা এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে। আর প্রিয়ব্রতকে আমি কাল আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। এখন থেকে ও আমার কাছেই থাকবে। আমি ওকে সামনের মাসেই স্কুলে ভর্তি করে দেব—

আমি চলে যাচ্ছি বলে মামার দুশ্চিন্তা ছিল না, তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন। বললেন—এক সপ্তাহ বড় কম সময় হয়ে গেল, টাকা তো ছড়ানো রয়েছে চারদিকে—

—এক সপ্তাহে পারবে না? আচ্ছা, দশ দিন সময় দিলাম—

এক সপ্তাহের বদলে দশ দিন! মামা অবশ্য আপত্তি করতে সাহস পেলেন না।

পরদিন আমার দু'খানা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট, দু'খানা সুতো-বেরুনো শার্ট আর গামছাটা পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে ইন্দুমামার সঙ্গে চললাম (এঁর নাম পরে জেনেছিলাম, ইনি মায়ের দূরসম্পর্কের জ্যাঠতুতো দাদা)। ইন্দুমামার বাড়িতে থাকার সময়টাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এই প্রথম বুঝতে পারলাম আশ্রিতজন মানেই বাড়ির চাকর নয়, বুঝতে পারলাম ভালবাসার স্বাদ কেমন। সন্ধ্যেবেলা ইন্দুমামা নিজের দুই ছেলে আর আমাকে একসঙ্গে পড়াতে বসিয়ে মুখে মুখে কত গল্প শোনাতেন, মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করতেন। আমার জীবনে সততার শিক্ষা ওঁর কাছেই।

ইন্দুমামার দুই ছেলে আমার চেয়ে উঁচু ক্লাসে পড়ত। ম্যাট্রিক পাস করে তারা যখন কলেজে পড়ছে, সেই সময় হঠাৎ ইন্দুমামা মারা গেলেন।

মামিমাও ভাল মানুষ ছিলেন, তাঁর কাছে আমাকে কখনো কষ্ট পেতে হয় নি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইন্দুমামার ছেলেদুটি মানুষ হল না। বাবার মৃত্যুর পর তারা কলেজ ছেড়ে দিয়ে কি-সব ব্যবসা শুরু করল। সে ব্যবসাসূত্রে যারা বাড়িতে যাতায়াত করত তাদের দেখে একদিন মামিমা ছেলেদের বললেন—তোদের আর ব্যবসা করে কাজ নেই। আমার গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। দেশের জমিগুলো বরং চষবার ব্যবস্থা কর, তোদের ভালই চলে যাবে—

মায়ের কথা তারা হেসে উড়িয়ে দিল। আমি যখন বি.এ. পড়ছি, সে সময় মামিমাও মারা গেলেন। মহৎ লোকের পুত্র সাধারণত মহৎ হয় না। মামাতো ভাইয়েরা আমাকে অচিরাৎ জানালো—বাবা বোকা এবং অবিবেচক ছিলেন বলে একজন দূরসম্পর্কের ভাগ্নেকে পোষবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দিনকাল কঠিন, পয়সাও সহজে উপার্জন হয় না, কাজেই আমি যেন নিজের পথ দেখে নিই। মামার কাছে আমার যে দশ হাজার টাকা ছিল, সে টাকা চাইতে গেলাম, তারা হেসে বলল —স্বপ্ন দেখছ নাকি? কার টাকা? কিসের টাকা? আমরা কিছু জানি না—

ঝগড়া করা বৃথা। বুঝলাম ও টাকা আমার কপালে নেই। যেমন একদিন কপর্দকহীন অবস্থায় বড়মামার বাড়ি থেকে চলে এসেছিলাম, তেমনই অসহায় অবস্থায় ইন্দুমামার বাড়ি থেকে পথে বেরুলাম।

তার পরের ইতিহাস কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস। উপার্জনের চেষ্টায় পথে

পথে ঘুরেছি, না খেয়ে কাটিয়েছি দিনের পর দিন, আমি যে কলেজের ছাত্র সে কথা চেপে গিয়ে হোটেলে এঁটো বাসন ধোয়ার কাজ করেছি, রাত্তিরে খেয়ে কুকুরের সঙ্গে ভাগাভাগি করে শুয়ে থেকেছি লোকের বাড়ির বারান্দায়। দু'এক টাকা করে জমিয়ে রাস্তার ধারে দরমার বেড়া দিয়ে তৈরি ঘরে একটা সাইকেল সারানোর দোকান দিলাম। আমার ব্যবহারে আর সততায় খুশি হয়ে খদ্দের আসতে লাগল। এখান-ওখান থেকে ধার করে একটা লেদ মেসিন বসাবার ব্যবস্থা করলাম বছর তিনেক পর। অনিল নামে এক বন্ধু পরামর্শ দিল তার সঙ্গে পার্টনারশিপে সাইকেল পার্টস্-এর দোকান দিতে। দুই বন্ধুর খাটুনিতে দোকান জমে উঠল। তারপর একদিন দোকানের সব মূলধন নিয়ে ঋণের দায়ে আমাকে পথে বসিয়ে প্রিয়বন্ধু অনিলের অন্তর্ধানে উপলব্ধি করলাম, আশৈশব তিক্ত এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আসা সত্ত্বেও মানবচরিত্র সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র ধারণা জন্মায় নি।

শুরু করার দাগে ফিরে গিয়ে নতুন করে দৌড় আরম্ভ করলাম। তবে সততার জন্য অনেকেই আমাকে বিশ্বাস করত, আর অনিলের ব্যাপারটা রটে যাওয়ায় মহাজনদের সহানুভূতিও পেলাম। ঋণ একদিন শোধ হয়ে গেল। একটু একটু করে বড় হল দোকান। প্রথমে দুটো, তারপর চারটে, তারপর ছ'টা লেদ। সাইকেলের পার্টস থেকে মোটরের পার্টস। ছোটখাটো কিছু ঠিকেদারির কাজ। মধ্যবিত্ত মানুষেরা সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ দিয়ে বাড়ি করবার সময় ঠিকেদারকে কাজ দিতে ভয় পায়। কিন্তু আমার সততা সম্বন্ধে বাজারে একটা খ্যাতি রটে গিয়েছিল। চেনাশুনো দু'একজন রিটায়ার করে আমাকে দিয়ে তাঁদের বাড়ি করিয়ে নিলেন। সামান্য লাভ রেখে কাজগুলো করে দিলাম। ক্রমেই আরো বড় কাজ আসতে লাগল। যেখানে পেঁছিলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা আর হঠাৎ ধ্বসে পড়ে যায় না, আমার ব্যবসা সেই আকাঙ্ক্ষিত বিন্দুতে পেঁছে গেল।

কিন্তু এসব হচ্ছে বাইরের ইতিবৃত্ত। ভেতরে বড় পরিবর্তন এল যেদিন তুমি আমার ঘরে এলে। প্রথমে কিছু বুঝতে পারি নি, জানো? বিয়েটা মানুষের দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একটা বলে ধরে নিয়েছিলাম। তোমার ছিপছিপে ফর্সা শরীর, সুন্দর চোখ আর পরনের বেনারসী দেখে ভাল লেগেছিল, কিন্তু মনের ভেতরে কোনো অন্তরঙ্গ আবেগের ঢেউ জাগে নি।

সেটা জাগল বিয়ের পাঁচ-সাতদিন পর। মনে আছে, একদিন দুপুরে খেতে বসে আমার বিষম লেগেছিল? অনেকক্ষণ ভাল করে নিঃশ্বাস নিতে পারি নি, শ্বাসনালীতে ভাত ঢুকে গিয়েছিল। তুমি পাংশুমুখে উঠে এলে টেবিলের ওপার থেকে, আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে, এক গ্লাস জল দিয়ে বললে—আস্তে আস্তে খাও দেখি, বাব্বাঃ, যা ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে!

আমাকে কেউ কখনো এমন আদরের কথা বলে নি। মাকে তো মনেই করতে পারি না। তুমি যেন সেই হারানো মায়ের প্রতিনিধি হয়ে, পৃথিবীতে যা কিছু ভাল, তার শরীরী প্রতীক হয়ে কল্যাণীমূর্তিতে আমার জীবনে এসে দাঁড়ালে। তোমার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল—এই এতদিনে এমন একজনকে পেয়েছি, যে শতকরা একশো ভাগ আমার নিজের। যে আলোতে ছায়ার মত, অন্ধকারে

অনুভূতির মত আমার সঙ্গে থাকবে। যে পার্টনারশিপ ভেঙে ঋণগ্রস্ত আমাকে রেখে পালিয়ে যাবে না, আমার অশ্রু ধারণ করবার জন্য যে পেতে দেবে তার যুক্ত অঞ্জলি। দ্রাবকের স্পর্শে দ্রাব্যের মত আমি তোমার ভালবাসায় প্লুত হয়ে গেলাম।

কতদিন রাত্তিরে জেগে বসে তোমার নিটোল, সুন্দর পা দু'খানি দেখে আমার প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়েছে। আসলে তো স্ত্রীকে নয়, তোমার মধ্যে জগতের কেন্দ্রীভূত মহত্ত্ব এবং স্নেহের অমৃতমূর্তিকে প্রণাম করার ইচ্ছে। কিন্তু যাকে দেবীর আসনে বসানো যায়, তাকে সাধারণ মানুষীর মত ভালবাসা কঠিন। সেই কঠিনকে আমি কি করে সম্ভব করেছিলাম কি জানি! একদিকে দেবীর মত সম্মানে তোমাকে মানসিক শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতাম গোপনে, আবার ভীষণ বুভুক্ষায় তোমাকে কাছে টেনে আনতাম নিবিড় আশ্লেষে।

একদিন তুমি হেসে বলেছিলে—আমাকে তুমিই নষ্ট করবে দেখছি, আমি যা চাই, তক্ষুনি তা এনে দাও কেন বল তো? বকতে পার না?

আমি হেসে বলেছিলাম—আমার কাছে যে কখনো কেউ কিছু চায় নি। তুমিই প্রথম এই তোমারই সব।

আমাদের সন্তান না হওয়া বোধহয় আমাদের আরো কাছাকাছি চলে আসার একটা কারণ। অবশ্য যদি এর চেয়েও কাছাকাছি আসা সম্ভব হয়! তুমি একদিন দুঃখ করে বলেছিলে—আমাদের একটা খোকা হল না, কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। তুমি ব্যবসার কাজে বাইরে থাকো, আমার কি করে সময় কাটে বল তো?

আমি বলেছিলাম—বেশ, আর কয়েকটা বছর—তারপর ব্যবসার দায়িত্ব অন্য কারো ওপর দিয়ে তোমাকে নিয়ে চলে যাবো নির্জনে কোথাও, কেমন? বাকি জীবনটা দু'জনে দু'জনের কাছাকাছি থাকব। আর একটু টাকা জমিয়ে নিই, তোমার যাতে কোনো কষ্ট না হয়।

আসলে আমার মনের গভীরে কোথাও পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি একটা বৈরাগ্য জমে উঠছিল। ছোটবেলা থেকে মধ্য-যৌবন পর্যন্ত লব্ধ অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলাম একথালা মোটা ভাত আর চচ্চড়ি খেতে পেলেও জীবনধারণে বিশেষ অসুবিধে হয় না, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে গেলে অনেকখানি ভালবাসার প্রয়োজন। আমার জীবনে সে ভালবাসার একমাত্র উৎস ছিলে তুমি।

গতবছর একদিন হঠাৎ তোমার শরীর খারাপ হল। দোকান থেকে ফিরে এসে দেখি তোমার জ্বর, তুমি শুয়ে আছ বিছানায়। আমার সাজানো-গোছানো জগৎ একদিনে কেমন এলোমেলো হয়ে পড়ল। স্নান করে বেরুবার সময় হাতের কাছে সাজানো নেই জামা-কাপড়, দরজার গোড়ায় গোছানো নেই ঘরে পরার চটিজুতো। একলা বসে খেতে হল রাতের খাবার, রাগ করে অর্ধেক খেয়ে উঠে পড়লাম। অনেক রাত্তির অবধি জেগে তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি দেখে তুমি হেসে বললে—উঃ, তোমার মত বৌ-পাগল মানুষ তো কখনও দেখি নি! একটু গা-গরম হয় না কারো? শুয়ে পড়ো দেখি—

কি করে তোমাকে বোঝাবো, সযত্নে নিরাপত্তার পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা জীবনপ্রাঙ্গণে সামান্যতম অনিশ্চয়তার প্রেতমূর্তি উঁকি দিলে কেমন লাগে!

পরের দিনও তোমার জ্বর ছাড়ল না। প্রবীণ বিশ্বপতি ডাক্তার তোমাকে দেখার পর প্রেসক্রিপশন লিখতে লিখতে হেসে আমাকে বললেন—ভয় নেই,

সাধারণ জ্বর। আজকাল এদিকটায় খুব ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছে, ঠাণ্ডা লাগতে দেবেন না। আপনি যা পত্নীগতপ্রাণ লোক মশায়, আপনার সেবার জোরে উনি তিনদিনে ঠেলে উঠবেন। কাউকে পাঠিয়ে দিন, ওষুধটা নিয়ে আসবে আমার ডিসপেনসারী থেকে—

সাতদিন কেটে গেল, কিন্তু তুমি ভাল হয়ে উঠলে না। বিশ্বপতি ডাক্তারের হাসি ক্রমশ শুকিয়ে এল। একদিন রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টটা হাতে নিয়ে বললেন—আমি বলি কি, আপনি বরং একজন ভাল স্পেশালিস্টকে দিয়ে এঁকে একবার চেক-আপ করান। বড্ড অবস্টিনেট ফিভার—

ভয় পেয়ে বলি—আপনি কি খারাপ কিছু বুঝছেন ডাক্তারবাবু ?

—না, খারাপ আর কি ? তবে রক্তে ডব্লু. বি. সি. কাউন্ট একটু বেশি—

—সেটা কি খারাপ কিছু ?

—না। তবে অ্যাকিউট অ্যানিমিয়া বেশিদিন থাকাটা—বুঝলেন না ?

কি নিবিড় আতঙ্কে ভরা দিনগুলো এল তারপর! তুমি ক্রমশ বিছানা থেকে আর উঠতে পারতে না। বিছানায় তোমার পাশে বসে থাকতাম সারারাত, নিদ্রাহীন প্রহরেরা ভয়ের মুখোশ পরে আমার চারদিকে ঘোরাফেরা করত। তোমার ওপর আমার সে কি সুতীব্র অভিমান! কেন তুমি চুপ করে শুয়ে আছ বিছানায়? কেন তুমি হাসছ না, কথা বলছ না ভাল করে ?

যেদিন বড় ডাক্তার বললেন তোমাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার কথা, আমি বললাম—না, ওকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে দেব না। এখানেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

—কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? যন্ত্রপাতি, ডাক্তার, নার্স—

সেফ থেকে চেকবই বের করে বললাম—ডাক্তারবাবু, আমার ওপর রাগ করবেন না, দু'বেলা আসতে আপনি কত ফি নেবেন ? অ্যামাউন্ট বসিয়ে নিন, আমি সই করে দিচ্ছি। যন্ত্রপাতি আর চব্বিশ ঘণ্টা নার্সিং-এ যা খরচ হতে পারে তাও হিসেব করে বসিয়ে নিন। খরচে কিছু এসে যায় না, ওর সেরে ওঠাই বড় কথা। সারবে তো ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তারবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—লেট আস হোপ ফর দি বেস্ট।

কত ওষুধপত্র এল, স্ট্যান্ড থেকে স্যালাইনের বোতল ঝুলতে লাগল, কপালে চিন্তার ভাঁজ নিয়ে রাত জেগে তোমাকে পাহারা দিতে লাগল নার্স।

একদিন অনেক রাত্তিরে পা টিপে টিপে তোমার পাশে গিয়ে বসলাম। নার্স ঘুমিয়ে পড়েছে চেয়ারে বসেই। তুমি চোখ বুঁজে ছিলে, কি করে যেন আমার উপস্থিতি টের পেয়ে চোখ মেলে তাকালে। কি দেখলে কে জানে, বললে—ইস্, তোমার চেহারা বড্ড খারাপ হয়ে গিয়েছে গো! ভাল করে খাওয়াদাওয়া করো, শরীর ঠিক রাখো।

তোমার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম—তুমি সেরে উঠে আমাকে রান্না করে দিলে তবে আমি ভাল করে খাবো—

তুমি হঠাৎ কেঁদে ফেলে আমার হাতের ওপর হাত রেখে বললে—ওগো, আমি তোমাকে ফেলে কোথাও যেতে পারব না, ডাক্তারকে বলো আমাকে যেন বাঁচিয়ে তোলে—

কালবৈশাখীর ঝড়ে উড়ে যাচ্ছিল আমার খড়ের চালা, অতীতের অসহায় দিনগুলোর গর্ভ থেকে প্রতিকারহীন দৈবের বিষণ্ণ অপচ্ছায়া উঠে এসে আবৃত করে ফেলেছিল আমার আলোকিত বর্তমান। উদ্গত কান্না দমন করে বললাম— কেন অমন কথা বলছ বল দেখি? কিছু হয় নি তোমার, এবার তুমি সেরে উঠতে শুরু করবে—

তারপর সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে একদিন সত্যিই তুমি সেরে উঠলে। ডাক্তার তোমার হাত থেকে টেনে বের করে নিল ড্রিপ এর ছুঁচ, খুলে দিল অক্সিজেনের নল। তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম—তুমি ভাল হয়ে গিয়েছ। আমার ঘর থেকে দূর হয়ে গেল অসুখের গন্ধ।

ঘরে দাঁড়িয়ে অনেক লোক। আমার ম্যানেজার, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট, পুরনো চাকর রঘু। নার্সের চোখে বোধহয় কি পড়েছে, জানলার কাছে দাঁড়িয়ে সে কেবলই চোখ মুছে চলেছে। অন্যরাও স্তব্ধ—সবাই উপভোগ করছে তোমার আরোগ্যের পবিত্র মুহূর্ত।

আমি এগিয়ে গিয়ে ডাক্তারের কাঁধে হাত রেখে বললাম—ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, আপনি না থাকলে আমি আমার স্ত্রীকে ফেরত পেতাম না। এবার চলুন আমরা বাইরে যাই। সেরে উঠে ও কেমন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে দেখুন! এখানে আমাদের শব্দ করা উচিত নয়।

ডাক্তার কেমন অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাল। অন্যরাও। আমার হাত ধরে ডাক্তার বলল—হ্যাঁ চলুন, আমরা বাইরেই যাই—

তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, তুমি সেরে উঠলে আর ব্যবসা করবো না। আমি সে কথা রেখেছি। তোমাকে নিয়ে চলে এসেছি এই নির্জন অরণ্যে, যেখানে বিয়ের পর প্রথম ফাল্গুনী প্রহরগুলি যাপন করেছিলাম। বুড়ো চৌকিদার হাসিমুখে এগিয়ে এসে সেলাম করল। সে এতদিন পরেও আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছে। কিন্তু ডবল বেডরুম আর দু'জনের খাবারের কথা বলায় সে অবাক হয়ে বলল— দু'জন? দু'জনের কেন বাবু?

মূর্খ! সাধে কি তোর সারাজীবন চৌকিদারী করে কাটল! এই যে পাশে আমার বৌ দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছিস্ না? আমার বৌ শোবে কোথায়? সে কি না খেয়ে থাকবে?

আমার ধমক খেয়েই কিনা কি জানি, লোকটা যেন কেমন গুটিয়ে গেল। কাছে আসে না, দূর থেকে অদ্ভুত চোখে তাকায়। কোলকাতার সেই ডাক্তারের মত।

ঘরে ফিরে আসি। জ্যোৎস্না তোমার ঘুমন্ত শরীরের ওপর স্বপ্নের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। বাইরে রাতজাগা পাখিটা কি আজ ঘুমোবে না? তুমি কি হাসছো ঘুমের ভেতর? স্বপ্ন দেখছো আমাকেই?

আর কখনো বিচ্ছেদ নেই। আর আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাবো না ব্যবসা করতে। এই অরণ্যের গহনে লুকানো জলপ্রপাতের ধারে শিলাখণ্ডে বসে আমরা দেখবো পূর্ণিমার চাঁদ উঠে আসছে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিতে হবে নাম-না-জানা পাখির ডাক। অরণ্যতলে মর্মরশব্দে গড়িয়ে যাবে শুকনো পাতা হঠাৎ জেগে ওঠা বাতাসের স্রোতে। মহাকালকে খণ্ডিত করার

মানুষী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে অনন্ত আনন্দের ঢেউ এসে স্পর্শ করবে এই আকাশ, পৃথিবী আর নক্ষত্রকে। বুঝতে পারব ঐশ্বর্য মিথ্যা, উন্নতি মিথ্যা, বেদনা মিথ্যা, মৃত্যু একটা কথার কথা মাত্র। সেই মহৎ উল্লাসের স্পন্দিত পরিসরে তুমি থাকবে আমার কাছে। তুমি আমার কাছে থাকবে। তুমি থাকবে কাছে কাছেই।

রুদ্র বীণা

রুদ্র সচরাচর ট্রামে চড়ে না। এত ধীরগতি কোনো যান তার মেজাজের সঙ্গে খাপ খায় না একেবারে। কিন্তু আজ ও সামনে একটা মোটামুটি খালি ট্রাম দেখে লাফিয়ে পাদানিতে উঠে পড়লো। দুপুরে এ সময় ট্রাম এমনিতেই কিছুটা ফাঁকা থাকে, এখন রুদ্র দু'সারি সিটের মধ্যে গিয়ে সামনের দিকে এগোতে এগোতে দেখলো কাঁচাপাকা চুলওয়ালা এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক নামবার জন্য উঠে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁর সামনে আর কেউ নেই, রুদ্র বসবার জন্য এগিয়ে গেল। কাঁধে শান্তিনিকেতনী ঝোলা ব্যাগ হাত দিয়ে সামলে ভদ্রলোক 'একটু দেখি ভাই' বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। রুদ্র বসলো।

রুদ্র যাবে হাতিবাগানে পিসিমার বাড়ি। অনেকদিন বাদে কোলকাতায় ট্রামে-বাসে বসতে পেলে সকলেরই আনন্দ হয়, রুদ্র ট্রামযাত্রা ভাল করে উপভোগ করবার জন্য নড়েচড়ে জমিয়ে বসলো। তার ডানদিকে একজন সিড়িঙ্গে চেহারার লোক জানালার বাইরে বিমর্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে। লোকটার জামার কলারের কাছে ময়লা জমে আছে। মুখের ভাব দেখলে মনে হয় কলিকের ব্যথা উঠেছে। একটা মাঝারী সাইজের ব্রাউন পেপারে প্যাক করা পুলিন্দা সিটের ওপর রেখেছে লোকটা, যার জন্য রুদ্রর বসতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু রুদ্র কিছু বলবার আগেই সিড়িঙ্গে লোকটাও উঠে পড়লো। রুদ্র দেখলো সিটে ব্রাউন পেপারের মোড়কটা পড়েই রয়েছে। সে ডেকে বললো—আপনার জিনিস পড়ে রইল। এই যে, এখানে—

লোকটা অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে বললো—আমাকে বলছেন? কি?

রুদ্র হাতে করে প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরলো—এটা নিয়ে গেলেন না?

—ওটা? কিন্তু ওটা তো আমার নয়। অন্য কারো হবে—

আর কোনো ঔৎসুক্য না দেখিয়ে লোকটা নেমে গেল।

রুদ্র হাতের প্যাকেটটার দিকে তাকিয়ে দেখল। রামকৃষ্ণ কথামৃতের মতো সাইজ। খুব একটা ভারি নয়। ভেতরে শক্ত কৌটোমত কিছু আছে বলে মনে হয়। প্যাকেটটা কে ফেলে গেল? সম্ভবত সেই কাঁচাপাকা চুলওয়ালা ভদ্রলোক। এটা নিয়ে সে কি করে এখন? কণ্ডাক্টরকে ডেকে ট্রাম কোম্পানিতে জমা দিয়ে দেবে? নাঃ, তাহলে আসল মালিকের কাছে কোনোদিনও পৌঁছবে কিনা কে জানে! তার চেয়ে এটা তার কাছেই থাক। বাড়ি ফিরে খুলে দেখা যাবে। ভেতরে মালিকের ঠিকানা পাওয়া অসম্ভব নয়। রুদ্র প্যাকেটটা নিজের কাছেই রেখে দিল।

কড়া নাড়তে দরজা খুলে দিলে পিসতুতো বোন টিক্লু।

—ওমা! রুদ্রদা এসেছে! মা সকাল থেকেই বলছিলেন আজ তুমি একবার নিশ্চয় আসবে। এসো, ভেতরে এসো—

পিসেমশাই ইজিচেয়ারে বসে চামড়ায় বাঁধানো পুরনো প্রবাসী পড়ছিলেন।

রুদ্রকে দেখে চশমা হাতে নিয়ে বললেন—তুমি কালই যাচ্ছ তাহলে?

—হ্যাঁ পিসেমশাই। সকালে একটা নতুন গাড়ি হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। সেইটেয় যাবো—

—জয়েন করছো কবে?

—গিয়েই করবার ইচ্ছে আছে। ওরা লিখেছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিপোর্ট করতে, কোনো নির্দিষ্ট তারিখ দেয় নি—

—তা না দিক, তুমি গিয়েই পরদিন সকালে জয়েন করবে। এসবেব ওপর অনেক সময় আবার প্রমোশন নির্ভর করে কিনা। আমি বেলা একটায় জীবনে প্রথম চাকবিতে যোগ দিই, ফলে যে ব্যাটা ফোরনুনে জয়েন করেছিল তাব আগে প্রমোশন হয়। সিনিয়রিটিতে পিছিয়ে গিয়ে প্রমোশনের জন্য আমাকে আড়াই বছর বসে থাকতে হয়েছিল।

এসব কথার ঠিক কোনো উত্তর হয় না। রুদ্র সদুপদেশ পেয়ে খুশি হয়েছে এমন মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পিসেমশাই নিজেই বললেন—আচ্ছা, যাও। যাবার সময় দেখা করে যেও—

অনেক রাত্তিরে নিজের ঘরে একা হলো রুদ্র। দরজায় ছিটকিনি লাগিযে টেবিলের ড্রয়ার থেকে প্যাকেটটা বের করল। ব্রাউন পেপারের ধারগুলো মুড়ে সেলোটেপ দিয়ে আটকানো। ব্লেড দিয়ে টেপ কেটে মোড়ক খুলল রুদ্র। ভেতরে একটা টিনের বাক্স। তার ঢাকনির চারদিকেও সেলোটেপ আঁটা। ঢাকনি খুলে চমকে উঠল রুদ্র।

ভেতরে রবারের গার্টার দিয়ে বাঁধা এক বাণ্ডিল একশো টাকার নোট আর কিছু সোনার গয়না।

এসব ঘটনা গল্প-উপন্যাসেই ঘটে। বা মাঝে মাঝে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে পাওয়া যায়—অমুক স্থানে অমুক জিনিস ফেলিয়া আসিয়াছি। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি—ইত্যাদি। বাস্তবেও এমন হয় তাহলে!

ভাল করে সবকিছু উল্‌টে-পাল্‌টে খুঁজে দেখলো রুদ্র। নাঃ, মালিকের ঠিকানার নামগন্ধও নেই কোথাও। নোটগুলো গুনে ফেলল এক এক করে। মোট দশ হাজার টাকা নগদে। গয়না বা তার ওজন সম্বন্ধে তার কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। তাও আন্দাজে মনে হলো ভরি পাঁচ-ছয় তো হবেই। মানে আজকের বাজারে সেও প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা!

এঃ! যার গেল তার অনেক গেল!

যার জিনিস সে অবশ্যই কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, ততদিনে এগুলো নিজের কাছে রেখে দেবার সিদ্ধান্ত করল রুদ্র। সে শিক্ষিত আদর্শবান ছেলে, জিনিস-গুলো আত্মসাৎ করার কোনো চিন্তাই তার মনে এল না।

কিন্তু রাখা যায় কোথায়? সে না থাকলে তার ঘরের কোনো জিনিসে কেউ হাত দেবে না ঠিকই, তবু বলা তো যায় না। কেন যেন এ ব্যাপারটা কাউকে জানাতে তার ইচ্ছে করল না।

দরজার ওপরে ঘরের এদিক থেকে ওদিক অবধি একটা সিমেণ্টের তাক করা আছে, তাতে অনেক পুরনো জিনিসপত্র স্তূপ করা। কাঠের টুলটা টেনে তার ওপরে দাঁড়িয়ে বহু পুরনো দিদিমার আমলের একটা টিনের তোরঙ্গের মধ্যে

প্যাকেটটা রেখে দিল রুদ্র।

অনেক রাত্তির অবধি শুয়ে শুয়ে তার ঘুম এল না। আগামীকাল নতুন জায়গায় চলেছে, জীবনের প্রথম চাকরি—বাড়ি ছেড়ে জীবনে প্রথম থাকা। বিজ্ঞাপন দেখে সরকারি বনবিভাগের একটা ভদ্র রকমের পদের জন্য দরখাস্ত করেছিল। গাছপালা তার বরাবরই ভাল লাগে। বি.এস্-সি.-তে বোট্যানি ছিল, তা ছাড়াও উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে বইপত্র পড়া তার শখ। অনেকেই ভয় দেখিয়েছিল—সরকারি চাকরি আজকাল এমনিতে হয় না, ঠিকঠাক জায়গায় তদ্বির করতে হয়, খুঁটির জোর লাগে। রুদ্রর জন্য বলবার মতো তেমন কেউ নেই, কিন্তু চাকরিটা হয়ে গেল।

বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে বলে খুব একটা মনখারাপ হচ্ছে না, শিলিগুড়ি এমন কিছু দূর নয়। আর এরকম জীবনই তো সে চেয়েছিল। ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়বার সময় থেকেই খেলাধুলো, দল বেঁধে রক্ত দেওয়া—এসব ব্যাপারে রুদ্র বেশ নাম করেছিল। বাড়ির আরামে থেকে বাঁধা চাকরি তার পছন্দ নয়। ঘুম এল না বাড়ি ছেড়ে যাবার দুঃখে নয়, নতুন জীবন শুরু করবার উদ্বেগে।

ভোর ছ'টায় ট্রেন। পাড়ার শেষে থাকে অজিত সিং, তার ট্যাক্সি আছে এবং সে-ট্যাক্সি রাত্তিরে অজিত সিংয়ের বাড়ির সামনেই থাকে। তাকে আগে থেকে বলা ছিল। সে-ই পেঁৗছে দিল হাওড়ায়।

জানলার ধারে সিট পেয়েছে রুদ্র। জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে সে নেমে এক প্যাকেট সিগারেট আর গোটা দুই পত্রিকা কিনে নিল। বাক্সের ভেতর সে তার প্রিয় কিছু বই নিয়েছে, কিন্তু সেগুলো এখন বের করা যা'ব না।

তার উল্টো দিকে জানালার ধারে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বসেছে। মেয়েদের সম্বন্ধে রুদ্র বিশেষ উৎসাহী নয়। কলেজে পড়ার সময়ে তার বন্ধুদের অনেকেরই একটি করে প্রেমিকা ছিল। অনেকেই চিঠি লিখত এবং পেত। রুদ্রর কখনো তেমন কোনো সুযোগ হয় নি। মেয়েদের সামনে সে খুব লাজুকও বটে।

একটুও দেরি না করে ঠিক সময়ে ট্রেন ছেড়ে দিল। টিকিয়াপাড়ার কারশেড ইত্যাদি পার হয়ে ক্রমে বাড়তে লাগল গাড়ির গতি। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছে রুদ্র। পত্রিকা দুটো কোলের ওপরে রাখা। লম্বা ট্রেনযাত্রায় প্রথম দিকে পড়তে ইচ্ছে করে না। তাছাড়া এত সকালে কখনো ট্রেনে চাপে নি সে, জানালার ধারে বসতে পাওয়াও একটা রীতিমত ভাগ্যের কথা। লাইনের দু'ধারেই ঘন বসতি। সেখানে মানুষ সবে ঘুম ভেঙে উঠছে, লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ট্রেন দেখতে দেখতে দাঁতন করছে কিংবা চায়ের দোকানে উনুনে আঁচ দিচ্ছে। আর এর মধ্যেই কোথা থেকে ঘুম ভেঙে কতখানি রাস্তা পেরিয়ে এসে সে ট্রেন ধরেছে।

সামনের মেয়েটি হঠাৎ ঝুঁকে পড়ে বলল—আপনার থেকে একটা পত্রিকা একটু দেখতে দেবেন? আমার নিতে ভুল হয়ে গিয়েছে—

রুদ্র একটু থতমত খেয়ে গেল, কারণ এই প্রথম সে লক্ষ্য করল মেয়েটির চোখ খুব সুন্দর। চিলের ছড়ানো ডানার মতো দুই ভুরু।

তারপরেই সে পত্রিকা দুটো বাড়িয়ে ধরল—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিন না—

পত্রিকা বেছে নিয়ে মেয়েটি হেসে বলল—কিছু করবার না থাকলে বসে থাকা খুব মুস্কিল, না? এ ট্রেন তো আবার বর্ধমানে থামে না, নইলে বর্ধমান থেকে একটা কিছু কিনে নিতাম—

—তাতে কিছু অসুবিধে হয় নি। এই দুটো পড়তে পড়তেই তো—আপনি কোথায় যাবেন?

—একেবারে শেষ স্টেশন। নিউ জলপাইগুড়ি। আপনি?

—আমিও তাই।

রুদ্র লক্ষ্য করল মেয়েটি সে নিউ জলপাইগুড়ি যাবে শুনে মনে মনে খুশি হয়েছে। তার খুব ইচ্ছে হলো বলে,—বেশ ভাল হলো, দু'জনে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। কিন্তু মুখে বলল—জানালার ধারে জায়গা পেলে কিন্তু বই পড়তে ইচ্ছে করে না। দেখতে দেখতে যেতে ভাল লাগে—

মেয়েটি হাসল—তা লাগে। কিন্তু এ পথে আমি অনেকবার গিয়েছি তো; সেইজন্যে আর কি—

—আপনি বুঝি প্রায়ই এই পথে যান?

—হ্যাঁ, আমার আত্মীয়ের বাড়ি যাই।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের প্রথম স্টপেজ বোলপুর। গাড়ি যখন বর্ধমান স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পার হচ্ছে, রুদ্র বলল—জানেন, আমি এই প্রথম এমন গাড়িতে চড়লাম যেটা বর্ধমানে থামে না—

—থামলে আমি একটা পত্রিকা কিনতাম।

—আর আমি সীতাভোগ।

দু'জনেই হেসে উঠল। রুদ্রর বেশ লাগল মেয়েটিকে। বেশির ভাগ বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েই নিতান্ত আড়ষ্ট। কথাও বলা যায় না। এই মেয়েটির সহজ সাবলীল ভঙ্গি, অনাড়ষ্ট ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করল।

সাড়ে আটটায় গাড়ি এসে থামল বোলপুরে। স্টেশনের বাইরে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে আকাশ, আবহাওয়ায় এখনো সকালের আমেজ। হাঁটু অবধি ধুলো নিয়ে কিছু গ্রাম্য মানুষ প্ল্যাটফর্মে বসে আছে সাহেবগঞ্জ লোকাল ধরবার জন্য। গলায় ফিতে দিয়ে কাঠের ট্রে ঝুলিয়ে টিং-টিং করে ঘণ্টা বাজিয়ে একটা লোক ঝুরিভাজা বিক্রি করছে। এত সকালে কারা ঝুরিভাজা খায়?

মেয়েটি বলল—আপনাকে একটু কষ্ট দেবো? আমার একটা কাজ করে দেবেন? এই বোতলটায় করে একটু জল এনে দেবেন স্টেশনের কল থেকে?

বোতল হাতে রুদ্র ট্রেন থেকে নামল। নেমে খুশি হলো। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সে রবীন্দ্রনাথের পরম ভক্ত, রাত্তিরে ঘুমোবার আগে মাঝে মাঝেই শত-বার্ষিকীর বছরে প্রকাশিত গীতাঞ্জলির পকেট এডিশনটা পড়ে। বোলপুরের মাটিতে পা দিতে পারা একটা বিশেষ সৌভাগ্য।

এবার লম্বা দৌড়। ট্রেন থামবে একেবারে মালদায় গিয়ে। এই তিন ঘণ্টায় রুদ্র জেনে ফেলল মেয়েটির নাম বীণা, থাকে পটুয়াটোলা লেন-এ। গতবছর বি. এ. পাস করেছে, মানে রুদ্রর চেয়ে বছর চারেকের জুনিয়ার। বীণা জেনে ফেলল রুদ্র জীবনে প্রথম চাকরি নিয়ে চলেছে বাড়ি ছেড়ে।

নিউ জলপাইগুড়িতে দু'জনে যখন বিদায় নিল তখন রুদ্র আবিষ্কার করল তার বুকের মধ্যে হঠাৎই একটা শূন্যতাবোধ তৈরি হয়েছে। সেই সঙ্গে কেমন একটা অযৌক্তিক রাগও হলো। কেন বীণা বিদায় নিয়ে চলে যাবে? নিজের চিন্তার ধারা দেখে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। বীণাকে কাছে রাখার কি অধিকার

আছে তার? বীণা তার কে? সামান্য কয়েক ঘণ্টার পরিচয় বই তো নয়?

তাহলে কি সে—কিন্তু এত অল্প সময়ে কি তা হয়?

এরপর অটো-রিক্সায় সুটকেস আর হোল্ড-অল ওঠাতে ওঠাতে রুদ্রর খেয়াল হলো সে বীণার ঠিকানা জেনে নেয় নি। না কালকাতার, না এখানকার। এমন ভুলও মানুষ করে! কোলকাতার রাস্তার নামটা জানা হয়েছে বটে। কিন্তু সমস্ত পটুয়াটোলা লেন ধরে তো আর 'বীণা ! বীণা!' বলে হেঁকে ফেরা যায় না!

প্রথমটায় খুব খারাপ লাগলেও পরে রুদ্রর মনে একটা অদ্ভুত বিশ্বাস জন্মাল। তার মনে হলো নিশ্চয় বীণার সঙ্গে আবার তার দেখা হবে। হবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। তাদের দু'জনের হারিয়ে যাবার পক্ষে এই পৃথিবীটা খুবই ছোট জায়গা।

ঠিকানা খুঁজে ওপরওয়ালা অফিসারের বাড়ি বের করল রুদ্র। ভদ্রলোক ভাল মানুষ। এক ধরনের মানুষ থাকে যারা কিছুতেই ভুলতে পারে না তারা উঁচু পদে চাকরি করছে, ইনি সে রকম নন। রুদ্রকে বাংলোর বারান্দায় বেতেব চেয়ারে বসিয়ে চা-জলখাবার খাওয়ালেন। বললেন—আপনাকে দেখে ভাই আমার চাকরি জীবনের প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ছে। ইস্! কি উৎসাহ তখন বুকে, যেন সারা পৃথিবীটাই জয় করে নিতে চলেছি—

রুদ্র বলল—কেন, এখন কি অন্যরকম মনে হচ্ছে?

ভদ্রলোক একটু কি ভাবলেন, তারপর বললেন—না। এখনও পৃথিবী ভালই লাগে। তা বলে ভাববেন না সারাজীবনটা নিতান্ত আরামে কাটিয়েছি। অনেক পিট্ফলস্ গেছে ভাই, অনেক ট্রাবল্—তবু বলতেই হবে যে মোটেব ওপর বাঁচতে ভালই লেগেছে। আসলে ও কথাটা বললাম এই কারণে যে, এখন রক্তের জোর গিয়েছে কমে। পৃথিবী জয় করবার ইচ্ছেও আর নেই, সাধ্যও নেই। জোরে লাফ দিতে কোমর ঝনঝন করে ওঠে। শুধু ইচ্ছের স্মৃতিটুকু রয়ে গিয়েছে। যাক্, অনেক সেণ্টিমেণ্টাল কথা বলে ফেললাম। আপনার জন্য একটা ছোট কোয়ার্টার এ্যালট করা গেছে। চলুন, ড্রাইভারকে বলে দিই কোথায় যেতে হবে। কাল সকালে আমার অফিসে গিয়ে জয়েনিং রিপোর্ট দেবেন এখন।

কোয়ার্টার পছন্দ হলো রুদ্রর। ডাকাডাকি করতে আউটহাউস থেকে বেরিয়ে এল এক অদ্ভুত জীব। পরনে তার জীর্ণ খাকি হাফপ্যাণ্ট, বয়েস বছর পঞ্চাশ-বাহান্ন, গায়ে চার-পাঁচ দিনে না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পাকশিটে মারা চেহারা —মুখে বিকশিত অমায়িক হাসি। সে রুদ্রকে দেখেই খটাস্ করে স্যালুট করে বলল—নতুন রেঞ্জারবাবু, না? অধীনের নাম রংলাল, আপনার চাকর। ঘরদোর সাফ করা, রান্নাবান্না, ফাইফরমাস খাটা—সব করে দেব হুজুর। আমার শরীরটা একটু ইয়ে দেখছেন বটে, কিন্তু কাজ আমার গায়ে লাগে না, হাতে হাতে করে ফেলব। পাজি লোকেরা আমাকে দেখতে পারে না, তারা আমার নামে আপনাকে নানারকম কথা বলবে। তাতে একদম কান দেবেন না হুজুর। সত্যি কথা বলতে কি, মাইনে পাবার দিন যা একটু গায়ের ব্যথা মারার ওষুধ খাই। আর সারা মাস ছুঁইও না। এই কি হুজুরের সব মালপত্র? আপনি বারান্দায় উঠে বসুন, আমি সব তুলে দিচ্ছি। আজ হোটেল থেকে খাবার এনে দেব এখন, কাল থেকে আমি

রাঁধব।

রুদ্রর হাসি পেল। লোকটা সরল। একটু বেশি বকে বটে, কিন্তু যারা বেশি কথা বলে তারা মানুষ ভাল হয়—এটা রুদ্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে।

এদিনও রাত্তিরে অনেকক্ষণ ঘুম এল না রুদ্রর। অচেনা জায়গা, বিদেশে প্রথম একা রাত্রিবাস, পথের কষ্ট। তাছাড়া—

ভাসমান চিলের ছড়ানো ডানার মতো কার দুই ভুরু, কার যেন সুন্দর দুই চোখের স্মৃতি, না-পাওয়ার মাদকতাময় বেদনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অনেক রাত অবধি তাকে জাগিয়ে রাখল—জানালার বাইরে দিগন্তে ঝুঁকে পড়েছে কালপুরুষ, অগ্নিময় টিকার মতো জ্বলছে লুব্ধক।

সে-ই কেবল একা জেগে।

দৃঢ় বিশ্বাস এবং ঐকান্তিক ইচ্ছার ফল যে এত তাড়াতাড়ি ফলে তা কে জানত! পরের দিন একটা মজার ঘটনা ঘটল।

বেলা সাড়ে-দশটায় সে গিয়ে ডি· এফ· ও·-র অফিসে রিপোর্ট করল। ভদ্রলোক বললেন—এই যে, সময়মত এসে গিয়েছেন দেখছি। একটা জয়েনিং রিপোর্ট হাতে লিখে দিয়ে দিন আমাকে, তারপর আমার জিপটা নিয়ে একবার বেরিয়ে পড়ুন। কাছাকাছি আমাদের যা অ্যাফোরেস্টেশন হয়েছে চিনে আসুন। ড্রাইভারই সব দেখিয়ে দেবে।

চাকরিতে ঢোকার একঘণ্টার মধ্যে রুদ্রর সক্রিয় জীবন শুরু হয়ে গেল। জিপে করে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ খুব ভাল লাগতে শুরু করল রুদ্রর। হ্যাঁ, ঠিক এই জীবন সে চেয়েছিল। ডাইনে একদিকেব আকাশ আড়াল করে দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে হিমালয়। রাস্তার দুদিকে অজস্র সোঁদালী আর কৃষ্ণচূড়া গাছ, মাঝে মাঝেই চা-বাগান। বাতাসে যেন কিসের উদ্দীপনা আর আশ্বাস।

রুদ্র জিজ্ঞাসা করল—আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?

ড্রাইভার ভদ্রলোক বললেন—আমরা আর একটু এগিয়ে ডানদিকে দার্জিলিং যাবার পথে বেঁকে শুকনা ফরেস্টের দিকে যাবো স্যার। তবে শুকনা অবধি যাবো না, তার আগেই বাঁদিকে আমাদের ডিপার্টমেণ্ট নতুন বন বসিয়েছে—সেটা দেখিয়ে আপনাকে বাগডোগরার দিকে নিয়ে যাবো।

—শুকনা অবধি যাবো না কেন?

—শুকনা যাবার পথে একটা ছোট্ট নালার ওপরে ব্রিজ ভেঙে গিয়েছে স্যার, মেরামত চলছে। চার-পাঁচ দিন পরে যাওয়া যাবে।

দার্জিলিং যাবার ন্যারোগেজ রেললাইনের ধারেই বন। কিছু ইউক্যালিপ্টাস বসানো হয়েছে। আর আছে শাল, সেগুন। বছর দুই তিন আগে বসানো তরুণ গাছ, বেশ ধরে গিয়েছে মাটিতে। গাড়ি থেকে নেমে বনের মধ্যে পা চালিয়ে ঘুরে এল রুদ্র। এ গাছেরা এখনো অরণ্যের রূপ পায় নি। বনস্পতির পত্রজালে রোদ্দুর বাধা পেয়ে বনভূমিতে যে ছায়ানিবিড় নিভৃতি রচনা করে, সে মায়াজাল তৈরি হতে এখনো দেরি আছে।

জিপে ফিরে এসে রুদ্র বলল—চলুন ভাই, যাওয়া যাক্।

ড্রাইভার ভদ্রলোক সিগারেট খাচ্ছিলেন, রুদ্রকে আসতে দেখেই ফেলে দিলেন। রুদ্রর খুব মজা লাগল। এ অভিজ্ঞতা তার একেবারেই নতুন। আজ তাকে দেখে কেউ সিগারেট লুকোচ্ছে, আর গতকাল অবধি—নাঃ, সরকারি চাকরির সুখ আছে বটে।

গাড়ি স্টার্ট নিতে রুদ্র বলল—বাগডোগরা?

—স্যার, ঠিক বাগডোগরা না। বাগডোগরার পথে মাটিগাড়া বাজারের আগে ডাইনে পড়বে নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি। ইউনিভার্সিটির ভেতরে আমাদের ফরেস্ট আছে। সেটা দেখিয়ে আপনাকে আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, নইলে দুপুরে খেতে দেরি হয়ে যাবে।

নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস খুব ভাল লাগল রুদ্রর। বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছড়ানো ছিটানো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের বাড়িগুলো, সুন্দর ঝক্‌ঝকে পিচের রাস্তা, রাস্তার পাশে সারি সারি নানা জাতের গাছ। মাঠের মধ্যে কয়েক জায়গায় শালবন—সেগুলো বনবিভাগ থেকে তৈরি করা হয়েছে।

এমনি একটা শালবনের পাশে জিপ থামতেই রুদ্রর মনে হলো পরিচিত কোলাহলময় জগত থেকে সে এক শান্তির পরিবেশে এসে পড়েছে। জিপের ইঞ্জিন বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে সে কি আশ্চর্য স্তব্ধতা! যেন ঘুম পেতে থাকে। হাল্‌কা হাওয়ায় গাছের পাতায় মৃদু মর্মর। তার সঙ্গে কোথা থেকে সুন্দর বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসছে। বেশ একটা ছোটবেলার পৌরাণিক কাহিনীতে পড়া তপোবন-তপোবন ভাব।

রুদ্র গিয়ে দাঁড়ালো শালবনে। বাঁশির আওয়াজ এখানে আরো স্পষ্ট।

হিমালয়কে যেন হাত বাড়িয়ে ধরা যাবে। পর্বতের বুকের কাছে জমে আছে মেঘ। দুটো শালিক রুদ্রর পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে গেল একটু দূরে।

একটা শালগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে একজন মানুষ বাঁশি বাজাচ্ছে। মাথায় কোঁকড়া চুল, পরনে পাজামা আর পাঞ্জাবি। একটু দূরে আর একটা গাছে একখানা সাইকেল হেলান দেওয়া রয়েছে। চোখ বুঁজে বাজাচ্ছে লোকটি।

রুদ্র দাঁড়িয়ে শুনছে, এমন সময় লোকটি বাজানো বন্ধ করে চোখ খুলেই রুদ্রকে দেখে বোধহয় একটু লজ্জা পেল। উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জিত মুখে পাজামা থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সাইকেল নেবার জন্য এগুলো। অপ্রস্তুত হয়ে রুদ্র বলল—বেশ বাজাচ্ছিলেন, আমি এসে সব গোলমাল করে দিলাম, না?

লোকটি ফিরে তাকিয়ে হেসে বলল—না না, আমার এমনিতেই বাড়ি ফেরবার সময় হয়েছে। আপনাকে মনে হচ্ছে আগে কখনো দেখি নি। এখানে নতুন বোধহয়, তাই না? এ জায়গার সবাইকেই মোটামুটি চিনি—

—আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরি পেয়ে এসেছি। কোলকাতায় বাড়ি।

—ওহো, তাই! আমারও বাড়ি কোলকাতায়, এখানে চাকরি করি। আমার কোয়ার্টার কাছেই। আসুন না, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। গল্প করবার লোকের আমাদের বড় অভাব।

একেবারে প্রথম আলাপেই চা খাবার নিমন্ত্রণ!

—আমি? চা? মানে, এখন চা—

—আরে, এভরিটাইম ইজ টি টাইম। চলে আসুন—

ড্রাইভার ভদ্রলোককে অপেক্ষা করতে বলে রুদ্র চললো নতুন বন্ধুর সঙ্গে। যেতে যেতে পরিচয় হলো। বংশীবাদকের নাম স্বপন ঘোষাল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিকস্ পড়ান। কোলকাতায় বাঘা যতীনে বাড়ি।

শালবনের পরেই একটা তেরাস্তার মোড়ে উঁচু সিমেন্টের বেদিমত করে একটা যুদ্ধের ট্যাঙ্ক রাখা আছে। বর্তমানে নানা লতাপাতা গজিয়ে উঠে ট্যাঙ্কটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এর থেকে কয়েক পা এগিয়েই স্বপনবাবুর বাড়ি।

বসবার ঘরে একটি ছেলেমানুষ চেহারার লোক বসেছিল। অযত্ন বিন্যস্ত চুল, উজ্জ্বল চোখ। এরা ঘরে ঢুকতেই সে বলে উঠল—এই যে স্বপনদা, এতক্ষণ ছিলেন কোথায়? আমি কখন থেকে এসে বসে আছি। মুলতানের গৎ-টা আজ কিন্তু দেখিয়ে দিতে হবে—

—আচ্ছা, হবে—হবে—এস আলাপ করিয়ে দিই। এ হচ্ছে পিনাকী চক্রবর্তী, আমাদের এখানে ইকনমিকস্ পড়ায়। আর ইনি রুদ্র সান্যাল, চাকরি নিয়ে সবে কোলকাতা থেকে এসেছেন—

রুদ্রর বেশ ভাল লাগছিল এদের অকপট বন্ধুত্ব। কিছু মানুষ আছে যাদের কাছে থাকলেই মন ভাল হয়ে যেতে থাকে—এরা সেই ধরনের মানুষ।

স্বপনবাবুর স্ত্রী সোনালী আর ছেলে চুম্‌কার সঙ্গেও আলাপ হলো। বস্তুত মিনিট দশেক পরে রুদ্র এমনভাবে সবার সঙ্গে বসে গল্প করছিল যেন এদের সঙ্গে তার কতদিনের চেনা।

গল্পের মধ্যেই যে মেয়েটি পর্দা সরিয়ে চায়ের ট্রে-হাতে ঘরে এসে ঢুকল, তাকে দেখে রুদ্রর হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল গলার কাছে।

বীণা। বীণা এখানে কি করে—

সে তো জানতোই, বীণাকে লুকিয়ে রাখার পক্ষে পৃথিবীটা যথেষ্ট বড় জায়গা নয়।

বীণাও ততক্ষণে তাকে দেখতে পেয়েছে।—একি! আপনি এখানে!

রুদ্রর গলার কাছে কি একটা আটকাচ্ছে। সে কথা বলতে পারছে না।

সোনালী অবাক হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে। স্বপনবাবু বললেন—কিহে! তোমাদের কি আগে থেকেই আলাপ আছে নাকি? অবাক ব্যাপার তো—

বীণা বলল—হ্যাঁ, আমরা গতকাল একই ট্রেনে এসেছি। কি মজা, বলুন? আবার দেখা হয়ে গেল—

রুদ্র কি যেন বলতে গেল, কিন্তু গলার কাছে সেই ব্যাপারটা আটকে আছে, কতগুলো অসংলগ্ন শব্দ হলো মাত্র।

এরপর চা খাওয়া হলো, পিনাকী চক্রবর্তীর গান হলো, বীণা যে সোনালী বৌদির জ্যাঠতুতো বোন তা জানা হলো। সমস্তক্ষণ রুদ্র মাথা নিচু করে বসে রইল। এর আগে অবধি তত না, আজ দেখা হওয়ার পর সে বুঝতে পেরেছে যে—

ঘণ্টাখানেক পর আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেরিয়ে এল রুদ্র। পিনাকীও নিজের কোয়ার্টারে ফিরবে, সে বেরিয়ে এল একই সঙ্গে। দুজনে জিপের দিকে হাঁটছে, পিনাকী বলল—স্বপনদা মানুষটা দারুণ ভাল জানেন? প্রথম যখন আসি, উনি এত সাহায্য করেছিলেন যে কি বলবো। আড্ডার লোভে রোজই একবার এসে জুটি। আজ আমার আর স্বপনদার অফ-ডে, তাই দুপুরেই আড্ডা হলো।

কাল বিকেলে কি আপনি ফ্রি আছেন?

রুদ্র হাসল।—আমি তো নতুন এসেছি। কাউকে চিনি না। চাকরির সময়টুকু বাদ দিয়ে সব সময়ই ফ্রি। কেন বলুন তো?

—কাল বিকেলে চলে আসুন না স্বপনদার বাড়ি, জমিয়ে গল্প করা যাবে। আসবেন?

রুদ্রকে বিশেষ উপরোধ করবার প্রয়োজন ছিল না। সে বলল—আসবো।

পরের দিন বিকেলে তিন চাকার অটো-রিক্সা ধরে স্বপনবাবুর বাড়িতে হাজির হলো রুদ্র। পিনাকী আগেই এসেছে। সোনালী বৌদি গল্প করতে করতে বিনুনি বাঁধছেন। রুদ্রকে দেখে স্বপনবাবু বললেন—এই যে মশায়, এসে গিয়েছেন দেখছি। চট্‌পট্ চা খেয়ে নিন, আমরা বেড়াতে যাবো।

—বেড়াতে? কোথায়?

—সেরকম কিছু না। ক্যাম্পাসের ভেতরেই একটু হেঁটে বেড়াবো।

কিন্তু কার্যকালে কি একটা কারণে সোনালী বৌদি বাড়িতে রয়ে গেলেন। স্বপন ঘোষাল হেসে বললেন—ভালই হলো। আজ শালীকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি। তুমি বরং আমাদের জন্য লুচি আর বেগুনভাজা করে রেখো। আমরা ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই ফিরবো। চলো বীণা—

এক একটা দিন যেন ভগবান নিজের হাতে গড়ে পাঠান। আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল রুদ্র? পথে বেরিয়েই স্বপন ঘোষাল বললেন—ওহোঃ, আমার তো তামাক ফুরিয়ে গিয়েছে। ভাই রুদ্র, তুমি বীণাকে নিয়ে একটু গল্প করতে করতে হেঁটে বেড়াও, আমি আর পিনাকী চট করে বাজার থেকে সিগারেটের তামাকটা কিনে আনি। তোমাদের তো আলাপ আছেই, কাজেই সঙ্কোচের কারণ নেই। বীণা, তোমরা শালবনের ভেতরে কাঠের প্যাগোডার কাছে থেকো, আমরা এই এলাম বলে—

পিনাকী আর স্বপন ঘোষাল নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ডানদিকের পথ ধরে বাজারের দিকে চলে গেল।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে রেলিংঘেরা ট্যাঙ্কটার সামনে। রুদ্রর মনে আগের সেই বিপন্ন ভাব আর নেই। তার বদলে কেমন একটা প্রশান্তি। লোকজন দেখা যায় না কোথাও, পশ্চিমে এক আশ্চর্য সুন্দর সূর্যাস্ত হচ্ছে—এইরকম নির্জন মুহূর্তে সে একা কাছে পেয়েছে একটি নম্র তরুণীকে, যাকে তার ভাল লাগে। অনেক বলবার কথা ভিড় করে এল রুদ্রর বুকের মধ্যে। কোন্‌টা সে আগে বলবে? কি করে বলতে হয়?

বীণাই প্রথম কথা বলল।

—এই ট্যাঙ্কটা দেখলে মায়া লাগে, না? আর কোনোদিন চলবে না—

রুদ্র একটা কথার সূত্র এতক্ষণে খুঁজে পেল। কলেজে পড়বার সময় একবার সে যুদ্ধবিরোধী এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেছিল। বীণার কথার উত্তরে সে এক নিঃশ্বাসে প্রায় পুরো বক্তৃতাটাই বলে গেল। শেষে বলল—আমি চাই পৃথিবীতে যেখানে যত ট্যাঙ্ক আছে এইরকম অকেজো হয়ে পড়ুক। পৃথিবী যুদ্ধের জন্য নয়, পৃথিবী বাঁচবার জন্য, ভালবাসবার জন্য।

উত্তেজনায় পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল রুদ্র।

বীণা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। সে থামতে বলল—ও বাব্বাঃ! আপনি তো দারুণ বক্তৃতা দেন! এটা এখনি বানিয়ে বললেন?

রাজনীতি আর প্রেমের ক্ষেত্রে নাকি মিথ্যা বলতে দোষ হয় না। রুদ্র অম্লান বদলে বলল—না তো কি! বাড়ি থেকে মুখস্থ করে এসেছিলাম? আমি কি জানতাম এইখানে একটা ট্যাঙ্ক থাকবে আর আপনি সেইটের কথা তুলবেন?

আবার সেই শালবন। আগে রুদ্র ঠিক খেয়াল করে নি, বনের মাঝখানে কাঠের তৈরি একটা প্যাগোডার মতো ব্যাপার আছে। বীণা বলল—এই জায়গায় ইউনিভার্সিটির কনভোকেশন হয়, জানেন? তাছাড়া, নানারকম ফাংশানও হয়। এর আগের বার যখন এসেছিলাম, এইখানে আমজাদ আলী খাঁ সাহেবের সরোদ শুনেছিলাম।

—আপনি বুঝি ক্লাসিকাল গান-বাজনা খুব ভালবাসেন?

—তা, একটু একটু—কেন, আপনি বাসেন না?

—আমি বুঝতে পারি না যে।

—আমিও তো বুঝি না। আর গানের আবার বোঝাবুঝির কি আছে? ভাল লাগলেই হলো।

ওরা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কাঠের বারান্দায় উঠে এল। চারদিকে শালের অরণ্যে বৈকালী নীরবতা। রুদ্র পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালো।

বীণা বলল—আসুন, এখানে একটু বসি। বসবেন?

রুদ্র রুমাল দিয়ে সিঁড়ির ওপরের ধাপটা ঝেড়ে দিল। বসল দু'জনে। সামান্য দূরত্ব রেখে, একই দিকে তাকিয়ে।

একটা শালপাতা উঁচু ডাল থেকে ঘুরতে ঘুরতে খসে পড়ল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে হিমালয়ের নীল নির্জনতা।

কত কথাই তো বলবার ছিল, কিছুই বলা হলো না। কিন্তু মন ভরে উঠল কানায় কানায়।

একসময় খুব আস্তে আস্তে বীণা বলল—খুব সুন্দর কাটল বিকেলটা।

রুদ্র উত্তর দিল না।

এই তরুণ বয়েসে, যখন সমস্ত জীবনটা সামনে বিস্তৃত রয়েছে রূপে-রসে-গন্ধে উপভোগ করে নেবার জন্য, একমাত্র সেই আশীর্বাদপূত বয়েসেই এরকম হতে পারে। এ মানসিকতা দৈনন্দিন জীবনের নীরস পুনরাবৃত্তিতে হারিয়ে যায়।

দূরে স্বপন ঘোষাল আর পিনাকীর গলা শোনা যাচ্ছে।

সন্ধ্যার ছায়া নামছে শালবনে।

হঠাৎ ওরা এসে পড়বার আগেই রুদ্র বলে উঠল—আমারও, আমারও খুব ভাল লাগল বিকেলটা, সত্যি বলছি—

রাত্তিরে খাওয়া সেরে সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় বসে রইল রুদ্র। দূরে পাহাড়ের গায়ে ঝিকমিক করছে তিনধরিয়া আর কার্শিয়াংয়ের আলো। কোয়ার্টারের হাতার ভেতর কাঠবাদাম গাছে কি একটা রাত্রিচর পাখি ডানা ঝটপট করে উঠল। আউটহাউসে বেসুরো গলায় গান গাইছে রংলাল।

বুকে যেন কিসের একটা অনির্দেশ্য ব্যথা। কিসের শূন্যতাবোধ।

স্বপন ঘোষালের পরিবারের সঙ্গে রুদ্রের দ্রুত পরিচয় জমে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সে এখন প্রায়ই চা খেতে এবং চা না খেতে স্বপনবাবুর বাড়ি যায়। বাইরের ঘরে আড্ডা জমে উঠে রাত হয়ে যায়। স্বপন ঘোষাল যে শুধু বাঁশি বাজান তাই নয়। তিনি সেতার এবং সন্তুরও বাজিয়ে থাকেন। সবার অনুরোধে একদিন সন্তুর বাজিয়ে শোনালেন। রুদ্র সবাইকে নেমন্তন্ন করে একদিন শুকনা ফরেস্টে বেড়াতে নিয়ে গেল।

কিন্তু এতে কি হবে? বীণার ফেরার সময় এগিয়ে আসছে, আর বেশিদিন সে থাকবে না। আজও রুদ্র পরিষ্কার করে তাকে বলতে পারল না মনের কথা।

হয়তো বীণা সবই বুঝতে পেরেছে। হয়তো কেন, নিশ্চয় বুঝেছে। কিন্তু এসব কথা তো একদিন না একদিন মুখ ফুটে বলতেই হয়।

এর পরেই দ্রুতপরম্পরায় এমন কয়েকটা ঘটনা ঘটে গেল যে, আর কারো আলাদা করে কিছু বলবার প্রয়োজন থাকল না।

একদিন রুদ্র জিপ নিয়ে কি কাজে শহরের বাইরে গিয়েছিল। কাজ সেরে বিকেল নাগাদ ফিরছে, দেখল মেডিকেল কলেজের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে পিনাকী চক্রবর্তী। তার চেহারা বিপর্যস্ত, চুল উস্‌কো খুস্‌কো।

তাড়াতাড়ি জিপ থেকে নেমে তার কাছে যেতেই রুদ্রকে দেখে সে যেন একটা বিষম দুর্ভাবনার হাত থেকে বাঁচল।—ওঃ, আপনি এসে পড়েছেন, খুব ভাল হয়েছে। দেখুন দিকিনি কি কান্ড!

—কেন, কি হয়েছে? কারো অসুখ-বিসুখ নাকি?

—বীণা হঠাৎ দুপুরবেলা বাথরুমে পা পিছলে পড়ে গিয়ে খুব আহত হয়েছে। মাথার পেছনে কেটে গিয়ে অনেক রক্তপাত হয়েছে। এমনিতে ভয়ের কিছু ছিল না, দু'বোতল রক্ত দিলে অনেকটা সামলে যেত। কিন্তু রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না। স্বপনদা একটা প্রাইভেট ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের খোঁজে গিয়েছেন। আপনি এসেছেন, অনেকটা রিলিভ্‌ড্‌ লাগছে। একা এত নার্ভাস লাগছিল।

সমস্ত বিশ্বসংসার যেন চারদিকে নৃত্য করতে শুরু করেছে। রক্ত না পেলে বীণার জীবন বিপন্ন হবে। কেন, রক্ত কেন পাওয়া যাচ্ছে না?

রুদ্র বলল—রক্ত কেন পাওয়া যাচ্ছে না পিনাকী?

—রক্ত তো অনেক আছে, কিন্তু বীণার দরকার বি-গ্রুপের নেগেটিভ রক্ত। সে রক্ত কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না—অথচ—

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল রুদ্রর। কোলকাতায় বন্ধুদের নিয়ে দল বেঁধে সে বহুবার রক্তদান করেছে। ডাক্তার তাকে বলে দিয়েছিলেন তার রক্ত খুব রেয়ার গোষ্ঠীর। সে ইউনিভার্সাল ডোনার, এবং তার রক্তের আর. এইচ. ফ্যাক্টর নেগেটিভ। তাহলে তো—

সে বলল—পিনাকী, তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে চল, আমি বীণাকে রক্ত দেবো—

পিনাকী অবাক হয়ে বলল—তোমার ব্লাড নেগেটিভ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক জানো?

—জানি।

—বি-গ্রুপ?

—না। ও-গ্রুপ। আমি ইউনিভার্সাল ডোনার, সবাইকেই রক্ত দিতে পারি। দাঁড়াও, আমার ওয়ালেটে ডাক্তারের সার্টিফাই করা কার্ডটাও বোধহয় আছে। এই যে, চল ভেতরে গিয়ে দেখাই—

লোহার উঁচু খাটে শুইয়ে রুদ্রর ব্লাডপ্রেসার দেখলেন ডাক্তারবাবু। রুদ্র বলল —যা রক্ত প্রয়োজন, যতটা প্রয়োজন, নিয়ে নিন—

- কিন্তু আড়াইশো মিলিলিটারের বেশি তো নেওয়া হয় না ভাই।

—আমি বলছি আমার কিছু হবে না। আপনি নিতে পারেন -

পাশে পিনাকী আর স্বপন ঘোষাল এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দিকে তাকিয়ে ডাক্তারবাবু বললেন—আপনাদের ডোনারের কথা শুনুন।

তারপর রুদ্রকে খুব গোপন কথা জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গিতে বললেন- পেসেণ্ট কে হয় আপনার ? অ্যাঁ ?

রুদ্র বলল—কিন্তু রক্ত না পেলে তো বীণার ক্রাইসিস্ কাটবে না।

—কাটবে। ভয় নেই, এক বোতল প্লাজমা দেওয়া চলছে। প্রাইমারি শক্ তাতেই অনেকটা কেটে যাবে। তারপর আপনার রক্ত। তারও পরে প্রয়োজন হলে দেখা যাবে।

স্বপন ঘোষাল বললেন—সময় পেলে কোলকাতা থেকে প্লেনে আনাতে পারি।

ডাক্তারবাবু বললেন—মনে হয় দরকার হবে না।

দরকার হলো না। সন্ধ্যের দিকে জ্ঞান ফিরে এল বীণার। এই সমস্ত সময়টা ঠায় হাসপাতালের বারান্দায় কাঠের বেঞ্চিতে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে গেল রুদ্র। রাত আটটা নাগাদ মেট্রন এসে বললেন—আপনারা আর কষ্ট করবেন না, আপনাদের পেসেণ্ট ভাল আছে। যান, বাড়ি যান—

স্বপন ঘোষাল বললেন—আমরা কি একবার-

—না, আজ নয়। কাল সকালে এসে দেখবেন। ডাক্তারের নিষেধ—

সারারাত ঘুমোতে পারল না রুদ্র।

যদি সে এখন বীণার কাছে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারত!

তিনধরিয়ার আলোগুলো জ্বলছে পাহাড়ের গায়ে। সেদিকে তাকিয়ে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎই রুদ্রর চোখে জল এল। কি রহস্যময় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের এই গভীর দিকটা! কিছুদিন আগে অবধি বীণা কে ছিল তার ? কি এসে যেত বীণার অসুখে ? আর আজ তার জন্য রুদ্র রাত জেগে বসে আছে।

এখন ক'টা বাজে ? এগারোটা ? ঠিক এখনি তার রক্ত ফোঁটা ফোঁটা করে মিশে যাচ্ছে বীণার শরীরে। বীণা ভাল হয়ে উঠুক। তার শরীর থেকে ঝরে যাক অসুখের বিষ। সে হেঁটে যাবে বলে পৃথিবীর ঘাস আরো সবুজ হয়ে উঠুক।

পরের দিন সকালে মন শক্ত করে অফিসে গেল রুদ্র। সকালে সে বীণার সঙ্গে দেখা করতে যাবে না, এখন অনেকেই দেখতে আসবে বীণাকে। সে একান্তে দেখতে চায়। বীণাকে জানাবে সে তার মনের কথা।

দুপুর তিনটে নাগাদ হাসপাতালে যে ডাক্তার ডিউটিতে ছিল তার সঙ্গে গিয়ে রুদ্র দেখা করল। লোকটি অল্পবয়স্ক, চোখে বুদ্ধির ছাপ। রুদ্র বলল- ডাক্তারবাবু, গতকাল যে মহিলাটি মাথায় আঘাত পেয়ে ভর্তি হয়েছেন, আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। বেশি নয়, মাত্র পাঁচ মিনিট—

—এখন না, চারটের পর ভিজিটিং আওয়ার, তখন আসুন—

—আমি একজন গভমেণ্ট অফিসার। আমাকে আজই ট্যুরে বেরিয়ে যেতে হবে, চারটের পরে আমি আর সময় পাবো না, প্লীজ—

ডাক্তার রুদ্রর দিকে তাকলেন। বললেন—পেসেণ্টের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ?

সামান্য ইতস্তত করে রুদ্র বলল—ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা আছে—

ডাক্তার একটু হাসলেন।—আচ্ছা যান। মনে রাখবেন, ঠিক পাঁচ মিনিট। সিস্টার, এঁকে বারো নম্বর কেবিনে পোঁছে দিন।

ধপ্ধপে সাদা বিছানায় চোখ বুজে শুয়ে আছে বীণা। রুদ্র গিয়ে সন্তর্পণে বিছানার পাশে রাখা চেয়ারে বসলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বীণার চোখ আস্তে আস্তে খুলে গেল। দু'জনে চোখে চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে জানালার পর্দা। বাইরে দিন গড়িয়ে যাচ্ছে দিনাবসানের দিকে।

তারপর বীণা রুদ্রর দিকে তাকিয়ে হাসল। উত্তরে রুদ্র ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়ে বলল—এখন একটু ভাল আছ বীণা?

বীণার ঠোঁট একটু কাঁপল, বলল—তুমি আমাকে রক্ত দিয়েছো। আমি শুনেছি।

রুদ্র বলল—আমি আরো দিতে চেয়েছিলাম। আমাকে দিতে দেয় নি।

ম্লান হাসল বীণা।—তুমি একটা পাগল!

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ। তারপর বীণাই আবার বলল—রক্তের কত দাম জানো? আমার তো কিছু নেই, আমি কি দিয়ে শোধ করবো?

—শোধ করতে চাও?

—চাই।

—বেশ। ভাল হয়ে ওঠো, আমি উপায় বলে দেবো।

বীণার আঙুলে একটা সাদা পাথরের আংটি। জানালা দিয়ে আসা শেষ বেলার আলো পড়ে ঝল্সে উঠছে।

সিস্টার দরজার কাছে এসে বললেন—আর না ভাই। লেট আস্ নট ডিসটার্ব হার—

রুদ্র দাঁড়িয়ে উঠে বলল—হ্যাঁ, এই যে—আর একমিনিট—

—ঠিক আছে।

রুদ্র বলল—আজ আসি তাহলে? ভাল থেকো—

—শোনো।

—কি?

—কাছে এসো, বিছানায় আমার পাশটায় বোসো।

ডিমের খোলার ওপরে বসবার মতো সন্তর্পণে রুদ্র বীণার পাশে বসলো। বলল—কি বলবে?

—কিছু না। এমনি তোমাকে বসতে বললাম।

পাখির ছড়ানো ডানার মতো বীণার দুই ভুরুর দিকে তাকিয়ে রুদ্র মনস্থির করে ফেলল। আজই বলবে সে। আজই বীণাকে জানাবে।

—বীণা, আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। বলবো?

বীণা একটু হাসলো, তারপর খুব মৃদু গলায় বলল—তুমি কি বলবে আমি জানি। বলবার দরকার নেই।

রুদ্রর গলার কাছে আবার সেই কি একটা উঠে আসছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল—আমি যাই বীণা। কাল আবার আসবো।

এমার্জেন্সী রুমে ছোকরা ডাক্তারটি চেয়ারে আড় হয়ে বসে রিডার্স ডাইজেস্ট পড়ছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে রুদ্র বলল—আমাকে মার্জনা করবেন।

ডাক্তার অবাক হয়ে বলল—অ্যাঁ! সে কি মশাই! কেন?

—আমার কোথাও ট্যুরে যাবার নেই। বারো নম্বর কেবিনের পেসেন্টের সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

ডাক্তারটি একটু হেসে বলল—যান, মাপ করা গেল। আমিও সামনের মাসে বিয়ে করবো, কাজেই মার্জনা করতে অসুবিধে হলো না—

পরের দিন খুব ভোরে প্রথম বাস ধরে রুদ্র স্বপন ঘোষালের বাড়ি গেল। ডোরাকাটা পায়জামা পরে স্বপনবাবু বাগানের গাছ তদারক করছিলেন। রুদ্রকে দেখে বললেন—আরে, এসো এসো। কি ব্যাপার, এত সকাল সকাল?

—আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে স্বপনদা।

রুদ্রর কথা বলার ভঙ্গিতে স্বপন ঘোষাল অবাক হয়ে তাকালেন।

—কী বলো তো? সিরিয়াস কিছু?

—ভয় পাবেন না। আমার ব্যক্তিগত একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই—

—বেশ তো, ভেতরে এসো। চা খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

—না স্বপনদা, বৌদির সামনে কথা হবে না। আপনি একটা জামা পরে আসুন। বাইরে কোথাও বসি। ফিরে এসে চা খাবো এখন।

স্বপন ঘোষালকে নিয়ে রুদ্র শালবনের মধ্যে সেই কাঠের প্যাগোডার সিঁড়ির ওপর এসে বসল। জায়গাটায় পবিত্রতার গন্ধ মাখা।

—স্বপনদা, আমি জীবনের একটা বড় পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছি। সেই বিষয়ে আপনার সাহায্য চাই। কোনো লজ্জা না করে বলবো?

সস্নেহে রুদ্রর কাঁধে হাত রেখে স্বপন ঘোষাল বললেন—বলো।

—আমি বীণাকে বিয়ে করতে চাই।

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে স্বপন ঘোষাল বললেন—আমি জানতাম। বুঝতেও পেরেছিলাম। কিন্তু রুদ্র, তুমি তো বোঝো—এর ভেতর বীণারও মতামতের প্রশ্ন আছে।

—বীণাও আমাকে—তারও আপত্তি নেই। আমি কাল জেনেছি।

স্বপন ঘোষাল কি ভাবলেন, তারপর বললেন—রুদ্র, তুমি শিক্ষিত ও ভদ্র, উপার্জনশীল। সবদিক দিয়েই বীণার যোগ্য পাত্র। কিন্তু তোমাকে আর একটা সিদ্ধান্তও এখুনি নিতে হবে। তাহলে আমি চেষ্টা করতে পারি।

—কি সিদ্ধান্ত?

—এ বিয়েতে একমাত্র বীণাকেই তুমি পাবে। আর কোনোদিক দিয়েই তুমি লাভবান হবে না। বীণার বাবার কিছুই দেবার ক্ষমতা নেই। ছিল, কিন্তু এখন নেই।

রুদ্র আহত স্বরে বলল—এ কথা আমাকে বলতে পারলেন স্বপনদা? বীণাকে

ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না—

একটা সিগারেট ধরালেন স্বপন ঘোষাল।

—তোমাকে একটা গোপন কথা বলি শোন। কেউ এ কথা জানে না এখনো। বীণার বিয়ের চেষ্টা চলছে আজ মাস কয়েক হলো। দু-এক জায়গায় অনেকদূর কথাও এগিয়েছে। বিয়ের আগে কয়েকদিন আমার এখানে ঘুরে যাবার জন্য বীণা এসেছে। ওর হাতে ওর বাবা, মানে সোনালীর জ্যাঠামশাই আমাকে একটা খামে বন্ধ চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে একটা দুঃসংবাদ আছে।

—কি দুঃসংবাদ?

—বীণা এখানে আসার আগের দিন ওর বাবা বিয়ের জন্য গড়ানো কিছু গয়না আর ক্যাশ টাকা নিয়ে ব্যাঙ্কের ভল্টে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। উনি ভয়ানক ভুলো মনের লোক। ট্রামে গয়না আর টাকাসুদ্ধ প্যাকেটটা ফেলে আসেন। ভদ্রলোকের ক্ষতি স্বীকার করে নেবার ক্ষমতা অসীম। কাউকে এখনো বলেন নি একথা। কেবল আমাকে জানিয়েছেন। ফলে বীণার বিয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। বীণাও জানে না চিঠিতে কি ছিল।

শুনতে শুনতে রুদ্রর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কাঁপছিল।

ট্রামে পাওয়া সেই ব্রাউন পেপারের প্যাকেটটা! কাঁচাপাকা চুলওয়ালা সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক, যিনি কলেজ স্ট্রীটে নেমে যাওয়ায় রুদ্র বসতে পেরেছিল, তিনিই তাহলে বীণার বাবা। যতদূর দৃশ্যটা মনে পড়ছে, ভদ্রলোকের কাঁধে একটা খদ্দরের ঝোলা ব্যাগ ছিল। প্যাকেটটা ব্যাগেই বা রাখেন নি কেন?

রুদ্রর মুখভাবের পরিবর্তন দেখে স্বপন ঘোষাল বললেন—ও কি! তোমার আবার কি হলো? হঠাৎ শরীর খারাপ লাগছে নাকি?

—স্বপনদা, বীণার বিয়ের কোনো অসুবিধা নেই। গয়না দিয়েই বিয়ে হবে—

স্বপনবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন—কী বলছো হে? গয়না দিয়ে বিয়ে হবে মানে কি? কে দেবে?

—আমি দেবো।

—তুমি দেবে! তার মানে? বীণাকে খুব ভালবাসো বুঝলাম, কিন্তু নতুন চাকরি—তুমিই বা পাবে কোথায়?

—স্বপনদা, হারিয়ে যাওয়া টাকা আর গয়না আমার কাছে রয়েছে। ওই ট্রামে আমি ছিলাম। বীণার বাবা উঠে যেতে খালি সিটে আমিই বসে প্যাকেটটা পাই। আমাকে ঠিকানা দিন, কালই কোলকাতা গিয়ে জিনিসগুলো ফেরৎ দিয়ে আসছি।

স্বপন ঘোষাল কিছুক্ষণ বর্তুলাকার চোখ করে বসে রইলেন। তারপর বললেন—আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, দৈব-টৈব মানি না। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব ঘটনা ঘটে যার কোনো ব্যাখ্যাও পাওয়া যায় না। তোমার সঙ্গে বীণার বিয়েটা যেন ঠিক হয়েই ছিল। যাক্, চল—তোমার সঙ্গে আমিও কোলকাতায় যাই। বিয়ের দিন একেবারে পাকা করে ফিরবো।

স্নিগ্ধ সকালের শালবনে শুকনো পাতা মাড়িয়ে ওরা দুজনে ফিরতে লাগল। তেমাথার মোড়ে লতাপাতায় ঘেরা ট্যাঙ্কটার পাশ দিয়ে আসবার সময় রুদ্র মনে মনে বলল—দেখো, একদিন পৃথিবীতে সব যুদ্ধ থেমে যাবে, জং ধরে অকেজো

হয়ে যাবে সব যুদ্ধের যন্ত্রপাতি। আমরা দু'জনে ভালোবাসা দিয়ে পৃথিবী ভরিয়ে দেবো। দেখো তুমি।

বুড়ি পিসিমা

মানুষের জীবনে অনেক ছোটখাটো গল্প থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রত্যেক মানুষেরই এক একটা গল্প আছে—থাকেই। এইচ. জি. ওয়েলসের 'দি ডায়মণ্ড মেকার' গল্পের নায়ক লোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে তার ভেতরের কাহিনীটা ঠেলে বের করে আনতো। এসব গল্প শান্ত, পাড়াগাঁয়ের বাঁশবনের ছায়ায় ছায়ায় যে পথটি নদীর দিকে গিয়েছে তার মত। আজকাল সবার সময় কম, চাহিদা বেশি। দুঃসাহসী এবং অদ্ভুতকর্মা গোপন এজেন্ট (যার নম্বর এক্স-৯৯৯ কিম্বা জেড-৫০১) কিভাবে আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রকে ধ্বংস করল—সবাই সেই গল্পই শুনতে চায়। যে মানুষ হাজার বছর বেঁচে আছে, একদিন ভোরে উঠে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে ভেসে আসা পাখির ডাক শুনে তার যে আনন্দ হয়েছিল, কিম্বা ফসল ভাল হওয়ায় যে হাট থেকে সাধের রঙীন কাপড় এনে বৌয়ের মুখে ফুটিয়ে তুলেছিল খুশির হাসি—অথবা সহস্রবর্ষজীবী যে মানুষ প্রিয়জনের চিতার ধারে বসে কেঁদেছিল পবিত্র শোকে—সে মানুষের সহজ গল্প কোথাও লেখা থাকে না, কেউ বলেও না। অথচ তাদের নিয়েই তো ইতিহাস।

এভাবে গুরুগম্ভীর কথা দিয়ে সচরাচর একটি ছোটগল্প শুরু হয় না। কিন্তু আজ সকালে শহরের প্রান্তে কুণ্ঠিত অস্তিত্ব নিয়ে বেড়ে ওঠা সজনে গাছটার সবুজ পাতার ঠাসবুনোটে শরতের সোনালী রোদ্দুরের যে লুকোচুরি খেলা চলেছে, সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ল মায়ের মুখে বহুবার শোনা বুড়িপিসিমার গল্পের কথা। এবং সেই সঙ্গে এইসব কথাও মনে ভেসে উঠল। যা যা মনে হয়েছিল তার কিছু বাদ দিয়ে কিছু লিখলে শিল্পের প্রতি সুবিচার করা হলেও সত্যের নেহাৎই অপলাপ ঘটে, কাজেই কি প্রসঙ্গে বুড়িপিসিমার কথা মনে এসেছিল তা জানিয়েই রাখলাম।

আমাদের পৈতৃক গ্রামে বুড়িপিসিমার মামাবাড়ি। সে গ্রাম ছেড়ে আমরা চলে এসেছি আমাদের অতি শৈশবেই, বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। এ গল্প সবটাই মায়ের কাছে শোনা। বুড়িপিসিমাকে আমি দেখি নি কখনো।

পিসিমার বাবা ছিলেন সম্পন্ন গৃহস্থ। ধানের জমি ছিল, গোয়ালে দুধেল গরু ছিল, উঠোনে ছিল বড় বড় ধানের গোলা। সারা বছর চলে গিয়েও অঢেল বাড়তি থাকত। এই ঘরে বিয়ে হয়েছিল পিসিমার মায়ের। গ্রামদেশে একেই রাজরাণী হওয়া বলে। কিন্তু সবার আড়ালে থেকে এক রহস্যময় হাত আমাদের সুখদুঃখ মাপে, তার হিসেবী হাতে পিসিমার মায়ের সুখের পরিমাণ একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। বিয়ের দু'বছর পরে সন্তান হতে গিয়ে বুড়িপিসিমার মা মারা গেলেন। সেই সন্তান পিসিমা। প্রসব হতে গিয়ে শিশুর কাঁধ আটকে গিয়েছিল প্রসবদ্বারে। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ধাত্রী, অনেক চেষ্টা করেও কোনো উপায় করতে পারে নি। অনেক কষ্ট পাবার পর শিশু ভূমিষ্ঠ হল বটে, কিন্তু

দু'দিন দু'রাত পরে পিসিমার মা শরীর বিষিয়ে উঠে মারা গেলেন। এখন মনে হয় তাঁর বোধহয় ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল।

মৃত্যুর সময়ে ঘরে আর কেউ ছিল না। শুধু দাই আর সদ্যপ্রসূতি। উঠোনের একদিকে বেড়ার দেয়াল দিয়ে আঁতুড়ঘর করা হয়েছিল। ভেজা স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে হোগলার মাদুরের ওপর কাঁথা পেতে বিছানা। বিকেলের দিকেই বাড়ির মেয়েরা গতিক দেখে বুঝতে পেরে গেল রাত কাটে কিনা সন্দেহ। পুরুষেরা তো পারতপক্ষে আঁতুড়ঘরে ঢোকে না। নিতান্ত প্রিয়জনের শেষ সময়—তাতে কি? মেয়েরা এই কিছুদিন আগে অবধি পুরুষের নর্ম-কর্ম-পূজার সঙ্গী ছিল না, ছিল একটা দরকারী আসবাব, বা একটা প্রয়োজনীয় যন্ত্র। এ দুটো জিনিসই বাজারে পাওয়া যায়। কাজেই মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত না থাকার জন্য পিসিমার বাবাকে দোষ দিই না। তিনি যে নিষ্ঠুর ছিলেন তাও নয়। সে সময়কার সমাজের ওটাই ছিল দস্তুর।

নবজাত শিশুকে তুলে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। দাই ঝিমোচ্ছিল ছিটে বেড়ার দরজায় হেলান দিয়ে বসে। বাইরে উঠোনের ওধারে কাঁঠালতলায় জোনাকির দল জ্বলছে-নিভছে। আঁতুড়ঘরের পেছনে ঘেঁটু আর আসশ্যাওড়ার বনে রাত্রিচর জন্তুর সতর্ক পায়ের শব্দ। হঠাৎ বিছানার দিক থেকে কেমন একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ পেয়ে দাই তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে প্রসূতির পাশে হাঁটু গেড়ে বসল।

তখন রোগিণীর চোয়াল শক্ত হয়ে আটকে গিয়েছে, যেন পার্থিব সম্বলটুকু প্রাণপণে আঁকড়ে ধরার ভঙ্গিতে দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ। কালান্তক রোগের দারুণ আক্ষেপে শরীরের সমস্ত পেশী একটু বাদেই মুচড়ে উঠছে। সেঁক করবার জন্য একটা ভাঙা কড়াইতে ঘুঁটের আগুন করা ছিল, তার নিভন্ত ছাই থেকে ধোঁয়া উঠে ঘরের মধ্যে আবছা আলোআঁধারি তৈরি করেছে। এককোণে জ্বলছে রেড়ির তেলের প্রদীপ। দাই দেখল রোগিণী বিস্ফারিত চোখে একবার বহুকষ্টে শক্ত হয়ে আসা ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পাশে খালি জায়গাটুকুর দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকাল—যেখান থেকে সন্ধ্যার পরেই শিশুটিকে তুলে নেওয়া হয়েছে। তারপর তার চোখ ঘুরে এসে দাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে গেল। পিসিমা অনেক পরে একবার দাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন মায়ের গল্প শোনবার জন্য। দাই শেষ-সময়ের বর্ণনা দিয়ে বলেছিল—খুকি, আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, কথা বলবার ক্ষমতা থাকলে তোর মা বলতো—রঙ্গিণী, আমার মেয়েকে দেখিস। কিন্তু আমি গরীব মানুষ, খুকি। ইচ্ছে থাকলেও আমার সাধ্য ছিল না।

সবার অনাদর আর হেলাফেলার মধ্যে বুড়িপিসিমা মানুষ হতে লাগলেন। বহুক্ষণ ঘরের মেঝেতে কাঁথায় শুয়ে চিৎকার করে কাঁদছে বাচ্চাটা, কারো হয়ত খেয়াল হওয়াতে এসে আধবাটি দুধ খাইয়ে আবার শুইয়ে রেখে গেল। তারপর ফের রয়েছে নিজের মনে।

খুকির দেড়মাস বয়েসে আবার এল পালাবদল।

পিসিমার বাবা জমিজমার কি কাজে সদর আদালতে গিয়েছিলেন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে। ফিরলেন জ্বর নিয়ে এবং তিনদিন রোগভোগ করে স্ত্রীর অনুগমন করলেন।

গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবার—এমনিতেই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মৃত্যু হওয়াতে পিসিমাকে সবাই বলত—মাখাকী। বাবা মারা যেতে পরিবারের অন্যান্য জীবিত সদস্যদের অনিষ্ট-আশঙ্কায় পিসিমার বাপের বাড়ির সকলে একমত হলেন যে, এ আপদ এখুনি বিদায় করা দরকার। কে একজন বুদ্ধি দিলেন—দাও ওকে ওর মামাবাড়িতে পাঠিয়ে। বুদ্ধি দিলেন বটে, কিন্তু সে গ্রাম প্রায় আট-দশ মাইল দূরে। ভাল পথও নেই। দু'বার খেয়াতে বিল আর বাঁওড় পার হয়ে আল ভেঙে চষা মাঠের ওপর দিয়ে সেখানে পেঁছিতে হয়। আপদকে নিয়ে যায় কে?

ডাক পড়ল রুক্মিণী দাইয়ের। রুক্মিণী রাজিও হল। পরে দেখা হবার সময় বুড়িপিসিমা জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি বলে তুই রাজি হলি দাই-মা?

—আমি রাজি না হলে তুই বাঁচতিস না খুকি। ওরা তোকে যত্ন না করে মেরে ফেলতো। কি হয়েছিল জানিস? তোর বড়কাকী আমাকে একটা কাঁথা আর একঘটি দুধ দিয়ে বলল—এই রইল দুধ, জ্বাল দিয়ে দিয়েছি। নে, এবার বেরিয়ে পড়। ওই কাঁথায় করে জড়িয়ে নে—

তোর ঠাকুমার বোধহয় তোকে তাড়াবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু বড়বো যা খাণ্ডার, কিছু বলতে সাহস পেল না। ভোরে বেরুলাম তোকে কোলে নিয়ে। এক মাইল করে পথ চলি আর কোনো গাছের তলায় বসে তোকে কাঁথার কোল ছিঁড়ে তৈরি করা সলতে দিয়ে দুধ খাওয়াই। একে ভাল রাস্তা নেই, তারপর বেলা একটু বাড়তেই উঠলো দারুণ রোদ। একহাতে তোকে জড়িয়ে রেখেছি আমার বুকের আড়ালে, আর এক হাতে দুধের ঘটি। মনে মনে বলছি—অপরাধ নিও না ঠাকুর, না নিয়ে এলে এ বাচ্চা মরে যেত।

বিকেলে পেঁছিলাম তোর মামার বাড়ি। তোর মামী দাওয়ায় বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল, আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল—তুমি কে গা?

আমার উত্তর শুনে সে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। ভাবলুম এইবার বুঝি সকলে বেরিয়ে এসে তোকে কোলে তুলে নেবে। তা কোথায় কি! একহাতে বাচ্চা আর একহাতে ঘটি নিয়ে উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি। মাঝে মাঝে একজন করে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখে আবার ঘরে ঢুকে যাচ্ছে। বসতেও বলে না, বা কিছুই না। শেষে বুঝলুম এমনিতে তোকে ওরা নেবে না। আমি করলুম কি, ওদের ভেতরবাড়িতে ঢোকবার দরজার কাছে কাঁথাতে তোকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে দুধের ঘটিটা মাথার কাছে রেখে জোরগলায় হেঁকে বললুম—ওগো বাছারা, কান দিয়ে শোনো আমার নাম রুক্মিণী দাই, এসেছিলুম তোমাদের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে। তা তোমরা তো আর নিজে থেকে মেয়ে নিলে না। আমি এই দোরগোড়ায় মেয়েকে শুইয়ে রেখে গেলুম। এখন তোমরা যা করবার করো—

এইভাবে শুরু হয়েছিল বুড়িপিসিমার জীবন। আত্মীয়ের দোরগোড়ায় ধুলোর মধ্যে পড়ে থেকে।

যখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে তখন নেহাৎ শেয়ালে নিয়ে যাবে মনে করে কে একজন ভেতরে নিয়ে যায় পিসিমাকে।

পনেরো বছর বয়েস অবধি বুড়িপিসিমা মামাদের আশ্রয়ে ছিলেন। অনাদর হলে তবু সহ্য করা যায়, কারণ অনাদরের মধ্যে নেতিবাচক হলেও যাকে দেখতে

পারি না তার অস্তিত্বের একটা স্বীকৃতি আছে। কিন্তু মামাদের কাছে পিসিমা যা পেয়েছিলেন তা হল সার্বিক উপেক্ষা—যেন তিনি এ পৃথিবীতে কোথাও নেই।

পনেরো বছর বয়েসে পিসিমার বিয়ে হয়। বিয়ে দেওয়াটা মামা-মামীর আন্তরিক আগ্রহের ফল নয়, ঘাড় থেকে পাপ নামানোর ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। দোজবরে পাত্র, অবশ্য আগের পক্ষের কোনো ছেলেপুলে নেই। নাম বামনদাস চাটুজ্যে। কাজ করেন পার্বতীপুর রেল-ইয়ার্ডে। সবাই শুনে বলল—বেশ ভাল পাত্র, এই বা মন্দ কী? ওই মেয়ের এই যথেষ্ট হয়েছে। পাত্রের দাবী কিছুই নেই। নমো নমো ক'রে লালপাড় শাড়ি আর শাঁখা সিঁদুর দিয়ে বিয়েটা হয়ে গেল।

দোজবরে হোক বা যাই হোক, বামনদাস লোকটি ছিল ভাল—পত্নীবৎসল। সধবা অবস্থায় আট-দশটি বছরই বুড়িপিসিমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে। স্বামীর আদর, বছর বছর রেলের পাস পেয়ে বেড়াতে যাওয়া—বেশ কেটেছে। কিন্তু দোরগোড়ার ধুলোর ওপর শুয়ে পিসিমার জীবন শুরু, সুখ তাঁর জীবনে একটা নিত্য অবস্থা নয়।

বিয়ের নবম বছরে, তখন পিসিমার দুই ছেলে হয়ে গিয়েছে, বামনদাসবাবুর কঠিন গ্রহণী রোগ হ'ল। যা খান কিছুই জীর্ণ হয়ে শরীরের কাজে লাগে না। দেখতে দেখতে শরীর অস্থিসার হয়ে গেল। ডাক্তারের পরামর্শে পিসিমা স্বামীকে পুরীতে নিয়ে গেলেন হাওয়া বদল করতে।

রাত্তিরে পৌঁছেছিলেন, পরদিন ভোরে সবাই মিলে গেলেন জগন্নাথ দর্শন করতে। পুজো দিয়ে ফিরে এসে পিসিমা দেখলেন স্বামীর মুখ গম্ভীর, কেমন যেন উদাস মত। বললেন—কি হয়েছে গো? কি ভাবছো?

—কিছু না।

—বলো না, বলতেই হবে—

—দেখ বৌ, একটা কথা বলি। আমার মনে হচ্ছে আমি আর বেশিদিন বাঁচবো না।

পিসিমা ভয় পেয়ে বললেন—ও আবার কেমন কথা? বাঁচবে না কেন?

—জানো, পুজো দিতে গিয়ে আজ আমি বলরামের মুখ দেখে ফেলেছি।

—তাতে কি?

—জগন্নাথের আগে বলরামের মুখ দেখে ফেললে সে আর বাঁচে না।

—কি বলছো আবোল-তাবোল! থামো তো—

পিসিমা ধমক দিলেন বটে, কিন্তু বামনদাসবাবু মাঝে মাঝেই বলতে লাগলেন —দেখো তুমি, আমার মা বলতেন এ কথা। এ ভুল হবার নয়।

রোগ কঠিন হোক বা না-ই হোক, রোগী যদি ভাবতে শুরু করে যে সে আর বাঁচবে না, তাহলে তাকে বাঁচানো সত্যিই কঠিন হয়ে পড়ে।

পুরী থেকে ফিরে কিছুদিনের মধ্যেই বামনদাসবাবুর মৃত্যু হল।

পিসিমা দুঃখ পেলেন খুবই, পৃথিবীতে একমাত্র যার কাছ থেকে প্রকৃত সমবেদনা পেয়েছিলেন, সে চলে গেল। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতে তিনি অগাধ জলে পড়লেন না, কারণ কষ্ট দুঃখ তাঁর অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল।

বামনদাসবাবুর দেশ ছিল হুগলি জেলার কোথাও। সেখানে এখন কিছুই নেই। কয়েকখানা কোম্পানীর কাগজ এবং সামান্য নগদ টাকা সম্বল করে পিসিমা

আবার মামাবাড়ির গ্রামে এসে উঠলেন। তবে এবার আর মামাবাড়িতে নয়। কালো রায়ের আমবাগানের পেছনে এতটুকু জমিতে একটা খড়ের চালা উঠিয়ে দুই ছেলে নিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই ঘটনারও পনেরো-কুড়ি বছর পরে এই গ্রামে আমার মা নববধূ হিসেবে শ্বশুরঘর করতে যান। হিসেবমত বুড়িপিসিমার বয়েস তখন পঞ্চাশ-বাহান্ন।

সেকালে মানুষের মন অন্যরকম ছিল। আজকাল পাড়ার লোকেও কেউ কারো খবর রাখে না। তখনকার দিনে পাড়ায় কোনো ক্রিয়াকর্ম উপস্থিত হলে সবাই যেচে এগিয়ে আসতো সাহায্য করতে। মা প্রথম যখন এসে উঠোনে দাঁড়ালেন, তখন গ্রামের অন্য সবার সঙ্গে বুড়িপিসিমাও এসেছিলেন। তারপর থেকে প্রায়ই আসাযাওয়া করতেন।

শ্বশুরবাড়ির দেশের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কেটে যাবার পর মা গ্রামের বৌ-ঝিদের সঙ্গে ইছামতী নদীতে স্নান করতে যেতেন। নদীতে যাবার পথ ছিল পিসিমার বাড়ির সামনে দিয়ে।। কোনোদিন কেউ পিসিমাকে বসে থাকতে দেখে নি। হয় তিনি তরকারী কুটছেন, নয় কাঁঠালবিচি ধুচ্ছেন অথবা উঠোনে বঁটি পেতে গরুর জন্য খড় কাটছেন। দেখতে পেলেই মাকে বলতেন—কিগো বৌমা, আমার বাড়িতে আসবে না? এসো একদিন, কাঁঠালবিচি পুড়িয়ে মুড়ি দিয়ে খেতে দেব।

একদিন বিকেলে রোদ্দুর পড়ে এলে মা গা ধুয়ে চুল বেঁধে বুড়িপিসিমার বাড়ি বেড়াতে গেলেন। বাড়ির সামনে ভেরেণ্ডা গাছের বেড়া, ঘুরে বাড়ির সামনে আসতে আসতে বেড়ার ফাঁক দিয়ে মার চোখে পড়ল পিসিমা বেশ একটা বড়সড় চেহারার বাচ্চাকে আড় করে কোলে নিয়ে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন, আর বাচ্চাটা প্রবলবেগে হাত-পা ছুঁড়ছে। মা একটু অবাক হয়ে ভাবলেন বাচ্চাটি কে হতে পারে। পিসিমার দুই ছেলে বুধো আর মঙ্গল বেশ বড় হয়ে গিয়েছে, বাড়িতেও অন্য কেউ নেই। এতটুকু খোকা কোথা থেকে এল?

তারপরেই উঠোনে পা দিয়ে মা থ' হয়ে গেলেন!

পিসিমার কোলে ওটা খোকা নয়। একটা বাছুর!

মাকে দেখে পিসিমা একগাল হেসে বললেন—এসো বৌমা। এতদিনে এলে তাহলে! দেখ দিকিনি, নতুন মানুষ এলে, উঠে যে একখানা আসন এগিয়ে দেব তার যো নেই। দেখছ তো অবস্থা—

—তাতে কি হয়েছে! আমি নিজে নিয়ে নিচ্ছি একখানা চাটাই। কি হয়েছে আপনার বাছুরের?

—হবে আবার কি? বড্ড ফৈজৎ করে খাবার সময়ে।

পিসিমার পাশে একটা বড় পাথরের খোরা, তাতে অনেকখানি কি তরল দ্রব্য রয়েছে। বাচ্চাদের খাওয়ানোর আগে ঝিনুক দিয়ে নাড়াচাড়া করে যেমন মায়েরা দুধ ঠান্ডা করে, তেমনি ভঙ্গিতে পিসিমা ঝিনুকটা দিয়ে খোরার তরল পদার্থটি নাড়ছেন এবং জোর করে হাঁ করিয়ে বাছুরকে খাওয়াচ্ছেন। সঙ্গে অবিরাম চলেছে সস্নেহ বকুনি—গেলো, আপদ, গেলো! সারাদিন তো গিলবে না, কেবল চার-পা দিয়ে আদাড়ে বাদাড়ে লাফিয়ে বেড়াবে! অমন করলে মোটাসোটা হবে না ছাই! ওই পাগলা নাপিতের মরকুটে ছাগলটার মত দেখতে হয়ে যাবি, দেখিস। আপদের

একটুকু বয়েসে আবার জিভের সোয়াদ হয়েছে! নুন না মেশালে খাবেন না! তা মেশালাম তো নুন—খাও দিকি এবার!

আমার মা তো ব্যাপার দেখে অবাক! একটু পরে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বললেন—অতবড় ঝিনুক পেলেন কোথায় পিসিমা? কখনো দেখি নি তো!

একগাল হেসে পিসিমা বললেন—ঝিনুক কোথায় দেখলে গো বৌমা? ঝিনুক কি এতবড় হয়? সন্ধ্যেবাতি দেবার পেতলের পিদ্দিমটা! ঝিনুকে কি আমার মুতলির পেট ভরে!

পরে মা বলেছিলেন—পিসিমার সহজ বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। বাছুরকে খাওয়ানোর জন্য ঝিনুক কোথায় পাওয়া যাবে, এ ভেবে আমরা হয়তো বিব্রত হতাম। প্রদীপকে ঝিনুক করে কাজ চালাবার বুদ্ধি আমাদের মাথায় আসতো না।

সংসার জিনিসটা নেহাৎ থেমে থাকবার নয়, ভালোমন্দ যে কোনো একটা দিকে চলেই, তাই বুড়িপিসিমার সংসার চলে যেত। স্বামীর মৃত্যুর পর পাওয়া টাকা দিয়ে বিঘে দেড়েক জমি কিনেছিলেন, সেটা ভাগে চাষ করতে দেওয়া ছিল। তার থেকে সামান্য ধান পেতেন, তাছাড়া হাতে তক্‌লি দিয়ে সুতো কেটে পৈতে বানিয়ে, নারকোলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি পাকিয়ে ছেলেদের দিয়ে হাটে বিক্রি করতে পাঠাতেন। তাতে যা আয় হত কোনোরকমে আধপেটা খাওয়াটা হয়ত চলে, কিন্তু ছেলেপুলেদের পড়াশুনো শেখাবার খরচ আর যোগাড় হয় না। ফলে বুধো আর মঙ্গল চড়কতলার পাঠশালায় কোনোরকমে বাংলা নামসই অবধি শিখে সরস্বতীর সাধনায় ইস্তফা দিল। গ্রামের এক ভদ্রলোক কোলকাতায় রেলে চাকরি করতেন, একটু বড় হয়ে দুইভাই সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে কোলকাতা গেল একটা যাহোক চাকরি যোগাড়ের আশায়। মঙ্গল বয়েসে ছোট হলেও তার স্বাস্থ্যটা ছিল দাদার চেয়ে ভাল, অবিলম্বে সে রেলে গ্যাংম্যানের কাজ পেয়ে গেল। বুধো একটু বাবু লোক। তার যা মেজাজ, তাতে লেখাপড়া না জানলেও একটা কেরানীর চাকরি পেলে সুবিধা হয়—বসে বসে কাজ ছাড়া তার পোষাবে না। দুইভাই গ্রামের পরিচিত ভদ্রলোকের মেসেই থাকা এবং খাওয়া সারছিল। বুধো কাজ না পেলে ব্যাপার ঘোরালো হয় দেখে ভদ্রলোক বুধোকে নিজেদের মেসের ম্যানেজার হিসেবে কাজে লাগিয়ে দিলেন। কাজ খুব হালকা, শুধু বাজার করা আর ঠাকুর-চাকরদের কাজের তদারক করা। খেতে পাবে আপাততঃ আর দশটাকা মাইনে। অন্য ভাল কিছু না পাওয়া অবধি এ চাকরি তো চলুক।

মানুষের জীবনের সত্যিকারের গল্পের সঙ্গে নাটক-নভেলের মিল বড় একটা থাকে না। সিনেমাতে, অথবা বাজারে খুব কাটতি আছে এমন একটা বাংলা উপন্যাসে এরপর এ গল্পটা কি রকম দাঁড়াতো তার বর্ণনা দিচ্ছি—

মেসের ম্যানেজারী করতে করতে বুধো একটা কারখানায় রাত্তিরবেলা পাহারা দেবার কাজ পেয়ে গেল। দিনের বেলা মেসের কাজ করে ঘুমিয়ে নেয়, রাত্তিরে দারোয়ানী করে। মঙ্গলের জীবনও বদলে গেল অদ্ভুত ভাবে। শেয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে, হঠাৎ দেখা গেল একটি দু'তিন বছর বয়েসের বাচ্চা মেয়ে, ফুটফুটে দেখতে, টলমল করে প্ল্যাটফর্মের কিনারার দিকে এগিয়ে চলেছে। সবাই হইচই করছে, কিন্তু কেউ বাঁচাতে যাচ্ছে না। মঙ্গল নিজের প্রাণ বিপন্ন করে মেয়েটিকে বুকে তুলে সরে এল। মেয়ের দিদিমা তাকে একশোটা টাকা দিতে গেলেন। সে

বলল—না মা, টাকা কেন? ও নেবো না—

ভদ্রমহিলার ছেলে মৃত। মা ডাকে মুগ্ধ হয়ে তিনি মঙ্গলকে চাকরী ছাড়িয়ে নিজের বালীগঞ্জের বাড়িতে নিয়ে এলেন। বাড়ির ছেলের মত থাকে, বাড়ির কাজ দেখাশুনা করে।

একদিন রাত্তিরে বাড়িতে চোর এল। আলমারী খুলে যাবতীয় গয়না পুঁটলী করে বেঁধে যখন রওনা দেবে, পেছন থেকে মঙ্গল এসে জাপটে ধরল। চোরের মুখে কালো মুখোশ। মুখোশ খুলে ফেলতে বেরিয়ে পড়ল বুধোর ভীত মুখ। আসলে সে রাত্রিতে দারোয়ানী করে না, চুরি করে। গিন্নি বললেন—থাক, ওকে ছেড়ে দাও। জিনিস তো নিতে পারে নি। কিন্তু মঙ্গল অটল। হোক নিজের দাদা, অন্যায়কে সে বরদাস্ত করবে না। চোর দাদাকে সে পুলিশে দেবেই। গিন্নি বুঝিয়ে বললেন—সবাইকে একবার ভাল হবার সুযোগ দেওয়া উচিত। তোমাদের দু'ভাইকে আমি কুড়ি হাজার টাকা দিচ্ছি—সৎভাবে ব্যবসা করে বড় হবার চেষ্টা করো।

সে টাকায় ব্যবসা করে আজ মঙ্গল আর বুধো লক্ষপতি হয়েছে।

কিন্তু না, জীবন এভাবে এগোয় না।

মেসের ঠাকুরের কাছে বুধো গাঁজা খাওয়া শিখল। তারপর ভাং, তারপর আরো কম খরচে নানান উদ্ভট নেশা। শরীর তার ছিল এমনিতেই দুর্বল, নেশা করে আরো দুর্বল হয়ে পড়ল। এখন সে প্রায় সব কাজের বাইরে হয়ে গিয়েছে। কোনোরকমে নিজের কাজটুকু সেরে মেসের বারান্দায় হাড়সার চেহারা নিয়ে বসে হাঁপায় আর খক্‌খক্‌ করে কাশে।

তবু তো সে বেঁচে রইল। বেঁচে থাকলে সব একদিন বদল হয়ে যেতে পারে। আজকের দিনটা যেমন-তেমন করে কেটে গেল, কিন্তু কে বলতে পারে আগামী-কাল একটা নতুন কিছু হবে না? মঙ্গলের আর কোনো আগামীকাল রইলো না।

দূর থেকে দার্জিলিং মেল আসছে। কর্মরত কুলিদের সরে যেতে বলে মঙ্গল নিজেও সরে আসবে, এমন সময় কেবিন থেকে লিভার টেনে পয়েণ্ট ক্লিয়ার দিল। ঘটাং করে দুটো লাইন জোড়া লাগতেই তার মধ্যে আটকে গেল মঙ্গলের জুতো। মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে নাকি বুদ্ধিভ্রংশ হয়। আসলে বুদ্ধিভ্রংশ হয় বলেই সম্ভবত মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। মঙ্গলের মনে হল জুতোটা বিসর্জন দিয়ে চলে এলে তার জীবনের সমস্ত সুখ চলে যাবে। সে জুতো নিয়ে টানাটানি করতে করতে দার্জিলিং মেল গায়ের ওপর এসে পড়ল।

তাৎক্ষণিক মৃত্যু নয়, হাসপাতালে গিয়ে তিনদিন পরে মারা গিয়েছিল মঙ্গল। দুটো পা-ই তার কেটে গিয়েছিল রেলের চাকায়।

সহকর্মীরা যখন অ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে, তখন একবার জ্ঞান ফিরেছিল মঙ্গলের। সে তাকিয়ে দেখল ওপরে ঝুঁকে থাকা সহকর্মী-দের বিষণ্ণ ব্যথিত মুখ—আর—

আর তার পাশেই গাড়ির মেঝেতে রাখা তারই দু-খানা পা।

ব্যাপার বুঝতে পেরে গোঙাতে গোঙাতে মঙ্গল গাড়ি থেকে গড়িয়ে নেমে যাবে বলে ছট্‌ফট্‌ শুরু করে দিয়েছিল, সবাই তাকে জোর করে চেপে ধরতে সে আবার অজ্ঞান হয়ে যায়।

কাঁদতে কাঁদতে বুধোই গ্রামে এল মাকে ভাইয়ের মৃত্যুসংবাদ দিতে। বাড়ি

অবধি যেতে পারল না, আমাদের বাড়ি ঢুকে বাবার পায়ে কেঁদে পড়ল—কাকাবাবু, আমি পারবো না—আপনি যান—

সব পাড়াতেই কিছু মানুষ থাকে, যারা লোককে দুঃসংবাদ দেবার সুযোগ পেলে ভারি খুশি হয়। বাবা সে দলের নন। তিনি বিপদে পড়ে শেষে প্রতিবেশী নগেন মুখুজ্যেকে সঙ্গে নিয়ে পিসিমার বাড়ি গেলেন।

তখন বেলা প্রায় চারটে। বাঁশবনের পাতার ফাঁকে ঝিলমিল করছে হলুদ রোদ্দুর। হলুদরঙা বৌ-কথা-ক' ডাকছে নুয়ে পড়া কঞ্চির ডগায় বসে। পায়ের নিচে গুঁড়িয়ে যাওয়া শুকনো বাঁশপাতার সোঁদা গন্ধে আশ্চর্য শান্তি। এরই মধ্যে বাবা নগেনখুড়োর সঙ্গে চলেছেন এক দুঃখিনী বিধবাকে তার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ দিতে।

গিয়ে দেখলেন বুড়িপিসিমা ওই অত বেলায় খেতে বসেছেন। কালো পাথরের কানা উঁচু থালায় লাল আউশচালের মোটা ভাত আর কাটোয়ার ডাঁটার চচ্চড়ি। পেছন ফিরে বসে খাচ্ছিলেন, এঁদের দেখতে পান নি। কি ব্যগ্র মুখে সেই নিরুপকরণ ভাতক'টি অবেলায় বসে খাচ্ছেন পিসিমা। এ সময়ে কিছু বলা যায় না। হাতের ইঙ্গিতে নগেন মুখুজ্যেকে সরিয়ে আনলেন বাবা। বললেন—উনি বিশ্রাম করে নিন, পরে আসবো।

সন্ধ্যের পর বাবার সঙ্গে আরো অনেকে গেলেন। অত লোককে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে পিসিমার মুখ যেন কেমন হয়ে গেল। দাওয়ার খুঁটি ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে বিভূতি? এত লোক কেন? কি হয়েছে?

আবার সময় কাটতে থাকে। রাজ্যের উত্থান-পতনের ইতিহাস নয়, হেনরী ফোর্ড কি করে কোটিপতি হয়েছিলেন সে গল্প নয়—এ একজন সাধারণ গ্রাম্য বিধবার কিছু না-পাওয়ার কাহিনী। চিত্তাকর্ষক হয়তো নয়, কিন্তু বড়ো বেশি করে সত্য।

মঙ্গল জীবন আর মরণের সীমা পেরিয়ে গিয়েছে, বুধো কোলকাতায় যেভাবে আছে সেটা না-থাকারই রকমফের, পিসিমা কিন্তু আশ্চর্যভাবে সামলে নিলেন। আসলে যাদের অনেক আছে তাদের কিছু ছাড়তে নাড়ীতে টান ধরে, কিন্তু যে কখনো কিছু পায় নি যে কোনো পরিস্থিতিতেই সে চট করে মানিয়ে নিতে পারে—এটা তার স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার একটা অঙ্গ।

গ্রামে সবার বিপদে বুক দিয়ে পড়তেন বুড়িপিসিমা। আমার দিদি হয়ে যেবার মারা যায়, তখন বাবা বাড়ি ছিলেন না। পূর্ণগর্ভা মায়ের হল কঠিন টাইফয়েড্। বাবার কাছে জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই চিঠি গেছে। সে চিঠি পেয়ে তবে আসবেন। এর মধ্যেই জ্বরের প্রবল দাপটে মার প্রসববেদনা উপস্থিত হল। সে সময়েই আবার নগেনখুড়োর স্ত্রী মায়ের পাশ থেকে উঠে নিজের বাড়ি গিয়েছেন কি কাজে। মা আর্তনাদ করছেন জ্বরের কষ্টে ও ব্যথায়। এমন সময় 'বৌমা আমার বুঝি মরে গেল গো!' বলে বুড়িপিসিমা ঘরে এসে মাকে ধরেন। অপরের বিপদে সাহায্য করতে এসেছেন, নিজের ঘোর বিপদের পর তখনও তাঁর দু'মাস কাটে নি।

এই দিদি হয়ে দু'দিন পরে মারা যায়। মা কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন, মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে উঠে বালিশের তলায় হাতড়াতেন—'আমার গলার হার কোথায় গেল? এইখানেই তো রেখেছিলাম'—বাবা জোর করে মাকে আবার শুইয়ে দিয়ে

সান্ত্বনা দিতেন।

আর সান্ত্বনা দিতেন পিসিমা। মায়ের সারা গায়ে হাত বুলিয়ে মায়ের মত মমতায় বলতেন—তোর সব আপদবালাই দূর হয়ে যাক। আবার হবে. ভাবনা কি বৌমা ?

হঠাৎই ঘুমের মধ্যে সাপের কামড়ে মারা গেলেন বুড়িপিসিমা। মাটির মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছিলেন, মাঝরাত্তিরে ডান হাতের মধ্যমায় কি কামড়ে দেয়। পিসিমার কাতর চিৎকারে পাড়ার লোকজন ছুটে আসে, ঘরের কোণে বিড়ে পাকানো সাপটাকে মারা হয় পিটিয়ে। আধঘণ্টার মধ্যে পাশের গ্রামের সেরা ওঝাও হাজির হয়। সবাই সব করেছিল, কেবল পিসিমারই আর থাকবার কথা ছিল না। সূর্য ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বুড়িপিসিমা মারা গেলেন।

রেখে গেলেন অধম নেশাখোর বুধোকে, আর সামান্য কিছু পার্থিব সম্পদ। দু'একটা হাঁড়িকুঁড়ি, চালের বাতায় পাট করে রাখা বড়ি দেবার ন্যাকড়া—ভাত খাবার কালো পাথরের থালাটা।

তাঁর জীবনের সবটাই বঞ্চনার আর নিষ্ফল কামনার ইতিহাস। পিসিমা মারা যাবার মাসছয়েক পরে মার গর্ভে আবার সন্তান আসে। সাতমাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একদিন মা স্বপ্ন দেখলেন—পিসিমা তাঁর পরিচিত ভঙ্গিতে একগাল হেসে দাওয়ায় উঠতে উঠতে মাকে বলছেন—তোর কাছে এলাম কল্যাণী, তোকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না।

আমার মা পিসিমাকে সত্যিই ভালোবাসতেন। বাবাকে ডেকে মা গোপনে বলেছিলেন—দেখ, এবার বোধহয় পিসিমাই আসছেন আমার কোলে।

এবারও মায়ের একটি মৃত কন্যা সন্তান হয়।

দিগন্তপুরে যাবো না

সোমনাথদার কাছে আমি প্রথম দিগন্তপুরের কথা শুনি।

তখন লোডশেডিং চলছে। অন্ধকারে নিজের অতি পরিচিত ঘরের চেহারাও কেমন বদলে গিয়ে রহস্যময় হয়ে ওঠে। দেওয়ালগুলো চলে আসে কাছাকাছি, নরম মোমের আলোয় পরিবেশে কাঁপা কাঁপা ছায়ার খেলা, সমস্ত পৃথিবীটা গুটিয়ে এতটুকু হয়ে ঢুকে পড়েছে বসবার ঘরে। স্বল্প আলোর সেই পরিধির বাইরে যেন সব অচেনা, দুর্বোধ্য।

পাইপে অ্যামফোরা তামাক ঠেসে দেশলাই জ্বাললেন সোমনাথদা, তৃপ্তির সঙ্গে বারদুই টেনে দেখলেন ধোঁয়া ঠিক আসছে কিনা, তারপর পাইপ কামড়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে বললেন—সবুজ গাছপালা পাহাড় এসব মিলিয়ে একটা বেড়াতে যাবার জায়গা খুঁজছো, না ?

বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু ঘাটশিলা নেতার হাট বা বেতলা ফরেস্টের মত ওয়েল ট্রড্‌ন্ জায়গা হলে চলবে না, ওসব আমিও জানি। নতুন কোনো জায়গার কথা বলতে পারেন ?

—এ প্লেস অফ্ ভার্জিন বিউটি, যেখানে এখনো সভ্যতার বিষবাষ্প প্রবেশ করে নি ?

—ঠিক। এমন জায়গা কি এখনো কোথাও আছে?

চোখ বুজেই সোমনাথদা বললেন—আছে। দিগন্তপুর।

ইদানীং ইংরিজি বাংলা অনেক ভ্রমণ-নির্দেশিকা ঘেঁটেছি, কিন্তু দিগন্তপুর নামটা চোখে পড়েছে বলে মনে করতে পারলাম না। বললাম—কেমন জায়গা? ভালো?

—তুমি যেমন চাইছো ঠিক তেমন। পাহাড়ী উপত্যকার বুক দিয়ে ছোট্ট নদী বয়ে চলেছে, তার স্বচ্ছ জলের ভেতর দিয়ে তলার নুড়ি দেখা যায়। চারদিকে উঁচু-নিচু পাহাড়, ঘন সবুজ গাছপালায় ঢাকা। থাকার জায়গা বলতে কিছু নেই। স্থানীয় বাসিন্দারা সরল এবং সৎ, তাদের কোনো গ্রামে আশ্রয় চাইলে থাকতে পাবে, এবং তুমি নিজে থেকে না বলা পর্যন্ত তারা তোমাকে যেতে বলবে না। কাছাকাছি রেল-স্টেশন নেই, ফ্যাক্টরি নেই, খবরের কাগজ যায় না—

শুনতে শুনতে বুক ধুকধুক করছিল। বললাম—সোমনাথদা, আপনি বানিয়ে বানিয়ে বলছেন—

পাইপে টান দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। চোখ খুলে রাগী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সোমনাথদা বললেন—বানিয়ে বানিয়ে বলে আমার লাভ কি? পরশু আমি ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছি, যাবার আগে তোমাকে অবশ্যই দিগন্তপুরে যাবার ডিরেকশন আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য জানিয়ে যাবো—

হতাশ হয়ে বললাম—তার মানে আপনি নিজে কখনো যান নি?

—না। তবে যাঁর কাছে দিগন্তপুরের কথা শুনেছি, তাঁর মুখের কথা আর নিজের যাওয়া একই ব্যাপার।

—কে তিনি?

—আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক, তোমারই মত নির্জন জায়গা খুঁজতেন। ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন, তাঁর ছেলের ঠিকানা তোমাকে দিয়ে যাবো। যেসব জায়গায় বেড়িয়েছেন তার বর্ণনা দিয়ে ডায়েরী লেখার অভ্যেস ছিল ওঁর. সেই ডায়েরী থেকে তুমি পথের হদিশ পেয়ে যাবে।

দু'দিন কেটে গেল, সোমনাথদার কাছ থেকে কোনো খবর পেলাম না। দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন, নানান জরুরী কাজের তাড়ায় আমার ব্যাপারটা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছেন। এদিকে এই দু'দিনে পরিচিত অনেককে জিজ্ঞাসা করলাম—নাঃ, দিগন্তপুরের কথা কেউ শোনে নি। একজন তো বলল—কি করে যেতে হয় জানতে পারলে আমাকে বলবেন তো মশাই, আমিও একবার যাবো—

মুখে সায় দিয়ে মনে মনে বললাম—তোমাকে জানাচ্ছি না কচু! তুমি আর একজনকে জানাবে, সে আবার আর একজনকে—এইভাবে আমার আহ্লাদের দিগন্তপুর পাঁচ বছরের মধ্যে ভিড়ে গিস্‌গিস্‌ করবে। যেমন অন্য সব জায়গায় হয়েছে। দিগন্তপুর একা আমার, কাউকে আমি সেখানকার ঠিকানা জানাবো না। কেবল আমি মাঝে মাঝে গিয়ে সেখানকার নুড়ি-বিছানো নদীব ধারে, সবুজ গাছের নিচে শুয়ে থাকবো।

কিন্তু সোমনাথদার কি হল? ঠিকানাটাই যে পেলাম না!

সন্ধ্যেবেলা ফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলতেই ওপারে সোমনাথদার গলা—হ্যালো!

সাগ্রহে বলি--হ্যাঁ, আমি আনন্দ। কোথা থেকে বলছেন সোমনাথদা?

—এয়ারপোর্ট থেকে। এখুনি আমার ফ্লাইট ছাড়বে। অনেক কষ্টে লাইন পেয়েছি; ঠিকানাটা বলে যাচ্ছি, তুমি লিখে নাও। কাগজ কলম নিয়েছো? বেশ, লেখো—চব্বিশের দুই—

লাইন কেটে গেল।

কানে আবার ডায়ালটোনের গরর-র-র শব্দ। বোকার মত কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে রিসিভার নামিয়ে রাখলাম। পরের একঘণ্টা ঠায় বসে রইলাম টেলিফোনের কাছে। যদি সোমনাথদা আবার ফোন করেন, যদি ঠিকানার বাকি অংশটা ভেসে আসে।

এল না। বিদ্যুৎ, টেলিফোন আর ট্রামের তারে সমস্ত শহরটা বর্তমানে জটিল জালে জড়িয়েছে। যারা এসব চালায় তারাও বোধহয় আর থই পায় না। ফলে বিদ্যুৎ নিভে যায়, ট্রাম বেলাইন হয়ে পড়ে থাকে, ফোন আসে না।

এদিকে বুকের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করে। প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং থেকে কেনা থর হেইয়েরডালের 'ফাতু-হিভা'-র পুরনো কপিটা পড়ি। নিরক্ষীয় প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গ বিধৌত মার্কুয়েসাস দ্বীপপুঞ্জের হলুদ বেলাভূমির ঠিকানা ঘেঁষে বেড়ে-ওঠা নারকেল গাছের পাতায় বাণিজ্যবায়ু যে মর্মরধ্বনি জাগিয়ে মহাসাগরের তরঙ্গ বিধৌত মার্কুয়েসাস দ্বীপপুঞ্জের হলুদ বেলাভূমির কিনারা তোলে, মহাসমুদ্র পার হয়ে তার ক্ষীণ গুঞ্জন আমার শেষরাত্তিরের স্বপ্নে ভেসে আসে। পরের দিন আমার অফিস কামাই হয়ে যায়, দরকারী কাজ পড়ে থাকে, আমার কিছু ভাল লাগে না। অথচ আমি তো জানি এসবের কোনো মানে হয় না। কি মূল্য আছে এই অহেতুক স্বপ্ন-বিলাসিতার? রোম্যাণ্টিক স্বপ্ন দেখার বয়েস আমার গিয়েছে, আর শান্তিময় স্বর্গরাজ্য হয়ে ওঠার পক্ষে পৃথিবীও অনেক বেশি প্রগত।

কমলেশ হালদার আমাকে বললেন—তুমি একটা ডাহা বোকা!

নতমুখে চুপ করে থেকে কথাটার সত্যতা মেনে নিলাম।

—লালচাঁদ গ্রুপের পার্চেজ ফাইল আটকে রেখেছো কেন? শুনলাম নাকি কোয়ালিটি কন্ট্রোলকে নোট দিয়েছো মাল আবার চেক করতে? তুমি কি পাগল? লালচাঁদে তোমার অপজিট নাম্বারের সঙ্গে আমাদের পাকা কথা হয়ে আছে, মাল পাশ হয়ে যাবে। ফের চেক করতে গিয়ে ডিফেক্ট বেরুলে পুরো কনসাইনমেন্ট আটকে যাবে তা জানো? তোমার কাণ্ড নিয়ে এবারের বোর্ড-মিটিংয়ে কথা উঠতে পারে। ডোন্ট ড্রাইভ এনি মোর নেইলস ইন ইয়োর ওন কফিন।

আমি বোকা বলে নিজের ভালো বুঝতে পারি না। দু'তিন দিন পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করে বলি—স্যার আমাকে লেস্‌ রেস্‌পনসিবল কোথাও দিন, সেলস্‌-এর কাজ বড় একজস্টিং—আমার খাপ খাচ্ছে না।

ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বোধহয় আগে থেকেই আমার বিষয়ে বলে রাখা হয়েছিল। ভদ্রলোক অবাক হলেন না, ঠাণ্ডা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন —বেশ। সামনের হপ্তা থেকে আপনি ওভারসীজ করেসপণ্ডেন্স দেখবেন—

ওপরে ওঠবার সিঁড়ি থেকে পা নামিয়ে সরে এলাম, কিন্তু দিগন্তপুর কাছে এল না। প্রতিবছর দু'তিনবার কোথাও বেড়াতে যাওয়া অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

কখনো কখনো দল বেঁধে বেরুই বটে। কিন্তু তারা কোথায় যাবে তা আমার জানা আছে। এবার তাই নিজে যোগাযোগ করে সারাণ্ডার একটা ফরেস্ট বাংলো দু'দিনের জন্য পেলাম। তবে ওই পর্যন্তই! পাশের ঘরে জনাপাঁচেকের একটা দল হিন্দী গানের ক্যাসেট চালিয়ে, মৃগীরুগীর মত হাত-পা ছুঁড়ে নেচে, পরিত্রাহি চিৎকার করে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ফূর্তি পালনের মাধ্যমে নির্জনবাসের মজা উপভোগ করতে লাগল। এসব আনন্দ তো শহরেও করা যায়, এর জন্য এত কষ্ট করে এই জঙ্গলে আসার কি দরকার ছিল বুঝি না।

একদিন সন্ধ্যের পর বড়দা এলেন। সল্ট লেকে বাড়ি করেছেন। ছোটবেলায় এক লেপের তলায় শুয়ে মানুষ হয়েছি, একই থালায় দু'দিক থেকে ভাত খেয়েছি। এখন বছরে এক-আধবার নেহাৎ দরকার পড়লে বড়দা আসেন, বাইরের ঘরের সোফায় বসেন অতিথির মত। প্রত্যেকবারই ওঠবার সময় বলেন—সময় পেলে একবার যাস—

অর্থাৎ না গেলেও চলে। কখনো বলেন না—অবশ্য একবার যাবি, সামনের রোববারই চলে আয় না। তোর সঙ্গে বলবার মত অনেক কথা জমে আছে।

বড়দাকে বসিয়ে হিটারে দু'কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এলাম। দাদা সঙ্কুচিত হয়ে বললেন—তুই আবার চা করতে গেলি কেন? তোর কাজের লোক নেই?

—আছে। সকালে ঝাড়ামোছা আর রান্না করে দিয়ে চলে যায়। রাত্তিরে বাইরে খাই, কিম্বা শুকনো খাবারে চালিয়ে নিই—

চায়ে চুমুক দিয়ে দাদা বললেন—মাধুরীর বিয়ে ঠিক হয়েছে, সামনের মাসের পনেরোই।

অবাক হয়ে বললাম—সেকি। মাধুর বিয়ে। আমি কিছু জানলাম না—।

—না, মানে—একটু হঠাৎ ঠিক হওয়াতে আগে খবর দিতে পারি নি।

—হঠাৎ কি করে হয়? একেবারে তারিখ পড়ে গিয়েছে যখন, তখন নিশ্চয় বহুবার যাতায়াত হয়েছে, অনেক কথা হয়েছে। অন্তত মেয়েকে দেখানোর দিন আমাকে বলতে পারতে—

দাদা নিঃশব্দে চা খেতে লাগলেন।

—তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?

—হ্যাঁ। যা ভুল হবার হয়ে গিয়েছে, এবার তুই একদিন আয়। তোকে তো কাজকর্ম করতে হবে—

একটু ভেবে বলি—যাবো। এই শনিবারই বিকেলের দিকে যাবো।

আবার কিছুক্ষণ কথাবার্তা থেমে থাকে। দাদা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বলেন—তুই যেন কেমন হয়ে গেলি। বিয়ে-থাওয়া করলি না, সব কেমন ছন্নছাড়া মতন—

এর উত্তরে অনেক কথা বলতে পারতাম। বলতে পারতাম—সেজন্য তো তুমিই দায়ী, দাদা। বাবা-মা বেঁচে থাকতেই তুমি বৌদিকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলে। মায়ের সঙ্গে বৌদির বনতো না, ভাবলে—আলাদা হলেই বুঝি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। মা-বাবা মারা যাবার পরও তুমি কিন্তু আমাকে একসঙ্গে থাকতে ডাকলে না, বরং পৈতৃক বাড়ি বিক্রি করে নিজের ভাগের টাকা নিয়ে গেলে। আমিও ক্রমে একলা বাঁচতে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আমাকে সংসারী

করার জন্য তুমিও তো কখনো আগ্রহ দেখাও নি—

এসব না বলে বললাম—তুমি কি কখনো দিগন্তপুরের কথা শুনেছ দাদা?

যাবার জন্য উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ে দাদা বললেন—দিগন্তপুর? কই, না তো।

—খুব সুন্দর জায়গা, জানো? কাছে কোথাও রেল-স্টেশন নেই, পিচের রাস্তা নেই, কলকারখানা নেই। নদী আছে, চারিদিকে পাহাড় আছে। ঘন সবুজ বন আছে। সকালবেলা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে। এবার ঠিক করেছি দিগন্তপুরে বেড়াতে যাবো—

দাদা অন্যমনস্কভাবে বললে—এরকম শান্তির জায়গা এখনো আছে নাকি? কোথায় জায়গাটা? কিভাবে যেতে হয়?

—তা ঠিক জানি না। সেজন্যেই তো দেরি হচ্ছে।

দাদা চুপ করে কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, তারপর বললেন—আচ্ছা আজ যাই। তুই যাস কিন্তু—

পেছন পেছন দরজাটা বন্ধ করতে এসে অনেকদিন আগের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমার বয়েস তখন সাত কি আট, দাদার পনেরো। পাড়ায় মণ্টু নামে একটা পাজি ছেলে ছিল। দাদারই বয়সী। তার কাজই ছিল সারাদিন ধরে লোকের পেছনে লাগা। অবসর সময়ে সে ঘোষেদের রকে বসে জর্দা দেওয়া পান চিবোতো আর পরবর্তী নষ্টামীর ফন্দী আঁটতো। একদিন বিকেলে সরকারবাগানের মাঠে বল খেলে বাড়ি ফিরছি। ঘোষেদের রক থেকে মণ্টু ডেকে বলল—এই ছোঁড়া, শোন্। রাস্তার ওপারের দোকান থেকে আমাকে দুটো কাঁচি সিগারেট এনে দে তো—

ভয়ে ভয়ে বললাম—আমি তো যেতে পারবো না মণ্টুদা। বড় রাস্তা একা পার হলে মা বকবে—

মণ্টুর মেজাজ বোধহয় সেদিন একটু বিশেষ রকম তিরিক্ষি হয়ে ছিল। আমার আপত্তি শুনেই সে ঝাঁ করে এগিয়ে এসে ঠাস করে আমার গালে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে বলল—হারামজাদাদের দিয়ে যদি একটাও কাজ পাওয়া যায়—

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম। দাদা বাইরের ঘরে মাদুর পেতে বসে অ্যালজেব্রার হোম-টাস্ক করছিল, সন্ধ্যেবেলা মাস্টারমশাই পড়াতে আসবেন। আমাকে দেখে দাদা বলল—এতক্ষণে ফিরলি? একি কাঁদছিস কেন?

ঘটনা শুনে দাদার মুখ লাল হয়ে উঠল, বলল—আয় দেখি আমার সঙ্গে—

দাদা ভালোমানুষ গোছের পড়ুয়া ছেলে, কখনো তাকে কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখি নি। ভয় পেয়ে বললাম—যেও না দাদা, তোমাকেও মারবে!

আমার হাতটা শক্ত করে ধরে বলল দাদা—ভয় নেই, আয় আমার সঙ্গে—

তখনো ঘোষেদের রকে বসে মণ্টু নারকোলি কুল খাচ্ছিল. আমাদের আসতে দেখে সে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার সামনে দাঁড়িয়ে দাদা বলল—এই যে, শুনছ? তুমি আমার ভাইকে খামোকা মেরেছ কেন?

ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থেকে মণ্টু কুল খেয়ে যেতে লাগল।

—কমবয়েসী ছেলেকে মারতে লজ্জা করে না? বড়দের সঙ্গে লড়তে ভয় পাও বুঝি?

'ফুঃ'- গোছের শব্দ করে মুখ থেকে একটা কুলের বিচি ছুঁড়ল মণ্টু, সেটা সজোরে এসে দাদার কপালে লাগল।

তারপরের মিনিট দুয়েকের ব্যাপার ভাবলে এখনো অবাক লাগে। রাগে দাদা গলা দিয়ে গর্জনের মত শব্দ করে লাফিয়ে পড়ল মণ্টুর ওপরে। নিজের ওপর মণ্টুর এত বিশ্বাস যে, প্রথম আঘাতটা অপরপক্ষ থেকে আসবে সেটা সে আন্দাজই করতে পারে নি। এক ধাক্কাতেই সে রক থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তারপরের দৃশ্য ভারি বিস্ময়কর। পাড়ার ত্রাস দুর্দান্ত মণ্টু চিতপাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, আর তার বুকের ওপর চেপে বসে আমার নিরীহ, ভালোমানুষ দাদা এলোপাথাড়ি ঘুঁসি চালিয়ে যাচ্ছে।

আমিই দাদাকে টেনে আলাদা করলাম।—ও দাদা, আর মেরো না, মণ্টুদা মরে যাবে—

মণ্টু উঠে বসে বিস্ময়মিশ্রিত ভয়ের চোখে দাদার দিকে তাকিয়ে হাতের উলটোদিক দিয়ে নাকের রক্ত মুছতে লাগল। দাদা তার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল —আর কখনো যদি শুনি আমার ভাইয়ের পেছনে লেগেছ, তাহলে এমন শিক্ষা দেব যে জন্মেও ভুলতে পারবে না—

দাদার হাত ধরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছিল।

সেই দাদা—এই দাদা!

শনিবার সন্ধ্যেবেলা গেলাম দাদার বাড়ি। দরজা খুলে দাদা প্রথমটা অবাক হয়ে গেলেন, যেন বিশ্বাসই করতে পারেন নি আমি সত্যি সত্যি যাবো। পেছন থেকে বৌ বললেন—কে এল গা? ওঃ, ঠাকুরপো! তবু ভাল, এলে তাহলে—

বসবার ঘরটা বেশ সুন্দর করে সাজানো। প্লাস টপ্ টেবিল, কাঁচের আলমারিতে নানারকম পুতুল, পেলমেট থেকে ঝুলছে গাঢ় মেরুন রঙের দামি পর্দা। জীবনে কাউকে কোনো ভাগ না দিয়ে থাকতে পারলে নিজের ঘর বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা যায়। বৌদির দিকে তাকিয়ে বললাম—ভাল আছো বৌদি? মাধুরী কোথায়?

—সে তার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছে ভবানীপুরে। ভাল আর কি করে থাকব বল? মেয়ের বিয়ে, সব ঝক্কিই তো একা সামলাতে হচ্ছে। কেনাকাটাও কম নয়— শ্বশুরবাড়ির থেকে এক বাড়ি বিক্রির টাকার অংশ ছাড়া আর তো কিছুই পাই নি —সমস্ত খুইয়ে বিয়ে দেওয়া।

—আমিও তো কিছু নিই নি বৌদি। সংসারই নেই, কিসের জন্য নেবো? তাহলে আমাদের পৈতৃক জিনিসপত্র সব গেল কোথায়?

—তুমি কি আজ ঝগড়া করতে এসেছ?

হেসে বললাম—না, ঝগড়া করব কেন? দাদা আসতে বলেছিলেন তাই এসেছি—

দাদা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—এসব কথা বরং থাক। তুমি একটু চা করো গে—

সোফায় হেলান দিয়ে বললাম—পাত্র কি করে দাদা?

—প্রফেসর। মুর্শিদাবাদের একটি কলেজে ইংরেজি পড়ায়। অল্প বয়েস, স্বভাবচরিত্র ভাল। বই পড়া ছাড়া আর কিছুর নেশা নেই। কৃষ্ণনগরে নিজেদের বাড়ি।

—দাবি আছে ?

—সেটাই বাঁচোয়া। ছেলে ভারি ভাল, বলেছে—আমাদের কিছু চাই না। বিয়ে কি ব্যবসা যে, জিনিস নিয়ে করতে হবে ? অবশ্য তারা না চাইলেও আমরা তো কেবল শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে মেয়ে পাঠাতে পারি না। নয় নয় করেও অনেক খরচ হয়ে যাচ্ছে।

—দাদা, আমি মাধুরীর বিয়েতে কিছু টাকা দিতে চাই।

দাদা অবাক হয়ে বললেন—তুই ? তুই কেন হঠাৎ—পেলে অবশ্য আমার অনেকটা—

—আমি তোমাকে দিচ্ছি না দাদা, মাধুকে দিচ্ছি।

ব্রিফকেস থেকে রাবার ব্যান্ড দিয়ে বাঁধা নোটগুলো বের করে সামনের টেবিলে রেখে বললাম—দশ হাজার আছে। আরো দশ হাজার দেব, তবে সেটা আর তোমাকে নয়—বিয়ের দিন মাধুর হাতে দেব। ওদের নতুন সংসার গড়ে তুলতে কাজে লাগবে।

চা নিয়ে এসে টেবিলে রাখতে গিয়ে বৌদি থমকে গেলেন—এ কি ! এখানে এ টাকা কিসের ?

দাদা বললেন—ও দিয়েছে। মাধুর বিয়ের জন্য। বিয়ের দিন আরো দশ হাজার দেবে—

পেয়ালার কিনারায় কালোমত একটা কি লেগে ছিল। আঁচল দিয়ে মুছে বৌদি বললেন—নলেন গুড়ের সন্দেশ দেব ঠাকুরপো ? খাবে ?

—নাঃ, বয়েস হচ্ছে বৌদি, মিষ্টি আর ভাল লাগে না।

চা খেয়ে উঠে পড়লাম। বিশেষ যে কোনো কাজ ছিল এমন নয়, তবু আর থাকতে ভাল লাগছিল না। আপন লোকেদের মধ্যে বসে নিজেকে একা বোধ করা একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি। বেরিয়ে আসবার সময় মনে হচ্ছিল এ বাড়িতে তো তিনজনের পক্ষে অনেক বেশি জায়গা রয়েছে। বাড়িটা আমার নিজের দাদা আর বৌদির, তাহলে আমি এখানে থাকতে পারব না কেন ? এখনি যদি আমি বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে ডিভানে জমিয়ে বসে পড়ি, তবে তার চেয়ে স্বাভাবিক আর কি হতে পারে ? সেটাই তো হওয়া উচিত।

কিন্তু তা হয় না। আমি বেরিয়ে এসে নিজের ফ্ল্যাটের পথ ধরি।

যথাসময়ে মাধুরীর বিয়ে হয়ে যায়। আমি গিয়ে কিছু খাটাখাটনিও করি।

একদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে খেয়াল হল সময়টা বসন্তকাল, মার্চ মাস। কিন্তু শহরে ফুল ফোটে না, উঁচু বাড়ির দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় দক্ষিণের বাতাস। শুধু ক্যালেন্ডারেই বসন্ত আসে। রবীন্দ্রনাথ বোধহয় ছিন্নপত্রে বলেছিলেন—বসন্তকালটা গানবাজনা করবার সময়। কিন্তু আজকাল কি কোথাও গানবাজনা হয় ? আরো বেশি আরামে থাকার, আরো বেশি উপার্জন করার প্রবল আগ্রহে সমস্ত পৃথিবী উন্দাম বেগে ছুটেছে। এর মধ্যে গানের অবকাশ কোথায় ?

উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ আর হিমাচল প্রদেশের পর্যটন দপ্তরে খোঁজ করলাম। দিগন্তপুরের সন্ধান কেউ দিতে পারল না। সোমনাথদাও এখন কোথায় আছেন কে জানে, তাঁর কাছ থেকেও ঠিকানা জানবার কোনো উপায় নেই।

আমার তেমন কোনো বন্ধু নেই। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কারো সঙ্গে বসে সুখদুঃখের গল্প করি। কিন্তু কার সঙ্গে? একদিন ছুটির পর এক সহকর্মীকে বললাম—চলুন, কোনো রেস্তোরাঁয় বসে একটু কথা বলা যাক্—

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—আজ? আজ নয়, বরং আর একদিন হবে এখন—

হেসে বললাম—কেন, আজ দিনটা খারাপ কি? আরে মশাই, বিলটা না হয় আমিই দিয়ে দেব।

সহকর্মী বিব্রত হয়ে বললেন—না না, তা নয়। আসলে আজ আমার ছোট-ছেলের জন্মদিন, সন্ধ্যেবেলাটা বাড়ির সবাই মিলে—বুঝলেন না? ছেলেটাও বার-বার বলে দিয়েছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে। আপনি বরং আমার সঙ্গে চলুন—

মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। সবার কেমন বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে, কারণ থাকে। আমারই কেবল জীবনটার কোনো মানে নেই। এখন বাড়ি ফিরলেও হয়, রাত দশটায় ফিরলেও হয়। অভিযোগ করবার কেউ নেই।

এক একদিন খুব মায়ের কথা মনে পড়ে।

সুদূর শৈশব থেকে ভেসে আসে কুয়াশামাখা মায়ের মুখ। ভোরবেলা স্নান সেরে ভিজে চুলের গোছা পিঠে ফেলে মা সংসারের কাজকর্ম শুরু করেছেন। শীতের দুপুরে কাঁথার তলায় মায়ের পাশে শুয়ে গল্প শোনা। বারান্দার ওপাশে নিমগাছের পাতায় খেলা করত পৌষের রোদ্দুর। কাঁথার নিচে বেশ একটা উষ্ণ নিরাপত্তার অনুভূতি। তেমন সব দিন আর কখনো ফিরে এল না।

যাক্ গে—নাহয় জীবনে কিছু না-ই হল। সার্থকতা কি এতই সহজলভ্য। এই তো সেদিন শুনলাম আফ্রিকার কোথায় নাকি পৃথিবীর পাঁচশো কোটিতম শিশুটির জন্ম হয়েছে। পাঁচশো কোটি মানুষের মধ্যে প্রত্যেকেই কি সার্থকতা খুঁজে পাবে? একটা গাছ সারাজীবনে কত বীজের জন্ম দেয়, তার প্রত্যেকটাই কি অঙ্কুরিত হয়? তাই বলে কি প্রকৃতির কোথাও কোনো অপূর্ণতা আছে? আমারই বা দাবি এত বেশি কেন?

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বসে আছি বাইরের ঘরে, অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু আলো জ্বালানো হয় নি। এমন সময় কলিং-বেল বেজে উঠল।

চুপ করে একা বসে থাকলে কিছুক্ষণ বাদে এক ধরনের মগ্নতা আসে। কলিং-বেলের কর্কশ শব্দে সে মগ্নতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। উঠে দরজা খুলে দিলাম।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন দাদা। আমার দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতভাবে বললেন—তোর কাছে এলাম। আলো জ্বালিস্ নি কেন? বড্ড অন্ধকার—

—এসো দাদা, বোসো। আলো জ্বালি—

—থাক। এই বেশ। তুইও বোস—আমার কোনো কাজ নেই, এমনি তোর সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম।

আশা করতে আজকাল ভয় হয়, তবু দাদার গলার সুরে হঠাৎ বুকটা কেমন করে উঠল। এ আমি শুনেছি, আমার বুকের ভেতরে ইদানীং ঠিক এই সুরে কে যেন কথা বলে। দাদা এমনভাবে কথা বলছে কেন?

কিছুটা যেন কৈফিয়তের সুরে দাদা বললেন—অন্য কিছু না, আসলে হয়েছে কি—মাধুর বিয়ের পর সব যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। অফিস থেকে বাড়ি

ফেরার আগে একটা তাড়া থাকত, আজকাল যেন কি হয়েছে—সেই আর্জটা আর নেই। মনের কথা বলার লোক পাই না, কেমন হাঁপ ধরে যায়। আজ হঠাৎ তোর কথা মনে পড়ল, ভাবলাম—যাই একবার। হ্যাঁরে, মনে আছে—ঠিক এইরকম সময়ে আমরা দু'জনে হ্যারিকেন জেবলে পড়তে বসতাম?

—হ্যাঁ। তুমি আমাকে হোম-টাস্ক দেখিয়ে দিতে—

—রান্নাঘর থেকে মায়ের রুটি সেঁকার গন্ধ ভেসে আসত।

—শীতকালে মা রুটির সঙ্গে বাঁধাকপির তরকারী করতেন—

—আর শেষপাতে খেজুরের গুড়—

—ব্ল্যাকি বলে আমাদের কুকুর ছিল—

—আর ঝুমুর বলে বেড়াল—

সেই নির্জন অন্ধকারে আমরা দু'ভাই পুরনো স্মৃতি উদ্ধারের খেলায় মেতে উঠলাম।

একসময় দাদা বললেন—তুই আমার অনেক ছোট, সব কথা তো তোকে বলা যায় না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আগে বললেই বোধহয় ভাল হত। প্রকৃতপক্ষে তোর বৌদির সঙ্গে কখনোই আমার মনের মিল হয় নি। এসব ব্যাপার বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। যখন বুঝলাম, তখন সংসার করাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তোর বৌদি এমনিতে লোক ভাল, হয়ত আমাকে ভালও বাসে—কিন্তু মনের সঙ্গে খাপ খাওয়াটা একটা অন্য জিনিস, সেটা আর হল না। এখন মাধুরীর বিয়ে হবার পর এত খারাপ লাগে! জীবনটার কোনো মানে নেই বলে মনে হয়।

দাদা থামলেন। আমার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ধবক ধবক শব্দ।

—তুই দিগন্তপুর বলে একটা জায়গার কথা বলেছিলি না? যেখানে সবুজ গাছপালা, নদী আর পাহাড় আছে? যেখানে পাখির ডাকে ঘুম ভাঙে? আমাকে দিবি ঠিকানাটা? তোর সঙ্গেও অবশ্য যেতে পারি—

আমি অকস্মাৎ উপলব্ধি করলাম অন্ধকার জিনিসটা শুধুমাত্র বাইরের, হৃদয়ের ভেতরের আলো কিছুতেই নেভে না। উপলব্ধি করলাম আমি ততটা একা নই যতটা মনে হয়েছিল। সময় আর দূরত্ব দিয়েও ব্যবধান রচনা করা যায় না।

উঠে দাদার পাশে বসে দাদার হাতদুটো হাতে নিয়ে বললাম—দাদা, আমি দিগন্তপুরে যাবো না, কোথাও যাবো না। এইমাত্র আমার ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

আগামীকাল

বেলঘরিয়া আর দমদমের মাঝখানে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার, বিশেষ কিছু দেখা যায় না। কেবল এখানে-ওখানে দু'একটা কেরোসিনের ডিবে অথবা হ্যারিকেনের আলো চোখে পড়ে। আজ থেকে পাঁচ-ছ' বছর আগেও এসব জায়গা শূন্য পড়ে ছিল, বর্তমানে কোথা থেকে দলে দলে মানুষ এসে দরমা আর টালি দিয়ে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। তাদেরই বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো চোখে আসে। পৃথিবীতে খালি জমি বলতে আর কিছু রইল না। কলেজে পড়বার সময়েও বিকেলে বাড়ি ফেরবার পথে ট্রেনের জানালা দিয়ে ঠিক এই জায়গাটায়

বাইরে তাকালে বিস্তৃত মাঠের শেষে দিগন্তে আশ্চর্য সূর্যাস্ত দেখা যেত। অবশ্য মানুষগুলোই বা করে কি? পৃথিবীতে যখন এসেই পড়েছে বেঁচে থাকবার জন্য কোথাও না কোথাও তো মাথা গুঁজতে হবে। অশোকের অবশ্য নিজের বাড়ি আছে, গাছতলায় বাস করতে হয় না কিম্বা ভাড়াবাড়ির নানান্ ঝামেলাও পোহাতে হয় না, তবু সে অসহায় এইসব মানুষের সমস্যা বেশ অনুভব করতে পারে। আসলে এদের সঙ্গে কোথায় তার নিজের একটা গভীর যোগ আছে। বিভিন্ন রকমের পোশাক আর রীতিনীতির পার্থক্য বাদ দিলে সমস্ত পৃথিবীর সাধারণ মানুষ বর্তমান যুগটায় একই যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে চলেছে। খাবার না থাকার যন্ত্রণা, মাথার ওপরে ছাদ না থাকার যন্ত্রণা, কোনো কিছুতে বিশ্বাস না থাকার যন্ত্রণা ভালবাসা না থাকার যন্ত্রণা।

একজন বুড়োমত লোক অশোকের পাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকে ছট্‌ফট্ করছে। তার গালে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি, গায়ে বোতামছেঁড়া নোংরা হাওয়াই শার্ট, পরনে কুচকে যাওয়া বিবর্ণ জিনের প্যান্ট, পায়ে সস্তা রবারের চটি। এককালে অবস্থা ভাল ছিল এমন সুপুরুষ মানুষের ভাগ্য এবং স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটলে তার যেমন চেহারা হয়, লোকটাকে তেমনি দেখতে। সে হঠাৎ অশোকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আমরা সবাই তো একদিন মারা যাবো, না?

ভিড়ে ঠাসা লোকাল ট্রেন, সবারই বাড়ি ফেরার তাড়া। তার মধ্যে এমন দার্শনিক প্রশ্ন শুনে দু'একজন অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল। অশোকও।

তাকিয়েই বুঝতে পারল—মানুষটা পাগল।

তীব্র, নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে। এত ঐকান্তিক দৃষ্টি সুস্থ লোকের থাকে না। আজকাল বেশির ভাগ সুস্থ মানুষের কোনো প্রশ্নও নেই।

কেউ কোনো উত্তর দিল না কেবল অশোক কেমন একটা মমতা বোধ করল, সামান্য ঝুঁকে পড়ে বলল—ঠিকই বলেছেন, সবাই মারা যাবো।

—প্রত্যেকে?

—প্রত্যেকে।

—কেউ চিরকাল বাঁচবে না? মরতেই হবে?

—তাই।

লোকটার বুকের ভেতর থেকে পরম শান্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল, অনেকক্ষণ ধরে বিঁধে থাকা কাঁটা খুলে এলে যেমন হয়।

—তাহলে এ নিয়ে ভেবে কোনো লাভ নেই, কি বলেন?

অশোক সামান্য হাসল—না, কোনো লাভ নেই।

—যাক, ও নিয়ে আর চিন্তা করবো না।

সামনের দিক থেকে ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজ ভেসে এল। ট্রেন ছেড়েছে। বাইরে ঘন অন্ধকার। জানালা দিয়ে তাকালে বোঝা যায় না কোথা দিয়ে কোথায় চলেছে গাড়ি। পাগল লোকটি ভিড় ঠেলে ওপাশে সবে গিয়ে ক্লান্ত তেলতেলে মুখওয়ালা একজন নিত্যযাত্রীকে একই প্রশ্ন করে ধমক খেয়ে ম্লান ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

স্টেশনে নেমে অশোক দেখল লোডশেডিং চলছে। শঙ্করের দোকান থেকে

একপ্যাকেট চারমিনার কিনে পকেটে রাখল। একটা ধরালে হত, কিন্তু আজকাল খুব নিয়ম করে কম সিগারেট খাচ্ছে অশোক। পয়সার সাশ্রয় হচ্ছে আবার স্বাস্থ্যের ওপরও চাপ পড়ছে না—দু'মুখো লাভ। দশ বছর আগে বাড়ি ফেরার একটা আলাদা আনন্দ ছিল। ক্লাস পালিয়ে কফি হাউসে আড্ডা, পঁয়ষট্টি পয়সার টিকিটে লাইন দিয়ে মেট্রোতে শার্লি ম্যাকলেইনের ছবি দেখা নয়তো অকারণ উল্লাসে পার্ক স্ট্রীট বা নিউ মার্কেটের শো-রুমের জানালায় জিনিস দেখে বেড়ানো। সে-সব জিনিস কোনোটাই এ পর্যন্ত কেনা হয় নি, ইহজীবনে হবেও না। তবু অপ্রাপ্য বস্তুর কাছাকাছি থাকার একটা মোহ আছে।

চা-পাতা কেনা দরকার। সামনেই স্টেশন রোডের ওপর পাঁচুবাবুর দোকান আছে, কিন্তু সেখানে যাওয়া যাবে না। গতমাসের দেনা এখনো শোধ করা হয় নি। আজ অবশ্য নগদ পয়সা দিয়েই চা-পাতা কিনবে, তবু ঠোঁটকাটা পাঁচুবাবু হয়ত অন্য খদ্দেরের সামনেই কর্কশ ভাষায় তাগাদা করে বসবে। বরং একটু ঘুরে রায়-পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়া যাক, গলির মুখে যে ছোট্ট মুদিখানাটা আছে সেখান থেকে চা কেনা যাবে।

গলিতে ঢুকতে রামুর চায়ের দোকান, সেখানে বেঞ্চিতে বসে আছে কানু। অশোককে দেখে ডাকল—কি রে, কোলকাতা থেকে ফিরলি নাকি? তোর ফ্যাক্টরি খুলল?

বেঞ্চিতে বসে অশোক বলল—নাঃ। কবে খুলবে কোনো ঠিকও নেই। আজ আমাদের সবাইকে ডেকেছিল কথাবার্তা বলবার জন্য। তা এরাও ছাড়বে না, ওরাও ছাড়বে না। আলোচনা ভেস্তে গেল।

মুখে চুক্-চুক্ শব্দ করে কানু বলল—তোর জন্য বড় খারাপ লাগে। আমাদের ভেতর সবচেয়ে বেশি লেখাপড়া জানা ভাল ছেলে ছিলি তুই। না, সত্যি বলছি—ইস্কুলে পড়বার সময় আমার বাবা প্রায়ই আমাকে বলত—তুই একটা গবেট। ওপাড়ার অশোকের মত হতে পারিস না? আমার তো কোনোকালেই কিছু হবে না, ধরেই রেখেছি। কিন্তু তোর—

এসব প্রসঙ্গ বড় অস্বস্তিকর। কথা ঘোরাবার জন্য অশোক বলল—বাদ দে, এখন এককাপ চা খাওয়া দেখি। আছে পয়সা?

কানু ঘোলাটে হাসি হেসে বলল—আছে। রামু, অশোককে চা আর কেক দে। আমার জন্যও একটা দুধছাড়া বানা—

—কেক দরকার নেই, শুধু চা হলেই চলবে—

কানু বলল—খালি পেটে কক্ষনো চা খাবি না। একটা কেক খা—

বাড়ি যাবার যে খুব তাড়া আছে এমন নয়, কি হবে এখনি ফিরে? আগে আগে বিকেলের দিক থেকে অমলার জন্য মন কেমন করতে শুরু করত, ফ্যাক্টরীতে কাজের শেষ ঘণ্টাটা যেন আর কাটতে চাইত না। তারপর খোকন হবার পরেও ছেলের জন্য ছটফট করত। বাড়ি ফেরার সময় হাতে অমলার জন্য একটা ব্লাউজ, একটু আমসত্ত্ব, কিম্বা একটা পাউডারের পাফ এরকম কিছু নিয়ে ঢুকত। আস্তে আস্তে কি যে শুরু হল, গত দু'বছর কেবল নেমে যাবার ইতিহাস, ফুরিয়ে যাবার গল্প। বাড়ি ফিরলে অমলা কিছু বলবে না ঠিকই, কিন্তু সপ্রশ্ন চোখে তাকাবে। অনুচ্চারিত প্রশ্ন—ভাল খবর কিছু আছে কি? অশোকও চুপ করে থাকবে। যে

নীরবতার অর্থ—কোনো খবর নেই। মন খারাপ লাগে। অনেকদিন সে অমলার জন্য কিছু নিয়ে ফেরে নি, ছেলের জন্যও না। ছেলের অবশ্য এখনো বায়নার বয়েস হয়নি তবু তো তার খোকনের জন্য কিছু কিনতে ইচ্ছে করে।

দরজা খুলেই অমলা উৎসুক চোখে তাকাবে। সেই অনিবার্য মুহূর্তকে যতটা পিছিয়ে দেওয়া যায় ততই ভাল। বরং বসে চা-ই খাওয়া যাক। চারমিনারের প্যাকেটটা বেনিয়ম করে খুলে ফেলল অশোক, একটা কানুকে দিল।

রাত প্রায় ন'টা। এরপর রায়পাড়ার মুদিখানা বন্ধ হয়ে যাবে, চা পাওয়া যাবে না। আধ-খাওয়া চারমিনার হাতে উঠে দাঁড়াল অশোক—চলি কানু, রাত হচ্ছে—

আচ্ছা তোর ফ্যাক্টরী যদি আর নাই খোলে? লক-আউট হয়ে আছে এমন কত কারখানার কর্মীকে রিক্সা চালাতে দেখছে, কত লোক অভাবের তাড়নায় সপরিবারে আত্মহত্যা করেছে বলে খবরের কাগজে বেরোয়। সে কি করবে? লেখাপড়া শিখে তার সর্বনাশ হয়েছে, সে কি আর রিক্সা চালাতে পারবে? না, পারতেই হবে। আগে থেকে চরম খারাপটা ভেবে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। তার খোকনকে, অমলাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সে সবকিছু করতে পারবে।

কাল আবার কোলকাতা যেতে হবে। কে জানে আদৌ আলোচনা হবে কিনা। তবু যেতে হবেই। আশাহীন, অকারণ যাতায়াত।

—দেড়শো হাফ-ডাস্ট চা দাওতো ভাই।

ব্রাউন পেপারের ঠোঙায় চা মাপতে মাপতে শিবু বলল—আপনাকে আর যে এদিকে দেখা যায় না অশোকদা, ব্যাপার কি? রামুর দোকানে বসেন না?

—না ভাই, আর সময় কোথায়? সে-সব দিন গিয়েছে। নিজের ধান্দায় ঘুরে—

—আপনার ফ্যাক্টরী খোলার কিছু হল?

দূর ছাই! সবাই এক কথা জিজ্ঞাসা করে। সে বলল—সামনের মাসে খুলবে। তুমি তাড়াতাড়ি করো, আমার বাড়ি যাবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

রায়পাড়ার গলি দিয়ে বেরিয়ে সন্তর্পণে বাঁয়ে ফিরলো অশোক। এই জায়গাটা থেকে পাঁচুবাবুর দোকান মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যায়। রাত্তিরে রাস্তায় লোকজনের চলাচলও কমে এসেছে। হন্ হন্ করে হেঁটে জায়গাটা পার হয়ে গেল অশোক।

গোবিন্দ বস্ত্রালয়ের সামনে ল্যাম্প-পোস্টের নিচে ছোকরাটা বসে রোজকার মত ফুল বিক্রি করছে। পেছনে দোকানের রোলিং-শাটার টেনে নামাচ্ছে কর্মচারীরা। ছোকরাটা ডাকল—বাবু, ও বাবু, শুনে যান—

অশোক দাঁড়াল।—কি বলছিস্?

—ফুল নেবেন বাবু? নিন না—এই ক'টা পড়ে রয়েছে—

—নাঃ, দরকার নেই।

ছেলেটা অনুনয়ের সুরে বলল—নিয়ে নিন না বাবু, সস্তা করে দিচ্ছি। কাল বাসি হয়ে গেলে বিক্রি হবে না। আপনার খেয়েই তো আমরা মানুষ—নিয়ে নিন।

অশোকের মনে হল ছেলেটার সমস্যা তার চেয়েও তীব্র। সে আরো তিন-চার মাস চালিয়ে দিতে পারবে—একটা সেভিংস সার্টিফিকেট আছে, তারপর—তারপর অমলার গয়না আছে। না, অমলার গয়নায় হাত দেবার আগে সে বিয়ের বোতামটা গোপনে বিক্রি করে ফেলবে। যাই হোক, এতে চলবে কিছুদিন—তারপরে অবশ্য অন্ধকার ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে রয়েছে।

আর এই ছেলেটার সমস্যা নিতান্ত আজকের। অনাহার ওর শিয়রে।

ফুল কিনে অশোক ওর আজকের চিন্তার কিছু অংশ দূর করতে পারে। অমলার জন্যও অনেকদিন কিছু নিয়ে যায় নি, ফুল পেলে সে খুশি হবে।

দেড় ডজন গ্ল্যাডিওলাস আর দু'ডজন রজনীগন্ধা শালপাতায় মুড়ে সাদা গুলিসুতো দিয়ে বেঁধে দিল ছেলেটা। অশোক দর করবে না ঠিক করেছিল। দাম দিয়ে বাড়ির দিকে এগুতে এগুতে হাসি পেল। চাল কেনার পয়সা থাকবে না কিছুদিন পরে, আজ সে ফুল কিনছে।

দরজার কড়া নেড়ে মন শক্ত করে দাঁড়াল অশোক। অমলাকে সে একটা মিথ্যা সান্ত্বনার কথা বলবে। যা হবার তা যখন হবেই, তখন বেচারিকে ভয় দেখিয়ে লাভ কি?

দরজা খুলতেই অশোক অবাক হয়ে গেল।

অমলা ট্রাঙ্ক থেকে গোলাপফুল আঁকা সাদা শিফনের শাড়িটা বের করে পরেছে, যেখানা বিশেষ বিশেষ উৎসবের জন্য তোলা থাকে। উল্‌টে আঁচড়ে টান করে চুল বাঁধা! কপালে সাদা সোয়েডের টিপ, মুখে হাল্‌কা পাউডারের প্রলেপ, চোখে কাজল।

আশ্চর্য হয়ে অশোক বলল—একি! আজ এত সাজগোজ! এই রাত্তিরে!

উত্তরে অমলা ঘনিষ্ঠ হয়ে এসে আদরের সুরে বলল—তুমি এত দেরি করলে কেন আজ? আমি সেই কখন থেকে আশা করে বসে আছি—

অমলার গলার সুরে বিয়ের পরেকার গোলাপী দিনের স্মৃতি। কিন্তু আজ ব্যাপারটা কি? বিয়ের তারিখ তো আষাঢ়ে, মানে জুলাইতে। আজ তাহলে—

দরজা বন্ধ করে বুকে মাথা রেখেছে অমলা।—আজ আমার জন্মদিন না?

ওহো! তাও তো বটে! বিয়ের পরে প্রথম বছর বেশ হৈ-হৈ করে জন্মদিন পালন করা হয়েছিল। কানু এসেছিল, বৌ নিয়ে সমীর এসেছিল, মুকুল এসেছিল। আর আজ? আজ সে তারিখটাই ভুলে গিয়েছে।

ফুলগুলো বৌয়ের হাতে দিয়ে অশোক বলল—তোমার জন্য এনেছি।

অমলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল—তবে? জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে—সাজগোজ কেন? বাবুর আবার মনে নেই! দুষ্টুমি হচ্ছিল না?

অশোক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সাদা শিফনে অমলাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

আর তিনমাস। তারপর—

—যাও, চট্‌ করে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলে এসো। আমি খাবার বেড়ে ফেলি। খাওয়া হলে মাদুর পেতে ছাদে গিয়ে বসবে গো? আজ অনেক রাত অবধি গল্প করবো, সেই আগেকার মত—

—খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে? খেয়েছে?

—হ্যাঁ। তুমি হাতমুখ ধুয়ে নাও।

খেতে বসে আবার বিস্ময়। সরু চালের ভাত, ঘন মুগের ডাল, পটলের ডালনা, বাটিতে মুরগীর ঠ্যাং, আলাদা প্লেটে কুচোনো স্যালাড্‌। অন্যদিন রাত্তিরে শুধু রুটি আর একটা তরকারী হয়। কালেভদ্রে ডিমের ডালনা।

—করেছ কি! এত রান্না! আবার মুরগীও দেখছি। তোমার জন্মদিন কেন বছরে দু'বার আসে না। তাহলে একটু ভালমন্দ খাওয়া যায়—

বিয়ের তোরঙ্গের এককোণে বহুকষ্টে সঞ্চিত টাকাক'টা খরচ করে দুপুরে বাজার করেছে অমলা। স্বামী তার হাতের রান্না খেতে ভালবাসে। কি হবে ও টাকা রেখে? স্বামীর মুখে সুখাদ্য দেখে যে হাসি ফুটেছে সেটাই তার খরচের সার্থকতা।

অনেক রাত্রি অবধি গল্প করল দু'জনে। যেন পৃথিবীতে কোথাও কোনো কষ্ট নেই, কোনো দুর্ভাবনা নেই, স্বামী-স্ত্রীর রচিত এই ঘনিষ্ঠ বৃত্তের বাইরে কোনো আগামীকাল নেই।

কিন্তু রাত্রিতে এক বৃদ্ধকে স্বপ্নে দেখল অশোক। তার গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে সে অশোকের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছে। তার ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর কানে এসে পেঁচচ্ছে না। সারারাত ধরে বৃদ্ধ প্রশ্ন করল।

পরের দিন কোলকাতা থেকে ফেরার সময় সন্ধ্যের ট্রেন আবার একই জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল। জানালার বাইরে নিবিড় অন্ধকার। যেন কোথা থেকে কোথায় চলেছে গাড়ি।

গণেশ

খুড়ো মারা যাবার পর থেকেই রূপচাঁদের মনে একটা চিন্তার আবছা ছায়া উঁকি দিতে শুরু করেছিল।

খুড়োর জমিগুলোর কি হবে?

খুড়ী মারা গিয়েছে বছর আষ্টেক আগে। খুড়তুতো ভাই গণেশ নামে যা, কাজেও তাই। ফূর্তিবাজ ছেলে। নেশাভাঙ করে না বটে, কিন্তু তেলচুকচুকে চুলে টেরি কেটে ডোরাকাটা শার্ট পরে পায়ে স্যাণ্ডেল দিয়ে চড়কতলার মাঠের ধারে গ্রামের শখের যাত্রা পার্টিতে রিহার্সাল দিতে যায় রোজ দুপুরে। ফিরতে যার নাম রাত একটা। যাত্রার দলে অবশ্য নাম আর খাতির খুব—গণেশ না হলে কোনো পালা নামবে না। অ্যাকটিং-এর ওপরে আবার তবলা বাজায়, গান গায়। 'নিশি গেল, কুমুদিনী কেন আঁখি মেলিল না-আ-আ' বলে এমন দীর্ঘ টান দেয় যে আসরে চড়বড় করে হাততালি পড়ে। কেন হবে না খাতির?

জমি বন্ধক রেখে খুড়ো যে টাকা বৌয়ের অসুখ আর মেয়ের বিয়ের জন্য ধার নিয়েছিল, তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রূপচাঁদের বাবার কাছে শোধ দিয়ে গিয়েছিল, এমন একটা কথা রূপচাঁদ শুনেছে বটে—কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর দলিলপত্র ঘেঁটে সম্পত্তির বুঝ নিতে গিয়ে এ বাবদ কোনো রসিদ পায় নি। এমন কি মূল কর্জের খতটা পর্যন্ত না। দুই ভাইয়ে খুব ভাব ছিল, বিশ্বাস ছিল। দলিল আদৌ হয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে? হয়ত বড়ভাই মুখের কথার ওপরেই ছোটভাইকে টাকা দিয়েছিল।

রূপচাঁদ অবশ্য খুড়তুতো ভাইকে ঠকাবার কথা ভাবছে না, তার সেরকম চরিত্রই নয়। কিন্তু গণেশ যা এলোমেলো স্বভাবের লোক, তার হাতে থাকলে পৈতৃক জমিগুলো না-হোক বেহাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে রূপচাঁদ দেখাশুনো করলে সেগুলো রক্ষা পেতে পারে। পরে কখনো যদি গণেশের স্বভাবচরিত্র ফেরে, তখন না হয়—

রূপচাঁদের বৌ মীরা এসব বিষয়ে স্বামীর পরামর্শদাত্রী। রাত্তিরে খাবার সময় স্বামীর মতলব শুনে সে বলল—এতে তো আমি কোনো দোষ দেখিনে। আর খুড়োমশাই কর্জ ফেরৎ দিয়েছিলেন কিনা তারই বা প্রমাণ কি? মুখের কথা শুনেছো বই তো নয়—

ঠিক কথা। কিন্তু অসুবিধেটা অন্য জায়গায়। কর্জ ফেরৎ দিয়ে খুড়ো যেমন রসিদ নেয় নি, তেমনি রূপচাঁদের বোকা বাপও কর্জ দিয়ে তার কোনো দলিল রাখে নি। কর্জ ফেরৎ দেওয়া হয় নি সেটা প্রমাণ করার আগে কর্জ যে আদৌ নেওয়া হয়েছিল সেটা তো প্রমাণ করতে হবে।

অবশ্য তারও উপায় আছে। গঞ্জের হাটের শেষদিকে বিনোদ মুহুরীর বাড়ি। উপযুক্ত পুজো পেলে সে সবরকম বরদান করে থাকে। তালডুবির বিশ্বাসের অত বিঘে জমিসংক্রান্ত মামলার দলিল গিয়েছিল হারিয়ে। বিশ্বাসরা পুজো দিল। পরের মাসেই আদালতের তারিখে নিবারণ বিশ্বাস বুক ফুলিয়ে হাকিমের সামনে দলিল দাখিল করল। ঝক্‌ঝকে দলিল—যেন আসল।

কালই একবার বিনোদ মুহুরীর বাড়ি যেতে হবে, পুজো নিয়ে। কিন্তু স্ত্রী যতই আপন হোক, তার সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনো কথা নয়। হাজার হোক মেয়েমানুষ, পেটে কথা থাকে না।

পুজো পেয়ে বিনোদ বর দিতে রাজি হল। তেলতেলে হাসি হেসে বলল—অত কিন্তু কিন্তু করছেন কেন? অসময়ে মানুষকে দেখাই তো মানুষের কাজ। বলছেন পৈতৃক সম্পত্তি, সত্যিই তো—কেন বেহাত হতে দেবেন? সামান্য দলিলটুকু পাওয়া যাচ্ছে না বলে কি ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন? তাহলে আর বিনোদ মুহুরী আছে কি করতে?

তারপর হাসিটা আরো বিস্তৃত করে বলল—আমার জন্য কিছু নয়, আপনাদের উপকার করেই আমি সন্তুষ্ট। কিন্তু, মানে—বোঝেন তো—চর বোয়ালিয়া থেকে এ অঞ্চলে অজানা দলিল-লেখক আনাতে হবে। আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকতে হবে কিনা। তারপরে জোগাড় করতে হবে দশ বছরের পুরনো কাগজ, যে অবিশ্যি আমার ইষ্টকেই আছে, শুধু দামটা—হেঁ হেঁ—যত্ন করে রাখা জিনিস—কিছু বেশিই পড়ে যাবে—দিনকুড়ির মধ্যে দলিল পেয়ে যাবেন। দশদিন চালের ভেতরে, আর দশদিন তুষের মধ্যে গুঁজে রাখতে হবে কিনা—

আসল দলিল তৈরি হতে লাগল। এবার জমি একটু প্রস্তুত করে রাখা প্রয়োজন। অন্তরঙ্গ আড্ডায় বসে একদিন ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল রূপচাঁদ। অখিল পালিত বলল—কি হল হে তোমার? বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে নাকি? মুখখানা দেখে মনে হচ্ছে ভূতে চুমু খেয়ে গিয়েছে—

বিষাদমগ্ন গলায় রূপচাঁদ বলল—মনটা ভাল নেই ভাই। ভাই হয়ে ভাইয়ের বিরুদ্ধে—নাঃ, সংসারে কর্তব্যের খাতিরে কত অপ্রিয় কাজই না করতে হয়—

খারাপ গন্ধ বিশু মিত্তির তিন মাইল দূর থেকে পায়, এবং খুশি হয়। সে সড়াক করে কিছুটা এগিয়ে এসে বলল—গণেশকে নিয়ে কোনো ব্যাপার?

'নিতান্ত অনিচ্ছায়' রূপচাঁদ বন্ধুদের সব ঘটনা খুলে বলল।

—আমাকে তো তোমরা চেন, লোভ জিনিসটা আমার ধাতে নেই। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি হল ন্যায্য পাওনা, সেটা ছেড়ে দিলে আমি যে আমার বাবার ছেলে

তাও তো অস্বীকার করতে হয়। তাছাড়া ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, তাদের ভবিষ্যৎ না ভাবলেও চলে না। একান্ত অনিচ্ছাতেই—

বিশু মিত্তির বলল—না ভায়া, লোভের কথা নয়। তবে নিজের পৈতৃক সম্পত্তি দাবি করা যেতেই পারে। এতে তোমাকে কেউ দোষ দেবে বলে আমার মনে হয় না। কি বল হে তোমরা?

আড্ডাধারীরা সকলেই কমবেশি রূপচাঁদের দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভরশীল। দেখা গেল এ বিষয়ে বিশু মিত্তিরের সঙ্গে কারো মতভেদ নেই।

জমিও প্রস্তুত হয়ে এল।

নৈশ শয্যার একান্ত ঘনিষ্ঠতায় একদিন মীরা বলল—খুড়োমশাইয়ের জমির ব্যাপারটা কতদূর কি হল গো?

ঘুমঘুম গলায় রূপচাঁদ বলল—কেন বল দেখি? হঠাৎ এ কথা?

একটু ইতস্তত করে মীরা বলল—না, আসলে আমার মেজদাদা দমদমের কারখানায় কাজ করে, সে তো জান। আগামী বছর সে রিটায়ার করবে। আমায় বলছিল—মীরা, তোর স্বামীকে তো গ্রামে সবাই মানে-গনে।—একবার বলে দেখিস্ না, যদি আমাকে কয়েক বিঘে জমি ব্যবস্থা করে দিতে পারে। রিটায়ারের পরে চাষবাস করবো ভাবছি। তা ওই জমিগুলো দাও না গো মেজদাকে, চাষ করে তোমায় বরং ফসলের ভাগ দেবে—

হাতে জমি পাবার আগেই তার বিলিব্যবস্থা হয়ে বসে আছে। বিরক্তিমাখা গলায় রূপচাঁদ বলল—আচ্ছা, সে হবে হবে। আগে পাই তো—

তখনকার মত চাপা দেওয়া গেলেও রূপচাঁদ বুঝতে পারল এ প্রসঙ্গ আবার উঠবে, এবং কিছু জমি মেজ শালার হাতে তুলে দিতেই হবে। সংসার একটা বিরাট ঝামেলার জায়গা, নিজের ন্যায্য পাওনাটুকু অবধি পুরো ভোগ করবার উপায় নেই!

মাসখানেকের মধ্যে দলিল হাতে এসে গেল। এবার গণেশের সঙ্গে একদিন মৌখিক কথাবার্তা বলে তারপর আদালতে মোকদ্দমা রুজু করলেই চলবে। তবে মৌখিক কথাবার্তাটা নিজের আড্ডায় বন্ধুবান্ধবদের সামনে হলেই ভাল হয়। সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে তারা কোর্টে সাক্ষী দিতে পারবে।

নিবারণ পালিতকে দিয়ে খবর পাঠান হল। রূপচাঁদের আড্ডায় বিকেলের দিকে এসে হাজির হল গণেশ।

—আমায় ডেকেছ বড়দা?

রূপচাঁদ যথোচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বলল—হ্যাঁ, বোসো ওইখানে। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে—

গণেশ একটু ইতস্তত করে বসে বলল—আমার আবার মহলার দেরি হয়ে যাচ্ছে। সামনের রবিবার বেলের বাজারে বায়না আছে, আজ তাই পুরো মহলা হবে। জরুরী কথা কাল বললে হত না বড়দা?

রূপচাঁদ একটু কেশে নিয়ে বলল—বেশিক্ষণ তোমায় আটকাবো না, তবে বিষয়সম্পত্তি সংক্রান্ত কথা তো, এসব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

—সম্পত্তি সংক্রান্ত? কি কথা বড়দা?

—ইয়ে, ওই খুড়োমশাইয়ের জমিগুলোর বিষয়ে আর কি। ওটার একটা ব্যবস্থা

এবার কিন্তু করে ফেলা দরকার—

গণেশের মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সে বললো—ওঃ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম। সম্পত্তির বিষয়ে আমারও কথা আছে যে তোমার সঙ্গে।

রূপচাঁদের দৃষ্টি তীক্ষ্ন হয়ে উঠল,—কি কথা ?

—বাবার ওই জমিগুলো সম্বন্ধেই। তুমি বললে ভাগ্যিস, তাই মনে পড়লো। বাবা মারা যাওয়ার আগে জ্যাঠামশাইকে সব টাকা মিটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, জানো বোধহয় ? কর্জেরও দলিল নেই, টাকা মেটানোরও রসিদ নেই--

রূপচাঁদ হাঁসফাঁস করে উঠে বলল—না না, কর্জের দলিল কিন্তু—

বাধা দিয়ে গণেশ বলল—সে তো আমি জানিই। নেই। তা, এদিকে হয়েছে কি, কোলকাতার এক যাত্রা পার্টির মালিক আমার অভিনয় দেখে আর গান শুনে খুব খুশি হয়েছে। ওই যে গতমাসে মহকুমা শহরে বায়না নিয়ে গেলাম না ? সেখানে নেমন্তন্ন পেয়ে এসেছিল। আমাকে পালা শেষ হবার পর আড়ালে ডেকে বলল—চারশো টাকা মাইনে দেব, থাকার জায়গা আর খাওয়াদাওয়া ফিরি, আমার দলে আসবে ? হাতে চাঁদ পেলুম বড়দা, বলে দিলুম—হ্যাঁ।

রূপচাঁদের গলা শুকিয়ে এসেছিল। সে বলল –তো ?

—তো আমি চল্লাম কোলকাতায়। আমার কোনো চুলোয় আর কেউ নেই, এক তুমি আর বৌদি ছাড়া। ও জমিগুলো তোমার কাছেই থাক। তুমি চাষবাস করো, ভোগ করো, বাবার আত্মা তৃপ্ত পাবে—

ঘষা গলায় রূপচাঁদ বলল—জমিগুলো—তুই আমাকে নিতে বলছিস ?

—হ্যাঁ দাদা।

—একটা লেখাপড়া করবি না ? কোনোদিন তুই আবার এসে চাইলে আমি যদি ফেরৎ না দিই ?

গণেশ তাড়কাসুরের রোলে অভ্যেস করা হাসিটা দিয়ে ঘর ফাটিয়ে ফেলল। —যদি ফেরৎ না দাও, না দেবে। ও চাষবাস আমার দ্বারা হবে না। যদি কখনো ফিরে আসি তাহলে জমি চাইবো না, শুধু আমাকে থাকতে দিও আর খেতে দিও। নাঃ, যাই—মহলার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

দরজা অবধি গিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে হেসে গণেশ বলল—আচ্ছা, লেখাপড়ার কথাটা কি করে তুললে বড়দা ? ছোটবেলায় তোমার কোলে উঠে খেলা করেছি, তোমাকে এটুকু বিশ্বাস করতে পারবো না ? বাবা আর জ্যাঠামশাই কি দলিল লিখে লেনদেন করেছিলেন ? সামনের হপ্তাতে আমি কোলকাতা চলে যাবো। কাল থেকেই ও জমি তোমার—

সেদিন আড্ডা আর জমলো না।

রাত্তিরে খেতে বসে রূপচাঁদ বলল—মীরা, আজ গণেশ এসেছিল—

উৎসাহী চোখে তাকিয়ে মীরা বলল—কি কি কথা হল ?

—গণেশ আর চারদিন পর কোলকাতা চলে যাচ্ছে। যাত্রাদলে চাকরি পেয়েছে, চারশো টাকা মাইনে।

—আর জমি ?

একটু চুপ করে থেকে রূপচাঁদ বলল—জমি আমার হেফাজতে রেখে যাচ্ছে। ভাগে চাষ করিয়ে ওর অংশের টাকা ব্যাঙ্কে রাখবো। মানুষ চিরকাল বিদেশে থাকে

না, একদিন না একদিন তো ফিরবেই, তখন টাকাগুলো পেলে ওর কাজে লাগবে—

মীরা অবাক হয়ে বলল—সেকি! তাহলে আমার মেজদা?

—রিটায়ার করার সময় তিনি কিছু টাকা নিশ্চয় পাবেন। সে টাকায় আমি অন্য জমি দেখে দেব—

—তা কি করে হয়। আমি মেজদাকে কথা দিয়ে ফেলেছি। এ হতে পারে না—

রূপচাঁদ গ্রামের মধ্যে বিখ্যাত বদ্‌রাগী। সে খুব ঠান্ডা গলায় বলল—মীরা, এ নিয়ে আর ঘ্যানঘ্যান করলে কিন্তু মেজাজ ঠিক রাখতে পারবো না। তোমার মেজদাকে কথা দেবার আগে আমার সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল—

ডালের গামলায় হাত ডুবিয়ে মীরা থুম হয়ে বসে রইল।

খাওয়ার পর আঁচিয়ে এসে বারান্দার দড়িতে টাঙানো গামছায় হাত মুছতে মুছতে রূপচাঁদ বলল—ভালো কথা, পরশু বিকেলে কিছু নারকেলের নাড়ু করে দিও তো, গণেশকে দিয়ে আসবো। ছোকরা নাড়ু খেতে ভালবাসে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বিদেশ যাচ্ছে, আমার উচিত সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দেওয়া। হাজার হলেও নিজের ভাই তো বটে।

কলের পুতুল

বাড়ি ফিরে অমল বুশশার্টটা খুলে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখছে, এমন সময় চায়ের কাপ হাতে ছায়া এসে বলল—আজ যাবে?

চায়ে চুমুক দিয়ে অমল জিজ্ঞাসা করল—কোথায়?

—বারে! তুমি ভুলে গেছ? কতদিন থেকে বলছি। আজ টুটুলের মাস্টারমশাই আসবেন না, কোথায় নাকি বরযাত্রী যাবার কথা আছে। ওকে নিয়েই বেরুই চল, কাল বৃহস্পতিবার। ওরিয়েণ্ট এম্পোরিয়াম বন্ধ থাকবে—

ওরিয়েণ্ট এম্পোরিয়াম শুনে অমলের ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। চায়ে আর একটু চুমুক দিয়ে সে বলল—তোমার সেই মিক্সার গ্রাইন্ডার!

কোমরে আঁচল জড়িয়ে সামনের চেয়ারে বসে ছায়া বলল—আমার গ্রাইন্ডার! জিনিসটা কিনলে আমার একার উপকার হবে?

ছায়ার গলায় তর্কের আভাস। স্বামী-স্ত্রীতে এই বিষয় নিয়ে এর আগে কয়েক প্রস্থ যুক্তি বিনিময় হয়ে গিয়েছে। ছায়া বলেছে—কত সময় বাঁচে বল তো? আজকাল তোলা কাজের লোক পাওয়া যায় না, যদি বা পাওয়া যায় তারা বাটনা বাটতে চায় না। এতে কোন ঝামেলা নেই—জিরে মরিচ হলুদ যা-হোক নিয়ে বৌলে ভরে দিয়ে সুইচ টেপো, ব্যাস্! দু'মিনিটে মশলা তৈরী। এই বিজ্ঞানের যুগে আবিষ্কারের সুযোগ নেব না কেন বলতে পার?

না। অমল বলতে পারে না। সত্যিই তো মানুষের সুবিধে করে দেবার জন্য এসব যন্ত্রের সৃষ্টি, মানুষ সে সুবিধে নিলে দোষ কি?

চায়ের কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে অমল বলল—চল তাহলে, ঘুরেই আসি। একদম ফিরে স্নান করব—

রিক্সায় করে শান্তিবাজারের দিকে যেতে যেতে ছায়া নরম গলায় বলল—তুমি রাগ করছো আমার ওপর, না? কেন বল তো? তোমাকে আমি মাঝে মাঝে বুঝতে

পারি না। দেখ, তুমি অ্যাক্সিডেন্টের ভয় পাও বলে গ্যাস নিলাম না। সেই সাবেকি ঘুঁটে কয়লায় রান্না চালাচ্ছি। আমার কি একটু ঝাড়া হাত-পা হতে ইচ্ছে করে না? আজকাল গিন্নীদের কাজ সহজ করে দেবার জন্য কত রকম জিনিস বেরিয়েছে। বিলেতে আমাদের মত মধ্যবিত্ত সংসারেও কাপড় কাচার মেশিন ব্যবহার করে, তা জানো?

মহিলাদের জন্য আজকাল অনেক রঙচঙে পত্রিকা বেরিয়েছে। তার থেকেই ছায়া এসব খবর সংগ্রহ করে। অমল ম্লান হেসে ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি রাগ করি নি তো। আসলে প্রত্যেকের সব বিষয়ে একটা ব্যক্তিগত মত থাকে। আমি ছোটবেলা থেকে বাটনা বাটতে, ঘুঁটে সাজিয়ে উনুন ধরাতে দেখেছি আমার মাকে। কাপড়কাচা কলের কথা তখন কেউ শোনেও নি। মার কিন্তু কোন অভিযোগ ছিল না, সুখী মহিলা ছিলেন—

ছায়া অসহিষ্ণু গলায় বলল—সে সময় তো এসব আবিষ্কারই হয় নি। সে কারণে কারো মনে এসবের জন্য চাহিদা ছিল না।

—ঠিক তাই। কাজেই বুঝতে পারছ বাজারে এসব জিনিস না থাকলে চাহিদাও থাকত না। তা সত্ত্বেও মানুষ সুখে থাকতো, কবিতা লিখত, বাগান করত, গান গাইত। এ চাহিদার কোনো শেষ নেই ছায়া—

ছায়া রাগ করে বলল—রিক্সা ঘোরাতে বল, আমি যাবো না।

—এই দেখ, তুমি আবার রাগ করছ। আমি কি কিনব না বলেছি?

—না, আমার দরকার নেই।

টুটুল বাবার কোলে বসে অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। অমল বলল—ছি। এত রাগ করে না। রাস্তার লোক তাকিয়ে দেখছে। চল—

দোকানে পৌঁছে কিন্তু ছায়ার মন ভাল হয়ে গেল। সুদৃশ্য কার্পেট, সানমাইকার প্যানেল আর আয়না দিয়ে সাজানো দোকান। শো-কেসে কত আশ্চর্য জিনিসের সজ্জা। চাহিদা তৈরি না হয়ে উপায় কি?

—ইস্, রঙীন প্রেসার কুকার বেরিয়েছে, দেখেছ? উনুনের আঁচে কালো হয়ে যাবে না, ন্যাকড়া দিয়ে জোরে ঘসে দিলেই আবার ঝক্‌ঝকে।

ছায়া শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে জিনিসপত্র দেখছে, টুটুল বাবাকে হাত ধরে টেনে দোকানের অন্যদিকে নিয়ে গেল।

—দেখ বাবা, এইখানে ওরা খেলনা রাখে। এই যে চাকাওয়ালা কামানটা দেখছ? এটা কিন্তু আসলে ব্যাটারীতে চলে। একটু যায়, দাঁড়িয়ে পড়ে, দুম দুম করে কামানের আওয়াজ হয়—তারপর আবার চলে। ভেতরে যন্ত্র আছে। কেমন সুন্দর, না?

তারপর বাবার মুখের দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বলল—কিনে দেবে বাবা? তুমি অনেকদিন আমাকে কিছু কিনে দাও না—

টুটুলের বয়সে অমল গাছের ডাল আর ন্যাকড়ার বল দিয়ে হকি খেলত। তবে ছেলের আর দোষ কি? দিন বদলাচ্ছে—

—দেব বাবা, আজ তো বেশি টাকা নেই সঙ্গে। তোমার মা তাহলে জিনিস কিনতে পারবে না। পরে দেব, কেমন? আজ বরং তুমি চুয়িংগাম কেনো—

নতুন ঘটি কিনলে মানুষ বারবার জল খায়। রাত্তিরে বিছানা করে মশারী

টাঙিয়ে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে ছায়া বলল—শুনছো, একটু শুয়ে ছেলেকে গল্প বলো না, আমি চট করে কালকে রান্নার মশলাটা গুঁড়িয়ে রাখি—

টুটুল ওদিকে সরে গিয়ে বাবার জন্য জায়গা করে দিল। অমল ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—মানুষের গল্প শুনবি বাবা?

বাবাকে টুটুল মায়ের চেয়ে বেশি পছন্দ করে, বোধহয় সারাদিন বিশেষ কাছে পায় না বলেই। তার অবশ্য ইচ্ছে ছিল অন্য গল্প শোনার। তবে বাবা যখন বলছে মানুষের গল্পই হোক।

অমল বলল—দেখ, মানুষ চিরদিন এইরকম দেখতে ছিল না, বুঝলি? এক ধরনের বাঁদর থেকে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পরিবর্তন হতে হতে মানুষের আবির্ভাব। মানুষ তো প্রথমে চাষবাস জানতো না, তাই তাকে বনের জন্তু শিকার করে আর গাছের ফলমূল পেড়ে খেতে হত। ক্রমে মানুষ চাষ করতে শিখল। তাতেও কিন্তু অবস্থার বিশেষ উন্নতি হল না। সেই আদিম মানুষেরা বিজ্ঞান জানত না, তাদের কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না—কাজেই শুধু খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকবার জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। কখনই বা তারা গান গাইবে, কবিতা আর ছবি আঁকবে। সময় কই? অথচ মানুষ তো শুধু খাওয়ার জন্য বাঁচে না।

টুটুল বলল—তারা যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করলো না কেন?

—করল তো? কাজের বোঝা হাল্কা করে আসল দিকে যাতে মন দিতে পারে সেজন্য কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ কেবল নানারকম আবিষ্কার করেই আসছে। এখন মজাটা কি দাঁড়িয়েছে জানিস?

—কি?

—এখন আরাম পাওয়াটা মানুষের নেশায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। কি করে কাজ আরো সহজ করা যায়, শরীরটাকে আরও আরামে রাখা যায়—নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছেই—হচ্ছেই—

একটু থেমে অমল বলল—কিন্তু আসল ব্যাপারটাই চাপা পড়ে গেল। কাজ কমে গেলে ভাবা গিয়েছিল মানুষ নিজেকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করবে, ভাল ভাল কাজে মন দেবে। হল তার উল্টো, এখন এইসব আরাম পাবার জিনিস কেনবার জন্য মানুষকে রাতদিন খাটতে হয়। সবারই চাই তো, কাজেই প্রতিযোগিতা খুব বেশি।

এ গল্প টুটুলের ভাল লাগল না। তার চোখ বুজে এসেছে দেখে অমল বলল —তুই ঘুমো। কাল তোকে শেয়াল আর ধোপার গল্পটা বলব—

ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে।

রান্নাঘর থেকে মিক্সার-গ্রাইণ্ডের চলার যান্ত্রিক শব্দ ভেসে আসছে।

আজ অফিস যাবার সময় ট্রেনের মধ্যে সুশান্ত রায় বলছিল—শুনেছেন দাদা, আমেরিকানরা ক্লেম করছে তাদের স্পাই স্যাটেলাইটে এমন টেলিস্কোপিক ক্যামেরা বসিয়েছে যে, রাস্তায় একটা জামার বোতাম পড়ে থাকলেও তিনশো মাইল ওপর থেকে সেটাকে ক্লোজ-আপে ধরতে পারবে—

বারীণবাবু বুড়োমানুষ, রিটায়ার করার পর কি একটা প্রাইভেট ফার্মে কাজ করেন। তিনি বললেন—বাঃ, অমন ক্যামেরা হয় নাকি?

সুশান্ত অনেক খবর রাখে, সে উত্তেজিত হয়ে বলল—হয় না? বলছেন কি

বারীণদা? পৃথিবী কত এগিয়ে গিয়েছে জানেন? আপনাদের গরুর গাড়ি, মোমবাতি আর পাটের দড়ির দিন আর নেই। জার্মেনীতে সামনের বছর থেকে একরকম ট্রেন চালাবে, তার চাকা রেল-লাইন ছোঁবে না, পুরো গাড়িটা শূন্যে ভেসে থাকবে। তাকে বলে ম্যাগনেটিক লেভিটেশন। আরো কত কত আবিষ্কার। দেখছেন কি, এই ইণ্ডিয়াকেই আমরা কেমন বদলে দিই দেখুন না। দশ বছরের মধ্যে প্রত্যেকের মোটরগাড়ি থাকবে। শুধু তাই? আইজাক্ অ্যাসিমভ বলেছেন কুড়ি বছর পরে মধ্যবিত্তেরাও বাড়ির কাজের জন্য রোবট সাহায্যকারী কিনতে পারবে—

ছায়া ঘরে এসে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে।

—যাই বল হলুদটা এত মিহি গুঁড়ো হল যে বলবার কথা নয়—একেবারে পাউডারের মত। জিনিসের মত জিনিস কেনা হল একটা—

ছায়াও ঘুমিয়ে পড়ে একসময়। অমল জেগে থাকে।

এই পৃথিবীতেই কোথায় যেন খড়ের চালে ঝরে পড়ত বৃষ্টিধারা। বাবলা ফুলের গন্ধে আকুল গ্রামের পথের বাঁকে মিলিয়ে যেত হাট-ফেরতা গরুর গাড়ি। জ্যোৎস্নারাতে শালবনে কবির দল গাইত বসন্তের গান। সরল মানুষ নিজের দু'হাতের শ্রমের ওপর নির্ভর করে জোগাড় করত ক্ষুধার অন্ন।

রাত্রির আকাশ জুড়ে মিক্সার-গ্রাইণ্ডার চলার শব্দ।

ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরতে গিয়ে অমলের বুকের মধ্যে শব্দ হল—ঠুন্।

সেকি! তার শরীরের ভেতরের হৃৎপিণ্ড, ফুস্‌ফুস্, লিভার সব লোহার হয়ে গেল নাকি? সে নিজেই যন্ত্র হয়ে গেল? পৃথিবীর সব মানুষই এইরকম হয়ে যাচ্ছে আজ রাতে?

সারারাত ধরে পাশ ফিরল অমল। তার বুকের মধ্যে থেকে ভেসে আসতে লাগল লোহালক্কড় গড়িয়ে যাবার ঝন্‌ঝন্ আওয়াজ।

মহেন্দ্র সমুদ্রে গেছে

ভেবেচিন্তে ঠিক করলাম সমুদ্রের ধারে কোথাও চলে যাওয়াই ভাল।

লিখতে হবে শ'দেড়েক পাতা, আর সময় হাতে আছে একমাস।

শুনতে এমন কিছু নয়, দিনে পাঁচ পাতা করে লিখতে পারলেই হয়ে যাবে।

দেড়শো পাতার একখানা বই পড়তে কতক্ষণ লাগে? ঘণ্টা দুই কি তিন বড়জোর। কিন্তু লিখতে বসলেই টের পাওয়া যায় কাজটা কত কঠিন। প্রথমত, গল্পটা কই? কতবার এমন হয়েছে, লেখা শুরু করার জন্য ক্লিপবোর্ডে কাগজ আটকে সকাল থেকে বিকেল অবধি বসে আছি—পাঁচ পাতা দূরের কথা, পাঁচ লাইনও লেখা হয় নি। কারণ মাথায় কোনো গল্প নেই। শুনেছি জেমস্ জয়েস্ নাকি অনেক সময় সারাদিন একটিমাত্র বাক্য নানাভাবে সাজিয়ে দেখতেন—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের ফসল ওই একটি বাক্য। অগ্রজেরা সর্বদাই নমস্য। তাই যদি কখনো 'গল্প' মাথায় না আসে, সারাদিন সাদা কাগজ সামনে নিয়ে বসে থাকি (যা প্রায়ই হয়) তখন জয়েসের কথা ভেবে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করি। আর গল্প মাথায় এলেই কি ঝামেলা মিটলো? একখানা দেড়শো পাতার বইয়ে কতগুলো শব্দ থাকে? স্মল পাইকায় ঠাসা কম্পোজ হলে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার। কাগজের

ওপর উপুড় হয়ে একটি একটি করে শব্দ গেঁথে পুরো ব্যাপারটা নামানোও কি সোজা কথা ?

কিন্তু সে কথা সম্পাদক শুনবেন কেন ? জুনের মাঝামাঝি তাঁকে গোটা উপন্যাসের কপি দিতেই হবে, নইলে পুজো সংখ্যায় ধরানো যাবে না। আমি এমন কিছু বড়দরের লেখক নই—যাঁদের দরজায় প্রকাশক এবং সম্পাদকদের ভিড় লেগে থাকে। এবার বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে, যে পত্রিকায় লেখা বেরুলে আর সব সাহিত্যিক-বন্ধুরা ঈর্ষা করতে থাকেন, সে কাগজ থেকে উপন্যাস লেখার ডাক পেয়েছি। পনেরোই জুনের ভেতর লেখা শেষ করতেই হবে।

এবং লিখতে হলে শহরে থাকলে চলবে না।

বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন—শিল্প হচ্ছে অবসরের ফসল। অফিস-সংসার-অতিথি-পাওনাদার-ট্রেনে নিত্যযাত্রা এসব বজায় রেখে সাহিত্য হয় না। এক বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে সমুদ্রের ধারের একটি ছোট্ট শহরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেললাম। বন্ধুর পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ি আছে সেখানে, উপযুক্ত লোক পেলে ভাড়া দিয়ে থাকেন। বন্ধুরই সুপারিশে কিছু কম ভাড়ায় সে বাড়ির একখানি ঘরও ভাড়া পাওয়া গেল।

পাঁচিল-ঘেরা ছিমছাম সুন্দর বাড়ি। জানালা খুলে দিলে দিব্যি সমুদ্র চোখে পড়ে। ঘরে আসবাব বলতে খাট আর একটা টেবিল। টেবিলটা টেনে আনলাম জানালার ধারে—সমুদ্র দেখতে দেখতে লিখব।

প্রথম দু'তিনদিন বেশ তরতর করে লেখা এগিয়ে গেল। সাহিত্য রচনা ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত, প্রায় অলৌকিক বলা যায়। চরিত্রগুলি একবার ঠিকমত দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে তারপর তারা নিজেদের প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করতে থাকে। অনেক সময় লেখকের ভূমিকা শুধুমাত্র দ্রষ্টা ও লিপিকারের হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আরম্ভ করাটাই বড় কঠিন।

লিখতে লিখতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই লেখা থেমে যায়, সমস্ত মন এক ধরনের মধুর অবসাদে ভরে আসে। একদিন বিকেলবেলা তো রীতিমত বুক কেঁপে উঠেছিল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। তখন বেলা বোধহয় সাড়ে-তিনটে কি চারটে। আমার উপন্যাসে স্বামী-স্ত্রী তখন ভয়ানক মানসিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। দু'জনেই ভাল চাকরি করে, কোলকাতায় তাদের নিজের ফ্ল্যাট আছে। অথচ সংসারে কিসের জন্য শূন্যতা—কেবলই তারা পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আধুনিক নগরজীবনের অসহায় বিচ্ছিন্নতা বোঝাবার জন্য এখানে আমি মোক্ষম একটা মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ কষেছি। ইংরেজিনবীশ নায়ক খাওয়াদাওয়ার পর শুতে যাবার আগ্রহ না দেখিয়ে অন্ধকার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে খেতে জন ডানের 'নো ম্যান ইজ অ্যান আইল্যান্ড' ইত্যাদি আবৃত্তি করছে, আর ভেতরে সোফায় বসে তার বৌ উল বুনতে বুনতে তাকে দেখছে—কিন্তু ঘরে ডাকছে না।

এই যখন পরিস্থিতি তখন হঠাৎই বাইরে তাকিয়ে দেখলাম জেড পাথরের রঙের সমুদ্রে আশ্চর্য ঢেউ উঠেছে। ডাঙার কাছাকাছি কলরব করে উঠেছে অজস্র সী-গাল। অনেক দূরে প্রায় দিগন্তের কাছে সাদা পাল তোলা একটা নৌকো কোথায় যেন চলেছে। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি—যতদূর দেখা যায়, শুধুই সমুদ্র, সামনেও তাই, ডান দিকেও তাই। ঝড়ের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে অনেকখানি

বাতাস নাকে-মুখে ঢুকে গিয়ে যেমন হাঁফ ধরে যায়—দৃশ্যের অতখানি বিস্তার তেমনি মনকে কেমন হাঁপিয়ে তুলল। মানুষের বুকের মধ্যে অনন্তের জন্য একটা গোপন তৃষ্ণা আছে, সেই কারণেই মানুষ সমুদ্রকে এত ভালবাসে।

দিনের বিভিন্ন সময়ে সমুদ্রের বিভিন্ন রূপ। লিখতে লিখতে তাকিয়ে দেখা অভ্যেস হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চমকে উঠে আবার লিখতে শুরু করি। সন্দেহ হল—একমাসে উপন্যাস শেষ হবে তো?

একদিন এই জানালা দিয়ে তাকিয়েই মহেন্দ্রকে প্রথম দেখতে পেলাম।

তখন সকাল। সবে সূর্য উঠেছে। ভাবলাম একেবারে বাজারটা করে এসে স্নান সেরে লিখতে বসবো। ছোট্ট স্টোভ, হাঁড়ি-কড়াই সঙ্গেই নিয়ে এসেছি। যা-হোক ভাতে-ভাত ফুটিয়ে খেয়ে নিই। রাত্তিরে পাঁউরুটি আর দুধেই কাজ চলে যায়।

পাঞ্জাবি গায়ে গলিয়ে বোতাম আঁটতে আঁটতে একবার বাইরে তাকালাম। জলের প্রায় ধারেই বালির ওপরে এক জায়গায় গোল হয়ে একটুখানি ভিড় জমেছে। সারারাত সমুদ্রে মাছ ধরার পর ভোরবেলা জেলেরা নৌকো নিয়ে ফেরে। তাদের ধরা মাছ দেখবার জন্য ভ্রমণার্থীরা গিয়ে ভিড় জমায়। কেউ কেউ কেনেও। বুঝতে পারলাম কোনো জেলে ফিরেছে মাছ নিয়ে। পরপর দু'তিনদিন ধরে আলুসেদ্ধ—ডিমসেদ্ধ ভাত খেয়েছি। আজ একটু টাটকা মাছভাজা হলে মন্দ হয় না। থলে হাতে গুটি গুটি এগোলাম ভিড় লক্ষ্য করে।

কাছে গিয়ে দেখি মাছই বটে। স্তূপীকৃত মাছের সামনে বসে কুচকুচে কালো চেহারার বছর বাইশ-তেইশের যুবক জেলে মাছ বাছাই করছে। চাঁদা, পমফ্রেট, চিংড়ি, ম্যাকারেল—কত রকম মাছ! তাছাড়া আলাদা করে বাতিলের স্তূপে সরিয়ে রাখা হচ্ছে জেলিফিশ, তারামাছ, ব্যাঙ্‌মাছ এবং আরো নানারকম অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণী। প্রায়ই এদের হাতে অক্টোপাস আর হাঙরের ছানাও ধরা পড়ে। এরই আকর্ষণে ভিড় জমে জেলেরা ফিরলেই।

লোকজন একটু কমলে জিজ্ঞাসা করলাম—কি হে, মাছ বেচবে নাকি?

ছেলেটা সাদা দাঁত বের করে বলল—আজ্ঞে, সেই জন্যেই তো এত কষ্ট করা—

খয়রা মাছের মত দেখতে পাতলা আর চকচকে একরকমের মাছ খুব পছন্দ হয়েছিল, দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—এগুলোকে কি বলে?

—ও হল বাঁশপাতা মাছ—

—খায়?

—হ্যাঁ বাবু, খায় বইকি। খুব টেস্—

—আমাকে টাকা পাঁচেকের দাও না ভাই—

তার কাছে দাঁড়িপাল্লা নেই। একবার মাথা চুলকে সে দুই হাতে একবোঝা মাছ জড়ো করে তুলে বলল—দিন বাবু, ব্যাগ দিন—

আমি শহরের আন্দাজে পাঁচ টাকা বলেছিলাম, ভেবেছিলাম গোটা দশ-বারো মাছ পাওয়া যাবে, কড়কড়ে করে ভেজে দু'বেলা খাবো। কিন্তু এ তো দেখা যাচ্ছে অন্তত তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা মাছ—এর সব আমি একা খেলে বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্বিক উপন্যাস চিরদিনের জন্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্যস্ত হ'য়ে বললাম—আরে না না, এত না। কম দাও—আমি একা লোক।

—তাহলে বাবু দু'টাকার নিন—

অন্তত গোটাপনেরো মাছ সে আমার ব্যাগে ভরে দিল।

বললাম—তোমার নাম কি?

সে বলল—মহেন্দ্র। ডাকনাম চেয়ার।

—চেয়ার?

—হ্যাঁ বাবু, আমার ভাইয়ের নাম টেবিল।

—ভারি মজার নাম তো। এরকম নাম আমি আগে কখনো শুনি নি—

আপ্যায়িত হয়ে মহেন্দ্র বিনীত হাসি হাসলো।

বাঙালী মাছ জিনিসটা ভালবাসে, মাছের সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকলে তার হৃদয় উল্লসিত হয়। কাজেই আমার কাজ মিটে গেলেও আমি দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রের বিচিত্র মৎস্য সম্ভার দেখতে লাগলাম। আরো দু'চারজন ভ্রমণার্থী বেড়াতে বেড়াতে মাছ কিনে নিয়ে গেলেন। স্থানীয় বাজার থেকে একজন ফড়ে এসে বিস্তর দরাদরি করে বাকি সব মাছ চ্যাপটা ঝুড়িতে ভরে নিল।

মাছভাজা আর মুগের ডাল দিয়ে দুপুরে মহাভোজ হয়ে গেল।

তার পরের দু'দিন মহেন্দ্রকে দেখলাম না। চতুর্থদিন ভোরবেলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি মহেন্দ্রের নৌকো এসে লেগেছে পারে। তাকে ঘিরে যথারীতি উৎসুক জনতার ভিড়। পায়ে পায়ে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভিড় একটু পাতলা হয়ে এলে মহেন্দ্র আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল—মাছ নেবেন তো বাবু? আমি কিন্তু ঠিক দেখেছি আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। এই দেখুন, আপনার জন্য মাছ আলাদা করে রেখেছি। নিন—

ব্যাগে মাছ ভরে বললাম—কত দেবো?

—দেবেন? দি-ন দু'টাকাই দিন।

কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। শহরের হিসেবে অন্তত টাকা দশ-বারোর নিয়েছি, গোটা পাঁচেক টাকা না দিলে কেমন দেখায়? এরপর হয়ত লোকটা মনে করবে মিষ্টি কথা বলে সস্তায় মাছ পাবার লোভে আমি রোজ এসে দাঁড়িয়ে থাকি। নাঃ, কাল থেকে আর মাছ নেবো না।

জিনিসপত্র গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল মহেন্দ্র। বললাম—এখন কোথায় যাবে?

—বাজারে যাবো বাবু। চাল-ডাল আর তেল কিনে তারপর বাড়ি যাবো।

—থাকো কোথায় তুমি?

—বাবু, আমার বাড়ি খাঁদালগোবরা গ্রামে। শহর ছাড়িয়ে পূর্বদিকের রাস্তা ধরে আধ ক্রোশ পথ যেতে হয়।

বললাম—চল, আমিও বাজারে যাবো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাই—

পথে না উঠে আমরা বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, একেবারে বাজারের সামনে গিয়ে উঠবো। বেলা প্রায় সাতটা বাজে, কিন্তু রোদ্দুরে তত তাত নেই। কিছুদূর থেকে বেলাভূমি ঢালু হয়ে উঁচুতে উঠেছে, সেই উঁচু পাড়ের ওপর দীর্ঘ ঝাউবনের সারি চলেছে দু'দিকে যতদূর চোখ যায়। একটি ফ্রক পরা ছোট্ট মেয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার বাবা-মা নিজেদের মধ্যে উত্তেজিত ভাবে তর্ক করছে। বেশ কেমন একটা শান্ত, ঝকঝকে

সকাল। কেমন অনাবিল শান্তি চারদিকে। কিন্তু উপন্যাস শেষ হলেই আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে শহরে। ঝাঁকের কই ঝাঁকে। আবার ন'টা সাতাশের লোকাল, ডিজেলের গন্ধ, সীমান্তে গুলি বিনিময়, 'চৌধুরীবাবু যে আপনার জমির ওপর দিয়ে নর্দমা কেটে ফেলল, মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা কমপ্লেন করুন মশাই!' পাতিলেবু টাকায় দুটো, পটল সাত টাকা কিলো, বেগুন পাঁচ. কাটাপোনা পঞ্চাশ টাকা। পনেরোই আষাঢ় শালার ছেলের অন্নপ্রাশন, সোনার আংটি না নিয়ে গিন্নী কোন্ মুখে সেখানে যান? ভাড়াবাড়ির কলতলায় টিনের বালতিতে ছড়ছড় করে একঘেয়ে জল পড়ার শব্দ। ফিরে গেলেই আবার এই—

তার চেয়ে কত ভাল হত চিরদিন এখানে থেকে যেতে পারলে। ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড্, জীবনের সবরকম কোলাহল, দায়িত্বের গুরুভার আর ক্লেদ থেকে দূরে। সারাদিন সমুদ্রের গান আর সী-গালের ওড়াউড়ি—

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলো—বাবু আর ক'দিন থাকবেন?

—তা, ধরো আর মাসখানেক—

মহেন্দ্র হেসে বলল—তাহলে আপনার খুব ভাল লেগে গিয়েছে জায়গাটা বলুন? বেড়াতে এসে কেউ তো এতদিন থাকে না—

বললাম—আমি ঠিক বেড়াতে আসি নি, কাজে এসেছি।

—এখানে কাজ? কি কাজ বাবু?

মহেন্দ্রকে বুঝিয়ে বললাম। সে অবাক হয়ে বলল—আপনি বই লেখেন? রবি ঠাকুরের মত?

খুব বিপদ। এর উত্তরে 'না' বললে মিথ্যে বলা হয়, আর বদ্ধ উন্মাদ না হলে 'হ্যাঁ' বলা যায় না। চুপ করে রইলাম।

মহেন্দ্রের চোখে শ্রদ্ধা ঘনিয়ে এল। সে বলল—উঃ! বাবু একজন লেখক! আমি কখনো লেখক দেখি নি, আজ প্রথম দেখলাম। আপনি ভূতের গল্প লেখেন?

গ্রাম্য সাধারণ মানুষেরা অনেক সময় বেশ সুন্দর আর মার্জিত ভাষায় কথা বলে। মহেন্দ্রর ভাষাতেও 'তথাপি', 'যদিচ', 'বারংবার' ইত্যাদি তৎসম শব্দের ছড়াছড়ি। একজন মৎস্যজীবীর সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহ দেখে মজা লাগল। বললাম —না, ভূতের গল্প কখনো লিখি নি। আমাদের শহর-বাজারে ভূত আর নেই, ইলেকট্রিক আলোর চোটে সব পালিয়েছে। তুমি রবীন্দ্রনাথের নাম করলে, তাঁর লেখা পড়েছো?

—না বাবু। আমরা কি তত লেখাপড়া জানি? তবে নাম শুনেছি। খুব বড় লেখক।

বাজারে এসে দু'জনে আলাদা হয়ে গেলাম।

লেখা বেশ জমে উঠেছে। পর পর দু'তিনদিন না বেরিয়ে একটানা লিখে গেলাম। এভাবে চললে নির্দিষ্ট সময়ের কয়েকদিন আগেই উপন্যাস শেষ হয়ে যাবে।

চারদিনের সকালে আমার দরজার কড়া নড়ে উঠল। খুলে দেখি মহেন্দ্র।

—কি হে, কি ব্যাপার?

—আপনার সঙ্গে ক'দিন দেখা হয় না, আজ কিছু মাছ নিয়ে এলাম—

একটা মাদার ডেয়ারীর পলিথিনের প্যাকেটে অন্তত আধকিলো মাঝারি সাইজের চিংড়ি সে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

—তুমি আমাকে বড় বিপদে ফেললে মহেন্দ্র। মাছ আনলেই রান্নার ঝামেলা করতে হয়, এমনিতে আমি ভাতে-ভাত খেয়ে চালিয়ে দিই—নইলে লেখার সময় নষ্ট হয়। বোসো মহেন্দ্র, ওই চেয়ারটাতে বোসো। কত দাম দেবো?

মহেন্দ্র লজ্জিতমুখে বলল—আমি এর দাম নিতে পারবো না—

—সেকি! না না, তা হয় না। দাম নেবে না কেন? বল কত দেবো?

—দাম নিতে পারবো না বাবু। আমরা গরীব লোক, তাই বলে কি কাউকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে না?

এরপর টাকা নেবার জন্য চাপাচাপি করলে ব্যাপারটা তেতো হয়ে যায়। বললাম—আচ্ছা ঠিক আছে, এগুলো বন্ধুর উপহার হিসেবে নিলাম।

মহেন্দ্রের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। সে বসে আছে আমি যে চেয়ারে বসে লিখি, সেটায়। এখানে আসবে বলে বোধহয় বাড়ি গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে একটা কলার ছেঁড়া, কুঁচকে যাওয়া সাদা হাফসার্ট পরে এসেছে। পরিচ্ছন্ন হবার চেষ্টা সত্ত্বেও তার গা থেকে হাল্‌কা মেছো গন্ধ ভেসে আসছে। সাদা জামার সঙ্গে তুলনায় তার মুখ, গলা আর হাত দেখাচ্ছে চকচকে কালো। একটা সিগারেট ধরিয়ে খাটের ওপর পা তুলে বসে মহেন্দ্রকে বললাম—তোমার মাছ ধরার গল্প বলো শুনি।

নিমেষে মহেন্দ্রর লাজুকভাব কেটে গেল। সে মুখ তুলে বলল—ওঃ, সে গল্প কি একদিনে করা যায়?

—কত বড় মাছ ধরেছো সেই কথা বলো।

—একবার ভীষণ কাণ্ড হয়েছিল, জানেন? ছোট নৌকোতে আমি আর আমাদের গ্রামের জলধর মাছ ধরতে গিয়েছি, সেদিন বাতাস দিচ্ছে জোর। একবার ভেবেছিলাম বেরুবো না, তারপর বাবু দেখলাম আকাশে মেঘ-টেঘ কিছু নেই, মনে হল বাতাস কমে যাবে। আর না বেরুলেই বা চলে কি করে বলুন? পরদিন খাবো কি?

বললাম—সে তো ঠিক কথা। তারপর কি হল?

—মাঝরাত্তির পেরিয়ে গেল, বাতাস কিন্তু সমানে বইতে লাগল। বেশ বড় বড় ঢেউ উঠেছে সমুদ্দুরে। আমি শক্ত করে হাল চেপে রয়েছি। হঠাৎ কি হল কি জানি, হাতজাল ছুঁড়তে গিয়ে পায়ে জালের দড়ি আটকে জলধর হুড়মুড় করে জলে পড়ে গেল।

—বলো কি!

—এমনিতে তাতে কিছু এসে যায় না বাবু। আমরা যারা সমুদ্দুরে যাই তারা মাছের মত সাঁতার দিতে পারি। কিন্তু সেদিন অত ঢেউ, তাছাড়া জলধরের পায়ে দড়ির ফাঁস এমনভাবে লেগেছে যে, সাঁতার কাটতে কাটতে কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না, এদিকে পায়ে দড়ি জড়িয়ে থাকায় ভাল করে সাঁতারও দিতে পারছে না। মহা বিপদ! তাকে সাহায্য করতে হাল ছেড়ে এগিয়ে গেলে এদিকে নৌকো বানচাল হয়ে যায়। ঢেউয়ের ধাক্কায় জলধর ক্রমেই নৌকো থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, প্রাণপণ চেষ্টা করেও কাছে আসতে পারছে না। এক্ষুনি তাকে তুলে না নিতে পারলে সে ডুবে মরবে। আমার অবস্থা ভাবুন বাবু, চোখের সামনে বন্ধু ডুবে মরছে, এদিকে হাল ছাড়ার উপায় নেই। জলধর চেঁচিয়ে আমাকে কি যেন বলছে, বাতাসের দাপটে শুনতে পাচ্ছি না ঠিকমত। শেষে উপায় নেই দেখে হালের মাথায় মোটা পাটের

দড়ি জড়িয়ে তার অন্যদিক বাঁধলাম দাঁড় বসাবার লোহার আংটার সঙ্গে। নৌকো একজায়গাতেই গোল হয়ে ঘুরতে লাগল। এবার উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে চিৎকার করে ডাকলাম—'জলধর'। কোনো সাড়া এল না। নৌকো ঘুরে চলছে চাকার মতো। আমারও যেন কেমন দিক ভুল হয়ে গিয়েছে। কোন্ দিকে ডাঙা? কোন্ দিকেই বা পড়েছে জলধর? হঠাৎ দেখি নৌকোর পাশেই হাতের কাছে ভেসে উঠেছে জালের মাথার দিকটা। এরই উল্টোদিকে জলধরের পা আটকে আছে। খপ্ করে হাত বাড়িয়ে জালটা ধরে ফেলে গায়ের জোরে টানতে আরম্ভ করলাম। কি ভারি হয়ে আছে জাল, যেন পাঁচ মণ মাছ পড়েছে। হ্যাঁ, ওই যে ভেসে উঠেছে জলধর, হাঁচোড়-পাঁচোড় করে কাছে আসবার চেষ্টা করছে। কোনোরকমে তাকে হাত ধরে পাটাতনের ওপর তুলে ফেলেছি প্রায়, এমন সময় হালের মাথায় জড়ানো দড়ির পাক গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে নৌকো কাত হয়ে অনেকখানি জল তুললো খোলে। তারপর পাগলের মত একবার এদিক একবার ওদিক ছুটতে লাগলো। আমি শক্ত করে জলধরের হাত ধরে থেকে পা দিয়ে হালের মাথাটা ধরবার চেষ্টা করছি। তা হাতের কাজ কি পা দিয়ে আর করা যায় বাবু? তারপর ওই ঢেউ! যাই হোক, জোড়া পায়ে হাল ঠেসে ধরতে নৌকো একটু সোজা হল, জলধরকে তুলে নিলাম ওপরে। বেচারী জল খেয়ে আধমরা হয়ে গিয়েছিল, আমাকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না! তাকে ধমক দিয়ে বললাম—'দূর ব্যাটা! তুই না জেলের পো? নৌকো থেকে একটু পড়ে গিয়ে মেয়েদের মত কাঁদছিস?'

ধমক খেয়ে জলধর কিছুটা শান্ত হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বাতাসের তেজও কমে গেল আধাআধি। মাছধরা সেদিন আর হল না, জাল ছিঁড়ে গিয়েছিল। জলধরকে হালে বসিয়ে আমি দাঁড় টানতে লাগলাম। ভোর রাত্তিরে, যখন আবছা আলোয় দূরে ডাঙা দেখা দিয়েছে, হঠাৎ জলধর বলল—যতই ঢেউ থাকুক, তার জন্য আমি ভয় পাই নি। কিন্তু—

অবাক হয়ে বললাম—কি হয়েছে তবে? অমন কাঁদলি কেন তুই?

একটু গুম হয়ে বসে থেকে জলধর বলল—জলের তলা থেকে আমার পা ধরে কে টানছিল। তাই তো অত জল খেলাম। সাঁতার কাটতে দিচ্ছিল না—

সেদিন বকাবকি করে জলধরকে চুপ করিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু সে কথা মনে পড়লে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দেয়—

আমার মুখে মৃদু হাসির রেখা দেখে মহেন্দ্র ক্ষুব্ধ গলায় বলল—না বাবু, হাসির কথা নয়। আপনারা শহরের মানুষ। আপনাদের সহজে বিশ্বাস হবে না, কিন্তু সমুদ্দুরে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। যারা জলে ডুবে মারা গিয়েছে, তাদের প্রেতাত্মা বাস করে সাগরের নিচে। জ্যান্ত মানুষের ওপর তাদের ভারি হিংসে। সুবিধে পেলেই তারা জীবন্ত মানুষকে টেনে জলের তলায় তাদের রাজ্যে নিয়ে যেতে চায়। আমার নিজেরই তো কতবার অমন হয়েছে—

বললাম—সে কি! তুমিও জলে পড়েছিলে নাকি?

মহেন্দ্র বলল—না বাবু। তবে হাল ধরে বসে থাকতে থাকতে গভীর রাত্তিরে ঝিমুনি আসে। একদিন ওইরকম ঝিমুনির মধ্যে শুনতে পেলাম কে যেন কোথা থেকে আমাকে ডাকছে। ঘুমভাব কেটে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। সাগরের মধ্যে আর মানুষ কোথা থেকে আসবে? তারপর আবার সেই ডাক শুনতে

পেলাম, জলের নিচে থেকে কে যেন ফিসফিসে গলায় ডাকছে—আয়! আয়! আয়!

জিজ্ঞাসা করলাম—বাংলায় বলছিল?

মহেন্দ্র আমার দিকে কেমন অদ্ভুতভাবে তাকাল। বলল—আপনি সাহিত্যিক মানুষ, ঠিক আসল কথাটা ধরে ফেলেছেন। আমি নিজেও পরে এই ব্যাপারটা ভেবেছি। না, কোনো ভাষাতেই ডাকছিল না—বাংলা তো নয়ই। সে মানুষের ভাষা নয়। কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম আমাকে ডাকছে—আয়! আয়! আয়!

সেদিন বিকেলে মেঘ করে এল। ঝাউবনের মাথা দুলছে প্রবল বাতাসে। হঠাৎ আমার আর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করল না, লেখা ফেলে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালাম সমুদ্রের ধারে। আলো তখন পড়ে এসেছে, ঘোলাটে অন্ধকার নেমে আসছে দিক-বিদিকে। দিন ও রাত্রির সেই আশ্চর্য সন্ধিক্ষণে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যেটা কেমন করে উঠল। দেখলাম কালচে সবুজ রঙের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে বেলাভূমিতে। কেউ নেই কোথাও, ঝড়বৃষ্টির ভয়ে সবাই ফিরে গিয়েছে নিজের আস্তানায়। মেঘচাপা সন্ধ্যেবেলা আমি একা রয়েছি যেন জীবহীন কোন সুদূর নক্ষত্রলোকের অজানা গ্রহের সমুদ্রতটে নির্বাসিত। ওই সমুদ্রের জলেই বহুকোটি বছর আগে প্রথম প্রাণের উন্মেষ ঘটেছিল। অনেক আদিম রহস্য আছে সমুদ্রের তলায় লুকোনো।

এবং আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম মহেন্দ্রের কাছ থেকে শোনা গল্পটা আর ততখানি অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে না।

প্রায় প্রত্যেকদিনেই সকালে মহেন্দ্র আসতো টাটকা মাছের প্যাকেট হাতে নিয়ে। পয়সা নিতে চাইতো না, জোর করে তার পকেটে গুঁজে দিতাম। কত অদ্ভুত গল্পই যে মহেন্দ্র বলতো! একদিন সে বলল—জানেন বাবু, সাগরে জল, আকাশের চাঁদ-তারা, ঝড়-বৃষ্টি-বাদল—এরা কেউ মানুষকে দেখতে পারে না। সবাই মানুষের শত্রু—

অবাক হয়ে বললাম—তার মানে?

—এরা কেউ চায় না তাদের রাজ্যে মানুষ ঢুকে পড়ুক, সেজন্যেই তো ঝড়—তুফান তুলে, পথ ভুলিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। একটা ঘটনা বলি শুনুন। পরিষ্কার রাত্তিরে আমরা নক্ষত্র দেখে দিক ঠিক করি। এটা আমাদের ছোটবেলা থেকেই শিখতে হয়, নইলে, সাগরে রাত্রিরবেলা নৌকো চালানো যায় না। একদিন সারারাত মাছ ধরে সঙ্গীর হাতে হাল দিয়ে একটু বিশ্রাম করার জন্য পাটাতনে চিৎ হয়ে শুয়ে আছি। সঙ্গীও হালের ওপর ভর দিয়ে ঝিমোচ্ছে। সমুদ্র সেদিন আয়নার মত শান্ত, কাজেই নিশ্চিত হয়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়েও নেওয়া যায়। স্রোতের টানে নৌকো আপনা আপনি ডাঙার দিকে চলেছে। ফুরফুরে হাওয়ায় চোখ প্রায় বুজে এসেছিল, হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে ঘুমের চটকা ভেঙে গেল। চিৎ হয়ে শুয়ে থেকেই ভাল করে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

একটু থেমে মহেন্দ্র পাশের জানালা দিয়ে একবার সমুদ্রের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল—এখন ভাবলে আমার নিজেরও যেন বিশ্বাস হয় না। ওপর দিকে চেয়ে স্পষ্ট দেখলাম নক্ষত্ররা জায়গা বদল করছে।

এবার না হেসে পারলাম না। বললাম—তুমি কি বলছ বুঝতে পারছ না মহেন্দ্র, হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে নক্ষত্ররা রয়েছে—তারা ওইভাবে জায়গা

বদল করতে পারে না। তাছাড়া তাতে কিভাবে প্রমাণিত হয় যে, প্রকৃতি আমাদের ভালবাসে না?

এটা বুঝলেন না? নক্ষত্র দেখে রাত্তিরে নৌকো চালাই। নক্ষত্র যদি জায়গা বদল করে তাহলে তো দিকভুল হয়ে বার-সমুদ্রে গিয়ে পড়বো। আমি যখন দেখেছি তখন তারাটা নিজের জায়গায় ফিরে আসছিল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখি, অমন অনেক তারা নড়েচড়ে নিজের জায়গায় চলে যাচ্ছে। তার মানে সাধারণত আমরা ডাঙার দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে গিয়েছি। ভোরবেলা সূর্য উঠলো আমাদের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিম দিক দিয়ে। কতদূর চলে গিয়েছিলাম কে জানে? তক্ষুণি নৌকো ঘুরিয়ে সারাদিন খিদেতেষ্টায় ভুগে বিকেল নাগাদ এসে ডাঙায় পেঁছাই। সবই মিথ্যে না বাবু, অনেক কিছু আছে দুনিয়ায়--

আমার উপন্যাস প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বিয়ের আগে নায়িকা যার সঙ্গে প্রেম করতো সেই ছেলেটিকে সুবিধেজনক ভাবে গল্পের এই পর্বে ফিরিয়ে এনেছি। তারা এখন মাঝে মাঝে রেস্তোরাঁয় বসে বা খেতে খেতে উদাস উদাস কথা বলে, আর নায়ক অফিসের কাজে লম্বা লম্বা ট্যুরে বাইরে থাকে। এখন নায়িকাকে কঠিন অসুখে ফেলে হাসপাতালে পাঠাবো। পূর্বতন মধুপিয়াসী প্রেমিক বেগতিক দেখে আবার জনারণ্যে বিলীন হয়ে যাবে। বেডের পাশে গ্ল্যাডিওলাস ফুলের গোছা, মভ্ রঙের পর্দার ফাঁক দিয়ে বিকেলের রোদ্দুর আসছে—হাসপাতালের নির্জন কেবিনে এইরকম এক রোম্যাণ্টিক পরিবেশে নায়ক-নায়িকা নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করবে। সে মুহূর্ত আগতপ্রায়।

এমন সময়ে একদিন বাজারে সিগারেট কিনতে গিয়ে শুনলাম মহেন্দ্র হারিয়ে গিয়েছে। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসে নি। গতকাল সে আর তার বন্ধু নৌকো নিয়ে বেরিয়েছিল, আজ সকালে তারা ফেরে নি। এই নিয়ে ছোট্ট শহরটা সরগরম হয়ে আছে।

মনটা নিতান্ত দমে গেল। আজ থেকে মাত্র একমাস আগেও মহেন্দ্রকে চিনতাম না। কিন্তু খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম তাকে এই অল্প সময়ে কাছের লোক হিসেবে তালিকাভুক্ত করে নিয়েছি। গতকাল মাঝরাত্তিরে হঠাৎ গুমগুম করে মেঘ ডেকে ঝড় উঠেছিল বটে, ঘণ্টাখানেক বৃষ্টিও হয়েছিল। মহেন্দ্র ও তার বন্ধু তখন দশ মাইল সমুদ্রের ভেতর। আর কি তাকে দেখতে পাব? দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে ফিরে আসে খুব কম লোকই। অবশ্য বাজারে শুনে এলাম মাইল আষ্টেক দূরের সরকারী মৎস্যচাষ কেন্দ্র থেকে লঞ্চ নিয়ে উদ্ধারকারী দল যাচ্ছে জেলে দু'জনকে খুঁজতে।

ফেরবার সময় রাস্তা দিয়ে না এসে সমুদ্রের ধার দিয়ে হেঁটে এলাম। অন্ধকারে অশান্ত সমুদ্র গর্জন করছে। ওই সমুদ্রের ভেতর কোথায় হারিয়ে গিয়েছে মহেন্দ্র আর তার সঙ্গী। আমার পরের লেখায় মহেন্দ্রকে আমি একটি প্রধান চরিত্র করবো।

পরের দিন মহেন্দ্রকে নিয়ে ফিরে এল উদ্ধারকারী লঞ্চ।

তার সঙ্গী ঝড়ের মুখে কোথায় ভেসে গিয়েছে কে জানে! নৌকো উল্টে গিয়েছিল, মহেন্দ্র দড়ি দিয়ে নিজেকে নৌকোর সঙ্গে বেঁধে নেয়। দু'দিন একরাত পরে আধমরা অবস্থায় তাকে সেইভাবেই ভাসতে দেখে লঞ্চের লোকেরা। তার

সারাগায়ে ফোস্‌কা, জ্ঞান প্রায় নেই। তবে এযাত্রা সে বেঁচে যাবে।

বিকেলের দিকে স্থানীয় সরকারী হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলাম।

বীভৎস চেহারা হয়েছে বেচারার। ঠোঁট শুকিয়ে ফেটে গিয়েছে, ফোস্‌কা গলে গিয়ে গায়ে লাল দগদগে ঘা। চোখে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। অবধারিত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে সে এখনো ধাতস্থ হয় নি। আমাকে দেখে মহেন্দ্র কেঁদে ফেলল।

পাশে বসে তার একখানা হাত ধরে বললাম—ছিঃ, পুরুষমানুষ কি কাঁদে? তুমি তো চমৎকার অ্যাডভেঞ্চার করে এলে একটা। এমন ক'জনের ভাগ্যে হয়?

না, উৎসাহের কোনো আলো জ্বলে উঠলো না মহেন্দ্রর চোখে। ফিস্‌ফিস্‌ করে সে বলল—আমি আর কখনো সাগরে যাবো না। কখনো না—

—বেশ, যেও না। করবার মত আরো কত কিছুই তো আছে—

আমার হাতটা শক্ত করে ধরে মহেন্দ্র বলল—আমাকে আপনার সঙ্গে শহরে নিয়ে চলুন। আমি আর সমুদ্রে যাবো না।

একটু বিব্রত বোধ করলাম। শহরে নিয়ে গিয়ে মহেন্দ্রর চাকরি করে দেওয়ার বা উপার্জনের পথ দেখিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু অসুস্থ, বিহ্বল একজনের মুখের ওপর সরাসরি 'না' বলতেও খারাপ লাগল। তখনকার মত প্রবোধ দিয়ে বললাম—আচ্ছা, সে হবে এখন।

মহেন্দ্র যেদিন হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে বাড়ি গেল, সেদিন আমার উপন্যাসও শেষ হল। এবার জব্বর গোছের একটা জটিল নাম ঠিক করতে হবে। আরো চার-পাঁচদিনের বাড়িভাড়া দেওয়া আছে, এ ক'টা দিন থেকেই যাই।

প্রায় রোজই বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে মহেন্দ্রর বাড়ি গিয়ে হাজির হতাম। বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে সে উদাসচোখে তাকিয়ে বসে থাকে। বলে—নিয়ে যাবেন তো বাবু আমাকে? এখানে আর ভাল লাগছে না। বাব্বাঃ, কি বাঁচান বেঁচে এলাম বাবু! সমুদ্দুরে মাছ ধরা আমার জন্মের মত চুকে গিয়েছে।

ভেবে ঠিক করলাম নিয়েই আসি মহেন্দ্রকে। আমার বাড়িতেই নাহয় ক'দিন থাকবে এখন। শহরে ওর অনেক জাতভাই আছে—এই জেলার লোক, তারা চেষ্টা করলে ওর একটা ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে। আর নইলে অন্তত কিছুদিন বেড়িয়ে আসা তো হবে।

আমার সিদ্ধান্ত জানাতে মহেন্দ্র খুশি হয়ে উঠল। বললাম, এই রবিবার সকালে রওনা দেব। তুমি তৈরি হয়ে থেকো, শনিবার সন্ধ্যেবেলা এসে নিয়ে যাবো তোমাকে।

শনিবার সন্ধ্যায় খাঁদালগোবরা গ্রামে গিয়ে খবর পেলাম মহেন্দ্র নৌকো নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়েছে।

আলেকজাণ্ডার ও গুরুদাস মল্লিক

শহরের একেবারে শেষে খেলার মাঠের ধারে গুরুদাস মল্লিকের বাড়ি। বাড়ি বলতে একটা ছোট্ট টিনের চাল, তাতে একখানাই ঘর। অসুবিধে হয় না, কারণ গুরুদাসের সংসারে মানুষজন কম, স্ত্রীলোকের ঝামেলাও নেই। বৌ মারা গিয়েছে আজ তেরো-

চোদ্দ বছর। গুরুদাস দুই ছেলেকে নিয়ে বাস করে। বড়ছেলে নিতাইয়ের বয়স উনিশ, ছোট গৌরাঙ্গের সতেরো। দু'জনেরই বেশ হাড়েমাসে জড়ানো শক্ত-সবল চেহারা। কিন্তু দুই ভাইয়েরই মুখে একধরনের শান্ত নির্বুদ্ধিতা মাখানো রয়েছে। দেখলেই তাদের নিতান্ত অকাজের এবং অপদার্থ বলে মনে হয়। চেহারার এ বৈশিষ্ট্য তারা সম্ভবত বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

গুরুদাস লোকটা বেঁটে, কিন্তু মোটা নয়। গড়পড়তা বাঙালীর মত মধ্যম আকৃতির দেহ। গলায় তুলসীর মালা, ভাবভঙ্গি অতি বিনীত। বিনয়ের প্রাবল্যে তার চোখ প্রায় সর্বদাই আধবোজা হয়ে থাকে। বিকেলের দিকে তার বাড়ির সামনে দিয়ে কখনো কখনো নদীর ধারে পায়চারি করতে যাবার সময় দেখি সে বাড়ির উঠোনে বসে করাত, র‍্যাঁদা হিক্কাপ নিয়ে আপনমনে কাজ করে চলেছে। দেখতে পেলেই সে বলে উঠবে—জয়গুরু! ভাল আছেন কর্তা? বাড়িতে সব ভাল? খোকারা?

—সবাই ভাল আছে। তুমি কেমন আছ গুরুদাস?

—গোঁসাই যেমন রেখেছেন। তাঁর কোলে আছি, ভালই বা কি, আর মন্দই বা কি?

এই বলে দু'হাত জোড় করে এমন ঢুলুঢুলু চোখে আকাশের দিকে তাকাত যে, মনে হওয়া সম্ভব সেখানে সে গোঁসাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

ম্যাদামারা নির্জীব লোক চিরকাল আমার অপছন্দ। গুরুদাসের এমন নুয়ে পড়া সখি-সখি ভাব দেখে আমার গা জ্বলে যেত। পুরুষ মানুষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবে, একটু সোজা চেহারার হবে। প্রাচীনকালে বাঙালী সমুদ্র পেরিয়ে নিজেদের সভ্যতাকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছিল। সে নিশ্চয় গুরুদাসের মত আলুভাতে মার্কা বাঙালী নয়।

কিন্তু গুরুদাসের চরিত্রের প্রধান গুণ, আজকাল যাকে প্লাস পয়েণ্ট বলে, তা ছিল এই; লোকটা প্রকৃতই সৎ এবং ভালমানুষ, বিনয় ওর ভড়ং নয়। ক'জন সম্বন্ধে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়? কাজেই গা জ্বলে গেলেও ওর সখি-সখি ভাব গোপনে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। নিতাই এবং গৌরাঙ্গকে বাপের অবিকল দুটি প্রতিরূপ বলা যেতে পারে। সারাদিন তারা দু'জন বোকা-বোকা হাসি-হাসি মুখ নিয়ে হয় উঠোনে বসে বাবাকে কাজে সাহায্য করছে, নয়ত সদ্য তৈরি গামারি কাঠের মিটসেফ বা বুকর‍্যাক কাঁধে করে দিকনগরের হাটে বিক্রি করতে চলেছে।

এই পরিবারের তিনটি প্রাণীর অকিঞ্চিৎকর জীবনের কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমার কেমন অবাক লাগত। বছর দুই হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি। কাজের মধ্যে বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে সকাল-বিকেল বই পড়ি। সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি জীবন দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু অনেক ভাল বই না-পড়া রয়ে গেল। গত তিন-চারদিন ধরে সেই কোন্ প্রায়-বিস্মৃত কলেজজীবনে কেনা প্লুটার্কের 'লাইভ্স্' বের করে পড়ছি। বড় বড় ইতিহাসখ্যাত মানুষের চরিত্রের মহৎ দিক-গুলির কথা পড়ে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি, আর তুলনামূলকভাবে মনে পড়ে নির্বোধ হাসিমাখা তিন বাপ-ব্যাটার মুখ। যাদের জীবনে বলবার মত কিছু ঘটে না, সবার কাছে অকারণে হাতজোড় করে কীর্তন গেয়ে প্রেমাশ্রু বিসর্জন করে যাদের সময় কাটে, তাদের জীবনধারণের সার্থকতা কি—এসব ভাবতে ভাবতে বিকেল গড়িয়ে

যায়। পুত্রবধূ বৈকালী চা দিতে আসে।

আলেকজাণ্ডার অর্ধেক পৃথিবী জয় করে ত্রিশ বছর বয়েসে অতুল কীর্তি রেখে যান, পম্পেই নগরী ডুবে যায় ভিসুভিয়াস থেকে নির্গত লাভাস্রোতের তলায়। উপনিষদ লেখা হয়, পিরামিড আকাশে মাথা তুলে ওঠে। পারমাণবিক বোমা পড়ে হিরোশিমা নাগাসাকিতে। আর এদিকে নদীতে যাবার পথের ধারে সারাদিন রাংচিতার বেড়া-ঘেরা উঠোনে গামারি কাঠের ওপর করাত চালায় গুরুদাস আর তার দুই ছেলে।

একদিন বেড়াতে যাবার পথে দেখলাম গুরুদাস মল্লিকের বাড়ির উঠোনে কিসের উৎসব হচ্ছে। বাঁশের খুঁটির মাথায় চটের ছাউনি টাঙানো, নাকে আর কপালে রসকলি আঁকা একদল মেয়ে পুরুষ তার নিচে সতরঞ্চি পেতে বসে একটা সেকেলে হারমোনিয়াম নিয়ে কীর্তন শুরু করার উদ্যোগ করছে। উঠোনের একধারে একটা বড় ইঁটের উনুনে প্রকাণ্ড লোহার কড়াইতে কিছু রান্না হচ্ছে, জনা দুই কোমরে গামছা জড়ানো লোক তার তদারকে ব্যস্ত।

আমাকে দেখতে পেয়ে গুরুদাস বেড়ার কাছে এগিয়ে এসে বলল—ভাল তো কর্তামশাই ? আসুন, আমার বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দিয়ে যান আজ—

বললাম—কি ব্যাপার ? কোনো গান-বাজনার আসর হবে নাকি ?

একটু ব্যথিত গলায় গুরুদাস বলল—বাবুর খেয়াল নেই, আজ জন্মাষ্টমী যে ! আমার বন্ধুবান্ধব ক'জন এসেছে একটু আনন্দ করবে বলে। আসুন বাবু—

তার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে সামিয়ানার তলায় গিয়ে বসলাম। ভাগ্যক্রমে আমাকে দেখে গায়কেরা ঈষৎ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ায় তখনই গান শুরু হল না। গুরুদাস তার সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, তারা সবাই মাথা নিচু করে যুক্তকরে নমস্কার জানালো আমাকে। গুরুদাসের বড় ছেলে পেতলের রেকাবিতে চারখানি গরম মালপোয়া (কড়াতে উক্ত দ্রব্যই ভাজা হচ্ছিল) নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলো। বললাম—একি ! এসব আবার কেন ?

গুরুদাস বলল—না কর্তা, কিছু নয়। আপনাকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে খাওয়াবো, সে ভাগ্য করে তো আসি নি। গোঁসাইয়ের প্রসাদ হিসেবে এটুকু মুখে দিন দয়া করে—

খুব খাতির করল গুরুদাস। আমি চলে আসবার সময় পুরো দলটা দাঁড়িয়ে উঠে আবার আমাকে নমস্কার জানালো। সবই ভাল, কিন্তু ওই যে বললাম, ম্যাদামারা মেয়েলি বিনয় আমার একেবারে সহ্য হয় না। নইলে এমনিতে গুরুদাস মানুষ ভাল তাতে সন্দেহ নেই।

কয়েকমাস কেটে গেল। অঘ্রাণের মাঝামাঝি শীত পড়ে গেল বেশ। আজকাল আর রোজ নদীর ধারে যাই না। কিছুটা ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে, আর কিছুটা অন্য উপদ্রবের আশঙ্কায়। ইদানীং আমাদের শহরে সন্ধ্যের পরে ছিচঁকে রাহাজানি বেড়েছে। প্রায়ই খবর পাওয়া যায় কোথায় কার ব্যাগ আর ঘড়ি ছিনতাই হয়ে গিয়েছে, বা বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে কার বৌয়ের গলার হার টান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। একে শীতকাল তাতে এইসব সংবাদে সন্ধ্যের পর পথে লোকজনের চলাচল বেশ কমে এল।

একদিন বিকেলে মনোযোগের সঙ্গে বসে নবীন সেনের আত্মজীবনী পড়-

ছিলাম। ক্রমে অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে এল। চোখ তুলে দেখলাম আলো কমে এসেছে। টানা অনেকদিন বাড়িতে বসে কেবল বই পড়ে চলেছি, ভাবলাম—যাই, আজ একটু নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি। সন্ধ্যের পর পরই ফিরে আসবো এখন।

একটা জামা গায়ে চাপিয়ে ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়লাম। কাঁধে একটা হাল্কা চাদর নিয়েছি, ভাবি, গরম পোশাক নেবার মত জাঁকিয়ে শীত পড়ে নি এখনো।

নদীর ধারে যখন পেঁছিলাম তখন শেষ গোধূলি। তরল অন্ধকার জমে গাঢ় হতে শুরু করেছে ঝোপঝাড়ের তলায়। পশ্চিম দিগন্তের কিছু ওপরে দৈবী মশালের মত দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে শুক্রগ্রহ। বাতাসে আশ্চর্য সতেজতা, বন্য লতাপাতার কটু গন্ধ আর আসন্ন শীতের চনমনে ছোঁয়া। নির্জন নদীতীরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যেন জীবনটাকে খোলা মানচিত্রের মত সামনে বিস্তৃত দেখতে পেলাম। মধ্যবিত্ত বাঙালীর গড় আয়ু প্রায় শেষ করে এনেছি। এই আর ক'বছর, তারপর নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাবো ব্ল্যাকবোর্ড থেকে মুছে ফেলা খড়ির দাগের মত। কোথাও কোনো চিহ্ন রেখে যাবো না—বা কোনো সার্থকতা। মনে পড়ে গেল সেই আবছা শৈশব আর কৈশোরের কথা। এই নদীর ধারেই কত খেলা, ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন—সবই শেষ পর্যন্ত আকাশকুসুম রয়ে গেল। কেন তাহলে এই অকারণ আসা যাওয়া ?

নদীর মাঝখানে চরের দিক থেকে একটা হিমেল হাওয়ার ঝাপটা বয়ে এসে দার্শনিক চিন্তার স্তর থেকে আমাকে বাস্তবের ভূমিতে নামিয়ে আনলে। চমকে দেখলাম অন্ধকার ঘনতর হয়েছে এবং শুক্রগ্রহ আর আকাশে একমাত্র নক্ষত্র নয়। চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বাড়ির পথে ফিরতে শুরু করলাম।

মিনিট তিন-চার হাঁটার পরেই বুঝতে পারলাম—বিপদে পড়েছি।

সামনে, পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে সবটা রাস্তা বন্ধ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ছ'-সাতটি ছেলে। কোমরে হাত দিয়ে তারা স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকার ভেতরে একটা নিঃশব্দ ভীতিপ্রদর্শন প্রকট।

প্রথমে আমার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছিল গলার কাছে। জোর করে মনের ভয়কে দমন করবার চেষ্টা করলাম। শহর এখনও অনেক দূরে। মাইলখানেক তো হবেই। এই জনহীন পথে শীতের সন্ধ্যায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ আমাকে সাহায্য করতে আসবে না। তাছাড়া—তাছাড়া একটা ক্ষীণ আশা এখনো আছে : এরা হয়তো খারাপ ছেলে নয়, এমনি গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। মিছি-মিছিই আমি ভয় পাচ্ছি।

প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক, এভাবে পঁচিশ হাত দূরত্বে পরস্পরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকা নিতান্ত বিসদৃশ। আমি কিছুই হয় নি এমন ভাব দেখিয়ে আস্তে আস্তে এগুতে শুরু করলাম।

দূরত্ব কমে পনেরো হাত।

দশ হাত।

প্রায় মুখোমুখি হয়ে থেমে যেতে হল। কারণ কেউ পথ ছেড়ে দিল না।

ক্ষীণ আশা তখন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে। আমি মরিয়ার সাহসে সামনের ঝাঁকড়াচুল বলিষ্ঠ ছেলেটির দিকে তাকিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে পাশ কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মুগুরের মত মোটা লোমশ একটা হাত বাড়িয়ে

আমার পথ আটকাল। আমি দুর্বল গলায় বললাম—একি ! পথ ছাড়ুন—এসব কি হচ্ছে ?

ঘষা ঘষা কর্কশ গলায় ছেলেটি বলল—পকেটে যা আছে চট্‌পট্‌ বার করো দেখি—

আমার কিছুই করবার নেই। অবসরপ্রাপ্ত অম্বলে ভোগা প্রৌঢ়, সঙ্গে অস্ত্র বলতে একটা বেড়াবার ছড়ি—যা দেখে বেড়ালবাচ্চাও ভয় পাবে না। সার্টের তিন পকেট হাতড়ে মোট পাঁচ টাকা ষাট পয়সা বেরুল। ছেলেটি ধমকে বলল—আংটি।

আংটিটা সোনার। বিয়ের দানে শ্বশুরমশাই দিয়েছিলেন, স্বামী-স্ত্রীর নাম লেখা। মৃতা গৃহিণীর স্মারকচিহ্ন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুলে দিলাম।

ছেলেটি পূর্ববৎ কর্কশ গলায় বলল—ঘড়ি !

—ঘড়ি ! ঘড়ি তো নেই।

পেছন থেকে একজন আমার চুল মুঠো করে বলল—ঘড়ি নেই ইয়ার্কি হচ্ছে ? আমরা কতদিন ধরে ওয়াচ করছি জানো ? কোথায় খুলে রাখা হয়েছে ?

এদিক থেকে একটা ছেলে বলল—আমরা ধুতি খুলে সার্চ করবো দাদু !

ভয়ে আর আতঙ্কে অবরুদ্ধ গলায় বললাম—বিশ্বাস করুন, আজ সত্যিই ঘড়ি আনি নি। আপনারা—মানে আজ আপনাদের দরকার হবে জানলে নিয়ে আসতাম—

—ওসব চলবে না মাইরি, আমরা ধুতি খুলে দেখবো। এই গুড়ে, ধর তো শালাকে—

অপমানের আশঙ্কায় দিশাহারা হয়ে বেড়াবার ছড়ি দিয়েই সামনের ছেলেটাকে এক ঘা বসাবো ঠিক করে ফেলেছি, এমন সময় খুব কাছে থেকে কে যেন নরম, বিনীত গলায় বলে উঠল—ছিঃ বাবারা ! কি করছেন ? ছেড়ে দেন ওঁকে—

ছেলেদের পুরো দলটাই বক্তার আশ্চর্য স্পর্ধায় থমকে গিয়ে ফিরে তাকালো।

পথের ধারে ঝোপের ফাঁক দিয়ে উঠে এসেছে গুরুদাস মল্লিক আর তার দুই ছেলে।

আমার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে গুরুদাস বলল—দিকনগরের হাটে গিয়েছিলাম। দু'খানা চেয়ার আর একটা র‍্যাক বিক্রি করলাম কর্তা—মোট সত্তর টাকায়।

তারপর ছেলেগুলির দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল—যান্‌, বাড়ি যান্‌ বাবারা। এমনি কি করতে আছে ? উনি বয়স্ক লোক, ওঁকে কষ্ট দেবেন না—

গুরুদাসের গলায় কণ্ঠির মালা, ভাবে ঢুলুঢুলু চোখ। ছেলে দুটোর নির্বোধ বিস্ময়চকিত মুখ। বলিষ্ঠ ছেলেটি, খুব সম্ভব দলের পাণ্ডা, পরম বিরক্তির সঙ্গে বলল—এরা আবার কোথা থেকে এসে জুটলো ? যা ভাগ—

গুরুদাস দেখলাম অপমানে অবিচল। সে একটুও রাগ না দেখিয়ে বলল—ভেগে যাচ্ছি বাবারা, তবে কর্তামশাইকে ছেড়ে দেন—

—হ্যাঁ ছাড়ব ! ঘড়িটা কোথায় লুকিয়েছে আগে দেখি। আর তোর কাছে মালবেচা সত্তর টাকা আছে বললি না ? সেটা দে—

গুরুদাস শান্ত চোখ তুলে বলল—টাকার দরকার আপনাদের ? তাহলে কাজ করেন না কেন বাবা ? আমার কাছে আসুন না, কাঠের কাজ শিখিয়ে দেব তিন মাসে। ভাল রোজগার করতে পারবেন—

উত্তরে ষণ্ডা ছেলেটি গুরুদাসের বুকে একটা সজোরে ধাক্কা দিল, আর পেছনের ছেলেটি এসে আমার ধুতি ধরে মারলো টান।

তার পরের মিনিটখানেকের ঘটনা আমি ঠিকঠাক বর্ণনা করতে পারব না। আমার বিস্ময়বিহ্বল চোখের সামনে গুরুদাসের বিনয়নম্র ঝুঁকে পড়া শরীর হঠাৎ অন্তর্নিহিত কোন্ শক্তির প্রেরণায় সটান ঋজু হয়ে উঠল। তার দুই ছেলে চিতা-বাঘের ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল গুণ্ডার দলের মাঝখানে। গুণ্ডারা অন্ধের মত হাত-পা চালিয়ে একটা যুদ্ধের ভাণ করলো বটে, কিন্তু চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড পরে দেখি দলের সর্দার রাস্তার ওপর পড়ে আছে, অন্য সকলে কোথা দিয়ে পালিয়েছে কে জানে?

অজ্ঞান হয়ে থাকা ছেলেটার ওপর ঝুঁকে পড়ে কি দেখে গুরুদাস বলল—যা নিতাই, দৌড়ে ঘর থেকে আধকলসী জল নিয়ে আয় তো। এত করে বারণ করলাম—তাও শোনে না। এদিকে শরীরে নেই ক্ষমতা—

বেশ কিছুক্ষণ জল ছিটোবার পর ছেলেটা হাতে ভর দিয়ে উঠে বসে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। তার পিঠে হাত বুলিয়ে গুরুদাস বলল দুষ্টুমি করতে নেই বাবা, ছিঃ। তখন বারণ করলাম, আমার কথা শুনলেই পারতে। সৎপথে থেকে ইচ্ছে করলে রোজগার করা যায়। খুব লেগেছে কি? দেখি হাতটা সোজা করুন—

ছেলেটা ঝট্‌কা দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর মাতালের মত টলতে টলতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল!

সেদিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে গুরুদাস বলল—চলুন কর্তা, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই—

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। বললাম—গুরুদাস ভাই, আমাকে একটু জল খাওয়াবে? বড্ড তেষ্টা পেয়েছে—

গুরুদাস ব্যস্ত হয়ে বলল—জল খাবেন? আসুন, আমার বাড়ি আসুন! ওরে গৌরাঙ্গ, দৌড়ে এগিয়ে গিয়ে উঠোনে কিছু পেতে ফেল্ বাবা; চলুন কর্তা—

উঠোনে পাতা নতুন একটা চেয়ারে বসে পর পর দু'গ্লাস জল খেয়ে ফেললাম। সঙ্গে দুটো বাতাসাও দিয়েছিল গুরুদাস। বললাম—তুমি না থাকলে আজ আমার যে কি অবস্থা হত। ওদের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে রাখলে—ওরা তোমার কোনো ক্ষতি করবে না তো?

গুরুদাস সামান্য হাসল, বলল—না কর্তা, ক্ষতি আর কি করবে? আপনার আশীর্বাদে আমাদের তিন বাপ-ব্যাটাকে কাবু করা সোজা কথা নয়—

—এমন লড়াই শিখলে কোথা থেকে। চর্চা ক'রতে নাকি?

—আমার বাবা ছোটবেলায় শিখিয়েছিলেন। তিনিও ছিলেন কৃষ্ণভক্ত, শান্ত মানুষ। কিন্তু বলতেন—শরীরটা সবল রাখতে হয়, আর দু'একটা প্যাঁচ শিখে রাখতে হয়! সামনে অত্যাচার হচ্ছে দেখলে চুপ করে থাকতে নেই। নিতাই আর গৌরাঙ্গকে আমি নিজের হাতে তালিম দিয়েছি কর্তা। গর্ব করতে নেই, তবু আপনি বলে বলছি—ওদের দেখে কিছু বুঝতে পারবেন না। ওরা খালি হাতে পৌনে এক ইঞ্চি মোটা লোহার শিক বাঁকিয়ে দিতে পারে—

গুরুদাসের দুই ছেলের দিকে তাকালাম। তারা শান্ত বড় বড় চোখে আমার

দিকে তাকিয়ে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ি ফিরে জামা খুলে আলনায় রেখে ঘরেতেই চোখে পড়ল তাকে রাখা 'প্লুটার্কের লাইভ্‌স্‌'-এর দিকে। মনে মনে হাসলাম। আর আমার ভুল হবে না। আজ সন্ধ্যেবেলা আধঘণ্টায় আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পরিবর্তিত হয়েছে।

আলেকজাণ্ডার আজ ইতিহাসের পাতায় একটা নামমাত্র। ফারাও খুফুর পিরামিড মৃত অতীতের সাক্ষ্য বহন করে রোদে-জলে ক্ষয়ে আসছে। পারমাণবিক বোমা তার বীভৎস ধ্বংসকারী শক্তি নিয়ে মানুষের ঘৃণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু এইসব উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে যুগে যুগে নদীতে যাবার নির্জন পথের ধারে বাড়ির উঠোনে গামারি কাঠের ওপর করাত চালাচ্ছে গুরুদাস মল্লিক আর তার দুই ছেলে। শান্ত সারল্যের মধ্যে দিয়ে ওরা অর্জন করছে পার্থিব অমরত্ব।

আইনের ফাঁদে

সরকারী জিপটা এসে থামল চৌমাথার মোড়ে।

প্রভিন্সিয়াল ট্রাঙ্ক রোড। নিতান্তই সরু রাস্তা, গর্ত আর খানাখন্দে ভর্তি। নেহাৎ জিপ তাই আসতে পেরেছে, অন্য গাড়ি হলে অ্যাক্সল ভেঙে মাঠের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকত।

জিপ থেকে নামল চারজন লোক। তারা এগিয়ে গেল পণ্ডুর চায়ের দোকানের দিকে। কানে পোড়া বিড়ি গুঁজে সবুজ লুঙ্গি পরা পণ্ডু খট্‌খট্‌ শব্দে চামচ দিয়ে চায়ের চিনি নাড়ছিল। সম্ভাবিত চারজন সুবেশ ভদ্রলোক খরিদ্দার দেখে—এবং গাড়িটা যে সরকারী তক্‌মা লাগানো গাড়ি সেটা খেয়াল করে—বিনয়ে গলে গিয়ে কাঁধের গামছা দিয়ে বেঞ্চিটা মুছে ডাকল—আসুন বাবু, বসুন এইখেনটায়। ও চরণ, এদিক আয় না বাবা, দেখ বাবুরা কি নেবেন—

চারজন লোকই বসল বেঞ্চিতে। পণ্ডু বলল—চায়ের সঙ্গে আর কি দেব বাবু? ভাল কেক আছে, আনারকলি বিস্কুট আছে—

চৌখুপি নক্সা কাটা জামা গায়ে লোকটা বলল—আর কিছু না, শুধু চা। ভাল চা হবে তো?

—নিজের কথা নিজের মুখে আর কি বলবো বাবু? তবে আপনাদের বাপ-মায়ের আশীর্বাদে দিনে সাত-আট কিলো দুধ লাগে দোকানে। খেয়েই দেখুন—

উনুনে সস্‌প্যান চাপিয়ে চায়ের দুধ ফোটাচ্ছে বারো কি তেরো বছর বয়সের একটা ছেলে। পরনে হাফপ্যাণ্ট আর গোলাপী রঙের গেঞ্জি। দুধ ফুটতে দিয়ে টেবিলের ওপর একটুকরো আদা রেখে কাঁচের গ্লাসের উল্টোদিক দিয়ে ছেঁচে নিচ্ছে দ্রুত হাতে।

পণ্ডুর দোকানে খদ্দের সবই প্রায় দুবরাজপুর, সিউড়ি বা ইসলামবাজার-মুখো মালভর্তি ট্রাকের ড্রাইভার। তারা গাড়ি থামিয়ে ঝুপ করে লাফিয়ে নামে। ওদিকে চারপাইগুলোর কোনো একটাতে গা এলিয়ে দেয়। তারপর কর্কশ গলায় হাঁক দেয়—দেড়শো কিলোমিটার চা বানারে খোকা—

অর্থাৎ এমন চা যা খেলে দেড়শো কিলোমিটার ফুর্তিতে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়।

সঙ্গে তারা চারখানা কাঁচা লঙ্কার কুচি দিয়ে বানানো ডবল ডিমের ওমলেট খায়। শুধু এই নয়, সন্ধ্যের পর এদের খুশি করবার জন্য ঝাঁপের বেড়া দিয়ে আলাদা করে পেছনের ঘরে চায়ের চেয়ে উত্তেজক পানীয়েরও বন্দোবস্ত আছে। পয়সা নগদ গুনে নেয় বটে পঞ্চু, কিন্তু পথের ধারের আর সব দোকানদারদের মত জল মিশিয়ে খদ্দের ঠকায় না। অনুপান হিসেবে সঙ্গে থাকে গরম গরম বেসনের ফুলুরি আর ঝালবড়া। তবে পাকা লোকেরা এসবের তোয়াক্কা রাখে না, নুন আর কাঁচালঙ্কা চিবিয়ে বড় এক'গ্লাস মেরে দেয়। কাজ করতে করতে চরণের হাত পাকা হয়ে গিয়েছে, সে আজকাল তার জড়িয়ে বাঁধা গালার সীল খুলে বোতল থেকে নিখুঁত হিসেবে পানীয় ঢেলে দেয়। সন্ধ্যের পর কোনো কোনো খদ্দের ট্রাক থেকে নেমেই সুট্ করে বেড়ার আড়ালে চলে যায়। ইদানীং স্থানীয় লোকজনও আসতে শুরু করেছে আশেপাশের গ্রাম থেকে। আড়চোখে তাদের দেখে নিয়ে পঞ্চু হাঁক ছাড়ে—বাবা চরণ, একবার ভেতরে যা তো বাবা! খদ্দের এয়েচে—

মাইনে খুব বেশি পায় না চরণ -মাত্র গোটা তিরিশেক টাকা। সেটা মাস পয়লা চরণের বাবা এসে নিয়ে যায়। চরণ নিজে বাড়ি যায় কম, রাত্তিরে দোকানেই চারপাই পেতে শুয়ে থাকে। বিশেষ করে শীতকালে সদ্য-নিভানো উনুনের পাশে ঘুমোতে যে কি আরাম!

সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর ওই সময়টুকু হচ্ছে চরণের স্বপ্ন দেখার সময়। চরণের শৈশব রূঢ় বাস্তবের স্পর্শে কর্কশ সেখানে খেলনা ছাড়া নরম অনুভূতি মায়ের মমতা ইত্যাদির স্থান নেই। ফলে তার স্বপ্নও তেরো বছরের ছেলের পক্ষে নিতান্ত বাস্তবমুখী। চরণের স্বপ্নঃ পঞ্চুর দোকানের মত একটি চা এবং ইয়ের দোকান। তবে আরো ভাল, সুন্দর করে গোছানো। বেঞ্চির বদলে চেয়ার, টেবিলের গোলাপ ফুলের নক্সা আঁকা সানমাইকা। চার-পাঁচজন লোক খাটছে।

হবে। একদিন নিশ্চয়ই হবে। কেউ জানে না, সরকার ফার্মেসী থেকে চেয়ে আনা এন্টেরোকুইনলের ছোট্ট টিনের কৌটোতে সে প্রায় সাঁইত্রিশ টাকা জমিয়ে ফেলেছে। নেশার ঝোঁকে দিলদরিয়া হয়ে খদ্দেররা মাঝে মাঝে চার আনা আট আনা বখশিস দেয়। সেই তিল কুড়িয়ে তাল।

চা তৈরি হয়ে এলো। এক একহাতে দু'খানা করে গেলাস ধরে আনল চরণ। খোপকাটা জামা গায়ে বাবুটি চা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার নাম চরণ?

ভেজা হাত প্যান্টের পেছনে মুছতে মুছতে চরণ বলল—হ্যাঁ।

—চরণ কি? উপাধি?

—মল্লিক।

—পড়াশুনো কর না কেন? তোমার বাবা কি করেন?

চরণ একটু ঘাবড়ে গেল। খদ্দেররা সাধারণত এরকম কথা বলে না। তারা কেউ নাম জিজ্ঞাসা করে, কেউ বাড়িতে কে কে আছে জানতে চায়, দু'-একজন রসিক মানুষ হেসে জানতে চায়—এই খোকা, তোর প্যান্টের ছেঁড়ার ফাঁক দিয়ে ওটা কি দেখা যাচ্ছে রে? ইঁদুর নাকি? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

কিন্তু লেখাপড়ার কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে না। একটু ঘাবড়ে গিয়ে চরণ বলল—পড়াশুনো হয়ে গিয়েছে—

লোকটা অবাক হয়ে বলল—হয়ে গিয়েছে মানে?

—আমি ক্লাস থ্রি অবধি পড়েছি—

—তারপর?

—তারপর এখানে কাজ করি। চার বছর হল।

—কেন? আর পড়ো নি কেন?

পঞ্চু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—কি হয়েছে বাবু? আমাকে বলুন। কিছু জিজ্ঞাসা করছিলেন ওকে?

—এই ছেলেটি পড়াশুনো করে না কেন?

পঞ্চু হেসে বলল—কি করে করবে বাবু? ওর বাপ অকর্মা। নেশা করে, জুয়া খেলে আর মাসপয়লা আমার কাছে এসে ছেলের মাইনে নিয়ে যায়। পড়াশুনোর খরচ দেবে কে?

ওপাশে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক বললেন—আপনি এই দোকানের মালিক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কেন বাবু?

—বসুন এখানে। আপনার সঙ্গে কথা আছে।

পঞ্চুর মনের ভেতরে অস্পষ্ট একটা বিপদের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। এই লোকগুলো কারা? কি চায়? সরকারী গাড়ি করে এসেছে, সাবধানে থাকাই ভাল।

ভদ্রলোক বললেন,—আমি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী। আর এরা তিনজন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোক, শ্রম দপ্তর আর যুব কল্যাণ বিভাগে কাজ করেন। এই যে চরণ বলে ছেলেটা আপনার দোকানে কাজ করছে এর বয়েস তো তেরো-চোদ্দর বেশি হবে বলে মনে হচ্ছে না। এই বয়েসের কোনো ছেলেকে মাইনের বিনিময়ে খাটানো যে অন্যায় তা আপনি জানেন? এর তো এখন স্কুলে পড়া উচিত—

এরকম কোনো আইন আছে কিনা পঞ্চু জানে না, কিন্তু সে সাবধানী লোক, সরকারী অফিসারদের সঙ্গে ঝামেলার মধ্যে যেতে চায় নাঃ সে বলল—কিন্তু বাবু, আমি তো ওকে জোর করে খাটাচ্ছি না, ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন—

—জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। বাচ্চাদের দিয়ে কাজ করানোর ব্যাপারে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ভয়ানক কড়া মনোভাব গ্রহণ করেছেন। আপনি বরং—অবশ্য আপনি ইংরেজি পত্রিকা পড়তে পারবেন কিনা জানি না—তাহলে গত সংখ্যা ইলাস্ট্রেটেড্ উইক্লি পড়ে দেখতে পারতেন, তাতে মধ্যপ্রদেশের শিশুদের বণ্ডেড লেবার সম্বন্ধে বিরাট আর্টিকল বেরিয়েছে।

পঞ্চু হাতজোড় করে বলল—আমার কোনো দোষ নেই, আমার ওপর রাগ করবেন না। চরণের সৎমা ওকে দেখতে পারে না, খেতে দেয় না, ধরে ধরে ঠ্যাঙায়—তাই একদিন চরণের বাবা ছেলের হাত ধরে আমার কাছে দিয়ে গেল। চরণ এখানে মাইনেও পায়, পেটভরে খেতেও পায়।

—সে যাই হোক, এটা অমানবিক—অন্যায়। আমি অফিসের প্যাডে একটা চিঠি লিখে দিয়ে যাচ্ছি, সেটা দেখালে এখানকার স্কুলে চরণকে আবার ভর্তি করে নেবে। আর আপনাদের একটা ভুল ধারণা আছে, স্কুলে পড়তে আজকাল টাকা লাগে না—কাজেই সে চিন্তা নেই।

ভদ্রলোক হাতের অ্যাটাচিকেস খুলে অশোকস্তম্ভের ছাপমারা প্যাড বের করলেন। খচ্‌খচ্‌ করে দু'কলম কি লিখে পঞ্চুর হাতে দিয়ে বললেন— নিন।

তারপর সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন—এইসব পেটি বিজনেসে চিপ্‌ লেবারের লোভ ছাড়া খুব মুস্কিল, বুঝলেন? কিন্তু উই মাস্ট সীক্‌-আউট দিজ হোপলেস সোলস্‌ অ্যান্ড সেভ দেম—

তারা যাবার সময় পঞ্চু চায়ের পয়সা নিতে চাইল না। কিন্তু মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক রীতিমত কঠোর।—না, তা হবে না। চায়ের দাম নেবেন না কেন? এটা আপনার বাড়ি নয়, এটা ব্যবসা—

ঝামেলা না বাড়িয়ে পঞ্চু হিসেব করে পয়সা নিল। লোকগুলো গাড়িতে উঠে চলে গেল মহকুমা শহরের দিকে।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে পঞ্চু ডাকল—চরণ!

—আজ্ঞে!

—এদিকে আয়।

চরণ এসে দাঁড়াতে তার হাতে সরকারী ছাপমারা কাগজখানা ধরিয়ে দিয়ে বলল—যাও বাবা, ইস্কুলে ভর্তি হওগে যাও—

চরণ ঘাড় বাঁকা করে দাঁড়িয়ে বলল—আমি ইস্কুল যাবো না।

পঞ্চু রেগে বলল—ভর্তি হবি না মানে? তোকে রেখে কে ঝামেলায় পড়বে? এই বাবুরা যদি কাল আবার এসে দেখে—না না, তুই সরে পড়্‌। এই নে চিঠি, ইস্কুলে ভর্তি হ' গে যা—

পঞ্চুর ব্যবসায় সরকারী লোকেদের চটানো চলে না। শত্রুর অভাব নেই দুনিয়াতে। কে কোথা দিয়ে লাগিয়ে দেবে, এবার হয়ত বাবুরা পুলিশ নিয়ে আসবে। ঝাঁপের ওধারে কাঠের প্যাকিং বাক্সে সারি সারি দেশী মদের বোতল। কোথায় বা পারমিট, কোথায় বা লাইসেন্স! সর্বনাশের মাথায় পা!

—না রে চরণ, রাগ করিস না আমার ওপর। আমি রাখতে পারবো না তোকে। তোর পড়াশুনা করাই ভাল।

ভাঁজ করা কাগজখানা হাতে চরণ কাজ থেকে মুক্তি পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। পঞ্চু ভাল লোক। হিসেব করে এ মাসে তার পাওনা পনেরো টাকা দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এত ছুটি দিয়ে চরণ এখন করে কি?

বাড়ির সামনে বসে অভয় মল্লিক বিড়ি খেতে খেতে শূন্যদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘরের ভেতরে দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেমেয়েদের চিৎকার এবং কান্নাকাটি শোনা যাচ্ছে। সঙ্গে তীক্ষ্ণ গলায় বৌয়ের তর্জন-গর্জন। প্রত্যেকদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই অভয়ের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। কারণ সকাল হওয়া মানেই আরও একটা দিন কি করে চলবে সেই দুর্ভাবনা।

হঠাৎ দূরে ও কে? চরণ না? চরণ এখানে কি করছে?

—ছেলে এসে দাঁড়াল বাপের কাছে। হাতে তার সরকারী চিঠি।

কি রে? এ সময় এলি যে? ছুটি নিলি বুঝি?

চরণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাল্‌কা বাতাসে ঝিরঝির করছে উঠোনের নিমগাছের পাতা। শালিকপাখি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে ঘাসের দানা। চরণের আজ কোনো কাজ নেই।

অভয় উঠে দাঁড়িয়েছে শঙ্কায়।—চলে এলি কেন বল!

—আমি ইস্কুলে ভর্তি হব। আর কাজ করব না—

অভয় আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকে। রাগের চাইতে বিস্ময় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বেশি করে।

—কাজ করবি না? তোকে খেতে দেবে কে?

এর উত্তরে একজন তেরো বছরের ছেলে সবচেয়ে স্বাভাবিক যে কথাটা বলতে পারত সেটা চরণের মুখে আটকে যায়। সে কথা বলে কোনো লাভ নেই। এখানে সে কোথায় থাকবে? এ সংসারে সে বাইরের লোক।

সে বলল—আমি কাজ ছাড়তে চাই নি, সরকারী বাবুরা মালিককে ভয় দেখিয়েছে। ইস্কুলে ভর্তি হবার জন্য এই চিঠি দিয়েছে—

অভয় নিরক্ষর। চিঠি দেখে সে কি করবে? ছেলের নড়া ধরে সে হাজির হল পঞ্চুর কাছে।

পঞ্চু নির্বিকার। চরণের বাপ আসবে সে জানত। উত্তর তার তৈরি করাই আছে।

- কি করবো বলো? তোমার ছেলে কাজ তো ভালই করে। কিন্তু কি নাকি সরকারী আইন হয়েছে, সব ছেলেকে ইস্কুলে পড়তে হবে। তাদের দিয়ে কাজ করানো চলবে না। তা, সে তো ভালই। দাও না ছেলেকে ইস্কুলে ভর্তি করে। লেখাপড়া শিখে এলে তোমার দুঃখু ঘুচবে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে—আমার ওপর রাগ কোরো না অভয়। আমি তোমার ছেলেকে তাড়িয়ে দিই নি—

এ বছর বর্ষা হয়েছে খুব ভাল। গাছপালার পাতা থেকে ধুলো মাটি ধুয়ে গিয়ে সবুজ পান্নার মত রঙ্ ঝক্‌মক্ করছে। অলস দুপুরবেলা পাখি ডাকে নদীর ধারে বাঁশের বনে। চরণ ঘুরে বেড়ায় পথে পথে। ইস্কুলে তাকে নেয় নি, এখন নাকি ভর্তি হবার সময় নয়। তাছাড়া মাইনে না লাগলেও লাইব্রেরী, পাখা, খেলাধুলো এসবের জন্য মাসে কত টাকা করে নাকি দিতে হবে। তারপর বইপত্র, খাতা-পেনসিল। নাঃ, সে-সব চরণের জন্য নয়।

চরণের কাজ নেই, কিন্তু খিদে আছে। পঞ্চু গতকাল একটা পাঁউরুটি আর আধ গ্লাস দুধজল দিয়েছিল। আজ? রোজ রোজ তো ভিক্ষে চলে না।

চারদিন পর সরকারী গাড়ি করে বাবুরা আবার এল পঞ্চুর দোকানে। তারা মহকুমা শহরের কাজ সেরে ফিরে যাচ্ছে সদর দপ্তরে। আজ আর চরণ নয়, বুড়োমত একজন লোক চা বানাচ্ছে—সেদিকে তাকিয়ে শিক্ষা দপ্তরের বাবু বললেন—তোমার সেই বাচ্চা ছেলেটা আর নেই তো?

—না বাবু। তাকে সেদিনই ছেড়ে দিয়েছি।

—সে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে?

এ খবরটা অবশ্য পঞ্চু জানে না। কিন্তু সে জোরের সংগে উত্তর দিল—হ্যাঁ, পরের দিন থেকেই তো—

ভদ্রলোক তৃপ্তির হাসি হেসে সঙ্গীদের বললেন—ওয়ান মোর সোল সেভ্‌ড্—

প্রথম ঢিলটা ফস্‌কে গেল। পরেরটা সজোরে এসে লাগল ভদ্রলোকের রগে।

কপালে হাতচাপা দিয়ে তিনি বসে পড়লেন বেঞ্চিতে। এলোমেলো আরো কয়েকটা ইঁটের টুকরো এসে পড়ল দোকানে। রক্তে শিক্ষা দপ্তরের অফিসারের জামার সামনেটা ভিজে গিয়েছে।

চরণ পালাতে পারে নি। সরকারী গাড়ির ড্রাইভার তাকে ধরেছে চেপে। চিৎকার করে গালিগালাজ করছে চরণ।

লোকজন ছুটে এসে চরণের হাত বাঁধল দড়ি দিয়ে। সে একটা কথাও বলল না। একজন অফিসার বললেন—চলো থানায় তোমাকে রিফর্মেটরি স্কুলে দেওয়া হবে। চরণ একটা কথাও বলল না। কেবল হাত বেঁধে গাড়িতে তোলবার সময় ভিড়ের মধ্যে অভয়কে দেখে সে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল—বাবা!

অভয় মল্লিক বলল—দূর হ! তুই দূর হয়ে যা।

আলোকবর্ষ

স্বয়ংক্রিয় ঘুম-ভাঙানো যন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের 'জাগো আলসশয়নবিলগ্ন' শুনে জেগে উঠলেন কনিষ্ক দেশাই। ঘুমের গভীরতা থেকে চেতনার জাগ্রত স্তরে ভেসে উঠতে উঠতে অনুভব করলেন, নিয়মমাফিক ছ'ঘণ্টা ঘুম শেষ হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপরে ঘুম আনবার হিপ্‌নো-ড্রিমার যন্ত্রের গুন্‌ গুন্‌ আওয়াজ থেমে আসছে। ঘুমোবার আগে একটা সুন্দর স্বপ্ন প্রোগ্রামিং করে হিপ্‌নো-ড্রিমারের চৌম্বক-স্মৃতিতে ভরে দিয়েছিলেন দেশাই। স্বপ্নটা শরীর আর মনকে শান্ত ও তাজা করে দিয়েছে। মৃদু তৃপ্তিতে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসে শোবার এয়ার-কুশনের পাশে রাখা আন্তঃসংযোগ প্যানেলের একটা বোতাম টিপলেন দেশাই, ডিস্‌প্লে বোর্ডে সবুজ আলো জ্বলে উঠল।

—পরিব্রাজক-১ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, কর্তব্যে মার্ক রস্‌।

—কনিষ্ক দেশাই বলছি।

—বলুন ক্যাপ্‌টেন। ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

—খুব ভাল, ধন্যবাদ। ছোটবেলার স্মৃতি নিয়ে একটা স্বপ্ন প্রোগ্রাম করে-ছিলাম, সেটা কাজে এসেছে। ওদিকে সব ঠিক তো? আমি তৈরি হয়ে আসছি—

—তাড়াহুড়োর কিছু নেই স্যার, আমার এখন ঘুমোতে না গেলেও চলবে। হ্যাঁ, এদিকে সব ঠিক। কেবল একটা ব্যাপার—

দেশাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে? কি ব্যাপার?

—এমন কিছু না স্যার। গ্যালাক্‌টিক রিসিভারের অডিব্‌ল্‌ ওয়েভলেংথে গত কয়েক ঘণ্টা ধরে মাঝে মাঝে একটা শব্দ ধরা পড়ছে—এখানে তো অমন হবার কথা নয়—

—আচ্ছা, আমি আসছি এক্ষুনি।

—আসুন স্যার।

কুশন থেকে নেমে দেশাই জামাকাপড় ছেড়ে আলট্রাসোনিক ধৌতিযন্ত্রের দিকে এগুলেন। গভীর মহাকাশে জল ব্যবহার করার বিলাসিতা কল্পনাও করা যায় না। স্নান, হাত-মুখ ধোওয়া, কাপড় কাচা—সবই এই যন্ত্রের আলট্রাসোনিক

শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে সারতে হয়। রেগুলেটর অন্তিম ঘর অবধি ঠেলে দিয়ে সছিদ্র উৎসমুখের নিচে দাঁড়ালেন দেশাই। আঃ! শরীরের প্রতি লোমকূপের গোড়া থেকে গ্লানি দূর হয়ে ঝরঝরে তৃপ্তিতে মন ভরে যাচ্ছে। পৃথিবীতে নিজের ফ্ল্যাটের বাথরুমে জল দিয়ে স্নান করার সঙ্গে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। তবু প্রত্যেকদিনই স্নানের সময় দেশাইয়ের মনে হয় একটু সত্যিকারের জল পেলে হত। পৃথিবীর মানুষের স্বাভাবিক ভূকেন্দ্রিক দুর্বলতা আর কি!

হাল্কা ছাইরঙা ইউনিফর্ম পরে নিলেন কনিষ্ক দেশাই। শার্টের বুকের কাছে আগুনরঙা মনোগ্রাম—অধিনায়কঃ পরিব্রাজক-১। দেয়ালে আঁটা ড্রেসারের খোপ থেকে সৌর-বিশ্ব সময়ের হাতঘড়িটা বের করে পরতে পরতে নজরে পড়ল ড্রেসারের ওপরে রাখা দ্বাবিংশ শতাব্দীর মহামানব সায়ন্তনদেবের বাঁধানো ছবিটার ওপর। এই মহাকাশযানের প্রতি কক্ষে সায়ন্তনদেবের একটি করে ছবি রয়েছে। থাকবেই তো, থাকবারই তো কথা। সমস্ত পশ্চিমী সভ্যতা চার-পাঁচশো বছরের জীবনচর্যায় যা সার্থক করতে পারে নি, ইনি তা করেছিলেন। এঁর চিন্তার প্রভাবেই দ্বাবিংশ শতকের মাঝামাঝি সমগ্র পৃথিবীতে মুছে যায় রাজনৈতিক সীমারেখা, মুছে যায় সাদা-কালোর ভেদ। আজ যে পৃথিবীতে কেবল একটি মাত্র রাষ্ট্র, একটি জাতি—মানুষজাতি, সে সায়ন্তনদেবেরই অলৌকিক ব্যক্তিত্বের ফলে।

রামধনু রঙের ঝিনুকের খোলা দিয়ে বাঁধানো ত্রিমাত্রিক ছবির ভেতর থেকে সেই আশ্চর্য দীপ্ত চোখে সায়ন্তনদেব তাকিয়ে আছেন।

প্রবাদে পরিণত ছবির এই মানুষটি। যীশু, বুদ্ধ, মোজেসের সঙ্গে মানুষ একাসনে এঁকে বসিয়েছে। সে কোনো শিশুকে অবশ্যপাঠ্য হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে সায়ন্তনদেবের বক্তৃতাগুলি পড়তে হয়—'জাগো মানুষ, মনের ভেতরে তাকিয়ে দেখ—সেখানে জাতি নেই, বর্ণের বিদ্বেষ নেই, ধনীর শোষণ নেই, স্বাভাবিক পৃথিবীর মানবকৃত খণ্ডিতকরণ নেই। পৃথিবীতে আছে শুধু মানুষ-জাতি, আর পৃথিবী রয়েছে সবাইকে ধরে—তাতে সকলেরই বাধাহীন উত্তরাধিকার।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে হেঁটে চললেন দেশাই। বাঁদিকে হিমায়ন কক্ষ, সেখানে এই অভিযানের ষোলোজন বিজ্ঞানীকে ক্রায়োজেনিক্সের কৌশলে অনির্দিষ্টকালের জন্য হিমায়িত করে রাখা হয়েছে। প্রয়োজনমত তাদের জাগিয়ে নেওয়া যাবে। ডানদিকে আরোগ্যসদন, সামান্য অসুখ থেকে শুরু করে কঠিনতম শল্যচিকিৎসার ব্যবস্থাও সেখানে রয়েছে। কিন্তু চিকিৎসক ঘুমিয়ে আছেন হিমায়ন-কক্ষে। চিকিৎসা করার প্রয়োজন হলে তাঁকে জাগাতে হবে। দু'জনই একসঙ্গে অসুস্থ বা আহত হয়ে পড়লেও চিন্তা নেই। পরিব্রাজক-১ এর সব মহাকাশচারীর ওপর দিনরাত অতন্দ্র নজর রাখছে বায়ো-স্ক্যানার। কারো শরীরে কোনো গোলমাল দেখা দিলে এবং একটা অনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার প্রতিকার না হলে বায়ো-স্ক্যানার নিজেই চিকিৎসককে জাগিয়ে দেবে।

বিনোদন-কক্ষ পার হয়ে সামনে বীক্ষণাগার। প্লেক্সিগ্লাসের বিশাল জানালার সামনে সারি সারি গদী-আঁটা আরামকেদারা পাতা। প্রত্যেক আসনের সামনে একটি করে ছোট কিন্তু শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

বীক্ষণাগার পার হয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ঢুকলেন কনিষ্ক দেশাই। মাথা থেকে হেডফোন খুলে নামিয়ে রেখে মার্ক রস্ বলল—সুপ্রভাত, ক্যাপ্টেন।

দেশাই হেসে বললেন—শুভরাত্রি। তোমার ভাল ঘুম হোক।

এটা মহাকাশচারীদের মধ্যে একটা চালু রসিকতা। মহাকাশে দিনও নেই, রাতও না। কেউ ঘুমিয়ে এসে কাজে বসলে তাকে সুপ্রভাত জানানো হয়, যে ঘুমোতে চলল তাকে জানানো হয় শুভরাত্রি।

—স্যার, আপনাকে যে কথা বলছিলাম, রিসিভারে একটা অদ্ভুত সংকেত আসছে।

—কত সাইকেলে?

—সেটাই আশ্চর্য স্যার, আসছে কানে শোনা যায় এমন তরঙ্গে। এই পজিশানে তো কস্‌মিক ওয়েভ বা নিউট্রিনো প্রবাহ ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ার কথা নয়—

—হুঁ, দেখি, পাওয়ার ইনপুট চালু করো—

দু'জনে দুটো হেডফোন লাগালেন। যন্ত্রে শক্তি প্রবাহিত হতেই ইয়ারপীসে একটানা রেডিও স্ট্যাটিকের আওয়াজ শোনা গেল। বিশ্বের সর্বত্রই এই স্ট্যাটিকের শোঁ-ও-ও শব্দ শোনা যায়। দেশাই হাত উল্‌টে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করলেন—কোথায় কি?

হাতের ইঙ্গিতেই মার্ক রস্‌ বলল—অপেক্ষা করুন।

হঠাৎ দেশাইয়ের কানে একঘেয়ে স্ট্যাটিকের শব্দ সামান্য বদলে গিয়ে একমুহূর্তের জন্য যেন জড়িতস্বরে উচ্চারিত কয়েকটা কথা ভেসে উঠল। তারপরই আবার স্ট্যাটিক।

মার্ক রস্‌ তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। দেশাই মাথা হেলিয়ে জানালেন—শুনেছি।

একটু পরেই আবার সেই শব্দ। এবার দেশাই তৈরি ছিলেন বলে আগের চেয়ে ভাল করে শুনতে পেলেন। তারপরেই তাঁর বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল।

মার্ক রস্‌ ছেলেমানুষ, নব্বই বছর বয়েসের তরুণ বিজ্ঞানী, বেচারা বুঝতে পারে নি ব্যাপারটার গুরুত্ব। এসব কারণেই অভিযানে প্রবীণদের প্রয়োজন হয়।

শব্দগুলি দেশাইয়ের কানে মানুষের গলার মত শোনাল।

কি ভাষা তা বোঝা যাচ্ছে না, কি বলা হচ্ছে তাও না। কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে শব্দটা মহাজাগতিক তরঙ্গের সংঘাতজনিত অর্থহীন কম্পন নয়।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব! ঠিক এইমুহূর্তে তাঁদের অবস্থান পৃথিবী থেকে প্রায় একশো আলোকবর্ষ দূরে। পৃথিবীর কণ্ঠ এখানে শোনা অসম্ভব।

অন্য কোনো নাক্ষত্রিক জগতের জীবের কণ্ঠস্বর নয় তো?

সম্ভাবনাটা মনে আসতেই শরীরে আবার বিদ্যুচ্চমকের মত উত্তেজনার প্রবাহ খেলে গেল। আজ পর্যন্ত বিশ্বের বহু অঞ্চল বর্তমানের উন্নত বিজ্ঞান দিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় নি। অ্যাল্‌গল নক্ষত্রের একটি গ্রহে সমুদ্রের জলে সিলেনটারেটা গোত্রের কয়েক জাতের জীব এবং ধনুরাশির একটি গ্রহজগতে আদিম কিছু উদ্ভিদ্‌ ছাড়া প্রাণের চিহ্ন পাওয়া যায় নি কোথাও। তিনি কি তাহলে প্রথম বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন? ওঃ! একজন মানুষ তার সামান্য দুশো বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে এর চেয়ে বেশি গৌরবের আর কি আশা করতে পারে?

কিন্তু আনন্দের প্রথম আবর্ত শান্ত হয়ে এলে দেশাইয়ের যুক্তিশীল মনের

কোণে একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল। এই ঘটনার একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে, যে কোনো কারণেই হোক, এই মুহূর্তে সেটা মাথায় আসছে না।

মার্ক রসের মুখ দেখে বোঝা যায় সেও বেশ উত্তেজিত। রস্ বয়সে তরুণ হলেও বোকা নয়। আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাস্ট্রো-ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করে বৃত্তি পেয়ে রস্ উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় পড়তে আসে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কনিষ্ক দেশাই কিছুদিন ফলিত মহাকাশবিদ্যার অধ্যাপনা করেছিলেন, সেই সময় মার্ক রস্ তাঁর ছাত্র ছিল। প্রিয় ছাত্র। এই অভিযানে রস্কে তিনিই বেছে নিয়েছেন।

হেডফোন খুলে মার্ক তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। দেশাই নিজের হেডফোন নামিয়ে রেখে প্রথমেই বললেন—পাওয়ার বন্ধ করে দাও।

ভবিষ্যতের জন্য কার্যকরী শক্তি জমিয়ে রাখা মহাকাশচারীদের একটা অকারণ বাতিক বলা যেতে পারে। কারণ পরিব্রাজক-১-এর লেজের দিকের দশ ফুট বাই কুড়ি ফুট রিঅ্যাক্টরের নিউক্লিয়ার পাইল থেকে যে তেজ তৈরি হচ্ছে তা আগামী পাঁচলক্ষ বছর ধরে এই যানকে সচল রাখতে পারে। এই যানেরই আয়ু থেকে তা অনেক বেশি। পরিব্রাজক-১ জীর্ণ হয়ে এলে এর থেকে রিঅ্যাক্টরটি খুলে অন্য যানে লাগিয়ে দেওয়া হবে। কাজেই শক্তির আপাতত কোনো টানাটানি নেই। কিন্তু —ওই বাতিক।

মার্ক বলল—স্যার ?

দেশাই বললেন—ভাবছি।

মার্ক আর কথা না বলে সশ্রদ্ধ চোখে চিন্তারত অধিনায়কের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু সে নয়, পৃথিবীর তাবৎ মানুষ শ্রদ্ধা করে এই প্রবীণ জ্ঞানতপস্বীকে। বর্তমানে বিজ্ঞান যেখানে পৌঁচেছে তাতে বিজ্ঞানের যে কোনো একটি শাখাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করা দুঃসাধ্য। আর কনিষ্ক দেশাই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শুদ্ধ গণিত এবং প্রযুক্তিবিদ্যায় এমন পৃথিবীতে সবচেয়ে পণ্ডিত বলে খ্যাত! চার চারটে বিষয়। ভাবলে মার্ক রসের হৃৎস্পন্দন মিনিটে দশটা করে কমে আসতে থাকে। দিল্লীর বিখ্যাত সাইবারনেটিকস্ চর্চা কেন্দ্রে নাকি ওঁর মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করার আবেদন জানিয়েছে। উনি রাজি হয়েছেন। মৃত্যুর পর ওঁর মস্তিষ্ক তাঁরা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য নিয়ে যাবে। সত্যি, কি করে এই বিপুল প্রতিভা পেলেন কনিষ্ক দেশাই। উত্তর-পশ্চিম ভারতের এক সাধারণ পিতামাতার সন্তান, অতি শৈশবে বাবা মারা যান। স্কুলের শেষদিকেই তাঁর মধ্যে প্রতিভার পূর্বাভাস দেখা যায়। কিন্তু দেশাইয়ের বংশে কোনো বৈজ্ঞানিকের নাম পাওয়া যায় নি, কোনো দিক দিয়ে নামোল্লেখ করার মত কেউ নেই। মোটামুটি গৃহস্থ পরিবারের সৎ ও ভদ্র মা-বাবার ছেলে।

দেশাই মুখ তুলে বললেন—তোমার কি মনে হয় ?

একটু ভেবে নিয়ে মার্ক বলল—স্যার, আমরা যেখানে আছি, পৃথিবী থেকে বেতার তরঙ্গের সেই এখানে পৌঁছতে একশো বছর সময় লাগে। আমরা হাইপারস্পেস দিয়ে মাত্র এক মাসে এখানে এসেছি। কিন্তু বেতার তরঙ্গ তো হাইপারস্পেস দিয়ে যায় না। অথচ এই শব্দগুলি জড়িত গলায় উচ্চারিত মানুষের কথার মত

শোনাচ্ছে—

—কি ভাষা বুঝতে পারছো ?

—না স্যার। তবে ধ্বনিটা বাংলার মত। কলেজে অবশ্যপাঠ্য আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে আমাকে বাংলা পড়তে হয়েছিল।

কনিষ্ক দেশাই বললেন—মার্ক, শব্দগুলো কোয়াসার বা নক্ষত্রের ফিউশনের ফলে জাত ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিও নয়েজ না। এটা কোনো ভাষাই বটে। তবে মহাকাশের এই অঞ্চলে আমরা প্লিয়াডিস্ নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে এক সরলরেখায় আছি। প্লিয়াডিস্-মন্ডলীতে কয়েকটা শক্তিশালী বেতার তরঙ্গের উৎস আছে। সম্ভবত তার জন্যই বার্তাটা আমরা ঠিকঠাক ধরতে পারছি না। প্লিয়াডিস্ থেকে আসা তরঙ্গ আমাদের শোনবার পথে বাধার সৃষ্টি করছে। আমার মনে হয় পরিব্রাজক-১-এর যাত্রাপথ বরাবর ডাইনে বা বাঁয়ে কিছু সরে গেলে কথাগুলো আমরা পরিষ্কার শুনতে পাবো।

মার্ক অবাক হয়ে বলল—কিন্তু স্যার, কম্পিউটারের প্রোগ্রাম করা পথ থেকে সরতে গেলে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হবে, নতুন করে প্রোগ্রামিং করতে হবে। তাছাড়া—বলছি বলে কিছু মনে করবেন না স্যার, এটা করতে হলে সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোলের অনুমতিও নেওয়া দরকার—

দেশাই হেসে বললেন—তোমার দুটো প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছি। প্রথমত, তুমি বোধহয় জানো আমাদের পরিব্রাজক-১-এর যন্ত্রগণক লীলাবতীর মত কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং করার মত মাঝারী গণিতের জ্ঞান আমার আছে। দ্বিতীয়ত, এটা তুমি জানো না, বিশ্বসংস্থা থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী মিশন কণ্ট্রোলকে না জানিয়েই যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা আমাকে দেওয়া আছে। আর কিছু ?

লজ্জিত গলায় মার্ক বললেন—না স্যার।

—বেশ, তুমি এখন ঘুমোও গিয়ে।

মার্ক চলে গেলে দেশাই চিন্তিত মুখে অঙ্ক করার যন্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা বিরাট সাদা পর্দার নিচে অজস্র চাবি রয়েছে। যন্ত্র চালু করে চাবি টিপে দিলেই পর্দার ওপরে অঙ্ক ভেসে ওঠে। দরকার হলে একটা অংশ মুছে আবার নতুন করে লেখা যায়। কাগজ-কলম নিয়ে প্রাচীন ঢঙে অংক কষা আজকাল উঠেই গিয়েছে। দ্রুত হাতে দেশাই অঙ্ক কষতে শুরু করলেন।

* * *

ঘুমোবার জায়গায় এসে মার্কের মনে হল আজ একটা স্বপ্ন দেখলে মন্দ হত না। গত কয়েকদিন হাইপারস্পেস দিয়ে ভ্রমণ করার জন্য নানান্ ভাবনা-চিন্তা করতে হয়েছে, ক্লান্ত হয়ে শোবার সময় আর স্বপ্ন দেখতে ইচ্ছে করে নি। আজ রুথের সঙ্গে তার প্রথম আলাপের দিনটা স্বপ্ন হিসেবে দেখতে ইচ্ছে করল। হিপনো-ড্রিমার যন্ত্রটা পোর্টেবল্। সে দেশাইয়ের ঘর থেকে স্বপ্ন দেখার যন্ত্র আনতে গেল।

অধিনায়কের ঘরে ঢুকেই তার প্রথমে চোখে পড়ল হিপ্নো-ড্রিমারের ওপরের লাল আলোটা জ্বলছে।

এটা খুব আশ্চর্য ব্যতিক্রম। লাল আলো জ্বলার মানে এই যন্ত্র যিনি আগে ব্যবহার করেছেন তিনি তাঁর দেখা স্বপ্নের প্রোগ্রাম যন্ত্রের স্মৃতি থেকে মুছে দিতে

ভুলে গিয়েছেন। এ ভুল কেউ করে না, কারণ পরবর্তী ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলেই তাহলে যন্ত্র চালু করে তার ব্যক্তিগত স্বপ্নের জগতে উঁকি দিতে পারে। স্বপ্ন মানুষের একান্ত গোপন কামনা এবং ইচ্ছার জগৎ, সেখানে বাইরের কৌতূহলী মনের প্রবেশ আর বাথরুমে থাকাকালীন আগন্তুকের দরজা ঠেলে ঢুকে পড়া একই ব্যাপার। তাড়াতাড়ি ইরেজ মার্কা বোতাম টিপে আগের স্বপ্নটা মুছে ফেলতে গিয়েও থেমে গেল মার্ক রস্।

দেখবে নাকি একবার কি স্বপ্ন বাছাই করেছিলেন কনিষ্ক দেশাই ?

না না। সে খুব অন্যায় কাজ হবে। প্রত্যেকের একান্ত জীবন কেবলমাত্র তার নিজের। সে পবিত্রতা নষ্ট করা একটি নৈতিক অপরাধ। তাছাড়া মার্ক কনিষ্ক দেশাইকে মহাগুরুর মত শ্রদ্ধা করে। আজ তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে সে যদি কতকগুলো কদর্য, অবৈধ ইচ্ছার প্রতিরূপ দেখতে পায়, তাহলে তার সেই শ্রদ্ধা টুকরো হয়ে যাবে—সে ধাক্কা মার্ক সহ্য করতে পারবে না। থাকগে, কাজ নেই এমন করে।

অথবা—অথবা একটু দেখাই যাক না! এমন সুযোগ কি আর আসবে ? এতবড় মনীষী, যাঁর প্রতিভার আলোয় গোটা পৃথিবী উদ্ভাসিত, তার আশ্চর্য মনের ভেতরটায় কি হচ্ছে তা দেখবার লোভ কি সামলানো যায়? অপরাধ হয় হোক, কেউ জানতে তো পারছে না!

চাকা লাগানো যন্ত্রটা নিজের ঘরে ঠেলে নিয়ে গেল মার্ক। এয়ার কুশনে এলিয়ে পড়ে রিমোট কন্ট্রোল সুইচ টিপে হিপ্নো-ড্রিমার চালু করে দিল।

এ যন্ত্রের নিচে চেষ্টা করলেও জেগে শুয়ে থাকা যায় না। যন্ত্র চলতে শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মার্কের চেতনা না-ঘুম না-জাগরণের গোধূলি-পরিসরে চলে যেতে শুরু করল। কিন্তু আজ অন্যদিনের মত হাল্কা আবেশ আসছে না কেন? যেন শতাব্দীর জমাট অন্ধকারের মত একটা চাপ বুকে চেপে বসছে। অনুভূতিটা শারীরিক নয়, নিতান্তই মানসিক—তবু মার্ক হাঁপিয়ে উঠল। বহুদূর থেকে হিপ্নো-ড্রিমারের একটানা গুঞ্জন কানে আসছে, যেন এক মাইল দূরে আছে যন্ত্রটা। বুকের মধ্যেটা কেমন করছে—আসলে কনিষ্ক দেশাইয়ের বিশাল ব্যক্তিত্বের ভরহীন চাপ অনুভব করছে মার্ক। প্রোগ্রামিং টেপের যে অংশ এখন ড্রিমারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, সেটা দেশাইয়ের জাগ্রত চেতনার শেষ দিক। একটা তরল সবুজ আলোর ভেতরে সাঁতার কাটছে মার্ক—আর সেই জলের মত সবুজ আলোর ভেতরে ভাসছে আলো দিয়েই গড়া সব দুরূহ গাণিতিক চিহ্ন। দূর থেকে ভাসতে ভাসতে এসে একটা অসীম-চিহ্ন মার্কের পাশ দিয়ে পেছনে চলে গেল। দশমিক চিহ্নের পর বারো ঘর অবধি পাই-এর মান ভাসছে অদৃশ্য তরঙ্গে। উল্টো করে আঁকা পিথাগোরাসের উপপাদ্য পাক খাচ্ছে তার পাশেই।

তারপর হঠাৎ এসব মিলিয়ে গিয়ে মার্কের বুক থেকে চাপটা সরে গেল। দেশাইয়ের চেতনা এই জায়গায় ঘুমিয়ে পড়ে। অচিরাৎ মার্কও গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেল।

খুব ফুল ফুটেছে এক সুন্দর বাগানে, বাতাসে দুলছে হলুদ ফুলের গুচ্ছ। একটি ছোট্ট শিশু ছুটোছুটি করে খেলছে সেই বাগানে।

স্মিতমুখী একজন সুন্দরী মহিলা, ছিপ্ছিপে গড়ন, কোলে নিয়ে শিশুটিকে

আদর করছেন। পাশে দাঁড়িয়ে একজন দীর্ঘদেহী মানুষ—তার মুখ ভাল দেখা যায় না।

অপরাহ্নের ম্লান রোদ্দুর পড়েছে কোথায় এক পাহাড়ের গায়ে। শিশুটি খেলা করছে। একটা বহুবর্ণ প্রজাপতি উড়ে গেল সামনে দিয়ে, শিশুটি তাকে ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। দীর্ঘদেহী মানুষটি এগিয়ে এসে আলতো করে তাকে কোলে নিয়ে গালে চুমু খেলেন। কি গভীর সে অনুভূতি, অন্যের স্বপ্ন, অন্যের ছোটবেলার ঘটনা, কিন্তু মার্কের মনেও সেই পবিত্র ভাবের ছটা বিকীর্ণ হয়ে পড়ল।

এমন আরো অনেক টুকরো টুকরো ছবি। ধারাবাহিকতা কিছু নেই, আছে পরিপূর্ণতা। ফুরিয়ে গেল ছ'ঘণ্টার ঘুম। হিপ্নো-ড্রিমারের শব্দ মিলিয়ে এল ক্রমে। আবার বেজে উঠল রবীন্দ্রনাথের গান—জাগো আলসশয়নবিলগ্ন—কারণ মার্ক নিজের মত করে প্রোগ্রাম করে নি।

জেগে উঠে প্রথমেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মার্ক রস্। যাক, কনিষ্ক দেশাইয়ের মনে বিশুদ্ধ গাণিতিক চিন্তা ছাড়া কোনো অবৈধ ভাবের প্রতিফলন নেই। আর কি ভয়ানক ব্যক্তিত্ব রে বাবা। বিছানার সঙ্গে একেবারে ঠেসে ধরেছিল, স্বপ্নের লোকটাই বা কে? মুখ দেখা গেল না তার।

তারপরেই তার চোখ পড়ল দেওয়ালে আঁটা পরিব্রাজক-১-এর অবস্থান-জ্ঞাপক ডায়ালের দিকে।

আরে! পরিব্রাজক-১ যাত্রাপথ থেকে প্রায় ত্রিশ ডিগ্রী বাঁদিকে সরে গিয়েছে। তার মানে মার্ক যতক্ষণ ঘুমোচ্ছিল তার মধ্যে কনিষ্ক দেশাই নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করেছেন, লীলাবতীকে সেই প্রোগ্রামমাফিক অ্যাডজাস্ট করেছেন এবং ফিউশন রকেট চালু করে পরিব্রাজক-১-কে ত্রিশ ডিগ্রী সরিয়ে এনেছেন।

অন্তত চারজন শিক্ষণপ্রাপ্ত মহাকাশচারীর দু'দিনের কাজ। পৃথিবীতে একজনই মাত্র আছেন যিনি একা এই কাজ ছ'ঘণ্টায় করতে পারেন। তাঁর নাম কনিষ্ক দেশাই।

কিন্তু অবাক হওয়ার তার অনেক বাকি ছিল।

চট্পট্ ইউনিফর্ম পরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে গিয়ে হাজির হল মার্ক। দেখল ঘুমোতে যাবার সময় যেমন দেখে গিয়েছিল ঠিক সেই একইভাবে অঙ্ক কষার যন্ত্রের সামনে ঝুঁকে ঝড়ের মত গতিতে কি একটা অঙ্ক কষছেন দেশাই।

—স্যার।

কনিষ্ক দেশাই ডাকটা শুনলেন কিনা বোঝা গেল না। আপনমনে বিড়বিড় করে বললেন—একশো সাত আলোকবর্ষ, ঠিকই তো, ঠিকই তো।

তারপর মুখ তুলে মার্কের দিকে তাকিয়ে বললেন—মিলে যাচ্ছে হিসেব। একশো সাত বছর আগেকার কথাই বটে।

অধিনায়ক সম্বন্ধে অলৌকিক শ্রদ্ধার মনোভাব সত্ত্বেও একজন মহাকাশচারীর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা হওয়া উচিত মার্কেরও তাই হল—সে চোখ তীক্ষ্ণ করে দেশাইয়ের দিকে তাকাল, চোখমুখে কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কি? বলা যায় না, মহাকাশের একাকীত্ব, পৃথিবী থেকে দূরত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা ও স্নায়বিক চাপ খুব শক্ত মানুষকেও টলিয়ে দেয়।

কনিষ্ক দেশাইয়ের চোখের কোণে জল।

মার্ক রস্ বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল। মহাকাশে সহযাত্রীর অস্বাভাবিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে করণীয় যা যা কাজের তালিকা তাকে মুখস্থ করানো হয়েছিল, সবগুলোই মার্কের মনে ছায়াছবির মত খেলে গেল। কিন্তু ক্যাপ্টেন কাঁদলে কি করতে হবে কিছু বলা নেই।

কনিষ্ক দেশাই এগিয়ে এসে মার্কের দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন--আমরা দু'জনেই বোকা, যাচ্ছেতাই রকমের বোকা। সবচেয়ে সহজ কথাটাই আমাদের মনে আসে নি—

—কি স্যার ?

--আরে, পৃথিবী থেকে যত বেতার অনুষ্ঠান আজ পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছে, সেগুলো তো আলোর গতিতে মহাকাশ বেয়ে ছুটে চলছে—কেমন কি না ? আমরা রয়েছি পৃথিবী থেকে ঠিক একশো সাত আলোকবর্ষ দূরে। আমাদের গ্যালাক্টিক্ 'রিসিভারে' যা ধরা পড়ছে তা অন্য নক্ষত্রজগতের প্রাণীদের প্রচারিত বার্তা নয়। একশো সাত বছর আগের আজকের দিনটা কেন বিখ্যাত জানো ?

মাথা নেড়ে মার্ক বলল—না স্যার।

করুণার চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেশাই বললেন—তুমি কিচ্ছু ইতিহাস জানো না ! যাই হোক, হেডফোন কানে লাগিয়ে দেখ তো বুঝতে পার কিনা। এখনো পরিষ্কার আসছে।

কানে ইয়ারপীস লাগিয়ে পাওয়ার ইনপুট সুইচ টিপলো মার্ক।

সঙ্গে সঙ্গে দুই কানে গম গম করে উঠলো একটি অত্যন্ত পরিচিত গায়ে রোমাঞ্চ জাগানো, সর্বত্র পূজিত এক স্টিরিও কণ্ঠস্বর। আজ আর কোনো গোলমাল নেই, স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে প্রতিটি শব্দ। মার্ক জানে, এ কার গলা, এই বিশেষ বক্তৃতার রেকর্ড লক্ষ লক্ষ বিক্রি হয় প্রতিবছর।

সায়ন্তনদেবের মৃত্যুর আগে রেকর্ড করা শেষ বক্তৃতা।

"মানুষ দীর্ঘজীবী হয়েছে, কিন্তু চিরজীবী হয় নি। আমি অনুভব করেছি আমার শরীরের প্রতি কোষে আসন্ন সমাপ্তির মৃদু পায়ের শব্দ—এবার আমাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু আমার কোনো খেদ নেই। আমি দেখে গেলাম আমার স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। যেটুকু কাজ বাকি রইল, আমার সন্তানেরা যেন তা সমাপ্ত করে—"

হেডফোন নামিয়ে রেখে মার্ক বলল—সায়ন্তনদেবের শেষ বক্তৃতা—

তারও মনে পড়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দেয়ালে বিরাট সৌর-বিশ্ব সময়ের ঘড়িতে পৃথিবীর তারিখ দেখা যাচ্ছে ১২ই জুন। একশো সাত বছর আগে আজই শেষ বক্তৃতা দিয়েছিলেন সায়ন্তনদেব।

কিন্তু কনিষ্ক দেশাই কি শুধু আবেগে কাঁদছিলেন ?

মার্ক বলল—কিন্তু স্যার—আপনি, মানে আপনার—

কনিষ্ক দেশাই বললেন—জানতাম তুমি এই প্রশ্ন করবে। আর আমিও উত্তর দেব বলে প্রস্তুত। আর গোপন করে কি হবে? আমরা তো পৃথিবীতে আর ফিরে যাবো না—আমরা চলছি পৃথিবীর সব মানুষের হয়ে কোনো বাসযোগ্য গ্রহ খুঁজে নিয়ে সেখানে বসতি স্থাপনের কাজ এগিয়ে রাখতে। এখন বলাই যায়--

তারপর একটু চুপ করে থেকে মুখ তুলে মার্কের চোখে চোখ রেখে দ্বিধাহীন স্পষ্ট গলায় বললেন—সায়ন্তনদেব আমার পিতা।

চকিতে মার্কের মনের মধ্যে দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেল। কনিষ্ক দেশাই সম্বন্ধে, তাঁর আশ্চর্য প্রতিভা সম্বন্ধে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ফুটে উঠল এই একটি বাক্যের অমোঘ উচ্চারণে। কোনোমতে মার্ক বলল—কিন্তু সায়ন্তনদেব অবিবাহিত ছিলেন—

—না, তিনি আমার মাকে গোপনে, কিন্তু সম্পূর্ণ সংগত প্রথার মধ্যে দিয়ে বিবাহ করেন। মানুষ তাকে সংসারী হিসেবে দেখতে চাইত না, তাই এ বিয়ের কথা তিনি গোপন রাখেন। দেশাই আমার পালক পিতার উপাধি।

হেডফোন তুলে আবার কানে লাগাচ্ছেন কনিষ্ক দেশাই, ডানহাতের তর্জনী দিয়ে ফাইন টিউনিং নব্ ঠেলে দিচ্ছেন ওধারে। তাঁর চোখ বোঁজা, মুখে আশ্চর্য প্রশান্তি। মার্ক রস্ সন্তর্পণে বেরিয়ে এল 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' থেকে।

পেছনে নিমীলিত চোখে এক মুগ্ধ সন্তান যন্ত্রের দরজায় কান পেতে রইল শতাব্দীর ওপার থেকে ভেসে আসা তার পিতার কণ্ঠস্বরের প্রত্যাশায়।

আমার শ্রেষ্ঠ ভ্রমণ

সম্পাদকের নির্দেশ—আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ভ্রমণের কাহিনীটি লিখতে হবে। প্রথমে শুনলে বিপদটা টের পাওয়া যায় না। মনে হয়—এ আর এমন কি। সে লিখে দেওয়া যাবে এখন। কিন্তু কার্যকালে বোঝা যায় ব্যাপারটা অত সোজা না। কাছে দূরে অনেক ভ্রমণের কাহিনীই তো ঝুলিতে রয়েছে, তার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ? আচ্ছা, দিল্লী-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবনের গল্পই বরং বলি, সেই যে হুমায়ুনের আসল সমাধি দেখতে মাটির তলার সুড়ঙ্গে ঢুকে নির্জন সন্ধ্যেবেলা কেমন গুন্ডার হাতে পড়তে পড়তে স্বামী-স্ত্রী বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাগজে কলম ঠেকাতে গিয়েই মনে হয়—নাঃ, তার চেয়ে বরং উড়িষ্যা ভ্রমণের সময় বর্ষায় ফেঁপে ওঠা তীব্রস্রোতা সুবর্ণরেখা নদীতে নৌকো করে মোটর গাড়িসুদ্ধ পার হতে গিয়ে কেমন সপরিবারে সলিল সমাধির উপক্রম হয়েছিল, সেটা লেখা যাক। কিন্তু এবারও লেখা শুরু করার আগে অন্য আর একটা ঘটনা মনে পড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ভ্রমণ মাত্রেই স্মরণীয়, কোনোটার চেয়ে কোনোটা বেশি বা কম রমণীয় নয়। এমন কি, অনেক খরচ করে অনেক দূরে গিয়ে অনেক বিপদের মুখে পড়ে যে ভ্রমণ, বাড়ির দরজার প্রায় কাছাকাছি ঠিক তেমনটি সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ একদিনের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করি।

এই ভ্রমণে আমি মোট চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছিলাম। ব্যয় হয় নি কিছুই, কারণ কোনো যানবাহন ব্যবহার করি নি। সময় লেগেছিল মোট তিন

ঘণ্টা, এক বন্ধুর বাড়িতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আড্ডা নিয়ে। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে এই তিন ঘণ্টা লিভিংস্টোনের আফ্রিকার অজানা দুর্গম গহনে কাটানো দশ বছর কিম্বা সোয়েন হেডিনের মধ্য এশিয়া অভিযানের শিহরণ জাগানো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গে একাসনে স্থান পাবার যোগ্য।

কোলকাতার উত্তরে তেইশ কিলোমিটার দূরের যে শহরে আমি বাস করি তার উপকণ্ঠে যে নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠছে সেখানে আমার এক বাল্যবন্ধু বাড়ি করেছে। যে হতভাগ্য মধ্যবিত্ত সারাজীবন ভাড়াবাড়িতে নানান্ অসুবিধে, জলের সারিতে অগ্রাধিকার, নর্দমার ধারে বাচ্চাদের অ্যা করা এবং বাড়িওয়ালার রক্তচক্ষু ও দাঁতে দাঁত ঘষার ভেতর দিয়ে জীবনের প্রারম্ভিক শ্রেষ্ঠ বছরগুলি কাটিয়েছে, সে ছাড়া স্বগৃহবাসী সুখীজনেরা বুঝবে না নিজের একখানা টালির ঘর থাকাও কত আনন্দের। কাজেই আমার বন্ধু বর্তমানে একজন আনন্দিত মানুষ, দেখা হলেই বলে—বাড়ি করলাম, একদিন বৌকে নিয়ে আয়! কাদের জন্য বাড়ি করেছি তবে?

আমার আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। ত্রিশ পেরুলেই মানুষ সাধারণত জীবনের জটিলতার ফাঁদে পড়ে যায়, দিনের সবটা সময় আর নিজের থাকে না। আমি ত্রিশ পেরিয়েছি দশ বছর আগে। কাজেই দেখা হলেই আমিও বলি—না, এইবার যাবো রে! গত হপ্তায় তো বুধবার সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েই পড়েছিলাম। গলির মোড়ে পৌঁচেছি, দেখি শ্বশুরবাড়ির অনেক আত্মীয়স্বজন দলবেঁধে ঢুকছেন। আর বেরুনো হল না। দেখি, সামনের হপ্তায় বরং—

—খুব ভাল, চলে আয় সামনের হপ্তায়। তুই তো লিখিস-টিখিস, তোর পছন্দ হবে জায়গাটা। এখনো ওদিকে বিশেষ বাড়িঘর ওঠে নি, আমার বাড়ির চারদিকে খোলামেলা মাঠ। আসবি তো?

কথা দিই। ঐকান্তিকতার সঙ্গেই বলি—যাবো, ঠিক যাবো।

পরের সপ্তাহে পুরনো রক্তআমাশা মাথাচাড়া দেয়। যাওয়া হয় না।

শীত পেরিয়ে গ্রীষ্ম। গ্রীষ্ম ফুরিয়ে বর্ষা।

এক রবিবার সকাল থেকেই নেমেছে বৃষ্টি। মাঝে মাঝে একটু ধরছে, মাঝে মাঝে আবার তেড়ে আসছে। সারাদিন বাড়িতে বসে বসে বৃষ্টি দেখে জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। সন্ধ্যেমুখো বৃষ্টি কমে আসতেই বৌকে বললাম—চলো, বেড়িয়ে আসি—

বৌ অবাক।—ওমা! এই দুর্যোগে কোথায় যাবে?

—চলো, রণজিতের বাড়ি ঘুরে আসি। বেচারা দেখা হলেই যেতে বলে। এই তো এইটুকু পথ, হেঁটেই চলে যাবো! গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে কেমন একছাতার তলায় দু'জনে—

আঠার বছর বিয়ে হয়েছে। বৌ বলল—আহা, কত ঢঙ্!

বলে কাপড় বদলাতে গেল। আমিও প্যাণ্টজামা পরে হাতে টর্চ আর ছাতা নিয়ে তৈরি হলাম। বাড়ি থেকে বেরুলাম যখন, তখন ঘড়িতে ঠিক সাতটা পনেরো। হায়, তখনো জানি না স্বামী-স্ত্রী কি জীবনমরণ সংকটের মধ্যে পড়তে চলেছি!

পথে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। দোকানপাট যা খোলা আছে তাতে একটিও খদ্দের নেই। গলির মোড়ে চায়ের দোকানে এই সময়টায় পাড়ার উঠতি

বয়সের ছেলেপুলেদের ভিড় জমে থাকে। সে দোকান আজ বন্ধ, উনুনের পাশে নেড়ি কুকুর ঘুমোচ্ছে। সমস্ত শহর বন্ধ দরজায় সাফল্যের সঙ্গে ভেজা বাতাস আটকে দিয়ে নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামে "জওয়ানী কি উলঝন্" দেখছে। আমরা ছাতি ধরে বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি।

মানুষের মনের ভেতরে গোপন একটা কুঠুরিতে আদিম যাযাবর বৃত্তিটা ঘুমিয়ে আছে। পনের-কুড়ি হাজার বছর আগে অবধি মানুষ ছিল নৃতত্ত্ববিদের ভাষায় যাকে বলে 'হান্টার-গ্যাদারার'। পুরো গোষ্ঠীটাই ফলমূল আর শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত আজ এখানে, কাল সেখানে। তারপর কৃষি শিখে, সভ্যতার উদ্বোধন ঘটিয়ে মানুষ একজায়গায় শেকড় গাড়তে শিখেছে-- তৈরি করেছে নগর বন্দর। কিন্তু কখনো কখনো পুরনো মস্তিষ্কের কোষে ঘুমিয়ে থাকা ভবঘুরে স্বভাবটা জেগে ওঠে। আজকাল তো আর সত্যি সত্যি সমস্ত গোষ্ঠী নিয়ে কোথাও মাঠের মধ্যে গিয়ে তাঁবু ফেলে বাস করা যায় না। তাই লোকে সারাবছর পয়সা জমিয়ে, অগ্রিম হোটেল বুকিং করে, রাত জেগে লাইন দিয়ে রেলে রিজার্ভেশন করে দূরে বেড়াতে যায়। এইভাবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে। আমিও বর্ষার মধ্যে বৌকে নিয়ে নির্জন পথে বের হয়ে সহস্রাব্দী আগের পূর্বপুরুষদের অ্যাডভেঞ্চারে বের হবার মত বেশ একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছিলাম।

রেলওয়ে লাইন পেরিয়ে পাঁচ মিনিট হাঁটতেই শহর ফুরিয়ে গেল। এদিকে 'দূরে' কাছে কিছু কিছু বাড়ি উঠেছে বটে, কিন্তু একটার থেকে আর একটার দূরত্ব অনেক। ডাকলে শোনা যাবে হয়ত, তবে বেশ চেঁচিয়ে ডাকতে হবে। এসব জায়গায় মিউনিসিপ্যালিটি এখনো স্ট্রীট ল্যাম্প দেয় নি। তাছাড়া সে অর্থে স্ট্রীট কোথায় যে ল্যাম্প দেবে? মেঘে ঢাকা বর্ষণমুখর রাত্তিরেও মাঠের মধ্যে ঠিক যাকে বলে 'সূচীভেদ্য অন্ধকার'—তা হয় না। কোথা থেকে আসা খুব ক্ষীণ একটু আলো থেকেই যায়। আরো কিছুদূর হেঁটে সেই আলোতে বুঝলাম বাঁদিকে মূল রাস্তা থেকে একটা পায়ে-চলা মত পথ নেমে গিয়েছে। বললাম—শুনছ, এবার এই পথে নামতে হবে, এসো—

সামনে তমিসাসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বৌ বলল—আমি বলি কি, আজ আর রণজিৎদার বাড়ি গিয়ে কাজ নেই, চল ফিরে যাই। এই অন্ধকারে মাঠের ভেতর--

বললাম—একেবারে এসে গিয়েছি। ডিরেকশন যা দিয়েছিল তাতে মনে হচ্ছে এই সামনেই কোথাও বাড়ি। এখান থেকে ফিরব? চলে এস—

মূল রাস্তা থেকে কিছুদূর হাল্কা ঘাসে ছাওয়া জমি, বেশ হাঁটা যায়। তারপর পা যেন কেমন পিছলে যেতে লাগল। নাঃ, এমন হচ্ছে কেন! টর্চ জেলে দেখলাম চারদিক, যতদূর চোখ যায় জমিতে কারখানার মিহি ধূসর বর্ণের ফ্লাই অ্যাশ ঢালা। যাকে চলতি ভাষায় 'ঘ্যাঁস' বলে। আমাদের ছোটবেলায় 'ঘ্যাঁস' বললে গোল গোল ছোট নুড়ির মত কারখানার বর্জ্য পদার্থকে বোঝাত, যার ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় মুড়মুড় করে শব্দ হত। এ সে জিনিস নয়, বিশেষ করে জল পড়লে ফ্লাই অ্যাশ মারাত্মক পদার্থ হয়ে উঠে, তার ওপর দিয়ে হাঁটতে গেলে প্রতিমুহূর্তে পদচ্যুতির ভয় থাকে।

বৌকে বললাম—তুমি সাবধানে পা টিপে টিপে আমার পেছন পেছন এসো। এটুকু আমি পেরিয়ে গেলে আর অসুবিধে হবে না—

টর্চ নেভাতেই অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল। আগে তারার আলোতেই চমৎকার দেখতে পাচ্ছিলাম, টর্চ জ্বালতে সর্বনাশ হয়ে গেল। বৌ কাতর গলায় বলল—আলো নেভালে কেন? জ্বালো—

মনে হল জায়গাটা আসলে পুকুর ছিল, ভরাট করা হয়েছে। বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গীতে ভারসাম্য রক্ষা করতে করতে এগুতে লাগলাম।

—হ্যাঁগো, আলোটা আমার দিকেও একটু দাও। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না—

টর্চ ঘোরালাম। আমার সামনে মূর্খের ভবিষ্যতের মত অন্ধকার।

দশ-বারো পা হাঁটবার পরই অনুভব করলাম পায়ের তলায় ঘ্যাঁসের চেয়েও পেছল কিছু। ব্যাপার উপলব্ধি করে সামলে নেবার আগেই সরসর করে এগিয়ে গেলাম পাঁচ-সাত হাত। হেঁটে নয়, আপন ভরবেগে। সেখান থেকে টর্চ ফেলে দেখি বৌ আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভরসা দেবার জন্য এমন ভাব দেখালাম যেন ইচ্ছে করেই অমন করেছি, কিম্বা ওইটেই আমার স্বাভাবিক গমনের ছন্দ। বললাম—এসো। বৌ পা বাড়াল।

পরমুহূর্তেই দেখি সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। ম্যাজিক!

বললাম—চল, এগুই—

সে বলল—আসবার সময় খোকা বলেছিল, মা, তাড়াতাড়ি ফিরো—

গলা কাঁপল, তবু বললাম—ফিরব, ফিরব—দেখ, ঠিক ফিরব—

আলো ফেলে দেখলাম—পায়ের নিচে এঁটেল মাটি। জিনিসটা কি ভয়ানক পেছল সে ভাষায় রোঝানো সম্ভব নয়। ভেজলিন, পাকা মর্তমান কলা, বিউলির ডাল এবং নারকোল তেল একসঙ্গে মেখে যদি কাঁচের মেঝেতে ছড়িয়ে রাখা যায়, এবং তার ওপর দিয়ে কাউকে হাঁটতে বলা হয়, তাহলে ঘটনাটা অনুধাবন করা যেতে পারে। তবু স্ত্রীর কাছে কাপুরুষ প্রমাণিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়। কাষ্ঠহাসি হেসে বললাম—ভয় নেই, যেখানে যেখানে আমি পা ফেলছি, ঠিক সেখানে সেখানে তুমি পা দাও।

বলেই আমি হাঁটু পর্যন্ত কাদাভর্তি একটি নালার মধ্যে পড়ে গেলাম।

কোথায় মাঠ আর কোথায় পথ বোঝবার উপায় নেই। আমার এক পা মাঠে, এক পা নালায়।

বৌ কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—ওগো, তুমি কোথায় গেলে!

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বৌয়ের কথাটা শুনে গা শিউরে উঠল। ধমকে উঠে বললাম—কি হচ্ছে! চুপ করো! একটু নালায় পড়ে গেছি বই নয় তো? অমন করছ কেন?

প্রাণের দায়, পা টেনে তুললাম, পাঁকের ভেতর বায়ুশূন্যতা সৃষ্টি হওয়ায় বিকট এবং অস্বস্তিকর শব্দ হল। কিন্তু উঠে এল খালি পা। জুতো কই? জুতো রয়ে গিয়েছে কাদার নিচে! উবু হয়ে বসে কাদায় তৈরি গর্তে হাত ঢুকিয়ে চটি বের করতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বার উপক্রম। দুই হাত মাটিতে ফেলে টাল সামলাতে গেলাম। এঁটেল মাটিতে আবার টাল সামলানো কি? হাত হড়কে গেল। চটি হাতে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন সর্বাঙ্গে চটচটে কাদা।

প্রথম দু'-একফোঁটা বৃষ্টিতে ভিজতে খারাপ লাগে। তারপর একবার গায়ে জল লাগলে ঝম্‌ঝম্ বর্ষণের মধ্যেও অক্লেশে হাঁটা যায়। ঠিক তেমনই একবার

গায়ে কাদা মেখে আমার আর নিজের সম্বন্ধে কোনো চিন্তা ছিল না। একমাত্র দুর্ভাবনা হল বৌকে অখণ্ড এবং জীবিত অবস্থায় কি করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। মাঠের অনেকখানি ভেতরে চলে এসেছি। এখন যা কপালে থাকে ভেবে এগুনোই ভাল।

কিন্তু যাবো কোন্‌দিকে? নালা থেকে উঠে সম্পূর্ণ দিকভ্রান্ত হয়েছি। ঘোর অন্ধকার ভেদ করে কিছুই দেখা যায় না। টর্চের আলো জ্বলতে জ্বলতে ক্রমেই লাল হয়ে আসছে! ঠিক এই সময়েই আবার বৃষ্টি এল বেশ চেপে। পা ঘসে ঘসে মিনিটে চার ইঞ্চি গতিতে এগুতে লাগলাম। বৌ আর্তনাদ করে বলল—না না! আমাকে ফেলে যেও না! আমি মরে যাবো।

একটু পিছিয়ে আসতেই বৌ সবেগে আমাকে জড়িয়ে ধরল। এমনভাবে আর কখনো না, বিয়ের প্রথমদিকেও না। মাঝখান থেকে হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল কাদায়।

ভাবুন অবস্থা! একটা কাদামাখা ভূতকে জড়িয়ে একজন মহিলা ঘোর অন্ধকার মাঠে বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় ডায়ালগ দিচ্ছেন—তুমি ছেড়ে গেলে মরে যাবো! লোকজন দেখতে পেলে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে প্রমাণিত হবার আগে মার খেয়ে মরতাম।

বৌ বলল—আমি এর মধ্যে আর এক পাও হাঁটতে পারবো না।

প্রায় বলে ফেলেছিলাম—আমিও না।

সামলে নিয়ে বললাম—পা তুলো না, ঘসে ঘসে এগোও।

উপাখ্যান দীর্ঘায়িত করে লাভ নেই। কখনো স্কেটিং করার মত ভেসে গিয়ে, কখনো কাদার মধ্যে আক্ষরিক অর্থে হামাগুড়ি দিয়ে, দুবার আছাড় খেয়ে বিপর্যস্ত, ভগ্ন অবস্থায় যখন বন্ধুর বাড়ি পেঁছিলাম, সে বিশেষ অবাক না হয়ে বলল—ঐ বালতিতে জল আছে, যা, হাত-পা ধুয়ে নে। মাঠের রাস্তা দিয়ে এলি নাকি?

—হ্যাঁ, তুই তো তাই বলেছিলি।

—আহা, সে তো শীতকালে। শীতের রাস্তা আর বর্ষার রাস্তা আলাদা। এই পেছন দিয়েই একটা পথ আছে, একেবারে খটখটে শুকনো। যাঃ, তুই একেবারে বোকা!

ঠাকুরমার ঝুলিতে রাক্ষসী ঠাকুমা নাতি লালকমলকে লোহার কড়াইভাজা চিবোতে দেওয়ায় তার মুখে যেমন আওয়াজ হয়েছিল, বন্ধুর কথা শুনে আমার মুখ দিয়েও তেমন শব্দ বেরুল।

জামায় নর্দমার পাক, চুলে কাদা শুকিয়ে কেক হয়ে আছে, হাতে জুতো, পেছনে আধমরা বৌ নিয়ে অনেক রাতে যখন বাড়ি ফিরলাম, কড়া নাড়তে মা বেরিয়ে এসে আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে দরজা আবার বন্ধ করে দিতে দিতে বললেন—আমার ছেলে এখন বাড়ি নেই, ফিরতে রাত হবে, কাল সকালে আসবেন।

এই শেষ ধাক্কাটুকুই বাকি ছিল। প্রায় কেঁদে ফেলে বললাম—মা, কাল সকাল অবধি কোথায় বসে থাকবো? ভাল করে দেখ, এই যে আমি—এই যে তোমার বৌমা—

বেলা যায়

খবরটা শুনে ব্রজমাধব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাতের মুঠোয় তখনও অপরাজিতা ফুলটা ধরে আছেন। বিকেলে বাড়ি থেকে বের হবার সময় চোখ পড়েছিল সাধের ছোট্ট বাগানটার দিকে। একসময় এ বাগানের পেছনে যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছেন। আজ কিছুদিন হ'ল উবু হয়ে বসতে কষ্ট হয়। বাগানে আগাছা গজিয়েছে, নিড়েন দিতে পারলে ভাল হত। অবশ্য—ব্রজমাধব মনে মনে হাসলেন—লাভ কি? এখন নতুন করে গাছ লাগালে তার ফুল দেখে যেতে পারবেন কিনা সন্দেহ আছে।

সারা জীবন ধরে আশা করে যত গাছ লাগিয়েছেন তাদের সবগুলোতে কি ফুল ধরেছে?

তবু সাদা অপরাজিতার লতাটা বড় প্রিয়। জীবনের অনেক না-পূর্ণ-হওয়া আশা, অনেক নিরর্থকতার মধ্যে এই শেষ দিকে কয়েকটা বছর ভরে গিয়েছে সাদা অপরাজিতার ফুলে। নিজে কখনও ফুল ছেঁড়েন না, অন্য কাউকেও হাত দিতে দেন না। কিন্তু আজ বেড়াতে বের হবার সময় দেখলেন বাঁশের খুঁটি বেয়ে ওঠা লতার নিচে একটা তাজা ফুল পড়ে আছে। নিজে থেকে খসে পড়ে নি নিশ্চয়—পাড়ার বাঁদর ছেলেগুলোর মধ্যে কেউ এসে ফুল চুরি করেছে, একটা ফেলে গিয়েছে পেছনে। কি ভেবে ফুলটা হাতের মুঠোয় ভরে নিয়েছিলেন।

শেষ হেমন্ত। চট করে সন্ধ্যে নেমে আসে। সূর্য ডোববার সঙ্গে সঙ্গে একটু শীত শীতও করতে শুরু করেছে। কিন্তু তেমনভাবে বারণ করবার কেউ না থাকায় এবং ব্রজমাধব জেদী লোক বলে রোজ বিকেলে বেরিয়ে পড়েন। মিনিট তিনেক টুকটুক করে হাঁটলেই নবীনের চায়ের দোকান। তিনি পেঁছলে রোগামত কালো নেড়ি কুকুরটা উৎসাহে সোজা হয়ে বসে, আগ্রহে উজ্জ্বল চোখে তাকাতে থাকে। নবীন হেসে বলে—ঐ যে ল্যাংড়া বুঝে গিয়েছে আপনি এসেছেন। আজ বিস্কুট দেব, না কেক?

একটা কেক কিনে টুকরো করে মাটিতে ছড়িয়ে দিতে থাকেন ব্রজমাধব। তিনপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কুকুরটা এগিয়ে এসে সকৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে খেতে থাকে। বেচারার পায়ের ওপর দিয়ে একটা চালভর্তি তিনচাকা ভ্যান চলে গিয়েছিল, চোট-খাওয়া অকেজো পা-টা গুটিয়ে পেটের নিচে ঝুলে থাকে। ওর কেক খাওয়া হয়ে গেলে ব্রজমাধব সেটেলমেণ্ট অফিসের পাশের মাঠটার দিকে হাঁটতে থাকেন, পেছনে না তাকালেও ঠিক বুঝতে পারেন ল্যাংড়া তাঁকে অনুসরণ করছে। গোলমাথা লাঠিটা পাশে রেখে ব্রজমাধব ঘাসের ওপরে বসেন। মাঠের দূর প্রান্তে শেষবেলার রোদ্দুর গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে থাকে বিশাল জিলিপি ফলের গাছ, অনেক দূরে কলকাতা শহরে যাবার রাস্তা থেকে বাস আর লরির তীক্ষ্ণ হর্নের শব্দ ভেসে আসে। হাই স্কুলের ছুটির ঘণ্টা বেজে যায়, ছেলেপুলেরা বই হাতে কলরব করতে করতে মাঠের মধ্যে দিয়ে বাড়ি ফেরে। ফড়িং ওড়ে চোরকাঁটা জঙ্গলের মঞ্জরীর ওপরে।

কুকুরটা ঠায় বসে থাকে একটু দূরে। তাঁর দিকে তাকিয়ে।

বেলা নিতান্তই পড়ে এলে ব্রজমাধব উঠে পড়েন। এবার ল্যাংড়া আগে আগে চলে তিনপায়ে। কিছুদূর গিয়ে তাকিয়ে দেখে তিনি আসছেন কিনা। ব্রজমাধব মাঠে বসে একদিন কুকুরটার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলেন—শেষ দিকটায় তুই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাস, তোকে এবার থেকে আমি ধর্ম বলে ডাকবো।

আজ নবীনের দোকানে এসে দেখলেন উনুনের পাশে নিজের জায়গায় ধর্ম শুয়ে নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোথাও তাকে দেখতে পেলেন না। নবীন একেবারেই এদিকে চোখ ফেরাচ্ছে না, বেঞ্চিতে বসে থাকা খদ্দেরদের জন্য একমনে চা ঘুঁটে চলেছে।

—নবীন, ল্যাংড়া কোথায়?

নবীন যেন খেয়ালই করছে না। হাতে হাতে চায়ের কাপ এগিয়ে দিচ্ছে খদ্দেরদের।

—আমার কুকুর কই নবীন?

এবার নবীন না তাকিয়ে পারে না।

—ওঃ, বাবু এসেছেন? বসুন বাবু, চা করে দিই ভাঁড়ে?

নীরব ব্রজমাধব তাকিয়ে থাকেন। একটু বাদে নবীন আস্তে আস্তে বলে—দুপুর বারোটা নাগাদ বাবু করিমপুরের এক্সপ্রেস বাস ছুটে আসছিল—ও তখন রাস্তা পার হচ্ছে। পা-টা গিয়ে তো আর ইদানীং দৌড়তে পারত না—বসুন বাবু, মনখারাপ করবেন না।

খবরটা শুনে ব্রজমাধব স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—চা বানাই বাবু?

—নাঃ, আজ থাক। আচ্ছা নবীন, ওকে কি—মানে ফেলেছে কোথায় বলতে পারো?

মাথা চুলকে নবীন বলল—একটু বাদেই মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা তোলার গাড়িতে নিয়ে গিয়েছে বাবু। নদীর ধারে কোথায় জঞ্জাল ফেলে ওরা, সেখানেই ফেলেছে বোধহয়—

জর্জ কোর্টের মোড়ের কাছে এসে একটা রিক্সা ভাড়া করলেন ব্রজমাধব। নদীর একেবারে ধার অবধি গেলেন না, একটু দূরে নেমে পড়ে রিক্সাওয়ালাকে বললেন—একটু দাঁড়াবে? এই ধরো—মিনিট পনের-কুড়ি? যা লাগে দেব—

রিক্সাওয়ালা হেসে বলল—যান বাবু, আমি আছি এখানে। আপনি ঠিকেদার সাহেবের বাবা তো? আপনাকে চিনি আমি।

শীতের শীর্ণ নদী শুয়ে আছে ক্লান্ত শিশুর মত। মোটর ব্রিজের পাশে কাটা ধাপ বেয়ে সন্তর্পণে নিচে নামলেন ব্রজমাধব।

হ্যাঁ, ওই তো। তোবড়ানো টিনের কৌটো, ছেঁড়া মাদুর, ডাবের খোলা আর বাতিল হয়ে যাওয়া নানা জঞ্জালের মধ্যে পড়ে রয়েছে ধর্ম। তার রোগা কালো শরীরে লেগেছে কাদার দাগ। কাছে গিয়ে ব্রজমাধব নিচু হয়ে ভাল করে দেখলেন, যেন তাঁর বিশ্বাস এখনও ধর্ম বেঁচে আছে। আসলে এ একটা খেলা, তিনি ডাকলেই সে উজ্জ্বল মুখে উঠে বসবে।

নাঃ, ধর্ম একেবারে মরে গিয়েছে।

হাতের মুঠো খুলে তিনি সাদা অপরাজিতা ফুলটা ফেলে দিলেন ধর্মের

শরীরের ওপর। শেষ বেলার রোদ্দুর লেগে রয়েছে নদীর ওপারে সরকারি সংরক্ষিত বনের গাছেদের মাথায়। কোথা থেকে কর্কশ স্বরে একটা চিল ডেকে উঠল। কি সুন্দর দেখায় ওপারের ওই সবুজ বন! একদিন ওখানে তিনি বেড়াতে যাবেন। সামনের মাসের প্রথমেই, হাতে পেনসনের টাকা থাকতে থাকতে রিক্সা নিয়ে আসবেন। কতদিন ভাল করে ইচ্ছেমত বেড়ানো হয় না।

বাড়ি ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে। একতলায় দক্ষিণের বড় ঘরটায় স্ত্রী মারা যাবার পর থেকে আছেন ব্রজমাধব। লাঠিটা দরজার পাশে ঠেস দিয়ে রেখে চৌকির ওপরে পা-মুড়ে বসলেন। এখন এককাপ চা পেলে ভাল হত, কিন্তু তাহলে পুত্রবধূকে ডেকে চায়ের কথা বলতে হয়। আরতি লোক মন্দ নয়, বললে চা করেও দেবে—কিন্তু তার মধ্যে কোনও ভালবাসার একান্ত স্পর্শ নেই। বুড়ো হয়ে গেলে মানুষ এগুলো ঠিক ধরতে পারে। আসলে বৌ মারা গেলে মানুষকে যত্ন করার আর কেউ থাকে না। এই যে এখন একটু গরম জল পেলে হাতমুখ ধুতে সুবিধে হত, সেটা তিনি বললে তবে হয়ত ঘণ্টা খানেক বাদে এলেও আসতে পারে। কিন্তু সাবিত্রী বেঁচে থাকতে সে ঠিক জানতো কখন তাঁর কী প্রয়োজন। সে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই—

—বাবা, কখন ফিরলে?

তাপস এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না। সারাদিন অফিসে অফিসে টেন্ডার আর বিলের জন্য ঘোরে, সাইটে কাজ দেখে। তারপর রাত আটটা-ন'টা অবধি কণ্ট্রাক্টরদের ক্লাবে বসে ব্যবসাপত্র নিয়ে আলোচনা করে। দু'পয়সা আনছে বলেও শোনা যায়। ব্রজমাধবের মাঝে মাঝে কেমন অবাক লাগে। এই তো সেদিন হল ছেলেটা, তাঁকে কোথাও বেরুতে দেখলেই মায়ের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে চলে আসার চেষ্টা করত। ওর সেই ঘুড়ি-লাঠাই মার্বেল, ইস্কুল যাবার নীল ক্যানভাসের ব্যাগখানা—কত গোপন আবদার, মায়ের কাছে বকা খেয়ে এসে কোলে মুখ গুঁজে থাকা। আর এখন সে কত দূরের মানুষ। একটা সম্পূর্ণ বিদেশী ব্যক্তিত্ব। প্রথম প্রথম অতটা খেয়াল করেন নি। একদিন—তাঁরই অন্যায়—হঠাৎ ছেলের ঘরে ঢুকে দেখলেন তাপস একতাড়া একশো টাকার নোট গুনে আরতির হাতে দিচ্ছে, সামনে স্টিলের আলমারিটা খোলা। তাঁকে দেখে তাপস ঝট্ করে নোটের তাড়াটা পকেটে লুকিয়ে ফেলল, তিনিও থতমত খেয়ে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু মনে ভারী দুঃখ হল। আজকাল তাপস আর আরতি নিজেদের ব্যাপার নিজেদের মধ্যেই রাখে। ছেলের উপার্জন কত, উপার্জিত অর্থ দিয়ে সে কি করে এসব তিনি কিছুই জানেন না। তাপস অবশ্য কখনও কখনও হাতখরচ বাবদ তাঁকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছে, তিনি নেন নি।

ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—আয়, বোস। কিছু বলবি? আজ তাড়াতাড়ি ফিরলি যে?

তাপস সন্তর্পণে চৌকির একপ্রান্তে বসল। দু'একবার কাশল।

—কিছু বলবি?

—বলছিলাম কি, তুমি যদি ওপরে মাঝের ঘরটায় যেমন ছিলে চলে যেতে, তাহলে আমার একটু সুবিধে হত—

ব্রজমাধব অবাক হয়ে বললেন—মানে?

তাপসকে দেখে বোঝা যায় সে কথা বলবার জন্য তৈরি হয়েই এসেছে।

—আসলে হয়েছে কি, ব্যবসার কাজে আমার কাছে নানা লোকজন আসে তো —তাদের সঙ্গে বারান্দায় চেয়ার পেতে কথা বলতে হয়। একটা অফিসমত করে নিতে পারলে কাজের সুবিধে—বুঝলে না? তুমি একা মানুষ, দোতলার ঘরে তোমার অসুবিধে হবে না। দক্ষিণের এই ঘরটা পেলে আমি অফিস করতে পারতাম—

ব্রজমাধব কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন—সে এখন সুবিধে হবে না। আমি এ ঘরেই থাকবো—

তাপস একটু উত্তেজিত গলায় বলল—কেন বল তো? ওপরের ঘর খারাপ কি?

—খারাপ ভালোর কথা হচ্ছে না। আমি এ ঘরেই থাকবো—

—এ কিন্তু তোমার অন্যায় জেদ বাবা, একটু সরে গেলে যদি আমার সুবিধে হয়, তাহলে তুমি—

ব্রজমাধব তীব্র গলায় বললেন—তুমি কি আমাকে ন্যায়-অন্যায় শেখাচ্ছ? শোনো, সারাজীবন আমি অপরের সুবিধে করে দেবার জন্য সরে সরে গিয়েছি, এখন শেষ বয়সে আর পারবো না। মনে রেখ, বাড়িটা এখনও আমার নামে। আমি এ ঘরেই থাকবো।

তাপস মুখ লাল করে উঠে গেল।

রাতে খাবার টেবিলে বসে আরতি জিজ্ঞাসা করল—বাবা কি বললেন? যাবেন ওপরের ঘরে?

—নাঃ। কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না। যত বুড়ো হচ্ছে, ততই জেদ বাড়ছে। অথচ জানো তো দক্ষিণের ঘরটা আমার কত দরকার? সরকারের ঘরে একগাদা টাকার বিল আটকে আছে, এখন ফণী মজুমদার টাকা না দিলে নতুন কাজ ধরার ক্যাপিটাল নেই। ওই ঘরটায় মজুমদার অফিস করতে চায়। যে এত টাকা দিচ্ছে, তার একটা কথা তো রাখতে হবে, না কি?

আরতি দুঃখী দুঃখী মুখ করে বসে রইল।

ব্রজমাধব রাতে কিছু খেলেন না। আরতি দেবুর মাকে দিয়ে একবার ডেকে পাঠিয়েছিল, ব্রজমাধব ধমক দিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিলেন।

আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুতেই নজরে পড়ল বাগানের দিকের বড় জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকে মেঝেতে লুটিয়ে আছে। ওই জানালার পাশে বসে সাবিত্রী চুল বাঁধত। কতদিন কত সলজ্জ চাহনি, কত সপ্রেম সংলাপের স্মৃতি এ ঘরের প্রতি কোণে। তখনও বাড়ি দোতলা হয় নি, তাপসের জন্ম হয় নি —তারা কি করে জানবে সেসব দিনের কথা?

এ ঘরেই তাঁদের ফুলশয্যা হয়েছিল। এখনও বুকভরে নিঃশ্বাস নিলে বিছানায় ছড়ানো সেদিনের চাঁপা ফুলের গন্ধ অতীতের তীর থেকে বিষণ্ণ বাতাসে ভর করে ফিরে এসেছে টের পাওয়া যায়।

সাবিত্রী চলে গিয়েছে আজ আট বছর। একা একা তাঁর আর ভাল লাগে না। তেমন করে তাঁর জন্য ভাববার কেউ নেই, নিজের মনের জমানো কথাও তিনি কাউকে বলতে পারেন না। অথচ কত কথা জমে আছে বুকের ভেতরে। এবার

সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা হলে সব খুলে বলবেন। দেখা তো হবেই। সাবিত্রী বলেছিল দেখা হবে।

বুকের বাঁদিকে একটা চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। বসন্ত ডাক্তার বলেছিল এরকম ব্যথা হলেই একটা সরবিট্রেট ট্যাবলেট জিভের তলায় রাখতে। টেবিলের ড্রয়ারে রয়েছে শিশিটা। উঠে কি একখানা বড়ি নিয়ে মুখে ফেলবেন? নাঃ, থাকগে। শুয়ে থাকতে বড় আরাম। ব্যথা আপনিই কমে যাবে এখন।

নদীর ওপারের বনে বেড়াতে যাচ্ছেন ব্রজমাধব। ওঃ, এতদিনে সময় হল! সামনে তিনপায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে ধর্ম। আচ্ছা, ধর্ম কি করে এলো? সে কোথায় চলে গিয়েছিল না? যাক, ভালই হয়েছে ধর্ম ফিরে এসেছে। এক্ষুণি ওকে কেক কিনে দেবেন ব্রজমাধব।

অরণ্যে পেঁাছে গেলেন তাঁরা দু'জন। ছায়া ছায়া শান্তি বনের ভেতরে। ঝিরঝিরে বাতাসে খসখস করে নড়ছে গাছের পাতা। মানুষ যেখানে থাকে তার থেকে অনেকটা দূরে চলে এসেছেন বলেই বোধহয় অকস্মাৎ ব্রজমাধব এক চমকে জীবনের সবটা পরিসর একসঙ্গে দেখতে পেলেন। ভালবাসা এবং না-বাসা, এগিয়ে যাবার জন্য ঠেলাঠেলি, যুদ্ধ শান্তি সন্ধি—সবই অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হল। সমস্ত পথই যখন একদিন এই ছায়াময় অরণ্যে নিয়ে আসে, তখন আর যুদ্ধ কেন?

সাবিত্রী এই বনে কোথাও লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

হঠাৎ আধো ঘুমের মধ্যে ছেলের জন্য বড্ড মন কেমন করে উঠল ব্রজমাধবের। আহা রে, খুব বকেছেন ওকে সন্ধ্যেবেলা। অত বকা উচিত হয় নি। আমার সোনার খোকা, তুই কি বুঝিস না তোকে কত ভালবাসি? আচ্ছা, কালই এ ঘর ছেড়ে ওপরে চলে যাবো। তুই অফিস করিস।

বুকে আর ব্যথা নেই। ব্রজমাধব ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে চা দিতে এসে দেবুর মা আবিষ্কার করল দক্ষিণের ঘর খালি হয়ে গিয়েছে।

গোত্রান্তর

কুসুমপুরের রেল-স্টেশন থেকে হাঁটাপথে মিনিট পাঁচেকের দূরত্বে বেশ সুন্দর একটা বাজার বসে। এসব জায়গায় দশ-বারো বছর আগেও দিনের বেলা শেয়াল ডাকত। বর্তমানে এত লোক বেড়ে গিয়েছে যে, কোথাও একফোঁটা জমি খালি পড়ে নেই। সকাল ছ'টা থেকেই থলে হাতে লোক আসতে শুরু করে বাজারে। সাতটার মধ্যে জোর কেনাবেচা আরম্ভ হয়ে যায়। চলে সেই যার নাম বেলা এগারোটা অবধি। ন'টার ভেতর ব্যস্তবাগীশ অফিসের বাবুরা ঊর্ধ্বশ্বাসে আধকিলো আলু, দু'শো গ্রাম ঢেঁড়স, একআঁটি লাল শাক, আড়াইশো গ্রাম চারাপোনা আর একটা পাতিলেবু কিনে বাড়ি ফিরে যায়, তাদের ট্রেন ধরবার বড্ড তাড়া। এরপর আসে রিটায়ার্ড বুড়ো আর বাড়ির গিন্নীর দল। আজকাল মেয়েদেরও বাজার করার রেওয়াজ হয়েছে। তবে এদের হাতে চটের থলে বা নাইলনের ব্যাগের বদলে থাকে প্ল্যাসটিকের ঝুড়ি ব্যাগ। এই দলটাকে ঠকানো শক্ত। অফিসবাবুরা তাড়ার মাথায় দরদাম করবার সময় পায় না। এরা প্রত্যেকটা আলু আর বেগুন টিপে দেখে, দর

পছন্দ না হলে পাশের দোকানে যায়, ওজন করার সময় কাঁটার দিকে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে বলে—ও কি হচ্ছে? ও আলুটা নামালে কেন? কাঁটা সোজা হয় নি এখনো—

এই বাজারে আজ বছর দুয়েক হল গৌরদাসী কুমড়ো, শাক, লাউ, বেল এসব বিক্রি করে। আগে ছেলে আসত। হঠাৎ তার কি মতি হল কে জানে, কাঁচামালের ব্যবসা ছেড়ে সে এক সন্ন্যাসীর আখড়ায় গিয়ে নাম লেখাল। বড় বড় চুল রাখল, লাল কাপড় পরা ধরল—কেবল অনেক চেষ্টাতেও জটা গজায় নি এখনো। সবাই বলে—গৌরদাসী, তোর ছেলে উদাসী হয়ে গিয়েছে—

গৌরদাসী অসুবিধেয় পড়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবার মানুষ না। সে তেজের সঙ্গে জবাব দেয়—উদাসী হয়েছে তো কি?

—না, তাই বলছি। তোর চলা-চলতির একটা ব্যবস্থা তো দেখতে হবে—

—সে আমি নিজে দেখে নেবো। তোমাদের ভাবতে হবে না।

মাস দু'-তিন ছেলের মতিগতি ফেরবার আশায় ছিল গৌরদাসী। এর মধ্যে ছেলে বিড়ি ছেড়ে গাঁজা ধরায় সে মনঃস্থির করে কাঁচামালের পাইকার নিমাই হাজরার কাছ থেকে একঝুড়ি পাঁচমিশেলী তরকারী নিয়ে একদিন কুসুমপুরের বাজারে এসে বসল। বসল মানে কি, মুখের কথাতেই কি বসা যায়? এই তিন মাসে ছেলের বসার জায়গা বেহাত হয়ে গিয়েছে। রমরমা বাজার—এতটুকু জায়গা পড়ে নেই। কে বসতে দেবে তাকে? তবে গৌরদাসীর দুটো বড় মূলধন ছিল। প্রথমত, সে প্রয়োজন হলে তোষামুদে কথা বলে লোককে ভিজিয়ে জল করে দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হওয়া সত্ত্বেও তার গড়নপেটন বেশ আঁটোসাঁটো এবং কালোর ওপর দেখতে সে মন্দ নয়। এই দুই গুণের সমাহারে পৃথিবীতে অনেকে অনেক কাজ গুছিয়েছে—গৌরদাসীরও নিবারণ মল্লিকের পাশে একটুখানি বসবার জায়গা হয়ে গেল।

প্রথমদিনেই গৌরদাসী অবাক। মাল আনবার সময় সে ভয়ে ভয়ে কম এনেছিল। বিক্রি না হলে তো আবার বয়ে নিয়ে ফিরতে হবে। রাস্তা তো কম না। ট্রেনে একঘণ্টার পথ। কিন্তু প্রথমদিন বেলা দশটার মধ্যে তার একঝুড়ি তরকারী বিক্রি হয়ে গেল। কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে সে যখন বগলি থেকে নোট আর খুচরো পয়সা বের করে গুনছে, নিবারণ মল্লিক তাকে ডেকে বলল—একেবারে সঙ্গে উঠে যেও না। মাসের প্রথম, বাজারও আজ ক'দিন একটু ভাল চলছে। এমন বিক্রি রোজ হবে না গো—

কিন্তু নিবারণের ভবিষ্যৎবাণীর সারবত্তা অপ্রমাণ করে গৌরদাসী রোজই বেলা দশটার মধ্যে ঝুড়ি শেষ করতে লাগল। তার প্রধান মূলধন দুটি বোধহয় এর কারণ। মাস ছয়েকের ভেতর বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে ফেলে গৌরদাসী অন্য কাঁচামাল বিক্রেতাদের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াল।

ছুটির বা পরবের আগের দিন বাজার গরম থাকে। সেদিন নির্ভাবনায় ডবল মাল আনা যায়। বিক্রি হবেই। পয়লা বৈশাখের দিন দুই আগে গৌরদাসী বাজারের উত্তর কোণে মাছওয়ালা মহেশকে গিয়ে বলল—মহেশভাই, আমাকে একশোটা টাকা দেবে?

মহেশ একটু বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল—একশো টাকা? ভাঙানি চাইছ?

—না, হাওলাত চাইছি। পরশু বাজারের পরে দিয়ে দেব। কাল একঝুড়ি বেশি মাল আনব, তাই—

মহেশ পাকা লোক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল—পরশু পরবের জন্য বেশি বিক্রি হবে এই আশায় আনছো তো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে তোমার টাকাটা না নেওয়াই ভাল। রাগ কোরো না। তুমি তরকারী বিক্রি করো, তোমার পুঁজি অল্প। মাল যদি কোনো কারণে বিক্রি না হয় তাহলে টাকা আটকে যাবে। তরকারী বেচে তুমি কতদিনে শোধ করবে আমার টাকা? মাঝখান থেকে টাকার জন্য আমাদের সম্পর্কটা যাবে—

মহেশ মিষ্টিমুখের লোক, সে বেশ মিষ্টি কথাতেই প্রত্যাখ্যান করল বটে, কিন্তু গৌরদাসীর মনে ব্যাপারটা খুব লাগল। তার মনে হল. সে তরকারী বিক্রি করে বলে মহেশ তাকে ছোট করল। বাজারের লোকেদের ভেতর এ জিনিসটা সে লক্ষ্য করেছে। যারা মাছের ব্যবসা করে তারা কাঁচামালের বাজারের লোকেদের পাত্তা দিতে চায় না। তার এ ধারণা দৃঢ়মূল হল নবীন রায়ের ছেলের মুখেভাতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে। নবীন মাছের ব্যবসা করে সম্প্রতি অবস্থা ফিরিয়েছে। বেশি বয়েসের ছেলে, আহ্লাদ করে বাজারের প্রায় সবাইকে নেমন্তন্ন করেছে। মা কালী বাসনালয় থেকে পলকাটা একখানা স্টেনলেস স্টীলের বাটি কিনে মার্বেল কাগজে মুড়ে নেমন্তন্ন খেতে গেল গৌরদাসী। নবীনের বৌ টিয়ারঙের শাড়ি পরে ছেলে কোলে বসে আছে। গৌরদাসী বাটিটা খোকার হাতে দিয়ে উপস্থিত মেয়েদের সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করল। যারা বসে আছে তাদের স্বামীরা মাছ বিক্রি করে, গৌর-দাসীকে তারা বিশেষ আমল দিল না। বাইরে এসে গৌরদাসী দেখল বারান্দায় পাতা শতরঞ্চিতে কাঁচামালের ব্যাপারীরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। হারু প্রামাণিক ডেকে উঠল—ও গৌরদি, এখানে এসে বোসো।

গৌরদাসী গিয়ে বসল বটে, কিন্তু তার মনে হতে লাগল তাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ঘরের মধ্যে গিয়ে বসতে পারলে তার মনটা ঠাণ্ডা হত। নবীন রায়ও নিজের দলের লোকেদের হেসে হেসে খাতির করছে। ঠিক ঈর্ষা বা রাগ নয়, কি একটা নাম-না-জানা অস্বস্তিতে গৌরদাসীর মন ছটফট করতে লাগল।

যে ব্যবসাবুদ্ধি আর ইচ্ছাশক্তির জোরে ফোর্ড বড়লোক হয়েছিলেন, আলা-মোহন দাস দাসনগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই একই স্ফুলিঙ্গ গৌরদাসীর ভেতরেও ছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রে তার শিক্ষাও নেই, পারিপার্শ্বিক অবস্থাও প্রতিকূল। তবু নিজের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে গৌরদাসী কাজে লেগে গেল। প্রথমেই পুঁজি কিছু বাড়ানো দরকার, মূলধন ছাড়া কোনো কাজ হবে না।

গৌরদাসী দেখল একবেলা বাজার করে বেশি কিছু জমানো অসম্ভব। দুবেলা খাওয়া আর যাতায়াতের ভাড়া বাদ দিয়ে গোটা পাঁচেক টাকা বাঁচে। তাও তো মাঝেমধ্যে রেলের চেকারবাবুকে টাকাটা—আমটা দিতে হয়। তার নিজের মান্থলি টিকিট আছে বটে, কিন্তু মালের ঝুড়ির ওজন নিয়ে রেলের বাবুরা বড় হুজ্জুতি করে। ষাট কিলো মাছ ফ্রি, তারপর প্রতি কুড়ি কিলোগ্রাম পিছু আলাদা ভাড়া। কোনো কোনোদিন নৈহাটিতে ট্রেন থামলে চেকারবাবু উঠে ভেণ্ডারদের

মাথাপিছু একটাকা করে নজর নেয়।

গরম বেশ পড়েছে। গৌরদাসী ঠিক করল সে সন্ধ্যেবেলা একঝুড়ি করে পাকা আম নিয়ে বসবে। অবশ্য তাহলে তার রাত্তিরে বাড়ি ফেরা হয় না। দরকারই বা কি? পনেরো টাকায় বাজারের ধারে একটা টালির ঘর ভাড়া নিল গৌরদাসী। এগারোটা নাগাদ ঘরে ফিরে দরজার সামনে পা ছড়িয়ে বসে বিক্রির হিসেব করে। একদিন ভানু সাঁতরা হেসে বলল—কি গৌরদি, আজ অনেক লাভ করেছো মনে হচ্ছে! অত টাকা চারদিকে ছড়িয়ে করছো কি?

গৌরদাসী অমায়িক হেসে উত্তর দেয়—তা কি করবো ভাই? কুড়ির হিসেবে গুনতে হয় তো! কুড়ির ওপরে জানি না, তাই ভাগ করে নিতে হয়—

শুধু দু'বেলা বাজারে বসলেই পয়সা জমানো যায় না, আরো কিছু কৌশল করতে হয়। কাউকে শিখিয়ে দিতে হল না, গৌরদাসী সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই সে-সব কৌশল শিখে নিল। সন্ধ্যের দিকে চৌধুরীবাবু, পালবাবু, মিত্তিরমশাই এরা সব বাজারে আসে। সব সময়ে যে কিছু কিনতে আসে তা নয়। এমনি বাজার ঘুরে দেখে, এটা-ওটা দর করে। পছন্দ হলে দুটো গন্ধরাজ লেবু কিংবা একটা পাকা ফুটি কিনে ফেলে। প্রৌঢ় অবসরপ্রাপ্তদের এই দলটাকে চিনে ফেলেছে গৌরদাসী। দেখলেই পানখাওয়া ঠোঁটে হেসে বলে—বাবু যে! আজ খুব ভাল আম ছিল, ভাবছিলাম—বাবু তো এখনো এলেন না। কতটা দেব?

ঝুড়ির ওপর উপুড় হয়ে নিজেই আম বেছে দেয় গৌরদাসী। আঁচল সরে যায়, কি করে ঠিক করবে বেচারী, সে তো আম বাছাই করায় ব্যস্ত। বাজারের কোণের দিকে আমের ঝুড়ি নিয়ে বসে গৌরদাসী। এদিকে ইলেকট্রিকের আলো তেমন পৌঁছয় না। মোমের অনুজ্জ্বল আলোর বৃত্তের ভেতর পালবাবু কি মিত্তির-মশাইয়ের মনে নিষিদ্ধ রোমাঞ্চের ঢেউ জেগে ওঠে। জবজবে তেল দিয়ে আঁচড়ানো কোঁকড়া চুল, আঁচল ঠিক করার সময় পায় নি, গৌরদাসী আম ওজন করছে দাঁড়ি-পাল্লায়। সংসারের ভারে অবসন্ন জীবনের শুষ্কতায় সামান্য নিভৃত সুখের মুহূর্ত। কে আর নজর রাখে পাল্লার দিকে? ওজন হয়ে যায়, পয়সা হাত বদল হয়। হাসিমুখে গৌরদাসী বলে—আবার আসবেন বাবু, কাল-পরশু হিমসাগর আনবো। আঁটি না, কিছু না—শুধু শাঁস।

মেয়েদের কাছে এ কৌশল চলে না। তাদের জন্য লম্বা নখ রেখেছে কড়ে আঙুলে। পাল্লার তলায় মরচে ধরে ভেঙে গিয়েছে এক জায়গায়। মুখে অনর্গল কথা বলতে বলতে নখের ডগা ভাঙা খাঁজে বিঁধিয়ে নিচের দিকে হাল্‌কা টান দেয়। ওই এক টানেই দেড়শো থেকে দুশো গ্রাম লাভ। মূলধন না জমে উপায় কি!

মাস ছ'য়েকের মধ্যে গৌরদাসীর বুকে অনেকখানি সাহস এসে গেল। অমর শিকদার তাদেরই শিমুরালির লোক, জ্যান্ত চারাপোনা নিয়ে বাজারে আসে। তালপাতার বেড়া দেওয়া ঘরে থাকত, খেত পান্তাভাত, কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ। মাছ বিক্রি করে সে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। এখন তার পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনির দেওয়ালের ওপর করোগেট টিনের ছাদ। উঠোনে হাঁস-মুরগী যথেচ্ছ চরে বেড়াচ্ছে। একদিন বিকেলের বাজারে না বসে দুপুরের ট্রেন ধরে শিমুরালি গেল গৌরদাসী। অমর শিকদারের বাড়ি ঢুকে চারদিকে তাকিয়ে বেশ জোর গলায় বলল—বাঃ, দেখলে চোখ জুড়োয়! লক্ষ্মীশ্রী বটে! তা হবে না কেন? অমর আমাদের সোনার

চাঁদ ছেলে। ভাল লোকের ভালই হয়—

অমর দাওয়ার ওপর মাদুরে শুয়েছিল, সে উঠে বসে বলল—আরে, মাসী যে! হঠাৎ কি মনে করে? এসো, বোসো—

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল অমরের বৌ মিনতি। তাদের অবস্থার উন্নতি হওয়ায় প্রতিবেশীরা বেদম চটেছে, কেউ আর প্রশংসা না করলে বাড়িঘর করে বা গরু পুষে লাভ কি? গৌরদাসীকে পেয়ে স্বামী-স্ত্রী যেন হাতে স্বর্গ পেল। দাওয়ায় ফুলকাটা আসনে বসিয়ে তারা গৌরদাসীর মধুমাখা কথা শুনলো সন্ধ্যে অবধি। খেতে দিল মুড়ি আর একবাটি দুধ। পান সেজে দিল মুস্কিপাতি জর্দা দিয়ে।

চলে আসবার সময় গৌরদাসী বলল—ও বাবা অমর! তুমি তো চড়কতলার আড়ত থেকে রোজ মাছ নিয়ে যাও বাজারে, টাকা দিয়ে দিলে ওই সঙ্গে আমার জন্য কিছু মাছ নিয়ে যাবে বাবা? আমি মেয়েমানুষ—আড়তে গেলে দরে ঠকিয়ে দেবে—

অমর অবাক হয়ে বলল—তুমি মাছের ব্যবসা করবে মাসী?

—ব্যবসা আর কি! দু'-চার পয়সার মাছ নিয়ে বসবো বই তো নয়! আমি কি আর তোমার মত ব্যবসা করতে পারবো বাবা?

আজ গৌরদাসীকে অদেয় কিছুই নেই। অমর রাজি হল।

গৌরদাসী আজকাল আর তরকারী বিক্রি করে না। দু'খানা কানা উঁচু লোহার পরাতে কই আর জিওল মাছ নিয়ে বসে। মাছ বয়ে আনবার খরচ তার নেই, পরিশ্রমও নয়। কেবল সপ্তাহে একদিন শিমুরালি গিয়ে অমরের বৌয়ের তোয়াজ করে আসতে হয়। রাত্তিরে নিজের ঘরে বসে খুচরো টাকা আর পয়সা গুনে গুনে বিরক্তি ধরে গেল গৌরদাসীর। বাজারে এখন তার খুব খাতির। সবাই স্বীকার করে—একবছর দোকান করে আর কাউকে এতটা উন্নতি করতে দেখা যায় নি।

সবারই জীবনে একটা চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, গৌরদাসীও ছিল। সেটা অবধি ভগবান পূরণ করেছেন গতকাল। নিবারণ মল্লিক তার কাছ থেকে একশো টাকার নোট ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বেশ দরের ব্যবসায়ী বলে না মনে করলে তার কাছে কেউ একশো টাকা ভাঙাতে যায় না।

সেদিন সকালের বাজার শেষ হবার পর টাকাগুলো গোছ করে নিচ্ছিল গৌরদাসী। ছোকরা শম্ভু গড়াই এসে বলল—মাসী, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল—

টাকার ওপর ঝপ্ করে আঁচল চাপা দিয়ে গৌরদাসী বলল—কি কথা?

—আমাকে শ'-দুই টাকা ধার দেবে মাসী? ব্যবসার জন্য দরকার ছিল। শুক্রবার শোধ করে দেব—

সামান্যক্ষণ কি ভেবে গৌরদাসী বলল—দিতাম। কিন্তু তুমি বাবা টাকা নিও না। তোমার পুঁজি অল্প। ব্যবসার কথা বলা যায় না—টাকা আটকে গেলে তরকারী বেচে আমার টাকা তুমি শোধ দিতে পারবে না। না বাবা, ও টাকা তোমার না নেওয়াই ভাল—

রামজীবন অবশ্য খুবই হৃদ্যতা দেখালেন। না দেখানোর কথাও নয়। মায়ের দিক দিয়ে সম্পর্কটা তো দূরের বলা যায়। নানা রঙের আলো দিয়ে সাজানো একটা আশ্চর্য সুন্দর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি সবাইকে অভ্যর্থনা করছিলেন। সঞ্জয়কে দেখেই এমনভাবে তার হাতদুটো জড়িয়ে ধরলেন যেন সে আসবে বলেই এতক্ষণ তিনি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সঞ্জয় নিচু হয়ে প্রণাম করতে গেল, রামজীবন বাধা দিয়ে বললেন—আরে থাক, কাজের বাড়িতে আর অত প্রণাম করে না। তারপর? বৌমা ভাল তো? মেয়েটি কত বড় হল?

সঞ্জয় একটু লজ্জা পেয়ে বলল—আজ্ঞে, মেয়ে না—আমার একটিই ছেলে—

—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ। ছেলেই তো বটে! নানা গোলমালে সকাল থেকে মাথাটা একদম—

সঞ্জয় দুঃখের সংগে লক্ষ্য করল রামজীবন বিশেষ অপ্রস্তুত হলেন না। এত নিকট আত্মীয়ের সন্তান ছেলে কি মেয়ে তিনি জানেন না, সেজন্য কিছুটা লজ্জিত হলে মানাতো। অবশ্য সামান্য ব্যাপারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লে এতদূর ওঠা যায় না। একেবারে 'কিছু না' থেকে শুরু করে 'সব কিছু' অবধি অর্জন করতে হলে যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

একটা জলপাই রঙের কনটেসা গাড়ি এসে থামলো গেটের সামনে। নিখুঁত থ্রি-পিস স্যুট পরা এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক নামলেন গাড়ি থেকে, পেছনে তাঁর স্ত্রী। ভদ্রলোকের চোখের নিচে প্রকট অমিতাচারের মাংসের পুঁটলী, ঠোঁট ভিজে ভিজে—শ্লথ। ভদ্রমহিলা আপাদমস্তক রঙ করা, মাথায় পাখির বাসা। রামজীবন আবার এমনভাবে এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের হাত ধরলেন, যেন এঁর জন্যই তিনি সেই কখন থেকে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে।—এত দেরি যে? আসুন মিসেস্ রায়—

মিস্টার রায় বললেন—আর বলেন কেন? নাথমল গ্রুপের কেসটা ট্রাইবুনালে যাচ্ছে, ব্রিফ টাইপিং শেষ হতেই সন্ধ্যে। বাড়ি গিয়েই মিসেসকে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি—

—আসুন, আসুন। ভেতরে চলুন—

তারপর হাজরা, তারপর মজুমদার, তারপর সেন, চক্রবর্তী এবং প্রামাণিক। হরেক রঙের ঝকঝকে গাড়িতে রাস্তাটা ছেয়ে গেল।—একি দত্তসাহেব, একা যে! মিসেস্ কই?

—তিনি আসতে পারলেন না, সিনসিয়ারলি রিগ্রেট করেছেন। দুপুর থেকে ভয়ানক মাথাধরা—এ টাইপ অফ্ মাইগ্রেইন আর কি।

—ও, আই অ্যাম সো সরি—

মিনিট কুড়ি বাদে রামজীবন হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে বললেন—আহা হা! তুমি এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছ? যাও, ভেতরে গিয়ে বোসো—

ভেতরে বিপুল আয়োজন। সারি সারি স্টীলফ্রেমের চেয়ার, মাথার ওপর ঝাড়লণ্ঠন, লুকোনো মাইক্রোফোনে সেতার বাজছে। দামী শাড়ি, জড়োয়া গয়না, চুরুট, পাইপ। সঞ্জয় সংকুচিতভাবে কোণের একটা চেয়ারে গিয়ে বসল। তার মনটা

হঠাৎ খারাপ হয়ে গিয়েছে। রামজীবন একবারও জিজ্ঞাসা করেন নি সুমিতা কেন এলো না, খোকা কেন এলো না। অথচ মিসেস্ দত্ত কেন আসেন নি সে কথা ব্যাকুল হয়ে বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন। আর তাছাড়া এখানের এই সুবেশ, সুখী মানুষদের মধ্যে তাকে একদম মানাচ্ছে না। হাতের উপহারের প্যাকেটটা কোনো-রকমে নতুন বৌয়ের হাতে দিয়ে পালাতে পারলে সে বাঁচে। কিন্তু কাকে বলা যায় নতুন বৌয়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য?

ব্যস্তভাবে বাড়ির ভেতর থেকে রামজীবনের ছেলে অভিরূপ বেরিয়ে এল। সুন্দর কাজ করা গরদের পাঞ্জাবিতে তাকে ভারি মানিয়েছে। তারই বৌভাত, কাজেই সে তো আজকে ব্যস্ত থাকবেই। সঞ্জয় কাছে গিয়ে বলল—ভাল আছ অভি?

অভিরূপ প্রথমটা যেন তাকে চিনতে পারল না, তারপরেই হেসে বলল—আরে! সঞ্জয়দা যে! কতক্ষণ এসেছো?

এই একটু আগে, বাইরে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। তোমার বৌ দেখাবে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—এসো আমার সঙ্গে।

যাবার আগে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা চাবির রিং বের করে বছর পঁচিশের এক যুবকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অভিরূপ বলল—মৈনাক, প্লিজ টেক মাই অ্যাম্বি, পার্ক স্ট্রীটে গিয়ে পেরেরাকে বলে আয় আর এক ক্রেট আইসক্রিম রেডি রাখতে।

নববধূর হাতে মা কালী বস্ত্রালয় থেকে ধারে কেনা শাড়ির প্যাকেটটা দিয়ে আবার বাইরে এসে চেয়ারে বসল সঞ্জয়। অভিরূপকে আর দেখা যাচ্ছে না। আশ্চর্য! ছোটবেলায় তারা দু'জনে কত খেলা করেছে আর আজকে—অভিরূপেরও কি খেয়াল করা উচিত ছিল না যে সুমিতা আসে নি? অবশ্য তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, অল্পবয়েসে অবস্থার পার্থক্যটা বন্ধুত্বের অন্তরায় হয় না। আজ অভিরূপ অনেক বড় হয়েছে, বাবার ফার্মে বসে মাসে পনের-কুড়ি হাজার টাকা রোজগার করে। তার বর্তমান বন্ধুদের সে বেশি খাতির তো করবেই। সঞ্জয় সরকারী অফিসে সামান্য মাইনের চাকরি করে। যতই আত্মীয়তা থাকুক—মনের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহুদিন।

শহরের সবচেয়ে দামী কেটারিং সার্ভিস এসেছে লোক খাওয়াতে। বড় বড় লম্বা মাছের ফ্রাই পাতে পড়তে সঞ্জয়ের মন খারাপ আরো বেড়ে গেল। সুমিতা এত মাছ খেতে ভালবাসে, অথচ সে-ই এসব খেতে পাচ্ছে না। চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা ভাল মাছের দর বাজারে। তার উপার্জনে সে মাছ কেনা সম্ভব নয়। হপ্তায় দু'-তিন দিন তেলাপিয়া, ভোলা বা সিলভারকাপ আসে। মাসে একদিন কাটা পোনা। তাও তিনশো গ্রাম এবং দু'বেলা ধরে খাওয়া হয়।

হাত দিয়ে ফ্রাই ভাঙতেই ভেতরে ভেটকির মোটা টুকরো, ভাঁজে ভাঁজে সুগন্ধি গলা মাখন। এলো চিকেন বিরিয়ানি, মাছের আর একটা কি রান্না। ঐ জিনিসটা আর একটু খেতে ইচ্ছে হয়েছিল সঞ্জয়ের, কিন্তু রান্নার নাম জানা না থাকায় চাইতে পারল না। এভাবে তো আর বলা যায় না—'ও মশাই, মাছের ওই ইয়েটা আর একটু দিন দেখি'—সুমিতা এলে বড় ভাল হতো, এদের এত ফেলাছড়া যাচ্ছে। খোকা অবশ্য মাছ ভালবাসে না। সে আইসক্রিম খেতে পারত প্রাণভরে। বেচারা পাড়ায় ঠেলাগাড়ি করে বিক্রি করতে আসা কাঠিতে আটকানো পঁচিশ পয়সা

দামের আইসক্রিম ছাড়া কিছু খায় নি।

সুমিতা নিজেই আসতে চায় নি। রামজীবনের ঐশ্বর্য সঞ্জয়দের পরিবারে প্রায় প্রবাদে পরিণত। তাঁর ছেলের বৌভাতে পরে যাবার মত শাড়ি-গয়না সুমিতার নেই। বিয়ের বেনারসীখানার রঙ ফিকে হয়ে গিয়েছে, সবুজ জর্জেট দিয়েছে পোকায় কেটে। সুমিতা গতকালই বলে দিয়েছে—আমার যাওয়া হবে না, অসুবিধে আছে। তুমি বরং অফিস থেকে চলে যেও—

নেহাৎ কাপড়খানা ধারে পাওয়া গিয়েছে তাই রক্ষে। নইলে তারও আসা হত না।

এদের বাড়িতে আজ শুভ উৎসব, সঞ্জয়ের উচিত নয় মনে কোনো বিরূপ ভাব রাখা। কিন্তু চারদিকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উপকরণের ছড়াছড়ি, উগ্র সাজ, ভদ্র কাশি—সব মিলিয়ে মনের ভেতরটা কেমন যেন বিদ্রোহ করে ওঠে। ওদিকের সারির একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়ে রামজীবন কাকে যেন খাতির করছেন। সঞ্জয়ের মামুলী জামাকাপড়, মামুলী চেহারা—দীর্ঘদিন অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তার ভাবভঙ্গির ওপরে ছড়িয়ে পড়া একটা মামুলিত্বের ছাপ। সে অবাঞ্ছিত না হলেও অনাদৃত।

প্যাঁচানো গলি দিয়ে বাড়ির পথ। একপাশে খোলা নর্দমা। পিচ উঠে গিয়ে রাস্তা এবড়ো-খেবড়ো হয়ে রয়েছে। ক্লান্ত পায়ে বাড়ির দিকে এগুতে সঞ্জয় মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করল—টাকাপয়সা বড় কথা নয়, মনুষ্যত্বই বড় কথা। কে কেমন জামাকাপড় পরেছে তাতে কিছু এসে যায় না, জামাকাপড়ের নিচে হৃদয়টা ঠিক জায়গায় আছে কিনা তাই দিয়ে মানুষের প্রকৃত বিচার।

কিন্তু এসব উপদেশ মন প্রবোধ মানে না। বুকের ভেতরটায় আদর না পাওয়ার জ্বালা কষ্ট দেয়।

কোন্ মহাপুরুষ যেন বলেছিলেন—প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সঞ্চয় যদি পাপ না হয়, তাহলে চুরি করাও পাপ নয়। বড় সত্যি কথা।

দরজা খুলে দিল সুমিতা। সঞ্জয় বলল—অনেক রাত হয়ে গেল না? খোকা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি? খুব খাওয়ালো, জানো? তোমার জন্য এত মনখারাপ করছিল!

উত্তরে সুমিতা বলল—তুমি এসে পড়েছ ভালই হয়েছে, কেবল ভাবছি এত রাত হচ্ছে কেন! দুপুর থেকে খোকার জ্বর এসেছে।

—সে কি! কত জ্বর? থার্মোমিটার দিয়েছিলে?

—বিকেলে তো কমই ছিল। সন্ধ্যের পর থেকে বাড়তে শুরু করেছে। একটু আগে দেখলাম একশো দুই। একা একা ভয় করছিল!

—চল, চল দেখি—

নীল রঙের পুরনো মশারীর মধ্যে খোকা শুয়ে। সঞ্জয় কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সুমিতার দিকে তাকিয়ে সে বলল—একটা কাজ করো, আমি হাতমুখ ধুয়ে আসছি, তুমি ততক্ষণে একটু জলপটি দেবার ব্যবস্থা করো। পটি বসিয়ে হাওয়া দেবে।

এক একটা দিন যেন যাবতীয় মনখারাপ আর দুশ্চিন্তার কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে আসে। আজকের সারাটা দিন তেমনি কাটছে। পায়জামা আর গেঞ্জী পরে

সিগারেট হাতে মশারীটা একটু সরিয়ে খাটের একধারে বসল সঞ্জয়।

—জ্বরটা কিন্তু এখন আরো বেশি লাগছে। একবার দেখ তো—

মশারীর ভেতর ডানহাত বাড়িয়ে ছেলের কপাল স্পর্শ করল সঞ্জয়। জ্বর বেড়েছে বটে।

—কতক্ষণ আগে থার্মোমিটার দিয়েছিলে?

– তা, তুমি আসার আধঘণ্টাখানেক আগে।

—এখন আর একবার দাও তো।

—একশো তিন।

সঞ্জয় বলল—শোনো, জলপটি আর দিও না। ওর মাথাটা ভাল করে ধুইয়ে দিই এসো। তুমি খোকাকে এদিকে মাথা করিয়ে শোয়াও, আমি জল নিয়ে আসছি। রবারক্লথ আছে?

—ছিল তো, এবারের গরমে গলে গিয়েছে। সে দিয়ে হবে না—

—আচ্ছা, তুমি ওকে ঘুরিয়ে শোয়াও, আমি দেখছি।

বারান্দার কোণে পুরনো খবরের কাগজের তলা থেকে একটা ভাঁজকরা পলিথিনের শিট বেরুলো। এটা দিয়ে বেশ কাজ চলে যাবে। বাথরুম থেকে বালতি করে জল আর মগ নিয়ে এল সঞ্জয়। সুমিতা মশারী থেকে বেরুতে যাচ্ছিল, সে বলল—তুমি ভেতরে থাকো, আমি ধুইয়ে দিচ্ছি। খোকার গায়ে চাদরটা ঢাকা দাও, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

—তোমার শরীর খারাপ হবে। সারাদিন বাইরে থাকো, কত কাজ করো।

—তুমিও তো বাড়িতে সারাদিন কত কাজ করো। করো না?

আধঘণ্টার ওপর মাথায় জল ঢালা চললো। রাত সাড়ে এগারোটা। সঞ্জয় বলল—এবার জ্বরটা দেখ তো, কমেছে বোধহয়।

—একেশো চার।

সুমিতার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে।—এমনভাবে জ্বর বাড়ছে কেন গো? একটা কিছু করো—

খোকা জ্বরের ঘোরে চোখ বুজে শুয়ে রয়েছে। ঘুম না আচ্ছন্নভাব ঠিক বোঝা যায় না।

কিন্তু সঞ্জয়ের মনে কোনো ভয় নেই, বরং কেমন একটা ক্রোধ মিশ্রিত জেদের ভাব জেগে উঠেছে। সর্বত্র পরাজয়? অনাদর? মাথা নিচু করে মেনে নেওয়া? না, খোকার জ্বর কমিয়ে আনতেই হবে।

—ভয় পেয়ো না। দাঁড়াও, জলটা বদলে আনি। আরো জল ঢালতে হবে।

এবার সুমিতা বাইরে বসে খোকার মাথা ধুইয়ে দিতে লাগল, সঞ্জয় গিয়ে বসল খোকার পাশে।

সোয়া বারোটা।

চুপি চুপি, সুমিতাকে জানতে না দিয়ে, আর একবার থার্মোমিটার লাগালো সঞ্জয়।

প্রায় একশো পাঁচের কাছাকাছি।

খাপসুদ্ধ থার্মোমিটার তোষকের নিচে লুকিয়ে রেখে সঞ্জয় বিছানা থেকে নামল।

—কি হল? কোথায় যাচ্ছ?

সঞ্জয় বলল—তুমি জল ঢালতে থাকো, আমি চট্ করে একবার ডাক্তার চক্রবর্তীর বাড়িটা ঘুরে আসি।

সুমিতা বালতির মধ্যে মগ ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—কেন? সত্যি করে বলো, তুমি কি কিছু খারাপ বুঝছো? ডাক্তারের কাছে যাচ্ছ কেন?

—আরে, না না! তবু বেশি রাত হবার আগে ডাক্তারের সঙ্গে একটা পরামর্শ করে রাখা ভাল। যদি পরে আরো বাড়ে, বুঝলে না? এখন তো জ্বর কমই লাগছে।

পায়জামার ওপরেই শার্ট গলিয়ে বেরুল সঞ্জয়। রাত ঝিম্‌ঝিম্ করছে। নির্জন রাস্তায় কড়া ইলেকট্রিকের আলো একধরনের অদ্ভুত অনুভূতি জাগায় মনে। যেন আশ্চর্য কোনো জাদুতে শহরের সব মানুষ উধাও হয়ে গিয়েছে। ঝক্‌ঝকে ইলেকট্রিকের আলো পিছলে যাচ্ছে পিচের ওপর। কয়েকটা কুকুর কেবল ম্লানমুখে শুঁকে দেখছে ডাস্টবিনের আবর্জনা, ফেলে দেওয়া টিনের কৌটা। সঞ্জয়ের খুব রাগ হল। কেন রে বাপু, আজ এত বিয়েবাড়ি শহরে, সে-সব জায়গায় যা না কেন! এখানে কি পাবি?

চাঁদ উঠেছে আকাশে গোল থালার মত। কিন্তু শহরে তার কোনো প্রতিফলন নেই।

চক্রবর্তী ডাক্তার লোক ভাল। ঘুমচোখে উঠে এসে সব শুনে বললেন—ভয়ের কিছু নেই। আমি দুটো ট্যাবলেট দিয়ে দিচ্ছি। মিজোরাল ট্যাবলেট। একটা এখনি খাইয়ে দিন—আধঘণ্টার মধ্যে জ্বর নেমে যাবে। পরে যদি আবার বাড়ে, আর একটা দেবেন। তবে দু'ঘণ্টার ভেতর নয়।

তারপর সঞ্জয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন—ছিঃ, এত ঘাবড়ে গেলে কি চলে! ছেলের বাবা হয়েছেন, এটা জানেন না বাচ্চাদের জ্বর হলে একটু বেশিই হয়।

—আপনি একবার চলুন ডাক্তারবাবু, আমার স্ত্রী খুব ভয় পেয়েছেন।

ডাক্তার চক্রবর্তী হাসলেন।

বৌমাকে বলবেন প্রয়োজন বুঝলে নিশ্চয় যেতাম। যান, দেরি করবেন না, ওষুধটা খাইয়ে দিন গিয়ে।

কাঁধের নিচে হাত দিয়ে মাথা উঁচু করে গুঁড়ো করা ট্যাবলেটটা খোকাকে খাইয়ে দিলে সুমিত্রা।

—মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালবো?

—দরকার নেই। ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। ডাক্তারবাবু তো বললেন এখুনি জ্বর নেমে যাবে। মিনিট পনেরো বাদে সুমিতা বলল—দেখ তো খোকার ঘাম হচ্ছে কিন্তু—

—তার মানে জ্বর নেমে যাচ্ছে। থার্মোমিটার দাও। দেখি, আমি বের করে দিচ্ছি।

তোষকের তলায় লুকোনো থার্মোমিটার বের করে সুমিতার হাতে দিল সঞ্জয়। এবার একটা সিগারেট খাওয়া যেতে পারে।

দেওয়ালে বাবার আমলের পুরনো রেগুলেটর ঘড়িটা একটানা টিক্‌টিক্

শব্দ করে চলেছে। সিগারেটের বিসর্পিল ধোঁয়া ধীরগতিতে উঠে যাচ্ছে ছাদের দিকে। কাল আবার অফিস। ট্রাম-বাস, অচেনা মুখের ভিড়, সব জায়গায় ছোট হয়ে থাকা, ভয়ে ভয়ে থাকা। অল্প আছে, তাই যা যায় তা একান্তই যায়। তার পরদিন আবার অফিস।

চাকা ঘুরে ঘুরে বার বার এক বিন্দুতে এসে স্থির হয়।

খুশিমাখা গলায় সুমিতা বলল—জ্বর অনেক কমে গিয়েছে। একশো পয়েন্ট পাঁচ।

সঞ্জয় উঠে এসে ছেলের গায়ে হাত দিল।—আরো কমে যাবে, ঘাম হচ্ছে।

ঠিক এই সময় লোডশেডিং হয়ে গেল। আজকাল প্রায়ই গভীর রাতেও হচ্ছে। টেবিলের ওপরে রাখা ছোট্ট ল্যাম্পটা জেবলে দিয়ে সিগারেটের টুকরোটা ফেলবার জন্য জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল সঞ্জয়।

সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল জ্যোৎস্না। এতক্ষণ বিদ্যুতের নকল উজ্জ্বল আলোয় কোথায় লুকিয়ে ছিল, এবারে রাতের প্রকৃত স্বরূপের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। মেঘহীন স্বচ্ছ আকাশে বিশাল চাঁদ—এতবড় চাঁদ শেষ কবে দেখেছে সঞ্জয় মনে করতে পারে না। বাইরে উঠোনের কলতলাটা, যেখানে রোজ সকালে ভূপতি মিত্র লুঙ্গি পরে উবু হয়ে বসে অসভ্যের মত দাঁত বের কবে দাঁতন ঘসে. বাসনমাজা ছাই আর ডাঁটার ছিবড়ে ছড়িয়ে থাকে শানের ওপর—সে জায়গাটাও এই জ্যোৎস্নায় কি সুন্দর দেখাচ্ছে! পাশে শীর্ণ, কোনমতে টিকে থাকা আমগাছটা আজকের মায়াবী চাঁদের আলোয় রূপকথার বৃক্ষ হয়ে উঠেছে, যার তলায় আশ্রয় নেয় ক্লান্ত রাজপুত্র, ডালে বাসা বাঁধে ব্যাঙগমা-ব্যাঙগমী।

খোকার জ্বর নেমে যাচ্ছে। বাইরে এমন জ্যোৎস্না। পৃথিবী কি সুন্দর।

মনের ভেতর সারাদিনের সঞ্চিত তিক্ততার জট উল্টোদিকে ঘুরে যাচ্ছে।

সুমিতা জিজ্ঞাসা করল—কি দেখছো গো ওখানে দাঁড়িয়ে?

মাথা না ঘুরিয়েই সঞ্জয় ডাকল—এসো, আমার কাছে এসো একটু—

স্ত্রীকে আদর করে একহাতে জড়িয়ে ধরে সঞ্জয় বলল—দেখ বাইরেটা কি সুন্দর দেখাচ্ছে।

অনন্ত জ্যোৎস্নায় চোখ মেলে রইল দু'জনে। আমপাতায় মৃদু বাতাসের কাঁপন কবেকার হারিয়ে যাওয়া কোন্ বসন্তদিনের আধো ভুলে যাওয়া গানের কলি মনে এনে দেয়, প্রথম যৌবনের আশাভরা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে সুমিতা বলল—তখন শোনা হল না। কি কি রান্না হয়েছিল গো বিয়েবাড়িতে? মাছ করেছিল?

গভীর মমতায়, এত মমতা সে বুকের মধ্যে অনেকদিন অনুভব করে নি. স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সঞ্জয় বলল—এবার মাইনে পেলে তোমার জন্য বড় ভেটকি মাছ নিয়ে আসব, কেমন?

সর্বত্র পরাজয় নেই। ধোঁয়ায় ধুলোয় ভরা ভয়ানক গতিতে ছুটে চলা জীবনটার সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে। অনেক দুঃখ এসে জড়িয়ে ধরে, বাসা ভেঙে সুখের পাখি উড়ে যায় দূর দিগন্তে—সকালের ফুল বিকালে ম্লান হয়ে যায়। তারই ভেতর মাঝে মাঝে এমন আশ্চর্য সুন্দর জ্যোৎস্না রাত।

হারানো বিকেল

আমার অধ্যাপক বন্ধু হেসে বললেন—তোমাদের শহুরে চোখে এ জায়গাটা হয়তো ভাল লাগবে না। সিনেমা হল নেই সুপারমার্কেট নেই, সিগারেট ফুরিয়ে গেলে আধ মাইল হেঁটে যেতে হয়—টেলিভিশনের রিসেপসনও ভাল না, কোলকাতা থেকে অনেকটা দূর পড়ে যায় তো। প্রথম দিকে অনেকেই কিনে ফেলেছিল, ব্যাপার-স্যাপার দেখে কম দামে শহরবাসী আত্মীয়দের বিক্রি করে দিয়েছে। আমাদের কলেজও মোটামুটি কলেজ। ছাত্রসংখ্যা কম, শীতের দিনে সবুজ প্যান্টের সঙ্গে নস্যিরঙের চাদর গায়ে জড়িয়ে পড়তে আসে। তোমরা যাকে লাইফ বল, তা এখানে নেই।

বন্ধু থামলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—তাহলে তুমি এখানে পড়ে আছো কেন?

ছাত্রজীবনে বন্ধু কবিতা লিখতেন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন—যা নেই তা তো শুনলে, এবার কি আছে তা শোনো। এখানে দশ মিনিট হেঁটে গেলে বড় বড় বাঁশবন আছে ছবির মত সুন্দর গ্রাম আছে, বিশাল বিল আছে একটা—শীতকালে শুকিয়ে গিয়ে খটখট করে। একটা গ্রাম্য নদী আছে, মাত্র পনেরো মিনিট তার জলের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে স্পষ্ট বুঝতে পারবে সে নদীতে সামান্য স্রোতও আছে। এখানে পথ দিয়ে হেঁটে গেলে লোকে হাতজোড় করে বলে—'নমস্কার মাস্টারমশাই, ভাল আছেন তো?' এইসব কারণে এখানে রয়ে গেলাম—

—বিকেলে আমাকে এই মাঠ, আর নদী, আর বাঁশবন দেখাতে নিয়ে যাবে?

বন্ধু আবার হাসলেন, বললেন—'নিয়ে যাবো। খেয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও।'

দুপুরের রোদ একটু গড়িয়ে গেলে আমরা বেরুলাম।

হেমন্তের অপরাহ্ন ভারি সুন্দর। সিগারেট ধরিয়ে দুই বন্ধু হাঁটছি পাশাপাশি। মাঠে মাঠে গা এলিয়ে পড়ে রয়েছে হলুদ রোদ্দুর, মাটির ঢেলার ফাঁক ফাঁকে হলুদ-ঠ্যাং শালিকপাখি ঠোঁট দিয়ে তুলে নিচ্ছে ঝরা ফসলের দানা, নুয়ে পড়া বাঁশের ডগায় বসে তীক্ষ্ণ শিস দিচ্ছে দোয়েল পাখি। কিছুক্ষণ শুনলে মনে হয় যেন বলছে—আমি নিইচি তুই দেকিচিস?

ধানকাটা মাঠে শুকনো খড়ের নাড়া পড়ে আছে। হেমন্তের উষ্ণতায় মাটি থেকে, খড় থেকে এক আশ্চর্য সুঘ্রাণ উঠছে। বন্ধু আস্তে আস্তে কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। তাঁর গলা ভাঙা ভাঙা, এতদিন পরেও উচ্চারণে নিজের জেলার টান, কিন্তু মাঠের গন্ধ, হলুদ রোদ্দুর আর মনের আনন্দ মিশে ছিল বলে খুব ভালো লাগছিল শুনতে।

নদীর ধারে বসে কিছুক্ষণ গল্প করলাম দুজনে, তারপর আবার ফেরা। সূর্য অস্ত গিয়েছে এই একটু আগে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসে সামান্য ঠাণ্ডার আমেজ। পথের ধারে কাদের কুমড়োর ক্ষেত নতুন কাটা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সেখানে দাঁড়িয়ে বন্ধু একটা সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন হাওয়া বাঁচিয়ে।

আমি হঠাৎ পথ থেকে একটু সরে এসে বাঁশের বেড়ার ওপর হাত রেখে দাঁড়ালাম। সদ্য কাটা বাঁশের তাজা উদ্ভিদজ গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। বাতাসে

আসন্ন হিমের ছোঁয়া। নির্জন প্রান্তরে রাত নামছে। বন্ধুর কোঁচা উড়ছে হাওয়ায়।

বহুদিন আগে, ঠিক এমন করেই, এমনই একটি সদ্য কাটা বেড়ার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম সন্ধ্যেবেলা। বেদনার নীড়ের মত মনের মধ্যে সেই পুরনো স্মৃতি হঠাৎই দিন শেষে সুরে কেঁপে কেঁপে উঠলো।

কতদিন হয়ে গেছে তারপর। একদিন যা নিতান্তই বর্তমান ছিল, অনেক-গুলো বছরের পর আজ তা কেবলই রোমন্থনের বিষয়।

আসলে মানুষ ভোলে না কিছুই—বুকের ভেতর কোথাও সমস্ত কথা জমা হয়ে থাকে। ঠিক সময়টিতে যেমন আজ এই হেমন্তের বিকেলে, নতুন করে মনে পড়ে যায়।

সময়ের গতি প্রকৃতই আপেক্ষিক। কতটুকু সময়ই বা দাঁড়িয়েছিলাম মাঠের মধ্যে বেড়াটার পাশে? মিনিট পাঁচ-সাত সবসুদ্ধু? বন্ধু সিগারেট ধরিয়ে অন্য মনে পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন, বেড়ার ওপরে হাত রেখে সামনে তাকিয়ে আছি আমি—এই সামান্য সময়ের মধ্যেই ফেলে আসা কৈশোরের কয়েকটা মাস আবার নতুন করে কাটালাম মনে মনে।

অনুরাধার গলায় আমি জীবনে প্রথম মফচেন দেখি। আমার ছোটবেলার সেই ছোট্ট না-শহর-না গ্রাম, বাবা চাকরি করতেন সেখানে। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল অনুরাধাদের বাড়ি। সামনে সবুজ বাগান, দুই বাড়ির মাঝখানে বেড়া দিয়ে ভাগ করা। বেড়াটার কোনো মানে ছিল না— ওদের বাড়ি থেকে সত্যনারায়ণের সিন্নি আসতো আমাদের বাড়ি, খালি থালাবাটি ফেরৎ দিতে নেই বলে এদিক থেকে মা তাতে সাজিয়ে দিতেন নারকোলের ছাঁচ। ওদের বাগানের লাউডগা বাড়তে বাড়তে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে আমাদের লেবুগাছের গোড়া জড়িয়ে ধরত, আমাদের গাছের পাকা পেয়ারা ঝরে পড়ত ওদের বাগানে। মধ্যে বেড়াটা দাঁড়িয়েছিল মানুষের অধিকারবোধের হাস্যকর প্রতীক হিসেবে।

আমাদের বাগানে নিমগাছের তেডালায় কাকে বাসা বেঁধেছিল। একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে খেলতে যাবো বলে তৈরি হতে হতে বাগানে অনেক কাকের ডাক শুনতে পেলাম। বেরিয়ে এসে দেখি একটা কাকের ছানা বাসা থেকে গড়িয়ে পড়ে গিয়েছে মাটিতে বেড়ার ধারে। কাকেরা খুব সামাজিক প্রাণী, কোথা থেকে গোটা পঞ্চাশ ষাট কাক জড়ো হয়েছে বিভিন্ন গাছের ডালে। তারা পরিত্রাহি ডাকছে। এর মধ্যে ছানাটার বাবা-মাকে আলাদা করে বোঝবার উপায় নেই।

ভাল করে দেখবার জন্য বাগানে গিয়ে দাঁড়াতেই কাকেদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। আমি নিচু হয়ে ছানাটাকে দেখছি, আর একের পর এক কাক উড়ে এসে আমাকে ঠোকরাবার চেষ্টা করছে। ওদেরই বা দোষ কি! মানুষ ঢিল আর গুলতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে এমন করেছে যে, ওদের কেউ ভাল চায়, তা ওরা ভাবতেই পারে না।

কি করে ছানাটাকে আবার বাসায় তুলে দেওয়া যায় ভাবছি, হঠাৎ মনে হল বেড়ার ওপাশে কে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুখ তুলে প্রথমেই চোখে পড়ল অনুরাধার গলার মফচেনটা।

ভারি সুন্দর ছিল ডিজাইনটা, এখনো মনে আছে। একটা করে যবদানা, কিছুটা চেন, তারপর আবার একটা যবদানা। বিকেলের পড়ন্ত রোদের ছোঁয়া লেগেছে অনুরাধার মুখে। আমি বোকার মত কেমন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমাদের

পরিচয় কিছু নতুন না, আজ চার-পাঁচ বছর আমরা পাশাপাশি বাস করছি। কিন্তু বিকেলের সেই পড়ন্ত আলো, নিমের পাতায় ঝিরঝিরে বাতাস, অনুরাধার মুখে বয়ঃসন্ধির অলৌকিক তারুণ্য—সবকিছু মিলিয়ে হঠাৎ মনে হল যেন নতুন কাউকে দেখছি।

এর সঙ্গে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমার খুব লজ্জা হল।

এর আগে কোনো খেয়াল হয় নি; এখন তাকিয়ে দেখলাম নীলরঙের হাফপ্যান্টের তলা থেকে আমার দুই রোগা ঠ্যাং বেরিয়ে রয়েছে, হাঁটুর গাঁটটা বিসদৃশভাবে প্রকট। হাওয়াই শার্টের নিচের দিক থেকে দুটো বোতাম নেই। বিষম কুণ্ঠায় আমার গলার কাছে গুটলি পাকিয়ে উঠতে লাগল।

অনুরাধা কিন্তু সহজভাবেই বলল—গাছে তুলে দেবে না পাখিটাকে?

আমি মাথা কাত করে ইঙ্গিতে জানালাম—হ্যাঁ।

—দাড়াও, আমাদের আঁকশিটা নিয়ে আসি। আঁকশির মাথায় করে তুলে ওটাকে বাসায় তুলে দাও—

ততক্ষণে আমি গলার আওয়াজ কিছুটা ফিরে পেয়েছি। বললাম—আঁকশি লাগবে না আমি গাছে উঠে গিয়ে রেখে আসছি।

অনুরাধা হেসে বলল—তাহলে আর দেখতে হবে না! গাছে উঠলে কাকেরা তোমাকে ঠুকরে শেষ করে দেবে। দাঁড়িয়ে থাকো, আমি এক্ষুনি আসছি—

আঁকশি এনে অনুরাধা নিজেই পাখিটাকে কায়দা করে বাসায় তুলে দিল। বোধ হয় এই বুদ্ধিটা তারই মাথায় এসেছিল বলে, এবং আমার ক্ষমতাকে তাচ্ছিল্য করেছিল বলে আমার খুব রাগ হল। সমস্ত ব্যাপারটা আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম, সাহায্য করতে এগুলাম না।

কাজ হয়ে গেলে সুন্দর ভঙ্গিতে বর্শা ছোঁড়ার মত করে আঁকশিটা নিজেদের বাগানে ফেলে দিয়ে অনুরাধা আমার দিকে তাকাল। রাগ আর সঙ্কোচ মিলিয়ে একটা কেমন যেন অনুভূতি বুকে নিয়ে আমি গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে অনুরাধা বলল—তোমার রাগ হয়েছে, না? কেন? আমি কি কোনো রাগের কথা বলেছি?

তাকিয়ে দেখলাম—এই প্রথম কোনো অনাত্মীয় মেয়েকে এত কাছ থেকে দেখলাম—অনুরাধার ঠোঁটের ওপরে একটা তিল। কয়েকটা চুল ঘামে কপালের সঙ্গে লেপটে আছে। একটা আশ্চর্য সুন্দর সুবাস আসছে ওর দিক থেকে ভেসে।

আমার রাগ ধুয়ে গেল। থাকলো সঙ্কোচ—আর তার সঙ্গে একটা বিচিত্র মনোভাব। যেন এক্ষুনি আমাকে খুব কঠিন একটা কিছু করে দেখিয়ে দিতে হবে পুরুষ হিসেবে আমি কতখানি যোগ্য। যেমন, সজোর টানে ছিঁড়ে ফেলবো একটা মোটা দড়ি—অথবা একলাফে ডিঙিয়ে যাবো বাগানের মধ্যের বেড়াটা। কিংবা খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলে অনুরাধাকে তাক লাগিয়ে দেবো।

কিন্তু মূলত আমি ছিলাম লাজুক। বারবার কেবল মিনমিন করে বলতে লাগলাম—রাগ করিনি তো! বা রে! রাগ করতে যাবো কেন?

বড়ো হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতাটা সবদিক দিয়ে যে খুব মধুর তা নয়। একদিকে যেমন আশ্চর্য কতগুলো অনুভূতির দরজা খুলে যাচ্ছিল, আর একদিকে পৃথিবীর সত্যিকারের রূপটাকে একটু একটু করে চিনতে পারছিলাম।

মজুমদারদের বাগানের পেছনের বেড়ায় একজায়গায় ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। আমরা পাড়ার ছেলেরা মাঝে মাঝে সেখান দিয়ে ঢুকে ফল পেড়ে খেতাম। একদিনের কথা মনে আছে, সেটা বিশেষ কোনো ফলেরই সময় নয়—কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল সারি সারি পেঁপে গাছে বিস্তর কাঁচা পেঁপে ঝুলছে। পেঁপেই সই—পকেটে কাগজে মুড়ে নুন নিয়ে আমরা ঢুকে পড়লাম মজুমদারদের বাগানে।

আমাদের সঙ্গে ছিল দীপেশ। তাকে আমার কেন যেন খুব পছন্দ হত না। এক একজন ছেলে থাকে যারা বয়েসের তুলনায় খুব চালাকচতুর হয়। পরে দেখেছি বড়ো হয়ে এরাই করিৎকর্মা হিসেবে নাম কেনে, ভাল কোম্পানীতে মোটা মাইনের চাকরি পায়। দীপেশ সেই ধরনের ছেলে ছিল। বোধ হয় ওর থেকে সব বিষয়ে আমি খাটো, এই ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার ছিল বলেই ওকে আমার ভাল লাগত না।

একটা ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে আমি ছুঁড়তেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীপেশও একটা ঢিল ছুঁড়লো। দুটো পেঁপে পড়ল একসঙ্গে, একটা বড়—একটা ছোট। আমি দৌড়ে গিয়ে বড়টা তুলে নিতেই দীপেশ প্রায় ধমকের সুরে বলল—এই! কি হচ্ছে কি? ওটা আমাকে দে—

আমি অবাক হয়ে বললাম—বাঃ, এটা তোমাকে দেবো কেন? ওইটে তুমি নাও—

—না, বড়টা আমার ঢিলে পড়েছে। দিয়ে দে আমাকে—

আমাদের দলে অনেকেই দীপেশের শিষ্য, তারাও বলতে লাগল বড় পেঁপেটা দীপেশের ঢিলে পড়েছে। কিন্তু আমি চোয়াল শক্ত করে বললাম—না, এটা আমার। তুমি ছোটটা নাও গে যাও—

দীপেশ যেন একটু অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, যেন আমার মত নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছেলের কাছে ও এরকম ঔদ্ধত্য আশা করেনি। তারপর নিজের দলের দিকে তাকিয়ে বলল—এ ছেলেটা তো ভারি ত্যাঁদড় হয়ে উঠেছে দেখা যাচ্ছে। আমাকে বলল—এখনও ভাল কথায় বলছি, দিবি কিনা বল?

বললাম—না, দেবো না। কি করবে তুমি?

আমার কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, দীপেশ ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মেরেই সঙ্গে সঙ্গেই অন্য হাত দিয়ে বড় পেঁপেটা কেড়ে নিল।

এত দ্রুত ঘটল ব্যাপারটা যে, আমি কিছু করবার সুযোগই পেলাম না। অবশ্য কিইবা করতাম আমি? দীপেশের স্বাস্থ্য আমার চেয়ে ভাল, দলেরও অনেকেই ওর দিকে। খুব লেগেছিল গালে। ব্যথাটা একটু জমে আসতে দেখলাম ওরা জামরুল গাছের নিচে বসে ছুরি দিয়ে কেটে পেঁপে ভাগ করছে।

পরাজয় মেনে নিয়ে এমনি এমনি চলে আসা যায় না। সেটা মার খাওয়ার চেয়েও অপমানজনক। আমি হেঁকে বললাম—দাঁড়াও না। দেখো তোমার কি করি!

ওর দলের ছেলেরা হেসে উঠল। ছুরি দিয়ে পেঁপের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দীপেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—যাঃ যাঃ—

এই ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। মজুমদারদের বাগানের একটা দূর কোণে গিয়ে আমি চুপ করে বসে রইলাম। মনে মনে দীপেশের কত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করলাম। চকবাজারের রাস্তায় অন্ধকার রাত্তিরে মাথায়

কালো থলে পরিয়ে বাবার বাঁদর-তাড়ানো লাঠি দিয়ে বেদম ঠ্যাঙালাম দীপেশকে। আমাদের বাগানের আমগাছের ডাল থেকে পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে নাকে নস্যি দিয়ে দিলাম।

কিন্তু মনের জ্বালা কিছুতেই গেল না। আরো লজ্জার কথা এই যে, সেদিনের দলে অনুরাধার ভাই ছিল। ও নিশ্চয় বাড়ি গিয়ে সবাইকে বলে দেবে আমার মার খাওয়ার কথা।

এই ঘটনা আমি কাউকে বলিনি। বাবাকেও না। কারণ জানতাম বললে কোনো ফল হবে না। দীপেশের বাবা আমার বাবা যে ইস্কুলে কাজ করেন তার সেক্রেটারী। শহরের একজন প্রতাপশালী লোক। তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে তাঁকে গিয়ে কিছু বলা বাবার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আবার জীবনের সুন্দর দিকও ছিল।

আমি যখন ক্লাশ এইটে পড়ি, তখন বাবা কোলকাতার একটা স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে আসেন। চলে আসবার কিছুদিন আগে একটা শিরশিরে অঘ্রাণের ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম আকাশ মেঘলামত করেছে, বাগানে কেমন একটা হালকা ছায়া। হঠাৎ আমার মন ভারি খুশি হয়ে উঠল। সেদিন রবিবার, ইস্কুল যেতে হবে না, সেটাও আনন্দের একটা কারণ। বাড়ির পেছনের দরজা খুলে আস্তে আস্তে বাগানে গিয়ে দাঁড়ালাম। গাছের গুঁড়ি বেয়ে কাঠপিঁপড়ে ওঠানামা করছে। বাতাসে সকালের আমেজ। এইরকম বাতাসে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থেকেও বলে দেওয়া যায় —এখন সকাল।

বাগানে যেদিকে গাছপালা খুব ঘন, সেখানে গিয়ে ঘাসের ওপর থেবড়ে বসলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের পেছনটা শিশিরে ভিজে গিয়ে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতে লাগল। সামনেই ঘাসের দুটো লম্বা শিসের মধ্যে একটা লুচির সাইজের ছোট্ট মাকড়সার জাল। তাতে শিশিরের কণা পড়ে ঝলমল করছে।

আমার হাতের ওপরে গাছের পাতা থেকে এক ফোঁটা শিশির পড়ল।

যেখান দিয়ে শিশির পড়েছে, আন্দাজ করে সেইখানে মুখ বাড়িয়ে ওপর দিকে তাকালাম।

টুপটুপ করে শিশির পড়তে লাগল আমার গালে, থুতনিতে, কপালে।

ইস্কুলে বাংলার মাস্টারমশাই নিরঞ্জনবাবু ক্লাশের ছেলেদের গল্প-কবিতা লিখতে উৎসাহ দিতেন। আজ পর্যন্ত কখনো মনে হয়নি আমি কবিতা লিখতে পারবো—ইচ্ছেও হয়নি। কিন্তু এমন চমৎকার সকালে হঠাৎই মনে হল একটা কবিতা লিখলে মন্দ হয় না। দৌড়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ইস্কুলের পরীক্ষা থেকে বাঁচানো কাগজ আর বারো আনা দামের 'রাইটার' পেন নিয়ে এসে গাছের নিচে বসেই একখানা কবিতা লিখে ফেললাম।

সে কবিতায় 'বিমল', 'ভাতিছে', 'প্রভাত' এসব শব্দের খুব প্রাচুর্য ছিল। পরের দিন ইস্কুলে গিয়েই নিরঞ্জনবাবুকে কবিতাটা দেখালাম। উনি পড়া শেষ করে বললেন—হুঁ।

বললাম—কেমন হয়েছে স্যার?

—ভালোই হয়েছে। কোথা থেকে টুকেছিস? সেটটাই মনে করবার চেষ্টা করছি—

নিরঞ্জনবাবু কিছুতেই বিশ্বাস করলেন না কবিতাটা একান্তই আমার। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, তাতে আমার দুঃখ না হয়ে বরং আনন্দই হল। তাহলে আমি এমন একখানা কবিতা লিখেছি যেটা আমার নিজের লেখা বলে বিশ্বাস করছে না কেউ। তার মানে লেখাটা সত্যি ভাল হয়েছে।

অবশ্য আমার সাহিত্যসাধনার সেখানেই শুরু, সেখানেই শেষ। কারণ পরপর কয়েকটা কবিতা লিখে ফেলবার পর ওই বয়েসেই আমি একটা মূল্যবান আবিষ্কার করলাম। দেখলাম বর্ণনা দিয়ে আমি কিছুতেই আসল ব্যাপারটার কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি না। আবছা আবছা বুঝতে পারলাম যা দেখে প্রেরণা আসে—ভাষা দিয়ে অবিকল তাকে ফুটিয়ে তোলা খুব কঠিন কাজ। ঝমঝম বৃষ্টিতে জানালার ধারে বসে একটা কবিতা লিখেছিলাম। দিনপাঁচেক বাদে সেটা পড়ে আমার কিছুই মনে হল না। অথচ 'আজ বারি ঝরে ঝরঝর' গানটা শুনলে বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেতাম। গুটিকয় কবিতার পর আমার সাহিত্যিক সম্ভাবনা ফুরিয়ে গেল।

যেদিন আমরা চলে আসবো, তার আগের সন্ধ্যেটা খুব মনে পড়ে। বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটেছিল বলে নয়—বিশেষ একটা অনুভূতি হয়েছিল বলে।

সারাটা দিন ধরে জিনিসপত্র বাঁধাবাঁধি চলেছে, তাতে আমার কোনো ভূমিকা নেই। এতদিন বাস করেও এ শহরে আমার কোনো প্রাণের বন্ধু হয়নি—কাজেই কাউকে ছেড়ে যেতে হবে বলে মন খারাপও হচ্ছে না। বরং নতুন জায়গায় যাবো বলে মনে কেমন একটা চাপা উত্তেজনা।

বিকেলে বাগানে গিয়ে বসেছিলাম। আস্তে আস্তে রোদ্দুর পড়ে গিয়ে ছায়া ঘন হয়ে এল। সরু একফালি মেঘ দিগন্তের ওপর আটকে থাকা সূর্যটাকে দু-ভাগ করে রেখেছে। কোলাহল করতে করতে পাখির দল মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পুব থেকে পশ্চিমে। আমি দেখেছি বেশির ভাগ পাখিরাই সন্ধেবেলা পশ্চিমদিকে উড়ে যায়। কেন জানি না।

সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া আরো গাঢ় হয়ে এল। একটা নেড়ি কুকুর বাগানের বাইরে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে অকারণেই বহুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাসে সামান্য শীত শীত ভাব। একটু পরেই হিম পড়তে শুরু করবে।

এই সময়ে আমার নাম ধরে কে ডাকল।

তাকিয়ে দেখি বাগানের মাঝখানে বেড়াটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অনুরাধা।

আমি উঠে গিয়ে বেড়ার এপাশে দাঁড়ালাম। অনুরাধা বলল—তোমরা তো কাল চলে যাচ্ছ, না?

—হ্যাঁ।

তারপর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। আমি বুঝে উঠতে পারছিলাম না অনুরাধা কেন আমাকে ডাকল। আমরা কাল চলে যাচ্ছি কিনা জিজ্ঞাসা করবার জন্য? সে তো ও জানেই।

একটু পরে অনুরাধা যেন কিছুটা আত্মগতভাবে বলল—তোমরা চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে। এ বাড়িতে এরপর কারা আসবে কে জানে। আমার খুব মনে পড়বে তোমাদের কথা—

আরো কয়েকটা কথা বলেছিল অনুরাধা, আজ আর ভাল মনে নেই। কিন্তু

আমাদের জন্য অনুরাধার মন খারাপ হবে শুনে হঠাৎ আমারও এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে খুব মন খারাপ করতে লাগল। সকাল থেকে যে উদাসীন বিচ্ছিন্নতা অনুভব করছিলাম সেটা কেটে গেল। যদিও অনুরাধা বিশেষ ক'রে আমার জন্য মন কেমন করবে বলেনি তবু আমার তেমনই ধারণা হল। হয়ত ওই বয়েসে তাই হয়।

অনুরাধা চলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ একা দাঁড়িয়ে রইলাম ঘনায়মান অন্ধকারে। নতুন বাঁশ চিরে বেড়ার একটা অংশ সারানো হয়েছে, সেখান থেকে সদ্য কাটা বাঁশের গন্ধ পাচ্ছি। এই আশ্চর্য সন্ধ্যায় হঠাৎই একসঙ্গে যেন অনেকখানি বড় হয়ে উঠলাম।

এক এক করে অনেক নক্ষত্র ফুটে উঠেছে আকাশে। ঠান্ডা পড়তে শুরু করেছে। বাড়ির ভেতর থেকে বাবার গলার আওয়াজ পাচ্ছি—খোকা কোথায় গেল, খোকা?

জীবনের অনেকগুলো বছরের ওপার থেকে বাবার গলার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাই। যেন কিছুই হারায় নি—যেন সব ঠিক আছে।

বন্ধুর সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছে. বলছেন—কি হে. দাঁড়ালে কেন? চলো—

ঘাসের ওপর ঝরে পড়া হিমের বিন্দুর ওপরে পা ফেলে হাঁটতে থাকি। হঠাৎই আবিষ্কার করি অনুরাধার মুখ আমার কিছুমাত্র মনে নেই. মনে আছে শুধু মফ্‌চেনের ডিজাইনটা।

আটত্রিশ মিনিট

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের লেবেল লাগানো বাদামী ফাইবারের সুটকেস হাতে সাদা রঙ করা কাঠের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়েই আমাকে দেখে বিমলদা বলে উঠলেন—হোয়াই! ইফ্ ইট ইজ নট আওয়ার ওল্ড বিশু! কতদিন পরে দেখা! ওয়েল, হাউ ইজ মম্? মা নিশ্চয়ই একটু সামলে উঠেছেন?

বিমলদার হাত থেকে সুটকেসটা নিয়ে বললাম—এদিক দিয়ে আসুন, প্রিপেড্ ট্যাক্সি ঠিক করা আছে। আর কোনো লাগেজ নেই তো?

—না রে ভাই। অলওয়েজ ট্র্যাভেল লাইট। তা, প্রিপেড্ ট্যাক্সি ঠিক করলি, কত ভাড়া লেগেছে বল—দিয়ে দিই—

—সে আপনার ভাবতে হবে না, মেসোমশাই দিয়ে দিয়েছেন। চলুন—

ভি. আই. পি· রোডটুকু ছাড়িয়ে এসেই আমাদের ট্যাক্সি কলকাতার স্বাভাবিক ট্র্যাফিক জ্যামে আটকে গেল। আন্দাজে বুঝলাম দক্ষিণ প্রান্তে পেঁছিতে এক ঘণ্টার ওপর লেগে যাবে। বিমলদা পকেট থেকে রুমাল বের করে ভাল করে মুখ মুছে বললেন—এই শহরটা দিন দিন যেন কেমন অচল হয়ে যাচ্ছে। ইস্ এত গাড়ি ঘোড়া মানুষ সাইকেল—সব একই রাস্তা দিয়ে চলেছে। জ্যাম তো হবেই। প্লেন ল্যাণ্ড করার আগে নিচে তাকিয়ে দেখছিলাম, সমস্ত শহরের ওপর একটা ধোঁয়া আর ধুলোর চাদর জমে আছে। এমন বিচ্ছিরি লাগে—

ট্যাক্সিকে বলা ছিল মেট্রোপলিটন বাইপাস ধরতে। বালিগঞ্জ দিয়ে শহরে ঢুকে পড়লেই হবে। কিন্তু কলকাতায় পরিকল্পনা মাফিক কাজ করা কঠিন। পার্ক-সার্কাসে ঢোকবার রাস্তার একটু এধারে বাঁধাকপি বোঝাই এক বিশাল ট্রাক আক্সেল ভেঙে কাত হয়ে পড়ে আছে, সমস্ত পথ জুড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে অজস্র

বাঁধাকপি। দু'জন অনিচ্ছুক চেহারার খালাসী একখানা একখানা করে কপি সরিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছে। দু'দিকেই জমেছে লম্বা গাড়ির লাইন।

বুকপকেট থেকে নোটবই আর ডটপেন বের করে বিমলদা খস্ খস্ করে কী লিখতে লাগলেন। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম বিমলদার গালে নীলচে আভা। ফর্সা লোকেদের গালে দাড়ি কামানোর পর এরকম একটা রঙ ফুটে বেরোয়। গায়ে না গেঞ্জি না—শার্ট গোছের সিনথেটিক কাপড়ের জামা। নিখুঁত কাটিংয়ের প্যাণ্ট। সবটা মিলিয়ে চেহারায় নিশ্চিত সাফল্যের ছবি। ট্যাক্সি আবার চলতে শুরু করতেই নোটবুক বন্ধ করে বিমলদা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—কালকে অফিসে একটা টেলেক্স করতে হবে। দু'একটা জরুরী পয়েণ্ট লিখে রাখলাম, পরে ভুলে যাবো—

ব্রিজ থেকে নেমে বালিগঞ্জ স্টেশনের মোড়ের কাছে বিমলদা বললেন—এখানে একটু দাঁড়াতে বল বিশু, মায়ের জন্য কিছু ফল কিনে নিই—

বললাম—দরকার নেই বিমলদা, বাড়ি চলুন সোজা। মাসিমা আজ দুপুরে মারা গিয়েছেন।

এয়ারপোর্টে আমার কথাটা বলা উচিত ছিল। কিন্তু এমন খবর আছে যা প্রথমেই বলে না ফেললে পরে ক্রমশই দেরি হয়ে যায়। তাছাড়া বিমলদা কোনো কারণে ধরে নিয়েছিলেন মাসিমা বেঁচে আছেন, আমি বুঝতেই পারছিলাম না কি করে খবরটা দেব।

বিমলদার মুখে যা ফুটে উঠল তাকে শোক না বলে ববং বিস্ময় বলা যেতে পারে। অবাক হয়ে বললেন—সে কি! মা বেঁচে নেই! কিন্তু আমি তো দেরি করি নি, টেলিগ্রাম পাবামাত্র প্রথম অ্যাভেলেব্‌ল্ ফ্লাইট ধরেছি। অথচ—

বললাম—আপনার কোনো দোষ নেই বিমলদা, মাসিমা খুবই অসুস্থ ছিলেন।

—তা বটে। তবু শেষ সময়টা দেখা হল না—যাঃ।

বিমলদা খুব চটপটে, হিসেবি আর দক্ষ মানুষ। শোকের আবেগ উনি মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দমন করে নিলেন, বললেন—এঃ, মুশকিল হয়ে গেল। আগে জানলে—

—কি হল?

—বেশি টাকা-পয়সা সঙ্গে আনি নি। ফেরার টিকিট আছে, তাছাড়া হাজার চারেক টাকা। টেলিগ্রাম পাই গতকাল সন্ধ্যেবেলা, তখন তো আর ব্যাংক খোলা নেই। হাতে যা ছিল নিয়ে চলে এসেছি। এতে হবে বলে মনে করিস?

—হয়ে যাবে বিমলদা। ঘাটে আর কত লাগে? চিকিৎসার খরচ তো আর নেই—

—আহা, তুই বুঝতে পারলি না, শুধু ঘাটের খরচ নয়। কার্ড ছাপানো, ডেকরেটার, লোক খাওয়ানো, সে কি আর চার হাজারে—কাল সকালেই অফিসে একটা ট্রাঙ্ককল করতে হবে, টাকা নিয়ে যাতে কেউ চলে আসে—

ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি কর্তব্যকর্মে যথাযথভাবে নিষ্পন্ন করার ব্যাপারে নিজের পরিবারে এবং পাড়ায় বিমলদার নাম আছে। পাড়ার বাবারা কোনো বিষয়ে ছেলেদের শৈথিল্য দেখলে উপদেশ দিতেন—বিমলের মত হবার চেষ্টা কর—

বললাম—ব্যাঙ্গালোরের লাইন খারাপ। আপনাকে ট্রাঙ্ককল করবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

—বড় মুশকিল তো! আচ্ছা, দেখা যাক—

বিমলদা বাড়ি ঢুকতেই একটা কান্নার রোল উঠল। সচরাচর এরকমই হয়ে থাকে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করার পর ব্যাপারটা একটু ঝিমিয়ে পড়ে। কেবল নতুন কেউ খবর পেয়ে এসে হাজির হলে আবার একচোট কেঁদে নেওয়া হয়। কিস্তিতে হওয়ার জন্য আত্মীয়স্বজনের ওপর কম চাপ পড়ে।

মেসোমশাই বারান্দার এককোণে চুপ করে বসেছিলেন। গালে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি, পরনে আধ ময়লা ধুতি আর খদ্দরের পাঞ্জাবি। ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি আবার শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

ভেতরের বারান্দায় নতুন খাটে মাসিমার দেহ শোয়ানো রয়েছে। বিমলদা এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে, পায়ে মাথা ঠেকাতে যেতেই বুকপকেট থেকে নোটবই, কলম, সিগারেট লাইটার আর কিছু খুচরো পয়সা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বিমলদা দ্বিধায় পড়েছেন বুঝতে পারলাম, জিনিসগুলো আগে কুড়োবেন, না মাকে প্রণাম করবেন? আমি এগিয়ে এসে সব গুছিয়ে তুলে নিচ্ছি দেখে তিনি হাঁটু গেড়ে মাসিমার পায়ে মাথা রাখলেন।

দৃশ্যটা সত্যিই কেমন অবাস্তব। এই তো সাত-আটদিন আগেও বারান্দার ওই কোণটাতে বসে তরকারি কুটতে কুটতে মাসিমা আমার সঙ্গে গল্প করেছেন। বলেছেন—আজকাল শীতে আর আলুর দর কমে না। মানুষ কি খেয়ে বাঁচবে বলো দেখি বিশু?

—হ্যাঁ, মাসিমা, আপনাদের সময় ছিল অন্যরকম—

—সত্যিই অন্যরকম ছিল। আমরা চার পয়সা সের দুধ খেয়েছি—আমার বাপের বাড়ির গ্রামে ছিল বিধু গোয়ালা। সে পুরো একটা টাকার খদ্দের পেলে ষোলোর বদলে কুড়ি সের দুধ দিত। মাংস ছিল ছ'আনা সের, দুটো ইলিশ মাছ চার আনা। তোমার মেসোমশাই দুটার কম আনতেন না। ওঃ, ভাল কথা মনে পড়েছে, সন্ধ্যেবেলা ফুলকপির সিঙাড়া ভাজবো। তুমি এসে খেয়ে যাবে কিন্তু—

তারপর কথায় কথায় মাসিমা বিমলদার প্রসঙ্গ এনে ফেলবেনই।

—এই রেখার বিয়ের জন্য যা আটকে আছি, বুঝলে বিশু? বিমল তো কেবলই বলছে ওর কাছে গিয়ে থাকতে। কিন্তু ওদেশে মেয়ের জন্য পাত্র পাব কোথা থেকে? গেল হপ্তাতেও বিমল লিখেছে—মা-বাবা ছেড়ে ওখানে ভাল লাগছে না। এবার রেখার ব্যবস্থাটা করেই—

মাসিমা জানেন না, গত পরশু বাজারে মেসোমশাই আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমাদের পাড়ায় কোন্ পিওন চিঠি দেয় বলো তো? ঠিকমত চিঠি পাচ্ছ? বিমলের চিঠি আসে নি আজ প্রায় দেড়মাস, ওর মা খুব চিন্তায় আছেন। পোস্টাপিসে গিয়ে কমপ্লেন করলে ফল হবে মনে কর?

কাজেই গেল হপ্তায় বিমলদার চিঠি আসতেই পারে না। কিন্তু আমি মাসিমাকে সে কথা জানাই না, বলি—যাবেন বই কি, অমন ছেলে থাকতে কেন পড়ে থাকবেন এখানে?

মাসিমা গলা নিচু করে ষড়যন্ত্রের সুরে বলেন—আসলে বৌমা যেন একটু কেমন। খারাপ বলছি না—কিন্তু আমাদের সঙ্গে মেলে না। বড্ড মডার্ন, বিমলকে নাম ধরে ডাকে, তোমার মেসোমশাইয়ের সামনে মাথায় ঘোমটা দেয় না। আবার

শুনেছি নাকি ব্যাঙ্গালোরে নিজে গাড়ি চালায়। ঘোমটা দেওয়া আলতা পরা বৌ হলে আমার হত ভাল—

মাসিমার ভাল হত, কিন্তু বিমলদা চালাতে পারতেন কি? ব্যাঙ্গালোরে ব্যবসা, ককটেল পার্টি, কম্পিউটার সফট্‌ওয়্যার আর ফ্লপি ডিস্‌কের জগতে লালপাড় শাড়ি পরা আলতা পায়ে ঘোমটা মাথায় বৌয়ের স্থান কোথায়?

বিমলদা বারান্দার কোণে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। মেসোমশাই মুখ তুলে তাকালেন ছেলের দিকে, আস্তে আস্তে বললেন—তুই এসে গিয়েছিস, আর আমার চিন্তা নেই। যা করবার তুই-ই কর—

বিমলদা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মেসোমশাই একটু পরে আবার বললেন—বৌমা আর বাচ্চাকে নিয়ে আসবার জন্য তোর কোনো কর্মচারীকে ফোন করে দে। তাদের একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলি না কেন?

—ওদের নিয়ে—মানে, আমি তো বুঝতে পারি নি মায়ের শরীর এতদূর খারাপ, তাহলে অবশ্য—

—এখন আনিয়ে নে। বাড়ির বৌ না থাকলে কাজ হবে কী করে?

একটু বিব্রত গলায় বিমলদা বললেন—আসলে হয়েছে কি, সামনেব মাসের প্রথমেই বুতুসের পরীক্ষা। এই সময়টায়—

মেসোমশাই একবার ছেলের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন—তোর ছেলে তো কেজি ওয়ানে পড়ে, তাই না?

—হ্যাঁ, কিন্তু ওদের স্কুলে ভয়ানক কড়াক্কড়ি। একদিন কামাই করলে প্যারেন্ট কল করে। তাছাড়া টাফ্ কর্মাপিটিশনের যুগ, একটা টার্ম মিস করা উচিত নয়—

মেসোমশাই বিমর্ষ, মৃদু গলায় বললেন—না না, থাক। পড়ার ক্ষতি করে আনার প্রয়োজন নেই।

ওদিকে পাড়ার ছেলেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। তারা প্রফেশনাল শ্মশানবন্ধু, মাসে বিশ জায়গায় মানুষের দায় উদ্ধার করে। একজনের বাড়িতে এত সময় দিলে চলে না।

বিমলদাও তৈরি হলেন কাঁধ দেবার জন্য। তবে তাঁর খালি পায়ে চলা অভ্যেস নেই আদৌ। কার একটা হাওয়াই চটি পরে নিলেন। শোনা গেল রবারের চটিতে কোনো দোষ হয় না। ভিড়ের মধ্যে সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেবার লোক থাকে।

হরিধ্বনি দিয়ে দলটা উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়ল। মেসোমশাই বারান্দার শেষ অবধি গিয়ে একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে বললাম—আপনি যাবেন না?

মেসোমশাই আমার দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলাম লোকটা সত্যি সত্যি বেঁচে নেই, লোকটা আজ দুপুরবেলা মরে গিয়েছে। যা দেখতে পাচ্ছি সেটা একটা শূন্য খোলস। এই খোলসটা এখনো কিছুদিন নড়েচড়ে বেড়াবে। দাড়ি কামাবে, বাজার করে এনে দুপুরবেলা ভাত খাবে, রাস্তা পার হবার সময়ে সতর্কভাবে দু'দিকে তাকিয়ে নেবে, পূর্ণিমার দিন প্রতিবেশীর বাড়িতে সত্যনারায়ণের প্রসাদ পেতে যাবে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে লোকটা একদম মরে গিয়েছে।

মাথা নেড়ে উনি বললেন—না, আমি যাবো না। অনেকদিন একসঙ্গে ছিলাম

বুঝলে ? চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাচ্ছে, দেহটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—সে আমি দেখতে পারবো না। বরং না দেখলে মনে হবে কাছে কাছেই আছে—

তারপর বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার চারদিকে তাকিয়ে বললেন—আমারই কিন্তু আগে যাবার কথা। কতদিন থেকে হার্টের অসুখে ভুগছি, জিভের তলায় সরবিটাল ট্যাবলেট রেখে রেখে চলছে--তাছাড়া আমি বয়েসেও তো আট বছরের বড়। কী অন্যায় কথা বলো তো ? আমি আবার কোনো জিনিস ঠিক সময়ে খুঁজে পাই না, সব ভুলে যাই—আমার পক্ষে এভাবে একা একা—

বলতে বলতে মেসোমশাই বুকপকেটে হাত দিলেন, তারপর পাশের দুই পকেটে। অসহায় ভঙ্গিতে বললেন—আমার চশমা কই ? চশমাটা কোথায় রাখলাম ?

যেন ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে মেসোমশাই চশমা খোঁজবার জন্য বারান্দা দিয়ে শোবার ঘরের দিকে হেঁটে চলে যেতে লাগলেন। আমিও বেরিয়ে এলাম বাড়ি থেকে।

প্রথামত বড় রাস্তার মোড় অবধি শ'দুয়েক গজ কাঁধে করে এনে বর্তমানে মাসিমার দেহ অপেক্ষমান মাটাডোর ভ্যানে চাপানো হচ্ছে। আমাকে দেখে বিমলদা বললেন—কোথায় পিছিয়ে পড়েছিলি ? তুইও যাবি তো সঙ্গে ?

যাবো বই কি, নিশ্চয় যাবো। বিমলদা জানেন না, মেসোমশাই জানেন না—পৃথিবীতে কেউ জানে না রেখার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা। আর কখনো সুযোগ হবে না—মাসিমার শেষ কাজে আমাকে থাকতেই হবে।

বিমলদা এফিসিয়েন্সি কথাটার মূর্ত প্রতীক। শ্মশানে পেঁাছে ঘাটবাবুকে ডেথ-সার্টিফিকেট দেখিয়ে, টাকা জমা দিয়ে, চা-জলখাবারের জন্য শ্মশান বন্ধুদের মাতব্বরকে খরচা বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমার পাশে সিমেন্টের বাঁধানো জায়গাটায় বসে বললেন—সব করে এলাম। ইলেকট্রিক চুল্লী একটা খালি হবে এক্ষুনি, সেটাই আমাদের দিয়ে দেবে। ফরচুনেটলি লাইনে আর কেউ নেই।

পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরালেন বিমলদা, তারপর রথম্যানসের প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে বললেন—চলে ?

বললাম—নাঃ, আপনি খান।

—খাস না ?

—খাই, কিন্তু আপনার সামনে খাবো না।

প্যাকেটটা আবার পকেটে পুরে ফেলে বিমলদা বললেন—ওঃ, এসব পুরনো সেন্টিমেন্ট এখনো বজায় রেখেছিস ! ডেজ আর চেঞ্জিং, ব্রাদার--

উত্তরে একটু হাসলাম।

ধোঁয়া ছেড়ে বিমলদা বললেন—মাদার ডিড্ এ লট্ ফর আওয়ার ফ্যামিলি। বাবা অনেস্ট ছিলেন, কিন্তু টাকা রোজগার করতে হলে এক ধরনের কমার্সিয়াল বুদ্ধি থাকা দরকার, সেটা বাবার ছিল না। ফলে সারা জীবন কষ্ট করে চালিয়েছেন। সেই অল্প আয়ের ভেতরেই মাকে সব করতে হত। মায়ের কাছে আমার ঋণ অনেক। কথায় বলে মাতৃঋণ, বল ? মায়ের কাজে আমি কোনো ক্ষোভ রাখবো না। সেই ঋণের যতটুকু পারি—আচ্ছা, তোর চেনাশুনো কোনো ভাল ক্যাটারার আছে ?

মাসিমার দেহ সামনে খাটের ওপর পড়ে। কিন্তু মেসোমশাই জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছেন। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম বিমলদা বাবার সম্বন্ধে কথা বলবার সময় ক্রিয়াপদের অতীতকাল ব্যবহার করছেন। প্রসঙ্গের মোড় ফেরাবার জন্য জিজ্ঞাসা

করলাম—আপনার কাজকর্ম কমন চলছে বিমলদা?

উৎসাহিত হয়ে বিমলদা বললেন—জাস্ট ফাইন। সফট্‌ওয়্যার নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম—সত্যি কথা বলতে কি, এখন প্রোগ্রামিংয়ের জগতে একটু নামও হয়েছে। নতুন একটা প্ল্যানও মাথায় খেলছে—ভাষার মত প্রোগ্রামিংয়ে যদি শর্ট-হ্যাণ্ডের মতো কিছু আবিষ্কার করা যায়, তাহলে একটাই ফ্লপি ডিস্‌ক থেকে সাত-আট মেগাবাইট বেশি ইনফরমেশন কালেক্‌ট করা যাবে। জিনিসটা করে ফেলতে পারলে—

বিমলদা কত কি বলে যেতে লাগলেন। আমি ইস্কুলে পড়াই আর লিট্‌ল ম্যাগাজিনে কবিতা লিখি, আমি তার অর্ধেকই বুঝতে পারলাম না। গিগাবাইট কাকে বলে? ফোরট্রান এবং ডিবেজ থ্রি প্লাসই বা কি জিনিস?

—আমি ঋণ রাখায় বিশ্বাস করি না, প্রাণপণ কাজ করে জীবন আর পৃথিবীর কাছে যত ঋণ সব শোধ করে যাবো। ও, ভালো কথা, ট্যাক্সির ভাড়াটা তুই নিলি না তো?

বললাম—ওটা সত্যিই মেসোমশাই দিয়ে দিয়েছিলেন—

—সত্যি বলছিস তো? দেখিস যেন—ওই যে ঘাটবাবু ডাকছে, চল চল—আমাদের টার্ম এসে গেছে—

মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে মেটাল ট্রে-তে করে মাসিমার দেহ চুল্লীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ঘাটবাবুর অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বিমলদা বললেন—থরো বার্নিং হতে আটত্রিশ মিনিট সময় লাগবে। ঘাটবাবু জানালেন। এই সময়টা নষ্ট না করে আমরা ব্যবহার করে নিতে পারি। হিন্দুশাস্ত্র কী বলে জানিস তো? যতক্ষণ চিতা জ্বলে ততক্ষণ অশৌচ হয় না। প্লেনে হালকা লাঞ্চ খেয়েছি, আই অ্যাম রিয়ালি স্টারভিং। পরে আবার কখন খাওয়া হবে কে জানে। ওদিকে একটা দোকানে তন্দুরী রুটি আর কোর্মা বিক্রি হচ্ছে, চল খেয়ে নিই—

বললাম—আপনি খান, আমার শরীরটা ভাল নয়। আমি সঙ্গে যাচ্ছি—

চারটে মোটা রুটি আর কোর্মা নিয়ে বসে গেলেন বিমলদা। দ্রুত খেয়ে নিতে হবে। সময় মাত্র আটত্রিশ মিনিট।

তারিণী ঘোষালের অন্তর্ধান

তারিণীদা ছিলেন দিলখোলা আমুদে মানুষ। শতকরা আটানব্বই জনই তাঁকে ভালোবাসতো। একশোর মধ্যে বাকি দু'জনের তারিণীদাকে না-ভালোবাসবার কারণ এই যে, তারা তারিণীদার সঙ্গে পরিচিত ছিল না। তাঁর সঙ্গে আলাপ হবার পরও তাঁকে ভালো লাগে নি—এমন মানুষ আমরা দেখি নি।

আমাদের ছোট্ট শহরের একেবারে প্রান্তে তিনি থাকতেন একটা টিনের চালায়। টিনের চালা বললেও ভুল হয়—ঘরটি একটা পুরনো বাসের বডি কায়দা মাফিক কেটে তৈরি হয়েছিল। নড়বড়ে কব্জার ওপরে যথাযথ স্থানে বসানো ছিল একটি দরজা ও দুটি জানালা। আম কাঠের। জোরে বাতাস দিলেই সেগুলো দমাদম্ খুলতো আর বন্ধ হত। মাটি থেকে ঘরের মেঝে দেড়ফুট উঁচু। ওঠবার সুবিধার

জন্য থান ইঁট পেতে তারিণীদা দুটো ধাপ তৈরি করেছিলেন। ভেতরের দেওয়ালে পঞ্জিকা, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও ঠোঙা ইত্যাদি থেকে কেটে নেওয়া আপ্তবাক্য গঁদের আঠা দিয়ে সাঁটা। গড্ ইজ গুড বা সত্যই পরম ধন—এমন সব বাণী।

আর ঘরের কোণে একটি জিনিস সযত্নে কাপড়ের খোলের মধ্যে ভরা থাকতো। সেটি একটি এস্‌রাজ।

আমরা কেউই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের খুব পাকা সমঝদার ছিলাম না। শুনতে ভালো লাগতো বটে– কিন্তু সঙ্গীতের ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান যতটা ল্যাটিন জানি তার চাইতে বেশি ছিল না। তবু বহু বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যখন আমি আর ব্রতীশ আড্ডা দিতে এসে বৃষ্টির তোড়ে তারিণীদার ঘরে আটকা পড়ে যেতাম - তখন তারিণীদা আস্তে আস্তে কাপড়ের খোলের ভেতর থেকে এস্‌রাজটা বের করতেন। কিছুক্ষণ একটা সুর বাজিয়ে বলতেন– কি রাগ ?

স্বীকার করতাম, আমরা সেটা ধরতে পারি নি।

--এটা বৃন্দাবনী সারঙ্গ। ওঠবার সময় শুদ্ধ আর অবরোহণে কোমল নিখাদ লাগছে। সেখানেই এ রাগের বৈশিষ্ট্য।

বৃষ্টির শব্দের পটভূমিতে আবার ভেসে উঠতো তারিণীদার বৃন্দাবনী সারঙ্গ। আমি গান-বাজনার সমালোচক নই –তবু মনে হত তারিণীদা ভালোই বাজাচ্ছেন। একসময় বাজনার সুর আর বৃষ্টির শব্দ একটা স্থিরবিন্দুতে এসে মিশে যেতো, দুটোকে আর আলাদা করা যেতো না। তখনই এস্‌রাজ নামিয়ে রেখে অন্যমনস্ক হয়ে তারিণীদা একটা বিড়ি বের করে দেড়টাকা দামের দেশী লাইটার দিয়ে ধরাতেন। বলতাম—থামলেন যে ?

—নাঃ, আর বাজালে শেষে মুড্ এসে যাবে। তখন সারারাত বাজিয়ে মরি আর কি!

বলতেন বটে, কিন্তু বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় দেড়শো পা হাঁটার আগেই শুনতে পেতাম তারিণীদা আবার শুরু করেছেন।

তারিণীদার কেউ ছিল না। অন্তত তারিণীদা কখনো কারুর কথা বলতেন না। বছর আষ্টেক আগে একদিন রামচাঁদ মিস্তিরির কাছ থেকে পুরনো লোহার দরে বাসের বডিটা কিনে উনি গৃহপ্রবেশ করেন। তার আগে রেলে চাকরি করতেন। বরকাকানা জংশনে যখন পোস্টিং, সে সময়ে রিটায়ার করেন এবং সটান এখানে চলে আসেন। আট বছরে তিনি আমাদের সবার আপন হয়ে উঠেছেন।

জিজ্ঞাসা করতাম—তারিণীদা, বিয়ে করেন নি ?

হেসে বলতেন—করেছিলাম। কিন্তু রকমসকম দেখে সে আন্দাজ করেছিল শেষ জীবনটা গাছতলায় কাটাতে হবে। সেই ভয়ে আগেই পালিয়েছে।

তারিণীদার মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখের কোনো ছাপ দেখতে পাইনি। বলেছি—কতদিন আগে ?

—চোদ্দ বছর হয়ে গেল।

—আর কেউ নেই আপনার ?

তারিণীদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন—তোমরা আছো।

একদিন আমি আর ব্রতীশ তারিণীদার ওখানে বসে আড্ডা দিচ্ছি, এমন সময়ে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে একজন লোক জিজ্ঞাসা করল—ভেতরে আসতে পারি ?

তারিণীদা হেসে বললেন—চলে আসুন। আমার এখানে অন্দরমহলের নিতান্ত অভাব। ভেতরে এসেই পড়েছেন বলা যায়।

লোকটি ভেতরে এসে বললে—আপনি তারিণী ঘোষাল ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আমার নাম মহিম চৌধুরী। রামনগরে আমার ছোট একটু ব্যবসা আছে। এখান থেকে আট মাইল। রবিবার সারারাত্তির জলসার আয়োজন করেছি, আমার বাড়িতেই। আপনাকে যেতে হবে।

—আমাব কথা আপনাকে কে বললো ?

—লোকের মুখে শুনি। সমঝদার না থাকলে জলসা জমে না। যাবেন তো ?

—যাবো। গান-বাজনা শুনতে আপত্তি কি ?

—আপনাকে কিন্তু বাজাতে হবে—

তারিণীদা একটু অবাক হয়ে বললেন—আমাকে ?

—হ্যাঁ। শুনেছি আপনি ভালো বাজান। সে জন্যই কষ্ট করে আসা।

—আমার কি সে যোগ্যতা আছে চৌধুরীমশায় ?

—সেটা আপনার বাজনা শুনে শ্রোতারা বলতে পারবে।

একটু চিন্তা করে তারিণীদা বললেন—আচ্ছা যাবো।

মহিম চৌধুরী নমস্কার করে বিদায় নিতেই ব্রতীশ বলল—তারিণীদা, প্রোগ্রাম করছেন—খাওয়াতে হবে কিন্তু।

—নিশ্চয়। কি খাবে বলো ?

—জিলিপি।

—চলো তাহলে বেরুই।

নিমাই ময়রার দোকানে আকণ্ঠ জিলিপি খেয়ে আমরা তিনজন সমস্ত সন্ধ্যেটা কুলকুলি নদীর ধারে বসে গল্প করলাম।

তারিণীদা কোনো কথা না বলে জলের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে ছিলেন। বললাম—কি ভাবছেন ?

—ভাবছি, জল কেমন বয়ে যায় !

—তাতে কি ? এ তো পুরনো কথা।

—পুরনো কথাই মাঝে মাঝে চমক নিয়ে আসে, শিবেন। দেখ না কেন, গতিই জীবনের ধর্ম—সব কিছুই বয়ে চলেছে, নড়ে বেড়াচ্ছে। এ কথাটা সবাই জানে, কিন্তু ভুলে থাকে। একদিন সত্যটা হঠাৎ চোখের পর্দায় আঘাত করলে তাক লেগে যায়। অথচ চলাই সব কিছু। জগৎ মানেই তো তাই। গম্ ধাতুর ক্বিপ্ করলে হয় জগৎ—

—আপনারও কি চমক লাগলো ?

—প্রায় তাই। জলের গতিতে নিজের স্থানুত্বকে অনুভব করছি—

কুলকুলির ধারে অন্ধকার নেমে এলো। পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বাব্‌লার বন আবছা হতে হতে মিলিয়ে গেলো একটা কালো পর্দার ওপারে।

তারিণীদা বললেন—পৃথিবীটা যে এক বিশাল সমস্যা, একটা দুর্বোধ্য জিনিস, তার প্রমাণ কি বলো তো ?

—আপনি বলুন তারিণীদা—

বাব্‌লা বনের মাথায় সপ্তর্ষি দেখিয়ে তারিণীদা বললেন—প্রমাণ ঐ সপ্তর্ষি। ব্যাটাচ্ছেলে কত যুগ থেকে জিজ্ঞাসার আঙুল উঁচিয়ে রেখেছে।

আমি আর ব্রতীশ হাসলাম।

—মাথার দিক থেকে ছ'নম্বর তারাটার নাম জানো?

বললাম—বশিষ্ঠ—

—হ্যাঁ। বৌয়ের সঙ্গে বশিষ্ঠের খুব ভাব ছিল। মরবার পরও দু'জনে এক-জায়গায় রয়েছে। দেখো, বশিষ্ঠের পাশেই মিটমিটে একটা তারা দেখছো? ওই হচ্ছে অরুন্ধতী।

নদীর ধার থেকে বাড়ি ফেরবার সময় তারিণীদা মুদির দোকান থেকে চিঁড়ে কিনলেন রাত্তিরে খাবেন বলে।

—রাত্তিরে রাঁধবেন না?

—না ভাই। কে আর ওসব হাঙ্গামা করে! চিঁড়ে ভিজিয়ে নুন-লেবু দিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়বো।

রাস্তার মোড়ে যখন বিদায় নিচ্ছি, তারিণীদা বললেন—শিবেন, হঠাৎ এক একটা কথা মানুষের খুব চকিত করে। আজকের কাণ্ডটা যেমন। ছোটবেলা থেকেই তো নদীর বয়ে যাওয়া দেখছি, তবে আজ বিশেষ করে কি চোখে পড়লো?

ব্রতীশ বলল—তারিণীদা যে দার্শনিক হয়ে গেলেন—

—না ভাই, সে সব কিছু না। হপ্তা খানেকের মধ্যে এ ব্যাপার দুবার ঘটলো তো—তাই আর কি—

—কি হয়েছিল?

—দিন চারেক আগে কালীপদ মিত্তিরের বাড়ি গেছি কি একটা কাজে। কিছুক্ষণ গল্প করার পর যখন উঠে আসবো, মিত্তিরমশাইয়ের ছোট নাতি, বছর চারেক বয়স, এসে আমার কোঁচা ধরে দাঁড়ালো। আদর করতে যাবো, তার আগেই বাচ্চাটা আধো আধো স্বরে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কে? বোঝো ঠ্যালা! আমি কে, এটার উত্তর এতো কঠিন তা তো জানা ছিল না! একটা চার বছরের বাচ্চাকে আমি তারিণী ঘোষাল একথা বলবার কোনো মানেই হয় না। বলতে যাচ্ছি—আমি তোমার দাদু হই, তক্ষুণি ছেলেটা আবার আমাকে বলল—তুমি কে? এবার উল্‌টে আমি বললাম—বলো তো আমি কে? ছেলেটা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—তুমি মানুষ। বলবো কি শিবেন, আমার যেন কেমন তাক লেগে গেল! আমি যে মানুষ, তা কি আর আমি জানতুম না? কিন্তু আচমকা কেউ যদি তোমাকে বলে—তুমি মানুষ, তবে ঘাবড়ে যেতে হয়।

—অতটুকু বাচ্চা এই কথা বললো?

—বিশ্বাস করো, এতটুকু বানিয়ে বলছি না—

একটু চুপ করে থেকে তারিণীদা বললেন—কথাটা শোনার পর থেকে মনটা যেন কিরকম হয়ে আছে। নতুন করে যেন বুঝতে পারছি আমি মানুষ, নতুন করে বুঝতে পারছি জীবনে কিছু করা হয় নি—

ব্রতীশ বলল—নিজের কাজ তো অন্তত মনোযোগ দিয়ে করেছেন।

তারিণীদা আবার যেন কি ভাবলেন, তারপর বললেন—একটা কথা বলি। একথা এই প্রথম তোমরা জানবে। কাউকে কখনো বলি নি, বলার মতোও নয়—

বললাম—কি তারিণীদা?

—নিজের কাজেও আমি বার কয়েক অসাধুতা করেছি। আমি দুবার ঘুষ নিয়েছিলাম।

আমরা চুপ করে রইলাম। তারিণীদা প্রধানশিক্ষকের সামনে তিরস্কৃত বালকের মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন। ব্রতীশ একটুখানি কেশে নিয়ে বলল—সে কিছু না—ওরকম দু'একবার সবারই হয়ে থাকে।

তারিণীদা মাথা নিচু করেই বললেন—কাজটা বড়ো ভুল হয়েছিল। তখন আমার খুব টানাটানি যাচ্ছে। লোকটা এমন লোভ দেখালো—থাকতে পারলাম না—

বললাম—ভুলে যান তারিণীদা—

—কিন্তু সারাজীবন কোনো এমন ভালো কাজ করি নি যাতে এটা ভুলে যেতে পারি। বক্তিয়ারপুরে যখন থাকি, একটা মেয়ে এসে ভিক্ষে চাইছিল—তার ছেলে রুগ্ন, কিছু খায় নি তিনদিন। আমি কিছু দিই নি। জানতাম, এটা বর্তমানে ভিক্ষে চাইবার একটা মনস্তাত্ত্বিক প্যাঁচ। পরের দিন দেখি স্টেশন রোডের ওপর এক ল্যাম্প-পোস্টের নিচে মেয়েটা বসে আছে—কোলে মরা বাচ্চা। হয়তো এতে আমার কোনো দায়িত্ব নেই, হয়তো আগের দিন আরও অনেকে ওকে ভিক্ষে দেয় নি। কিন্তু তাদের সবার প্রত্যাখ্যানের দায়িত্ব যেন আমার কাঁধে এসে বোঝা হয়ে চেপে বসলো। এখনো দৃশ্যটা ভুলতে পারি না।

বিদায় নিয়ে তারিণীদা চিঁড়ে হাতে বাড়ি গেলেন।

রবিবার দিন তারিণীদার সঙ্গে আমরাও মহিম চৌধুরীর বাড়ি গেলাম জলসা শুনতে। ব্রতীশ যেতে চায় নি। তারিণীদা বললেন—কেন? নেমন্তন্ন করে নি বলে যাবে না? তাহলে তোমরা বরং তল্পিবাহক হয়ে চলো। এস্‌রাজটা পালা করে তোমরা দু'জন বইবে, কেমন?

তাই করেই চললাম। রামনগরে বাস থেকে নেমে একটু হেঁটেই মহিম চৌধুরীর বিরাট বাড়ি। বাড়ি দেখে বুঝলাম ভদ্রলোক বিত্তবান। নিচের হলঘরে জলসার আয়োজন হয়েছে। বেশ ভিড়। ঢোকবার মুখে দরজায় একজন লোক সবার গায়ে আতরদান থেকে আতর দিচ্ছে। মহিম চৌধুরী ভদ্রলোক। চরিত্রে দৃঢ়তা আছে, কিন্তু অর্থের দম্ভ নেই। নিজে এসে তারিণীদা ও আমাদের ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

তারিণীদা বললেন—সামনে বসবো না চৌধুরীমশাই। পেছনেই বসি। তাহলে নির্বিঘ্নে শোনা যাবে—

—আপনাকে কখন বসাবো বলুন?

—ভোররাতে বাজাবো। রাত চারটেয় দেবেন। ভৈরবী বাজাবো।

—তাই হবে।

জলসা শুরু হল। প্রথমে কে এক ভদ্রলোক নটকেদারে ধ্রুপদ গাইলেন, ধামার তালে। ধ্রুপদ আমাদের কাছে কঠিন লাগলো। আমি আর ব্রতীশ একবার বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে এলাম। তারিণীদা দেখি মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, চোখ বুঁজে।

তারপর সেতার। রাগ দরবারী। মিষ্টি হাত, বাজনার মেজাজ একটু একটু করে জমে উঠছে। রাত ক্রমে গভীর হয়ে নেমে আসছে চারপাশে। আমরা চুপ।

তারিণীদা স্থির—ধ্যানমগ্ন !

আলাপ জোড়—গৎ—ঝালা। সেতার শেষ। তারপর আবার গান। এবার খেয়াল। তারিণীদা যেন গানে ডুবে গেছেন। কথা নেই—একেবারে নিশ্চুপ।

রাত সাড়ে তিনটে নাগাদ তারিণীদা উঠে বাইরে গেলেন। আমার আর ব্রতীশের ঘুমঘুম পাচ্ছিলো। একটু ঝিমিয়েও পড়েছিলাম। ঘোর ভাঙলো মহিম চৌধুরীর ডাকে।

শুনছেন ? ঘোষালমশাইকে ডাকুন—ওঁর বাজনা হবে এবার।

আমরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। মহিম চৌধুরী আবার বললেন ঘোষাল মশাই কোথায় ?

বললাম—তা তো জানি না। এক্ষুণি উঠে বাইরে গেলেন বোধহয় ইয়ে করতে। ফেরেন নি ?

- না তো !

যেখানে তারিণীদা বসেছিলেন তার পাশে এস্রাজ এবং এস্রাজের পাশে বিড়ির বাণ্ডিল আর সেই দেড়টাকা দামের দেশী লাইটারখানা পড়ে আছে।

বাইরে বেরিয়ে তারিণীদাকে ডাকাডাকি করা হল। পরে লোক লাগিয়ে খোঁজা-খুঁজি করা হল। কিন্তু তারিণীদার সন্ধান পাওয়া গেল না। আসরে নিজের অনুষ্ঠানের মুহূর্তে তিনি কোথায় চলে গেলেন ! আর কোনোদিনই তারিণীদা ফিরে আসেন নি। তিনি কোথায় গেলেন তাও কেউ বলতে পারে না।

এইভাবে তারিণী ঘোষাল মৃত্যুকে ফাঁকি দিলেন। সবাই মারা যায়, সবার অস্তিত্ব লোপ পায়। কিন্তু তারিণীদা পালিয়ে যাওয়ায় তার জীবনের অধ্যায় সেখানেই থেমে রইলো। শেষটুকু আর দেখা হল না। এরপর অনেকদিন কেটেছে এখন হয়তো তারিণীদা আর বেঁচে নেই। তবু অনেক জীবন্ত মানুষের চেয়ে তিনি আরও অনেক বেশি করে আমার কাছে বেঁচে আছেন। এখনও কোনোদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে অস্তগামী শুকতারার দিকে চোখ পড়লেই তারিণীদার কথা মনে পড়ে।

লুণ্ঠিত ঐশ্বর্য

ভোরের হালকা কুয়াশায় রেল লাইনের উঁচু জমির ওপর পড়ে থাকা মানুষটাকে আদিনাথই আগে দেখতে পেয়েছিল। পরমেশ ছিল কয়েক হাত পেছনে। আদিনাথকে থামতে দেখে সেও থামলো, তারপর তাকালো আদিনাথ যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে। অস্পষ্ট কুয়াশার ওপারে তার অবস্থানবিন্দুর দশ ফুট ওপরে শুয়ে রয়েছে একটা মানুষ। একটা হাত ছড়ানো, একটা হাত শরীরের তলায় চাপা। ছিটের সার্ট গায়ে। অসহায় দুখানা পা ঢালুর দিকে কিছুটা নেমে এসেছে। এক পায়ে চামড়ার চটি।

চাপা সাবধানী গলায়, যেন তার কথা শোনবার জন্য কেউ কাছেই লুকিয়ে রয়েছে, আদিনাথ বলল কাল লাস্ট ট্রেনে কাটা পড়েছে !

পরমেশ বলল চল্ আদি, বাড়ি চলে যাই। সকালে উঠেই কি কাণ্ড !

সে নিরীহ ভালোমানুষ। রাস্তার ভিখিরিকে পয়সা দেয়; কারু কাছ থেকে

বই পড়তে নিলে প্রতিশ্রুত দিলে সেটা আবার ফেরৎ দিয়ে আসে। কোথাও গোলমাল হয়েছে খবর পেলে তার গলা শুকিয়ে যায়, ভেবে দেখবার চেষ্টা করে কোনোভাবে গণ্ডগোলটা তাদের এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে কিনা! স্বভাবতই সকালবেলা বেড়াতে বেরিয়ে অপমৃত্যুর কবলিত একজন মানুষকে দেখতে তার ভালো লাগে নি। গলার স্বরে আরও তাড়া মিশিয়ে সে বলল—চল্ না, কি দেখছিস্ অতো?

আদিনাথ যেন হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে, চোয়ালটা কেমন চৌকো দেখাচ্ছে। পরমেশের কথায় কান না দিয়ে সে বলল—আয়, ব্যাপারটা দেখে যাই।

আদিনাথের কথা পরমেশ কোনোদিন উপেক্ষা করতে পারে না। মনে মনে সে স্বীকার করে আদিনাথেব শ্রেষ্ঠত্ব। পরমেশ আর আদিনাথ কোথাও একসঙ্গে বেড়াতে গেলে পরমেশের মনে সব সময় জেগে থাকে এক পরম নির্ভরতার বোধ।

রেল-লাইনের দু'পাটি লোহার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁতের ফাঁক দিয়ে শব্দ করে বাতাস টেনে নিল আদিনাথ। বলল—দ্যাখ্।

সম্ভাব্য বীভৎসতা কল্পনা করে পরমেশ অন্যদিকে তাকিয়েছিল। এবার চোখ ফেরাল। নাঃ, তেমন বীভৎস কিছু নয়। কোথাও রক্ত নেই, জামা-কাপড় বিশেষ অবিন্যস্ত হয় নি, কোথাও ক্লেশের ছাপ নেই। খুব শান্তভাবে এখানে গতকাল রাত্রিবেলা একটি মৃত্যু ঘটে গেছে।

পরমেশ ভাল করে বুঝতে পারার আগেই আদিনাথ ঝুঁকে পড়ে মৃতদেহের সার্টের পকেট থেকে তুলে নিয়েছে মানিব্যাগটা। চকচকে চামড়ার ব্যাগ। এক-মুহূর্ত সময় লাগল পরমেশের ঘটনাটা বুঝতে, তারপরই তার হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে গলার কাছে চলে এল।—কি করছিস্ আদি! চলে আয়—

ততক্ষণে ব্যাগ খোলা হয়েছে, ভেতরে খেলা করছে আদিনাথের আঙুল। ফিস্‌ফিস্ করে যেন নিজেকেই আবার বলল পরমেশ—চলে আয়, চলে আয়।

আদিনাথ যেন হঠাৎ জাদুকর হয়ে গেছে। ব্যাগের ভেতর থেকে বার করছে করকরে একশো টাকার নোট, একটা—দুটো—তিনটে—অনেক, অনেক—

পরমেশের জিভ শুকনো শুকনো লাগছে। বুঝতে পারছে গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ছে তার এলাকায়। আদিনাথ চাপা হাসি হাসছে, তার দু'চোখে অস্বাচ্ছন্দ্যকর দৃষ্টি।

—রেখে দে আদি, ফিরিয়ে দে—

—অনেক টাকা পরম—অনেক টাকা—

—ফিরিয়ে দে—

আদিনাথ ঘেঁষে এল। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

—বাইশশো টাকা আছে। এগারোশো তোর, এগারোশো আমার। বুঝলি গাধা? কেউ কখনো জানতে পারবে না। আঠারো টাকা চার আনা খুচরো টাকায় আছে, সেটা রেখে যাচ্ছি এর পকেটে। কে সন্দেহ করবে? নে চল্, এখন পালাই।

বিমূঢ় পরমেশ হেঁটে চলল আদিনাথের পিছু পিছু। পরমেশের ঘরে ঢুকে আদিনাথ সাবধানীর মতো দরজা বন্ধ করল, একগ্লাস জল খেল কুঁজো থেকে গড়িয়ে, তারপর চৌকির ওপর বসে বলল—ভালোই হয়েছে তোর বউ এখন বাপের-বাড়ি—মেয়েছেলে সব ব্যাপারেই বড্ড হাঁউমাউ করে। আয়, এখন ভাগ করি টাকাটা।

পরমেশ এসব অর্ধেক শুনছিল, অর্ধেক শুনছিল না। সে ভাবছিল রেল-লাইনে শুয়ে থাকা সেই ছিটের সার্ট গায়ে মধ্যবয়সী লোকটার কথা। একটুও রক্ত

বেরোয় নি, কে যেন নিপুণ হাতে যত্ন করে মাথাটা সরিয়ে রেখেছে আর একদিকে। কেমন পরম আরামে শুয়ে রয়েছে। তার এলাকায় গোলমাল খতম্।

এগারোখানা নীল রঙের নোট বাড়িয়ে ধরল আদিনাথ।—নে, এগুলো সব তোর—

পরমেশ কথা বললো না, যদিও সে বলতে চাইছিল—এমন কেন করলি আদি ?

—টাকাটা নিয়ে নে পরম। আমরা না নিলে অন্য কেউ নিয়ে নিত। অনেক টাকা পরম, অনেক টাকা।

এগারোটা নীল একশো টাকার নোট সামনে স্বর্গোদ্যানের সোনার এগারোটা আপেলের মতো যেন নিবলম্ব শূন্যে ঝুলে রয়েছে। পরমেশের বড় টাকার দরকার। এই তো গতকালও সে ত্রিদিবের কাছে দশটা টাকা ধার করেছে। বড় কষ্টে সে সংসার চালায়। দু'দিন যদি একটু ফুর্তি করা যেত। এ কি পাপ ? লোকটা তো মরেই গিয়েছিল। সে তো আর চুরি করছে না। করছে চুরি ? সে না নিলে অন্য কেউ নিয়ে নিত। ঠিকই বলেছে আদি।

টাকাগুলো নেবার জন্য যখন সে হাত বাড়াল, তখনও তার বুকের ভেতর এক মাইল গভীরতা থেকে কে বলছে না, না, না।

বিয়েতে পাওয়া আলমারির ভেতরে সুতপার শাড়ির মধ্যে সে গুঁজে রাখল টাকাটা। সামনে শীত আসছে। চিড়িয়াখানা, থিয়েটার, পিকনিক, ফুলকপি, আরাম আরাম—আরাম—

রক্তে আচমকা একটা বেপরোয়া ভাব অনুভব করছে পরমেশ। তার ছাদ ফুটো করে হঠাৎ ঝরে পড়ছে অনেক টাকা। এ টাকা তার—একান্তই তার। প্রাপ্য ছিল কি ছিল না, সেটা আলাদা কথা। সংসারে এত লোক, এত টাকা উপার্জন করে, সবটাই কি তাদের প্রাপ্য ?

চারদিন বেশ নিরুপদ্রবে কেটে যাবার পর পঞ্চম দিনও যথারীতি দাড়ি কামিয়ে, স্নান করে অফিসে বেরুল পরমেশ। হোটেলে খেল, কারণ সুতপা নেই, রান্নার হাঙ্গামা কে করে ?

অফিসের টিফিনের পরে ব্যাপারটা ঘটল। কি একটা ফাইল নিয়ে কাজ করতে করতে অকস্মাৎ তার মনে হল—এই রে ! ঘরের দরজায় বেরুবার সময় তালা দিয়েছিলাম তো ?

একটু ভেবে দেখল পরমেশ। নিশ্চয় দিয়েছিল, অবশ্য দিয়েছিল। এসব তার কখনো ভুল হয় না। আবোল-তাবোল না ভেবে বরং কাজে মন দেওয়া যাক।

কিছুক্ষণ কাজ করার পর পরমেশ ভাবল—যদি তালা দিয়েই থাকবো, তাহলে একথা মনে এলো কেন ? রোজই তো তালা দিয়ে বেরুই—কোনোদিন এমন হয় না, আজই বা হবে কেন ? নিশ্চয় ভুল হয়েছে আজ। হ্যাঁ, তালা আজ দেওয়াই হয় নি বটে।

এ-কথা মনে হতেই প্রাণ উড়ে গেল পরমেশের। ঐ ঘরেই যে তার সব কিছু রয়েছে। আলমারিতে রয়েছে সুতপার গয়না, বিয়ের বেনারসী আর—আর ঐ এগারোশো টাকা।

অত্যধিক ভয়ে পরমেশের বুক খালি খালি লাগছিল। আড়াইটের সময় হাফ-ডে লিভ্ নিয়ে বাড়ি ফিরল পরমেশ।

বারান্দায় বাঁক নিয়ে দরজায় পেঁছিনোর আগে কয়েক পা চোখ বুজে হাঁটল

সে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একঝটকায় চোখ খুলে ফেলল।

সব ঠিকঠাক আছে। চাবিবন্ধ তালা ঝুলছে দরজায়।

আশ্চর্য ! তালা তাহলে সে লাগিয়েই বেরিয়েছিল।

ঘরে ঢুকে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল পরমেশ। কেন এমন হল? কত অদ্ভুত কান্ড যে হয়!

হাওয়াই সার্ট খুলে পাখা চালিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে হঠাৎ মনে খটকা লাগল পরমেশের।

অফিস থেকে বেরুবার সময় অফিসের ডেস্কে তালা দিয়ে এসেছিল তো? দেয় নি বোধহয়—তাড়াহুড়োতে ভুলে গিয়েছে! তাই হবে।

সর্বনাশ!

ঐ ডেস্কে রয়েছে পারচেজ অফিসারের জরুরী কাগজপত্র। যদি একটা কাগজও খোয়া যায়, তাহলে ওর চাকরি চলে যাবে। তাছাড়া বড়বাবু ছুটির পরে সবার ডেস্ক হাতড়ে দেখেন। আদিনাথের দেওয়া একটা অশ্লীল ছবিওয়ালা বইও ওখানে রয়েছে। বড়বাবু দেখলে কেলেঙ্কারী। প্রাইভেট ফার্ম। এককথায় চাকরি চলে যাবে।

আধঘণ্টা ধরে চিন্তা করতে করতে মাথা গরম হয়ে গেল পরমেশের। সে বুঝতে পারল, হয়তো সে ঠিকঠিকই তালা লাগিয়ে এসেছে ডেস্কে, কিন্তু তবু তাকে যেতেই হবে একবার। একবার দেখতে হবে তালাটা সত্যি সত্যি লাগানো আছে কিনা। নইলে মুক্তি নেই।

ছুটি হয়ে যাওয়া ফাঁকা অফিসে দারোয়ানকে বলে ঢুকে নিজের ডেস্কের সামনে দাঁড়ালো পরমেশ।

তালাটা লাগানো রয়েছে। ডেস্কের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ।

বিহ্বল পরমেশ হেঁটে হেঁটে অনেক দূর চলে গেল অফিস থেকে বেরিয়ে। মানুষের ভিড় ঠেলে কোনো এক অজানা গন্তব্যে এগুতে এগুতে তার মনে হল যতই তালা দেওয়া থাক, কি এক অজ্ঞাত উপায়ে অলৌকিকভাবে খুলে যাচ্ছে তার গোপন রত্নাগারের সব দরজা, ফাঁক হয়ে যাচ্ছে তার যত আলমারির পাল্লা। কালো কালো চেহারার বিরাট দেহ কারা যেন বাইরে বেরিয়েছে লুঠ করে নিতে তার সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য।

এর থেকে মুক্তি নেই। কোনো মুক্তি নেই। এখন থেকে খুলে যেতে থাকবে সব গোপন কোষাগারের দরজা।

সেদিন রাত্তিরে একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল পরমেশ। বিশাল এক কালো পাথরে তৈরি প্রাসাদের ভেতর সে চুপ করে দাঁড়িয়ে। বড় বড় মশালের অপার্থিব আলোয় প্রাসাদের কৃষ্ণান্ধকার আরও প্রেতায়িত হয়েছে। বড় ঘরের দূরপ্রান্তে কালো সিংহাসনে কে যেন বসে। তার মুখ দেখা যায়, যায়—যায় না। কারণ সামনে জ্বলছে বিরাট এক অগ্নিকুন্ড। শিঙওয়ালা মুকুট তার মাথায়। পরমেশ বলতে যাবে—কে তুমি? ঠিক তখনই সিংহাসনে ঝুঁকে বসে লোকটি আগুনের ভেতর দিয়ে পরমেশের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল। সে হাতে রয়েছে এগারোখানা নীল রঙের একশো টাকার নোট।

তিরিশ বছর

টেবিলের ওপর থেকে ফাইলপত্র তাকে সরিয়ে রেখে উকিল বন্ধু বলল—এসো হে, বোসো। দিন দশেক দেখা নেই, ব্যাপার কি ? এদিকে আড্ডা না দিতে পেরে হাঁপিয়ে মরছি।

বললাম –জ্বর হয়েছিল। ডাক্তার বলল বিশ্রাম নিতে। তাই ক'দিন আর বেরুই নি—

—ডাক্তারের সব কথা মানলে চলে না। বুড়ো হয়ে গেলে নাকি ?

হাসলাম। বললাম—পঞ্চাশ হল। এখনও বুড়ো হব না, বল কি ?

—আরে দূর ! ওটা তো শরীরের বয়েস, শরীর কতদিনের পুরনো হল সেটা হিসেব করবার একটা কনভেনশনাল উপায়। মনের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ? নাও, এই সিগারেটটা ধরিয়ে ফেল—

—আমার যে সিগারেট খাওয়াও নিষেধ। ডায়াস্টোলিক প্রেশার বড্ড বেশি।

—আবার বকবক করে ! নাও, ধরাও—

হেসে বললাম—তুমি আমাকে মারবে।

—ডাক্তারের হাতে পয়সা খরচ করে মরার চেয়ে বন্ধুর হাতে মরা ভাল। চা, না কফি ?

—তাহলে ভাল করেই মরি। কফি বলো, আর মোড়ের দোকান থেকে তেলেভাজা-

—মরে যাই ! কি সাজেসশান। অনিল, ওরে অনিল, ভেতরে কফি করতে বলে দৌড়ে নন্দুর দোকান থেকে ছ'টা—না না, আটটা গরম আলুর চপ নিয়ে আয়। বাবুর প্রেশার তাড়াতে হবে।

বন্ধু সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—বয়েস বাড়ে না, বুঝলে ? বয়েস বাড়তে থাকলে একদিন তো মরেই যাব। আমার বেঁচে থাকা খুবই দরকার, জানো ?

—সে আর কার দরকার নয় ? মরতে চায় কে ?

—না হে, ভুল করছো। সে রকম বাঁচার কথা বলছি না। বেশির ভাগ লোকই দুনিয়ায় অকারণে বাঁচে। চাকরি-বাকরি করে, গপসপ করে খায় -গুচ্ছের ছেলে-পিলের জন্ম দেয়, তারপর একদিন পটল প্লাক্ করে। তাদের বাঁচাটা উদ্দেশ্যহীন, নিতান্তই একটা জৈব নিয়মমাত্র।

বললাম—তোমার বাঁচার বিশেষত্বটা কি ?

বন্ধু আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ঠাট্টা করছ ? কোরো না। পাজি লোকেরা অবশ্য ডাক্তার, উকিল আর কসাইকে একই ক্যাটেগরিতে ফেলে হাসি-তামাসা করে থাকে—কিন্তু জেনে রাখো, উকিলেরও গভীরতা থাকতে পারে। আমারই কফি আর চপ খেয়ে আমাকেই খোঁচা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

—নেভার মাইন্ড। তোমার বাঁচার উদ্দেশ্যটা বলো—

—বোসো, কফি আসুক। জমিয়ে বলবো।

কফি এলো, তেলেভাজাও। কফি খেতে খেতে বন্ধু কেমন অন্যমনস্ক হয়ে

গেল। একটু যেন গম্ভীরও। যে হাল্কা পরিবেশে আড্ডা শুরু হয়েছিল তা ভারি হয়ে এল ক্রমশ। বাইরে বিকেলের আলো ক্রমে গাঢ় হয়ে আসছে। দিন শেষ হয়ে এল। জানালা দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে বন্ধু বলল—কিভাবে কথাটা গুছিয়ে বলব জানি না, কারণ কথাটা খুবই সামান্য। এমনকি বলবার কিছু নেই বললেও চলে। সবটাই আমার নিজের মনের কারখানায় তৈরি। খুব ভালো গল্পকারও হয়তো এর থেকে কোনো গল্প বানাতে পারবে না। তবে শুনতে রোম্যান্টিক লাগতে পারে বোধহয়। আমার কৈশোরে একটা ঘটনা ঘটেছিল। এত গল্প করেছি তোমার সঙ্গে, কিন্তু এটা কখনো বলা হয়ে ওঠেনি। মনেই ছিল না—জাগ্রত চেতনার স্তর থেকে গভীর অবচেতনে তলিয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা। কিন্তু আজ অনুভব করতে পারছি কিছুই ভুলি নি। স্মৃতির এই দরজাটা অনেকদিন খোলা হয় নি, এইমাত্র। ফেলো না, ওই চপটাও খেয়ে নাও।

কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে পেয়ালাটা নামিয়ে রাখল বন্ধু। নতুন একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল—ছোটবেলায় নদীয়ার একটা গ্রামে মামাবাড়িতে মানুষ হয়েছিলাম সে কথা তো তুমি জানো। বাবা মারা যাওয়ার পর মা আমাকে নিয়ে মামাবাড়িতে এসে ওঠেন। মামারা হৃদয়বান ছিলেন, আমাদের বোঝা বলে মনে করেন নি কখনো। আদর-যত্নেই মানুষ হলাম। সেখানকার ইস্কুল থেকে পাস করেই শহরের কলেজে পড়তে আসি।

গ্রামের কালীনাথ রায় বড়মামার বন্ধু ছিলেন। বেঁটেখাটো ফর্সা মানুষটি, শান্ত স্বভাব। জমিয়ে গল্প করতে ভালোবাসতেন। রোজ সন্ধ্যেবেলা বড়মামার বৈঠকখানায় দাবার আসর বসতো। প্রধান খেলোয়াড় ছিলেন বড়মামা আর কালীনাথ কাকা। আর সবাই চারপাশে গোল হয়ে বসে দাবাড়ুদের উৎসাহ দিতেন। দুজনেই তুখোড় খেলোয়াড়—খেলতে খেলতে এক একদিন গভীর রাত হয়ে যেত।

কালীনাথ কাকা কোনোদিন আসতে দেরি করলে বড়মামা আমাকে ডেকে বলতেন—বিজয়, যাও তো, কালীনাথকে ডেকে আনো—

এইরকম একদিন কালীনাথ রায়ের বাড়ি গিয়েছি তাঁকে ডাকতে, একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে বলল—কি চাই?

আমার গলার মধ্যে কি যেন আটকে গেল। স্বর আর বের হয় না। মেয়েটি খুব যে চটকদার সুন্দরী তা নয়। পরবর্তী জীবনে তার চেয়ে অধিক সুন্দরী মেয়েরা পথেঘাটে আমার বুকে দোলা দিয়ে গেছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমার পৃথিবী ওই গ্রামের সীমানার মধ্যেই প্রসারিত ছিল। সেটুকু পরিধির মধ্যে ওর চেয়ে সুন্দরী মেয়ে তখনো আমি দেখি নি। বড় বড় টানা টানা চোখ, ঈষৎ কোঁকড়া চুল। পাতলা শরীর ঘিরে একটি চাঁপাফুল রঙের শাড়ি। একটা নরম পেলবতা যেন ফুটে বেরুচ্ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। তখন আমার পনেরো বছর বয়েস। সব বুঝি না, কিন্তু কিছু কিছু বুঝি। আমার জিভে যেন আঠা জড়িয়ে গেল।

মেয়েটির বয়েসও পনেরো-ষোল, হয়তো আমার চেয়ে বছর খানেকের বড়ই হবে। আগে একে তো কখনো দেখি নি এ বাড়িতে! কে মেয়েটি? গ্রামে সবাই সবার মুখ চেনে। এ কে তবে? এইসব ভাবছি, এমন সময় মেয়েটি আবার বলল—কাকে চাই?

বললাম—কালীকাকা আছেন? বড়মামা ডেকে নিয়ে যেতে বললেন।

মেয়েটি কিছু বলবার আগেই ভেতর থেকে কালীনাথ কাকা এগিয়ে আসতে

আসতে বললেন—কে রে মিনু? কে এসেছে? ওঃ বিজয়! হরিচরণ পাঠিয়ে দিলে বুঝি? আচ্ছা, তুমি গিয়ে বল আমি আসছি।

আস্তে আস্তে মেয়েটির সম্বন্ধে জানতে পারলাম। মিনু কালীকাকার এক দূর-সম্পর্কের ভাইঝি। আমারই মত অবস্থা ওদের—বাবা মারা যেতে কাকার আশ্রয়ে এসে উঠেছে। তবে ওর মায়ের হাতে কিছু পয়সা আছে মিনুর বিয়েটা তাতেই কোনোরকম করে হয়ে যাবে। বাড়িতে মেয়ে-মজলিসে এসব নিয়ে আলোচনা হত—সেখান থেকেই জেনেছিলাম।

কালীকাকাকে প্রায়ই ডাকতে যেতে হত। মিনুর সঙ্গেও একটু একটু করে ভাব হয়ে গেল। গ্রামে তখনো আমাদের বালক বলেই ধরা হত—কাজেই আমাদের মধ্যে পর্দার বালাই ছিল না বা মেলামেশা করলেও দৃষ্টিকটু হত না। প্রায়ই কালীকাকার বাড়ির পেছনে পুকুরধারে যে পেয়ারা গাছটা ছিল, তার তলায় বসে দুজনে গল্প করতাম। গাছে উঠতে পারদর্শী ছিলাম খুব। গাছটায় পেয়ারাও খুব ভালো হত। ভেতরটা টক্‌টকে লাল। আর কি মিষ্টি! অনেকগুলো পেয়ারা পেড়ে নিয়ে দুজনে বসে খেতাম। তবে মিনুর ব্যবহারে একটা গাম্ভীর্য ছিল, নিজেকে কখনো আমার স্তরে নামিয়ে আনতো না। ঠিক প্রকাশ করতো না, কিন্তু মনে হত আমার প্রতি কৃপা করে যেন আমার সঙ্গে মিশছে। তাতে আমার আপত্তি ছিল না, আমি মিনুর সঙ্গে মিশতে পেয়েই খুশি ছিলাম। সাধারণ মেয়েদের মত মিনু পেয়ারা খেতে খেতে কক্ষনো পা দোলাতো না। অনর্থক বকবক করতো না। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলতো। বলতো—আচ্ছা তুমি কখনো পাহাড় দেখেছো?

আমি কখনো পাহাড় দেখি নি, চিরকাল সমতলে মানুষ। লজ্জা পেয়ে বলতাম, না। তুমি দেখেছো?

অবজ্ঞার ভঙ্গি করে মিনু বলতো—কতো! পাহাড়ের দেশেই আমরা থাকতাম কিনা। চক্রধরপুর, নাম শুনেছো?

স্বীকার করতে হত শুনি নি। মিনুকে কত বহুদর্শী বলে মনে হত।

যদিও মিনু একটা তফাৎ বজায় রাখতো তবু একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, আমার মনে প্রেমের চেতনা প্রথম মিনুই জাগিয়েছিল। ও যখন দূরদেশের গল্প বলতো, আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ওর ঠোঁটের সুকুমার ভঙ্গি কথা বলতে বলতে একটা বিশেষভাবে মাথা নাড়ানো—এসব আমি প্রাণভরে দেখতাম। দেবীর মত লাগতো ওকে। মনে হত ওর জন্য খুব কঠিন একটা কিছু করি। মিনু যদি আমাকে খুব, খু-ব অসম্ভব একটা কিছু করতে বলতো তাহলে আমি তা করে ধন্য হতে পারতাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পেয়ারা পেড়ে দেওয়ার চেয়ে কঠিনতর কিছু করবার সুযোগ পাই নি কখনো। সেটাই ভীষণভাবে করতাম। গাছের একেবারে মগডালে উঠে গিয়ে বড় পেয়ারা পেড়ে আনতাম। নিচে দাঁড়িয়ে মিনু বলতো—অত সরু ডালে যেও না বিজয়, ভেঙে পড়ে যাবে—

আমি হাসতাম, বলতাম—কিচ্ছু হবে না। দ্যাখো না মজা—

এখন বুঝি কি গভীরভাবে ভালোবেসেছিলাম মিনুকে। কিন্তু সে কথা বলবার সাহস হয় নি কখনো। কি করে বলবো? যাঃ, তাই কি কখনো হয়!

বলতে পারতাম না কিন্তু কষ্ট পেতাম। বড়দের মতো ভালোবাসার কষ্ট নয়, অপরিপক্ক কিশোর মনের কেমন যেন কষ্ট। কতবার পুকুরপাড়ে বসে ওর চাঁপার

কলির মতো আঙুলগুলো ছুঁতে ইচ্ছে করতো। একবার মাত্র—শুধু একবার। কিন্তু তা তো হত না। মিনু ওর গল্পের সেই পাহাড়ী দেশের মতো সুদূর অলীক আবছায়া। একটা কল্পনামাত্র। তাকে ধরাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না।

মিনু কি বুঝতো না কিছু? হয়তো বুঝতো। মেয়েরা এসব ব্যাপারে অনেক তাড়াতাড়ি অভিজ্ঞ হয়। আমার চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি তার কাছে কি কোনো বিশেষ অর্থ বহন করে নিয়ে যেতো না? হয়তো যেতো—কিন্তু সে বলতো না কিছু।

এইভাবে একদিন আমার ইস্কুলজীবন ফুরিয়ে গেল। পাস করে শহরের কলেজে পড়তে যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। আশ্চর্যের কথা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, অন্য কিছুর জন্য অতটা মন খারাপ হল না, যতটা হল মিনুর জন্য। সেই কথাটা ওকে বলা হল না—সেই জন্যে।

শহরে যাবার দিন হু-হু করে এগিয়ে এলো। তিন-চারদিন বিভিন্ন তোড়-জোড় করতে করতে মিনুর সঙ্গে দেখা করা হয়ে ওঠে নি। যাবার আগের দিন একবার কালীনাথ কাকার বাড়ি গেলাম মিনুর সঙ্গে দেখা করতে।

তখন সন্ধ্যে। ঠিক আজকের মতো সন্ধ্যে। একটা ডুরেশাড়ি পরে ও দাঁড়িয়ে-ছিল কঞ্চির বেড়ার ধারে। কালীকাকার কুমড়ো ক্ষেতের বেড়া। আমি গিয়ে বেড়ার এপারে দাঁড়ালাম।

কিরকম যেন হয়ে গিয়েছে মিনুর মুখ। কোথায় সেই গর্বিতা দূরবাসিনী! এ যেন খুব দুঃখী অভিমানিনীর মুখ। ওকে দেখেই সেদিন আমার বুকের মধ্যে কে যেন বলে উঠল--আজ ও বলবে! এতদিন পরে আজ!

কঞ্চির বেড়া দুই হাতের চাঁপার কলির মতো আঙুলে চেপে ধরে ও বলল—বিজয়, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

আমার বুকের মধ্যে রক্ত চল্‌কে উঠলো। বললাম—বলো।

ও বলতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে বাড়ির ভেতর থেকে কে যেন ওকে ডাকল—মিনু, শুনে যাও তো একবার—

ও বলল—একটু দাঁড়াও আমি এক্ষুনি আসছি। এসে বলবো।

আমি দাঁড়িয়েই রইলাম। বহুক্ষণ। দিনের শেষ পাখিটিও মাথার ওপর দিয়ে বাসায় ফিরে গেল। ক্রমে ঘন অন্ধকার নেমে এল চারদিকে। কি কাজে যে ও আটকে গেল ভেতরে কে জানে। আমি লোভে লোভে আরো অনেকক্ষণ অন্ধকারে চোরের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম কালীনাথ কাকার কুমড়ো ক্ষেতের কঞ্চির বেড়ার পাশে। শেষে আমার মনই একসময় বলল--ও আর আসবে না।

ত্রিশ বছর কেটে গিয়েছে! আজ আর মিনু পনেরো বছরের কিশোরী নয়। কোথায় সে চলে গিয়েছে জীবনের বিষম ঘূর্ণিপাকে কে জানে?

কিন্তু আমি ভুলি নি। হঠাৎই দেখতে পাচ্ছি ত্রিশ বছর পরেও তাকে আমি মনে করে রেখেছি। এই ত্রিশ বছর ধরে, এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি আমি সেই কথাটা জানবার জন্য বেঁচে আছি। কি বলতে চেয়েছিল মিনু সেদিন? আরো যতদিন বাঁচবো এই জন্যেই বাঁচবো—এই কথাটা জানবার জন্য।

যাকে খুব ভালোবাসা যায়, তাকে নাকি মানুষ স্বপ্ন দেখে। যদি কোনোদিন মিনুকে স্বপ্ন দেখি তাহলে স্বপ্নেই তাকে জিজ্ঞাসা করবো—কই মিনু, কি বলবে বলেছিলে বলে গেলে না তো? এই দ্যাখো, তিরিশ বছর ধরে তোমার কথা শুনে অপেক্ষা করে রয়েছি। কবে বলবে? কবে?

প্রভুচরণ চলে যায়

প্রভুচরণ বিশ্বাস যেদিন মারা গেল সেদিন মাঘ মাসের আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। শীত শীত উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে এই দুপুরেই। সেই হাওয়ায় রোদ্দুর যেন জল হয়ে যাচ্ছে। বড় বড় ফেটে যাওয়া চ্যাটালো পায়ের আঙুলের ফাঁকে লাল ধুলো নিয়ে দশ-বারোজন মানুষ উঠোনে বসে শান্ত ধৈর্যের সঙ্গে বিড়ি খাচ্ছে, গল্প-গুজব করছে। ওরা এসেছে বহুক্ষণ, তখনো প্রভুচরণ পুরনো পৃথিবীটার শেষ ঋণ মিটিয়ে ফেলে নি। খবর দিয়েই আনা হয়েছে ওদের। ভাবটা এমন—যেন অসুখের সংবাদে উদ্বিগ্ন প্রতিবেশী দেখতে এসেছে রোগীকে। কিন্তু আসল কারণটা মুখে কেউ না বললেও মনে মনে সবাই জানে। ওরা এখন তৈরি, দু'জন মানুষ ভীষ্ম মল্লিকের ঝাড়ে বাঁশ কেটে চালি বানাতে গিয়েছে। এটা-ওটা কেনা বাকি আছে, বেরোবার মুখে একটা কান্নাকাটির ধাক্কাও রয়েছে বই কি। এইসব করে বেরোতে বেরোতে বিকেল যে ঘুরে যাবে, সে কথা ওরা জানে বলেই শান্ত হয়ে বসে বিড়ি খাচ্ছে।

প্রভুচরণের অন্ত্যেষ্টি হচ্ছে চাঁদা তুলে। এরাই সব দিয়েছে চাঁদা। নইলে পয়সা আসছে কোথা থেকে ? লোকটার ভাগ্য ভারি খারাপ যাচ্ছিল শেষদিকে, নিজের ঘাট-খরচটাও রেখে যেতে পারে নি। তবে লোকের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে, রোজ বিকেলে বটতলার সাধুর আড্ডায় দোতারা বাজিয়ে গান করে অনেক বন্ধু পেয়েছিল বটে। এই তো তারাই দায় উদ্ধার করতে এসেছে আজকে। নইলে ঘরে শুয়ে বাসি মড়া হয়ে যেত সে। বন্ধুর মত বন্ধু।

উঠোনের একপাশে লাঙলটা গোয়ালের বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো। গরু নেই অনেকদিন। গোয়ালের দরজার মাথায় সৌভাগ্যের চিহ্ন হিসেবে একটা বাছুরের খুলি লটকানো। ওটা থাকলে গরুর দুধ কমে না, নজর লাগে না, বছর বছর বক্না বাছুর হয়। যেটা এককালে সৌভাগ্যের প্রতীক ছিল আজ দুঃখের দিনে সেটাই দাঁত বের করে বিদ্রূপ করছে। উঠোনের মাঝখানে একখানা খোঁটা পোঁতা। দিন দশেক আগে প্রভুচরণ নিজে পুঁতেছিল। ছোলা ওঠবার সময় হল মাঠ থেকে, পাড়া থেকে হালের বলদ ধার করে এনে ওই খুঁটিতে বেঁধে ছোলা মাড়াই করবার কথা ছিল। মাঠের ছোলা মাঠেই থাক্‌লো, প্রভুচরণ ফৌত হয়ে গেল মাঝখান থেকে।

পয়সা হাতে না জমবার কারণ আছে। প্রভুচরণ বিঘে কয়েক জমি ভাগে চাষ করতো। জমির মালিক থাকে শহরে। সে বাবুলোক, অফিসে চাকরি করে কিন্তু শহুরে মানুষ হলেও বোকা না, চাষবাস ভালো বোঝে। ফসল ওঠবার সময়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাওনার কড়াক্রান্তি বুঝে নেয়। তাতে অবশ্য রাগের কিছু নেই, যে যার ভাগ বুঝে নেবে সেই রকমই যখন কথা আছে, তখন ভাগ দিতে হাত কাঁপা উচিত নয়—প্রভুচরণ এইরকম ভাবতো। কিন্তু মুশকিল এই—চড়ুইপাখির মাংস ভাগ করলে আর কতটুকু পাওয়া যায় ? যা আসে, তাও দাম বাড়বার আশায় জমিয়ে রাখা যায় না। উদরের তাড়নায় তৎক্ষণাৎ বিক্রি করে ফেলতে হয়। যেমন সেবারে পাটের সময়ে যা হল। টুপি-পেন্টলুন পরা সরকারি বাবুরা এসে সস্তায় কলে তৈরি সার দিয়ে গেল, মাঠে বসিয়ে গেল জলের পাম্প। খুব ভালো পাট হল সেবার।

দেড়গুণ ফসল। কিন্তু প্রভুচরণের কপালে চেপে থাকা পাথরটা নামলো না। ফসল তার একার ভালো হয় নি, সবারই হয়েছে। সবাই কলের সার আর পাম্পের জল দিয়ে তুমুল চাষ করেছে। ফলে পাট কেচে যখন ডাঙায় উঠলো, তখন বাজারে প্রচুর পাট। যা দাম তাতে চাষের খরচই বলতে গেলে ওঠে না। নক্‌ফুল হাটের আড়তদার হাজারী সরকার ওকে ডেকে বলল—প্রভুচরণ, এখন পাট ছেড়ো না বাজারে। কিচ্ছু দাম পাবে না। ধরে রাখো, বুঝলে হে, ধরে রাখো। শীগ্‌গিরই দাম বাড়বে বলে গন্ধ পাচ্ছি—

হাজারী সরকার একথা বলতে পারে। নক্‌ফুল বাজারে তার বড় আড়ত, আদ্দি'র পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম লাগিয়ে বসে সে দোকানদারী করে। হাজার মণ পাট সুদিনের আশায় ধরে রাখা তার পক্ষে বিশেষ কঠিন নয়। কিন্তু প্রভুচরণের যে এবেলা হাঁড়ি চড়ে তো ওবেলা চড়ে না। যতদিন সম্ভব ধরে রেখে তারপর পড়তির মুখেই পাট বেচে দিল সে। করে কি? উঠোনে যারা বসে আছে তারা কেউই বিশেষ বিচলিত নয়। কারণ প্রভুচরণ বিদায় নেওয়ায় পরিচিত পৃথিবীর কোনো ব্যতিক্রম তারা দেখতে পাচ্ছে না। মৃত্যুকে যে তারা ভয় করে না এমন নয়, কিন্তু প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত কাছাকাছি বাস করবার জন্য মৃত্যুকে তারা একটা সহজ দার্শনিকতার সঙ্গে মেনে নিয়েছে। ভয় হয় না, একটা বিষণ্নতা আসে, যাকে ব্যাখ্যা করা তাদের সাধ্যের অতীত।

দুই হাঁটু জড়িয়ে ধরে কার্তিক বসে ছিল। বিশেষ কাউকে লক্ষ্য না করেই সে বলল—প্রভুদা মরে গেল।

একটা কথার কথা। স্পষ্টই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রভুচরণ আর বেঁচে নেই। এ কথার কোনো উত্তরও দেবার দরকার হয় না। তবু একটা নিঃশ্বাস ফেলে তার দিকে তাকিয়ে শ্রীনাথ বলল—হ্যাঁ, মরে গেল লোকটা—

জীবু পাটকাঠি দিয়ে পিঠ চুলকোতে চুলকোতে বলল—ঠাণ্ডাটা বড্ড বসে গিয়েছিল বুকে। বরাবরই ঠাণ্ডার ধাত প্রভুদার। এমনিতে বেশ ভাল, খাটতেও পারত খুব। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা লাগলেই কাত। বুকের দোষ হয়ে গিয়েছিল।

কার্তিক বলল—সেদিনও হাটে দেখা বিকেলের ঝোঁকে। দেখি এই শীতেও ছেঁড়া হাফশার্ট পরে চুনোমাছ কিনছে। বললাম—একটা চাদর কেনো প্রভুদা। নিমাই দাসের দোকানে ভালো ভালো খদ্দরের দুসুতি চাদর এসেছে, অল্প দাম। তা হাসে, আর বলে—হবে হবে, কিনবা। এদিকে দেখি শীতে গায়ে কাঁটা দিয়েছে। তখন কি ছাই জানি একেবারেই পয়সা নেই হাতে? কাউকে বলতো না তো কিছু। জানলে সবাই মিলে ব্যবস্থা করতাম। গাঁয়েরই লোক—

জানলে কিছু হতো কি হতো না, তা তর্কের বিষয়। কিন্তু আগে জানলে এরা একটা ব্যবস্থা করতে পারতো, এই চিন্তাটা সবার ভালো লাগায় প্রত্যেকেই মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল—বটেই তো, বটেই তো—

শীতকালের বেলা দ্রুত পড়ে আসছে। খড়ের চালের ছায়া উঠোনে দীর্ঘায়ত করে সূর্য মাথা নিচু করছে দিগন্তকে চুম্বন করতে। পাশেই নগেন প্রামাণিকের বেগুনক্ষেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা ছাগল। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসছে প্রভুচরণের বৌয়ের কান্নার শব্দ। সমানে কাঁদছে বৌটা। এখন এই কার্তিক, জীবু, শ্রীনাথকে চষে দিতে হবে প্রভুচরণের বন্দোবস্ত নেওয়া জমিটুকু। পরিশ্রমের জন্য ওরা কিছু কেটে নেবে, মালিকের ভাগ মালিককে দিয়ে বাকি যা থাকবে, তাতে

প্রভুচরণের পরিবারের চলে গেলেও যেতে পারে। দরিদ্র সংসার। একজন চলে যাওয়া মানে দৈনিক একটা পেট কম খাবে। তবু কেন যে কান্না আসে!

পড়ন্ত রোদ্দুরে গা ডোবানো এই মাঠে মাঠে প্রভুচরণের স্মৃতি থেকে যাচ্ছে। ইতিহাস কীর্তিহীন এত ক্ষুদ্র মানুষকে মনে করে রাখে না। পৃথিবীর কি স্মৃতি আছে? তাহলে পৃথিবী কিছুদিন মনে করে রাখবে তাকে। সে বড় যন্ত্রণা দিয়ে, কুমারী ভূমিতে হাল চালনা করে ফসল তুলে এনেছিল দু'হাতে। বটতলার সাধুর আড্ডায় এখনও কিছুদিন তার আলোচনা হবে। গাঁজা টিপতে টিপতে জীবু হঠাৎ হয়তো বলবে—প্রভুদা থাকলে এখন বেশ একখানা গান শোনা যেতো—

পূবদেশ থেকে আসা জটাধারী রোগা কালী সাধক হাসবে, বলবে—মানুষ থাকে না হে, মানুষের কথাটাই থেকে যায়। এই যে প্রভুচরণ আজ আর নেই, অথচ তোমরা তার কথা বলছো—এইটুকুই থাকে।

বত্রিশ বছর আগে মাঠের ওপারের ওই পথটা দিয়ে বৈরামপুর থেকে বিয়ে করে বৌ নিয়ে ফিরেছিল প্রভুচরণ গরুর গাড়ি করে। ছইওয়ালা নিজেদের গাড়ি। সংগে গোলাপফুল আঁকা টিনের তোরঙ্গে জিনিসপত্তর। গুনগুন গান করে প্রভুচরণ আর আড় চোখে দেখে বৌ শুনছে কিনা। সে সব দিন কে মনে করে রেখেছে? তারপর বন্যার জলের মত কেমন বছরগুলো কাটলো। কত হাসিকান্না, কত দুঃখ-দারিদ্র্যের ইতিহাস! বত্রিশ বছর! অথচ মনে হয় এই তো সেদিনের কথা!

স্বাস্থ্য নিতান্ত খারাপ ছিল না তার। তবু কি করে যে এমন উচট্কা ঠাণ্ডাটা লেগে গেল। এবার জ্বর হয়ে বিছানা নিতেই তার বুকের ভেতর থেকে কে যেন ভারী গলায় বলল—প্রভুচরণ তোমার সময় হয়েছে।

প্রভুচরণ বলল—জানি।

বিছানায় শুয়ে ইদানীং কেবলই পুরনো দিনের কথা মনে পড়তো। খুকীর কথা মনে পড়তো বেশি করে। তার দেড় বছরের খুকী। একটু রোগা-হাবা মত ছিল মেয়েটা। একটা কথাই শুধু বলতে পারতো—বাবা। প্রভুচরণ বেড়া বাঁধছে, খুকী টলমল করে এসে বলত—বাবা।

—কি রে খুকী-মা? কি চাই?

খুকী বলত—বাবা।

এখনও মনে আছে একদিনের কথা। বিশেষ কোনো ঘটনা নয়, একটা ছবি কেবল। সে মাঠ থেকে ফিরছে বিকেলে, দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে বাড়ির দাওয়ায় বৌ দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোলে খুকী। তাকে আসতে দেখে খুকী ছোট ছোট হাত নাড়ছে আর ডাকছে—বাবা, বাবা—

কিছুই নয়, একটা দৃশ্য মাত্র। কিন্তু এই ছবিটা রোগশয্যায় ঘুরেফিরে বারবার প্রভুচরণের মনে এসেছে। একবছর আটমাস বয়েসে খুকী মারা যায়। বড় শান্ত ছিল, দাওয়ায় বসে একটা পুঁতির মালা নিয়ে খেলতো আপনমনে। সে মালাটা তুলে রেখে দিয়েছিল প্রভুচরণ। প্রথম সন্তান বড় আদরের হয়—তার স্মৃতি। টিনের তোরঙ্গটায় সে মালা বোধহয় আজও আছে। তার অনেক পরে আবার সন্তান হয়। এক মেয়ে, এক ছেলে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলে ছোট।

দশদিন জানালার পাশে শুয়ে শুয়ে বাইরে মাঠ দেখেছে প্রভুচরণ। মাঠ, মাঠের ওপর হেলে রয়েছে আকাশ। নদী দেখা যায় না, জমি ঢালু হয়ে নদীতে নেমেছে, আবার ওপারে তেমনি উঠে গিয়ে মিশেছে মাঠে। সারা দুপুর কর্কশ ভট্ ভট্

আওয়াজ করে ওপারে মাধবপুরের হারুন সেখের রিভার পাম্প চলে। বিরক্তিকর একঘেয়ে শব্দটা। অসুখ শরীরে ভাল লাগে না।

খুকী বেঁচে থাকলে চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়েস হয়ে যেতো।

চিৎ হয়ে শুয়ে ঘরের চালে একজায়গায় খড় ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দেখতে পায় প্রভুচরণ। এবার সেরে উঠে নতুন খড় দিতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে কার স্বর গম্‌গম্‌ করে –কিন্তু তুমি তো আর উঠছো না।

গভীর ক্লান্তিতে সে চোখ বুজে বলে—জানি।

আজকাল নতুন খেলা এসেছে গ্রামে। ছেলেরা চড়কতলার মাঠে খেলে। তেকাঠি পুঁতে তার সামনে কাঠের ব্যাট হাতে একজন দাঁড়ায়, আর একজন উলটো দিক থেকে বল ছোঁড়ে। মারতে পারলে ঠিক আছে, কিন্তু ব্যাটে না লেগে তেকাঠিতে লাগলেই সর্বনাশ! তখন আর একজন ব্যাট নেয়।

প্রভুচরণের তেকাঠিতে বল লেগে গিয়েছে। সামর্থ্য ডিঙিয়েও যতদূর ডাক্তার-বদ্যি করা যায়, সবই করা হয়েছে। কিন্তু প্রভুচরণ থাকবে কি করে? তার সময় হয়ে গিয়েছে যে!

আজ সকাল থেকেই ঘোর ঘোর লাগছিল, বেলা দশটা নাগাদ জ্ঞান রইলো না আর। খবর গেল পাড়ায় পাড়ায়। যাদের গান শোনাতো প্রভুচরণ, তারা এসে উঠোনে বসলো সবাই। অবস্থা দেখে তারা বুঝলো এবেলা কাটবে না। ভারি বুদ্ধিমান লোক, প্রভুচরণের বৌকে লুকিয়ে ঘাটের খরচ নিজেদের ভেতর চাঁদা করে তুলে ফেলল। এখনো মানুষটা বেঁচে, প্রকাশ্যে খারাপ দেখায়। একজন ভেতর থেকে দেখে এসে বলল—জ্ঞান নেই, তবে শ্বাস পড়ছে একটু একটু-

চৈতন্যহীনতা নয় মৃত্যুর মুহূর্তে চেতনা বুঝি মানুষের ভেতরে গুটিয়ে যায়। বাইরের জগতে তো অনেকদিন কাটলো, এবার বুকের গভীরে ডুব দেয় মন।

চোখ বোঁজবার আগে শেষবারের মত প্রভুচরণ দেখেছিল জানালার বাইরে শীতের নির্মেঘ আকাশে উড়ছে একটা চিল, আর দেওয়ালের ছেঁচার বেড়ায় ঝোলানো তার দোতারাটা।

তারপর আকাশ এলো অন্ধকার হয়ে। কালো রঙ দিয়ে কে যেন চুনকাম করে দিল আকাশ-বাতাস। সেই কালো আকাশে ডানা ছড়িয়ে উড়তে লাগল একটা দুর্দান্ত চিল। ক্রমে তার দুই ডানা হয়ে গেল একজোড়া ভ্রূ, তার নিচে ফুটে উঠলো চোখ। ক্রমে আকাশজোড়া একখানা কচি মুখ তার দিকে তাকিয়ে রইলো। দিনের বেলাতেই কি করে যে আকাশ এমন অন্ধকার হল, তা ভেবে ভারি অবাক হয়ে গেল প্রভুচরণ। কালো আকাশে এবার ফুটে উঠছে একটি-দুটি করে নক্ষত্র। অথবা নক্ষত্র নয়, কার পুঁতির মালা থেকে খসে খসে পড়ছে পুঁতি। নিচে, বহু নিচে পায়ের তলায় কারা যেন খুব কাঁদছে। তাদের কান্না বারবার তাকে অন্যমনস্ক করে দিলেও প্রভুচরণ জোর করে মনকে ছিনিয়ে নিয়ে আকাশের দিকে তাকালো।

বেরোতে বেরোতে সত্যিই সন্ধ্যে। হরিধ্বনির ফাঁকে 'জীবু' বলল—কি ঠান্ডা পড়েছে দেখেছো শ্রীনাথদা?

—হুঁ। ঠান্ডাটা এবছর কম পড়লে প্রভুদা টিকে যেতো—

—গাঁজা এনেছো?

—এনেছি। চল্‌, গিয়ে ধরাবো।

চিতা জ্বললো নদীর ধারে। কন্‌কনে শীত। সবাই উদ্‌গ্রীব, কখন ছিলিম ঘুরতে শুরু করে হাতে হাতে। চিতার আলোয় তাদের চোখ চক্‌চক্‌ করছে। শ্রীনাথ সাজে ভালো। বাঁহাতের তালুতে সামান্য জল দিয়ে গুলিটা রগড়াতে রগড়াতে সে অনুভব করলো শীতটা যেন কম কম লাগছে। চিতার গরম। একটু থেমে ডানহাতের আঙুলকটা প্রভুচরণের চিতার দিকে উষ্ণতার প্রত্যাশায় বাড়িয়ে দিয়ে শ্রীনাথ বলল কান্ড দ্যাখ্‌ কার্তিক, প্রভুদা মরলো ঠাণ্ডা লেগে, আর তার চিতার আগুনে বসে আমরা হাত সেঁকছি।

প্রেত ও প্রণব

বেশ রাত হয়েছে। প্রণব আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরছিল। বাড়ি না বলে অবশ্য আস্তানা বলাই ভাল। কারণ প্রণব বিয়ে করে নি, করবার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। যে বয়েসে আত্মীয়স্বজন থাকলে নাতবৌ অথবা ভাগ্নেবৌ দেখে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, তাঁরা অনেক আগেই প্রণবের মায়া কাটিয়ে লোকান্তরে সুখের সন্ধানে গেছেন। প্রণব একাই থাকে। নেশার মধ্যে এই আর সিগারেট। ঘরের কোনো ছিরিছাঁদ নেই। বিছানার চাদর দেখলে মনে হয় সমুদ্র গুপ্তের আমলের পর সেটা আর কাচা হয় নি। তার ওপরে ঐ পরিমাণে ফর্সা ওয়াড় দেওয়া বালিশ। বিছানায়, টেবিলে, মেঝেতে ও অন্যান্য নানান অসম্ভব স্থানে শুধু বইয়ের রাশি।

প্রণব কোলকাতায় কোনো একটা কলেজে অধ্যাপনা করে। ক্লাস শেষ হলে প্রেসিডেন্সী কলেজের রেলিং-এ কিছুক্ষণ পুরনো বইপত্র দেখে ট্রেন ধরে বাড়ি ফেরে। যাতায়াতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। বেশি দূরের রাস্তা নয়। কোলকাতায় তার কোনো আড্ডা নেই।

প্রায় রোজই স্থানীয় ইস্কুলের মাস্টার নবীন দত্তর বাড়ি সন্ধ্যের দিকে আড্ডা বসে। প্রণব, কন্ট্রাক্টর ভূপেশ সেন, পোস্টমাস্টারবাবু এবং নবীন দত্ত নিজে— এ ছাড়াও অনেকে জমা হয় সেখানে। আড্ডায় আলোচিত হয় না এমন বিষয় নেই। মানুষের মহাকাশযাত্রা থেকে শুরু করে কি উপায়ে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মনোরঞ্জন করা যেতে পারে—তা পর্যন্ত।

আজ ভূতের কথা হচ্ছিল। সব জায়গায় এই মাসে অন্ততঃ পাঁচদিন ভূতের গল্প হয়ে থাকে। নবীন দত্তর আড্ডাতেও হয়। বড় মুখরোচক জিনিস—একবার প্রসঙ্গ উঠলে সবাই নিজের নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে। বেশির ভাগই পরোক্ষ অভিজ্ঞতা। কেউ বিশেষ কিছু দেখে নি। আমার পিসিমার ছোটবেলায় একবার হয়েছিল কি অথবা সেদিন অফিসের নিরঞ্জন বলছিল—সবই এই ধরনের গল্প। তবু মন্দ লাগে না। বিশ্বাস করবার জন্য মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক আকুলতা আছে, তাতেই আড্ডা জমে ওঠে। প্রণব ভূতে বিশ্বাস করে না। বলে মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে হয়ত, কিন্তু সে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের এবং অন্য স্তরের অস্তিত্ব। তাদের পক্ষে আর পৃথিবীতে দৃশ্যমান হওয়া সম্ভব নয়। ভূতে করে কি, না, একটা বাড়িতে হানা দিয়ে বসে থাকে। উপদ্রব করে। যে আত্মা পৃথিবীর বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গিয়েছে, সে আর খামোকা অমন ছেলেমানুষী করতে যাবে কেন ?

ভূতেদের প্রধান উকিল নবীন দত্ত দুঃখিত স্বরে বললেন--ভূত নেই ? তাহলে

আমার ছোটবেলায় মাধব সরকারের টিনের চালে ঢিল ছুঁড়তো কে?

প্রণব বলল—কোনো দুষ্টু লোক। মাধব সরকারের সঙ্গে কোনো কারণে হয়ত অবনিবনা হয়েছিল, লুকিয়ে ঢিল ছুঁড়ে তার শোধ নিত।

নবীন দত্ত বললেন—কিন্তু পাড়ার লোক তো সজাগ থেকে পাহারা দিত। তাহলে?

—পুলিশও তো কম সজাগ নয়, তা বলে কি কোথাও চুরি হয় না? কত দিকে নজর দেবেন?

নবীন বললেন—আচ্ছা, তা না হয় হোল। কিন্তু এলে ভূত? সে ব্যাপারে কি বলবেন? আড্ডাধারীরা উৎসুক হয়ে বললেন—সে কেমন?

দোক্তা দেওয়া পান মুখে পুরে জমিয়ে বসে নবীন বললেন—ঈশ্বর ভট্চায ছিলেন আমার জ্যোঠামশায়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। লম্বা—দোহারা শরীর, টকটকে রঙ। খাঁড়ার মত নাক, মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরতেন। চেহারাটা এখনও চোখে ভাসছে। এই তো কিছুদিন আগে নদীতে স্নান করতে গিয়ে একানব্বই বছর বয়েসে মারা গেলেন। দেশের বাড়িতেই।

ভূপেশ সেন বললেন—ডুবে গেলেন নাকি?

—না। বুকজলে দাঁড়িয়ে ডুব দিতেই সন্ন্যাস রোগ হয়েছিল। সেরিব্রাল এ্যাটাক আর কি! জলের তলা থেকে আর উঠতে পারেন নি। শোচনীয় মৃত্যু।

প্রণব বলল—যাক গে সে কথা। বয়েস হয়েছিল, শোকের কিছু নেই। তাঁর কি হয়েছিল সেইটে বলুন আগে—

নবীন দত্ত বললেন—ঈশ্বরকাকা তাঁর মামাশ্বশুরের বাড়ি যাচ্ছিলেন। আমাদের গ্রাম থেকে জায়গাটা ক্রোশ পাঁচেক দূরে। তখনকার দিনে পাল্কী ছাড়া আর কোনো যানবাহন ও-অঞ্চলে ছিল না। কিন্তু তাতে যেত কেবল মেয়েছেলে আর জমিদারেরা। সাধারণ লোক হেঁটেই মেরে দিত দু'দশ ক্রোশ। ঈশ্বরকাকাও হেঁটেই যাচ্ছিলেন।

আমাদের গ্রাম ছাড়িয়ে মাইল চারেক গেলেই পড়ে একটা বিরাট মাঠ। কাঁকুরে জমি—ডাঙা মাত্র। ফসল হয় না, কাজেই অনাবাদী পড়ে আছে বহুকাল থেকে। বেলা যখন ঠিক দুপুর, সেই সময় ঈশ্বরকাকা মাঠে নামলেন। প্রায় এক মাইল বিস্তৃত প্রান্তর, ওপার দেখা যায় না। দিগন্তের কাছে সূর্যের তাপে ধোঁয়া ধোঁয়া তাপতরঙ্গ উঠে থিরথির করে কাঁপছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় ওখানে দীঘি রয়েছে বুঝি একটা। এখানে-ওখানে দু'একটা বুনো ঝোপঝাড় ছাড়া সে মাঠে আর কিছু নেই। পোকামাকড়, প্রজাপতি, পাখ-পাখালী—মানুষজন, কিচ্ছু না। দুপুরের ঝিমঝিম মায়াবী রোদ্দুরে গা ঢেলে শুয়ে আছে কেবল ন্যাড়া মাঠ।

যেতে যেতে ঈশ্বরকাকার পথের পাশে পড়ল একটা আকন্দের ঝোপ। থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটে আছে তাতে। কাকা পথে বেরুলে সাধারণত হাতে একটা তেলেজলে পাকানো মোটা বাঁশের লাঠি নিতেন। আজও সে লাঠি হাতেই ছিল। ঐ ঝোপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাকা অন্যমনস্ক ভাবে ঝোপটায় লাঠি দিয়ে একটা বাড়ি মেরে গেলেন। যেমন লোকে করেই থাকে।

মাঠটা এমনিতেই বড়, কিন্তু আজ আর পথ যেন ফুরোতেই চাইছে না পেঁছিতে দেরি হবে, অবেলায় কুটুমবাড়ি গেলে তারা আবার রান্নাবান্নার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবে—এই ভেবে কাকা খাওয়া-দাওয়া সেরেই বেরিয়েছিলেন। সেকালের

লোকে বেশ খেতে পারত। ভরপেট খেয়ে রোদ্দুরে পথ হাঁটা ভারি কষ্টকর। আরো কিছুক্ষণ হেঁটে কাকা বিরক্ত হয়ে উঠলেন। কি ব্যাপার রে বাবা! যত বড়ই হোক—এর শেষ আছে তো, না কি? মোটে মাইলখানেকের তো মাঠ! সঙ্গে কেউ থাকলেও গল্প করতে করতে গেলে কষ্ট গায়ে লাগে না। কিন্তু এই তেপান্তরে কাউকে চোখেও দেখা যায় না কোনোদিকে।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পরেই ব্যাপারটা ঘটল। এক টুকরো নাবাল জমি পেরুনোর পরেই কাকার ডানদিকে পড়ল একটা আকন্দের ঝোপ। অমন ঝোপ এ মাঠে অনেক ছড়িয়ে আছে, কিন্তু এটার দিকে তাকিয়েই ঈশ্বরকাকার বুক দুরদুর করে উঠল।

ঝোপটার ক'টা ডাল ভেঙে নেতিয়ে পড়ে আছে। ভাঙা ডালগুলোর গোড়া দিয়ে তখনও ঝরে পড়ছে ঘন সাদা আঠার মত ক্বাথ। যেন এই কিছুক্ষণ আগেই কে ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

এরকম একটা ঝোপ একটু আগেই কাকা ভেঙে দিয়ে এসেছেন, সেই কথা মনে পড়ল। এটা কি সেই গাছটাই? কারণ সেই গাছটার কাছে পৌঁছবার সময়ও তাঁকে একটা নাবাল জমি পেরুতে হয়েছিল। অন্য কোনো মানুষও নেই এ মাঠে যে, এসে এই কান্ড করে যাবে। তাহলে কি ঘুরেফিরে তিনি আবার ঐ একই গাছের কাছে এসে হাজির হয়েছেন? একটু অবাক হয়ে এবার সোজা নাক বরাবর লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলেন ঈশ্বরকাকা।

কিছুটা যেতেই আবার সেই নাবাল জমি এবং আকন্দ ঝোপ! ভাঙা ডাল বেয়ে বিন্দু বিন্দু ক্বাথ ঝরছে!

চারদিকে শূন্য জনহীন মাঠ। ঈষৎ পড়ন্ত বেলার রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। মাঠের সীমানার চিহ্ন নেই কোনোদিকে। ঈশ্বরকাকা সাহসী লোক ছিলেন, তবু তার গা ছমছম করতে লাগল—যদিও তখন খটখট করছে দিনের আলো।

আরো কয়েকবার এমনি হোল। যত সোজা চলে মাঠ থেকে বেরুতে চান, ততই ঘুরে আবার একই জায়গায় এসে পড়েন।

তখন কাকার মনে হোল তিনি এলে ভূতের পাল্লায় পড়েছেন। গাঁয়ে সবাই বলে বটে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন না। নির্জন জায়গায় মানুষকে একা পেলে এলে ভূত প্রথমে তাকে দিকভ্রান্ত করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়; তারপর সে ক্লান্ত ও ভীত হয়ে পড়লে তাকে মেরে ফেলে। আগে অবিশ্বাসী ছিলেন, আজ এ অবস্থায় পড়ে ভাল করেই বিশ্বাস জন্মাল।

গ্রামের লোকেরা বলে, এলে ভূত ধরলে ছাড়া পাবার উপায় হচ্ছে কাপড় ছেড়ে উল্টো করে পরা। ঈশ্বরকাকা প্রথমে হাতজোড় করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন—হে ভগবান! তুমি সর্বশক্তিমান। আমাকে এ অবস্থা থেকে উদ্ধার করো।

মানুষজন নেই কোথাও, কাজেই লজ্জা পাবারও প্রশ্ন ওঠে না। কাকা সেখানে দাঁড়িয়েই কাপড় খুলে ফেলে ভাল করে ঝেড়ে উল্টে পরলেন। তারপর ভগবানের নাম করতে করতে এগুতে লাগলেন। পাঁচ মিনিট হাঁটতেই হাতীশালা গ্রামের প্রথম বাড়িটির খড়ের চাল দেখা গেল।

গল্প থামালেন নবীন দত্ত। তাঁর বলার ভঙ্গিটি ভারি চিত্তাকর্ষক। আড্ডাধারীরা মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন। নবীন প্রণবের দিকে তাকিয়ে বললেন—তবে?

—তবে কি?

ঈশ্বরকাকা কি মিথ্যে কথা বলেছিলেন আমাকে? আমার নিজের কানে শোনা—

—মিথ্যে বলেন নি, তবে আপনাকে ছেলেমানুষ পেয়ে বানিয়ে বলে থাকতে পারেন।

—তাহলে আপনি এর কোনো গুরুত্বই দিচ্ছেন না?

প্রণব হেসে বলল—অবশ্য এর আর একটা ব্যাখ্যাও হয়।

নবীন বললেন—কি?

—আপনার কাকা ঠেসে খেয়ে বেরিয়েছিলেন বলছেন। ভরপেট খেয়েই রোদ্দুরে বেরুনোর জন্য আপনার কাকার পেটগরম হয়ে থাকবে। ও অবস্থায় মানুষ অনেক কিছু দেখে।

ক্ষুব্ধ নবীন দত্ত আর কিছু বলেন নি।

আড্ডা ভাঙতে ভাঙতে বেশ রাত হয়েছিল। এখন বাড়ি ফিরছে প্রণব। একটা লোক আছে পার্ট-টাইম কাজের জন্য। সে রান্না করে খাবার চাপা দিয়ে রেখে চলে যায়। প্রণবের ফিরতে দেরি হয় রোজই। চাকর তালা দিয়ে যায়। তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। বিশ্বাসী লোক—সামনে টাকা পড়ে থাকলেও ছোঁবে না।

অন্ধকার পথ। এদিকে রাস্তায় আলো নেই। তাতে অবশ্য কোনো অসুবিধে হয় না; দুবেলা যাওয়া-আসা এই পথে। চোখবুজে হেঁটে চলে যাওয়া যায়। কিন্তু আজ প্রণবের মনে কেমন একটা ভাব হল। ঠিক ভয় বলা চলে না বোধহয়, একটা গা-ছমছম-করা অনুভূতি। ঠিক যেন মনে হচ্ছে পেছনে কে আসছে। তার পায়ে কোনো শব্দ হচ্ছে না, তাকে দেখাও যাচ্ছে না। তবু বোঝা যাচ্ছে সে পেছন পেছন আসছে। প্রণবের মাথার পেছনটা শিরশির করতে লাগল। সে ভীতু নয়, ভূতের অস্তিত্ব আছে—এ কথাও মানে না, তবু মনের গভীরে দানা বেঁধে ওঠা ভয়টাকে সে উড়িয়ে দিতে পারল না।

তালা খুলে বাড়িতে ঢুকে কেরোসিনের বড় আলোটা জ্বালতেই তার ভয় অনেকটা দূর হয়ে গেল। এমন কি মিছিমিছি ভয় পাওয়ার জন্য নিজের ওপর রাগও হল কিছুটা। অড়র ডাল, হাতে গড়া রুটি আর ঢেঁড়সের তরকারি খেয়ে দু'গ্লাস জল খেল প্রণব। তারপর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু ঘুম এল না। খাটের পাশে বড় জানালাটা খোলা। তাকালেই দেখা যায় সুপুরি গাছের মাথায় আটকা পড়েছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। টিপ-টিপ করে জোনাকি জ্বলছে শেওড়াবনে। কিন্তু আজ জানালার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করল না প্রণবের। যেন ঐদিকে তাকালেই কার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাবে। ঘরেও যেন কেমন গুমোট—কেমন একটা প্রতীক্ষার শান্তভাব। কার যেন আজ আসবার কথা আছে। কে আসবে বলে যেন অপেক্ষা করে আছে আজকের রাত। অনেক চেষ্টা করেও মনের অস্বস্তিটা কিছুতেই কাটাতে পারল না প্রণব।

ক্রমে রাত আরো গভীর হল। বাতাসও যেন পড়ল ঘুমিয়ে। ঘুমে অবসন্ন নক্ষত্রদের চোখে ম্লান হয়ে এল জ্যোতি। তখনও প্রণব জেগে।

ঠিক এই সময়ে তার মনে হল ঘরে কি যেন একটা হচ্ছে। কে যেন তার কানে কানে ফিসফিস করে বলল—পায়ের দিকে তাকাও।

পায়ের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সেখানে অন্ধকারের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা আলোর অবয়ব। তীব্র আলো নয়। খুব ম্লান রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ির

অক্ষরের মত মৃদু সবুজ আলো। ফসফরাস থেকে যেমন বেরোয়।

প্রণব তাকিয়ে আছে, আর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে একটা মূর্তি। সে মূর্তি মানুষের মত নয়—আবার ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠবার মতও কিছু নয়। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে তার দুই চোখ।

হঠাৎই প্রণবের মন থেকে ভয়ের ভাবটা দূর হয়ে গেল। যাকে দেখা যায়, তাকে আবার এত ভয় কিসের? না, আর সে ভয় পেয়ে নিজেকে ছোট করবে না।

সেই আশ্চর্য মূর্তির গঠন তখন শেষ। মানুষের পরিচিত কোনো জীবের সঙ্গেই তার তুলনা হয় না। দুই পায়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং দুটো চোখ আছে—এইটুকুই মানুষের সঙ্গে তার যা মিল। মূর্তিটা তার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আধবসা হয়ে প্রণব জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে? কি জন্যে এসেছ?

আশ্চর্যরকম মোটা খসখসে গলায় সে বলল—আমি প্রেত।

প্রণব বলল—ভূত?

—বলতে পার।

—তা, এখানে কি মনে করে? ঘাড় মটকাবে?

প্রণবের মনে হল মূর্তিটা যেন হাসল। তারপর বলল—তোমরা আজ প্রেত নিয়ে আলোচনা করছিলে, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম তুমি একেবারে অবিশ্বাসী। মনে হল তোমাকে একবার দেখা দেওয়া দরকার।

প্রণব বলল—তুমি কতক্ষণ থাকবে?

—বেশিক্ষণ নয়। পৃথিবীর আবহমণ্ডল থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আমাদের দৃশ্যমান হতে হয়। সে জিনিস আমরা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারি না।

—তাহলে তুমি পালাবার আগেই তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে নিই। অন্য কেউ তার উত্তর দিতে পারবে না। আচ্ছা, পরলোক বলে কি সত্যি কিছু আছে?

প্রেত বললে—দেখতেই পাচ্ছ।

—ঈশ্বর আছেন?

কিছুক্ষণ সব চুপ, তারপর প্রেত বলল—ও প্রশ্ন কোরো না।

—কেন?

—সব প্রশ্নের উত্তর আমরাও জানি না। কিছু রহস্য চিরকালই রহস্য থেকে যায়।

বালিসে হেলান দিয়ে প্রণব একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল—তোমাদের দিন গিয়েছে।

অবাক গলায় প্রেত বলল—কিরকম?

—তোমরা তো আজকাল কাউকে পাও না। সত্যি বলতে কি গত পঞ্চাশ বছরে তোমরা মানুষকে পাওয়া ছেড়েই দিয়েছ বলা যায়। বহুদিন তেমন কোনো খবর শুনি নি। তোমাদের হল কি? এই বিদ্যুৎ, রেডিও, এরোপ্লেন, এটম বোমার যুগে তোমরা ভয় পেয়ে লুকিয়ে পড়েছ নাকি?

প্রেত গম্ভীর গলায় বলল—ভুল, ভুল। তুমি ভুল করছো। আমি বেশিক্ষণ আর থাকবো না। তোমাকে ক'টা কথা বলে যাই। দেখ, তোমরা মানুষেরা যে আর ভূতে-পাওয়ার খবর শুনতে পাও না, তার কারণ এই নয় যে, আমরা আর কাউকে পাই

না। আমরা আমাদের আক্রমণের কায়দা বদলেছি মাত্র। আমরা এখন লোক বুঝে পাই—

বিহ্বল প্রণব বলল—তার মানে?

—গত পঞ্চাশ বছরে খাদ্যে ভেজাল বেড়েছে, লক্ষ্য করেছ? নকল ওষুধ তৈরি হয়, সে খবর পাও নি? মানুষ মানুষকে হাসতে হাসতে ঠকাচ্ছে, ট্রামে-বাসে দুর্বল—অশক্তকে কেউ জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে না—এসব কেন হচ্ছে জান? আমরা ওদের সবাইকে পেয়ে বসেছি। কিছু কিছু ঘৃণ্য সৎলোক আছে, তারা ভয়ানক কাজে বাধা দিচ্ছে। তবে কালে তাদেরও কাবু করে ফেলতে পারব আশা রাখি। তুমি জান না, কিন্তু দুনিয়া অনেকদিন আগেই আমাদের হাতে চলে এসেছে। হিঃ হিঃ—

হতবুদ্ধি প্রণবের সামনে আশ্চর্য হাসি হাসতে লাগল এক জ্বলজ্বলে প্রেত।

সাক্ষাৎকার

গাড়িতে উঠে জায়গা পাওয়া গেল। রবিবার। ভিড় কম। তাছাড়া এ গাড়ি চলেছে কোলকাতা থেকে উল্টোদিকে। রাজধানী থেকে দূরে যেতে চায় এমন লোক কম—এটা সহদেবের বহুদিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা।

জানালার পাশে মুখোমুখি দুটি সিট পাওয়া গেল পাশে একটি। বসে সিগারেট ধরালো তিনজনে। সহদেব উইলস, বাকিরা চারমিনার। বার কয়েক ধোঁয়া ছেড়ে হিমাংশু বলল—সহদেব, পাঁচ ফর্মা ডবল ডিমাই স্মলপাইকা ছাপতে কত নেবে রে?

সহদেব কিছুক্ষণ ভেবে বলল– তা ভালো প্রেস হলে তিনশো সাড়ে-তিনশো তো বটেই—

আর মনে কর, এগারোশো ইম্প্রেশনের কাগজ, কভার, বাঁধাই—এসব?

—আরো চারশো—

—তাহলে সাড়ে-সাতশো। আচ্ছা, আটশোই ধর। গ্রামে আমার একটু জমি আছে, সেটা বিক্রি করে একটা পাঁচ ফর্মার কবিতার বই বার করবো, বুঝলি?

সহদেব বলল—বুঝলাম। কিন্তু তারপর?

হিমাংশু বলল—তারপর সুইসাইড করবো।

পবিত্র একবার তাকালো হিমাংশুর দিকে, তারপর বলল—শালা পাগল।

—খামোকা গালাগাল দিচ্ছিস কেন?

সহদেব হেসে বলল—রাগ করিস না, পবিত্রর মুখ একটু খারাপ। তুইও ভেবে দ্যাখ—একবার মার খেলে তুই আর কখনো জমি বিক্রি করার সুযোগ পাবি না। বরং বেঁচে থাকলে পরে সুবিধেমতো সুইসাইড করলেই হবে।

—বেঁচে থাকা এখন ঘোর মুশকিল। কোলকাতায় একটা চাকরির ঠিক হয়েছিল, তার ভরসায় গ্রামের স্কুলের মাস্টারী ছেড়ে দিয়ে এলাম। এখন সেখানে আর নিতে চাইছে না। আমার নৌকো নদীর ঠিক মাঝখানে—এপারেও না, ওপারেও না। আর কিছুদিন গেলে এমনিতেই মরে যাবো। তার চেয়ে বরং বই ছাপিয়ে আত্মহত্যা করলে অমর হয়ে যাওয়ার চান্স আছে।

পবিত্র বলল—দ্যাখ, মেয়ে দেখতে যাওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আবার ওসব কুকথা

কেন ? বরং, একটা গান গা দেখি—

দ্বিতীয়বার অনুরোধ করার আগেই হিমাংশু কামরাসুদ্ধ লোককে চমকে দিয়ে বিকট হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠলো—চল নাতি জীব কলিকতাকু / বন্ধা রাখিনুআ জুতা ছতাকু / কলিকতা বড় শহর / ঠাঁউ ঠাঁউ পকা অফিস ঘর / ঘরে বসি বসি কঁড় করিব—

সহদেব ধমক দিল—এই, কি হচ্ছে ? সবাই দেখছে তোকে—

হিমাংশু গলার জোর বাড়ালো—ফিরিনু কলিকতারু / কিনিবা হলে গরু—

পুরো গানটি গেয়ে থামলো হিমাংশু। পবিত্র পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে বলল—ওফ্।

নৈহাটিতে গাড়ি বেশ ফাঁকা হয়ে গেল। কল্যাণী ছাড়িয়ে দু'পাশে বড় বড় মাঠ। অনেকদিন বাদে এত সবুজ একসঙ্গে দেখছে সহদেব। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনটা তার ভারি ভালো হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চলেছে। চাকদা, পায়রাডাঙ্গা, রাণাঘাট। রাণাঘাটে চা কিনলো সহদেব। সবাইকে দিল। ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে কি কারণে।

চা খেয়ে হিমাংশুর মুড এলো। নতুন সিগারেট ধরিয়ে একটা কায়দা করে জিজ্ঞাসা করলো—মেয়েটির নাম কি বন্ধু ?

—শিউলী।

—শিউলী ! একটু ঊনবিংশ শতাব্দীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না ?

সহদেব সংক্ষেপে বললো—আমার তাই ভালো।

বেশিক্ষণ তর্ক করার সুযোগ না পেয়ে দুঃখিত মুখে হিমাংশু সিগারেটে মন দিলো।

তাহেরপুর থেকে উঠেছে এক চাষী পরিবার। সঙ্গে টিনের বাক্স, একটা মরচে ধরা পাখির খাঁচা, গুড়ের নাগরী, হাতপাখা, দুটো পেট মোটা চটের বস্তা এবং একটা ফাটা চিমনীওয়ালা হ্যারিকেন। গাড়ির মেঝেয় বাবা-মা কালো কালো দুটো বাচ্চার এক একটিকে কোলে নিয়ে বসে।

দেখতে দেখতে চলেছে সহদেব। হিমাংশু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। একটু উস্‌খুস্ করে বলল—কি খাওয়াবে রে ?

সহদেব অন্যমনস্ক ছিল, শুনতে পেল না।

—অ্যাই ?

—অ্যাঁ ?

—কি খাওয়াবে রে ওরা ?

—তা আমি কি করে জানবো ? আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তো আর আয়োজন করে নি।

কথাটার যাথার্থ্য উপলব্ধি করে হিমাংশু আবার বিমর্ষ হয়ে পড়লো। একটু ভেবে সহদেবের দিকে তাকালো।

—সহদেব—

—বল—

—দুপুরে খেতে বলেছে যখন, মাংস করবে বোধহয়। না ?

—তা করতে পারে।

—বহুদিন মাংস খাই নি। শালা চাকরিটা গিয়ে অবধি—

পবিত্র শুনছিল। এবার বলল—মাঝে মাঝে এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। হপ্তাখানেক আগে একদিন কোলকাতায় গেছি, পকেটে ছিল শুধু যাবার ট্রেন ভাড়াটা। ব্যারাকপুর থেকে শেয়ালদা—পঁয়ষট্টি পয়সা। একজনের কাছে দশটা টাকা পেতাম। বলেছিল বারোটার সময় কফি হাউসের নিচে দাঁড়াবি, টাকাটা দেব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের গাঁট ফুলে গেল, ছেলেটা এলো না। সারাদিন খাওয়াদাওয়া নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। একটা পয়সা নেই পকেটে, কি খাবো? একেবারে না খেয়ে কখনো থাকি নি, কাজেই দিনটা মনে ছিল। গতকাল দেখলাম প্রেসিডেন্সী কলেজের গেটের পাশে একটা লোক ভুট্টা পোড়াচ্ছে। পকেটে পয়সা ছিল দাঁড়ালাম। পরপর তিনটে ভুট্টা পোড়া খেয়ে লোকটাকে একটাকা পাঁচ পয়সা গুণে দিতে গিয়ে হাসি পেল। সাতদিন আগে ভাত জোটে নি—এককাপ চা খেতে পারি নে পয়সার অভাবে! আর আজ একটাকার ভুট্টা খেয়ে দাম দিচ্ছি।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। তারপর হিমাংশু বলল—বিয়ে এখানেই হবে মনে হয়, না?

সহদেব বলল—আশা করা যায়। মা এসে মেয়ে পছন্দ করে গেছেন। মায়ের পছন্দে আমার বিশ্বাস আছে। মেয়ের নাকি পানপাতার মত মুখ, গলায় তিনটে খাঁজ। তাছাড়া গান গায় আর ছবি আঁকে।

পবিত্র আবার পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে বলল—উফ্।

কৃষ্ণনগরে নেমে রিক্সা ভাড়া করল ওরা। একটায় সহদেব আর পবিত্র, একটায় হিমাংশু একা।

—কোথায় যাবেন বাবু?

—ডি. এন. রায় রোড চেনো?

রিক্সাওয়ালা ঘাড়টা একবার চুলকে অমায়িকভাবে হেসে বলল—কৃষ্ণনগরে দশ বছর রিক্সা চালাচ্ছি আজ্ঞে—

ডি. এন. রায় রোড, পাশে জজকোর্ট, সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি মেয়ের বাবার। এমন আদর করে তাদের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হোল যে সহদেবের নিজেকে ভি. আই. পি বলে মনে হচ্ছিল। বাড়ির আবহাওয়া খুব ভালো লাগছিল সহদেবের। মেয়ের বাবা সুদর্শন ভদ্রলোক—তাঁকে সহদেব আগেই দেখেছে, এবার তিনি একজন সৌম্যমূর্তি মহিলাকে নিয়ে ঘরে এলেন—ইনি হচ্ছেন—

আর কিছু বলবার আগেই সহদেবরা উঠে টকাটক প্রণাম করে ফেলেছে। ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে পবিত্র ফিস ফিস করে বলল—তোর শাশুড়ী। সহদেব চাপা গলায় ধমকে বলল—চোপ।

প্রাথমিক আপ্যায়নের অঙ্গ হিসেবে সরবত এলো। তাতে প্রথম চুমুক দেওয়া হয়েছে, এমন সময় মেয়ের বাবা বললেন—এবার তাহলে—

হিমাংশু ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক আছে, এবার আনুন।

উত্তেজনায় সহদেব সরবতের গ্লাসটা সজোরে চেপে ধরেছে। গলার কাছে একটা শিরা দপ্‌দপ্ করছে। সহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউনিভার্সিটির নামকরা

ডিবেটার সারা ক্লাসকে যে মাতিয়ে রাখতো হাসির গল্প করে আর গান গেয়ে, এখনো অফিসের সহকর্মীরা যাকে টিফিন আওয়ারে ঘিরে বসে মজার গল্প শোনবার জন্য, সে কিনা একটা সতেরো বছরের বালিকার সঙ্গে প্রাক্-বৈবাহিক সাক্ষাৎকারে ভয় পেয়ে গেল!

এভাবে মনকে বুঝিয়ে অবশ্য কোনো লাভ হোল না। সে গ্লাসটা চেপে ধরেই রইল, গলার শিরাটা দপ্‌দপ্ করতেই থাকল।

মেয়ে সত্যিই ছেলেমানুষ। বেগুনী রঙের পিওর সিল্কের শাড়ি পরে ঘরে ঢুকে বসলো খাটের এককোণে। সহদেব যেন খুব অন্যমনস্ক, উদাসীন। কেন সে এসেছে, চারপাশে কি হচ্ছে, এসব সম্বন্ধে সে আদৌ সচেতন নয়।

হাতের ইঙ্গিতে ময়ের বাবা বয়স্কদের সরিয়ে দিলেন, তারপর মেয়ের পিসিকে মোতায়েন রেখে বুদ্ধিমান ভদ্রলোক নিজেও কক্ষান্তরে পা চালালেন।

হিমাংশু সামনে ঝুঁকে পড়ে চেহারায় স্মার্টনেস্ আনতে আনতে জিজ্ঞাসা করল—আপনার নামটা—

পিসিমা বললেন—এইটুকু মেয়েকে আবার আপনি কেন?

থতমত খেয়ে হিমাংশু উইকেট ছেড়ে দেবার উপক্রম করতেই পবিত্র ভীষণ শব্দে কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল—তোমার নাম কি?

সহদেব যেন এসব কথায় কৌতূহলী নয়। মনোযোগ দিয়ে দেখছে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলো। এদিকে শ্রবণেন্দ্রিয় উদ্‌গ্রীব বিশেষ একটি কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য চোখ দুটো বারবার ফিরে যেতে চাইছে খাটের কোণায়। কঠোর প্রচেষ্টায় সে তাদের দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারে নিবদ্ধ রেখেছে।

সেতারের চিকারীর মৃদু শব্দের মত উত্তর এলো—শিউলী মৌলিক।

মরিয়া হয়ে সহদেব ঝট্ করে তাকালো মেয়েটির দিকে। ঠিক আছে—গলায় তিনটে খাঁজ, পানপাতার মত মুখ, আর চিবুকে একটা টোলও আছে। এটা মা পুরো ওভারলুক করে গেছে—মনে মনে ভাবলে সহদেব।

পিসিমা বললেন—তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করবে না বাবা?

সহদেব সদ্যগ্রামাগত যুবকের মত ঢোঁক গিলে বলল—আমি?

—হ্যাঁ, কথা বলো দু'একটা—

অনেক ভেবে সহদেব বলল—আপনি তো—মানে তুমি তো গান গাইতে পারো, তাই না?

একটা অদৃশ্য সেতারের চিকারীতে আবার যেন কার আঙুল একটা ঘা দিল।

—হ্যাঁ—

—একটা গাও না—

হারমোনিয়াম এলো। এবার চিকারীতে ঝড়। রবীন্দ্রসঙ্গীত—'দিনের বেলা বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে।'

বেশ গলা। সহদেব মুগ্ধ। আরো পনেরো মিনিট বিভিন্ন একাক্ষরী সংলাপের পর মেয়ের বাবা মেয়েকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

খাওয়ার ডাক এলো। ফ্রায়েড্ রাইস্, মাছভাজা, ইলিশের ঝাল, মাংস, সরষে দিয়ে পার্শে মাছ, দই, মিষ্টি। সহদেব যা খেলো তা তার স্বাভাবিক খাওয়ার এক-চতুর্থাংশ। হিমাংশু চেটেপুটে খেয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে ঢেঁকুর তুলতে লাগল।

পবিত্রর পেট ভালো যাচ্ছে না, তার সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই।

আবার বাড়ির পথ। দিনশেষের ক্লান্ত স্পর্শ রেল-লাইনের দু'পাশের দিগন্ত-প্রসারী সবুজ মাঠে। লাইন সারানো হচ্ছে—ঢিকোতে ঢিকোতে চলেছে গাড়ি। হিমাংশু ওড়িয়া গানে উৎসাহ পাচ্ছে না, পবিত্র মুখখারাপ করছে না। ওরা দু'জন যেন কেমন মিইয়ে গেছে। কণ্ঠিওয়ালা একজন লোক গান গেয়ে ভিক্ষে করছে—ওমা আর কতদিন থাকবো বসে ঘাটে।

হিমাংশু ডাকলে—সহদেব—

—কি ?

—তুই যদি মেয়েটাকে বিয়ে না করিস, তাহলে আমাকে জানাবি। একটা ভালো চাকরি পেলে আমিই বিয়ে করবো। জানাবি তো ?

সহদেব চাকরির বাজার কেমন জানে। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল—জানাবো।

মরবো না

রবিবার সকালে কানাই আমার বাড়ি এল।

খবরের কাগজ খুলে চা নিয়ে বসেছিলাম। তখনো চুমুক দিই নি. কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম,—নে খা—আমার জন্য বানাতে বলি।

কানাই মাথা নেড়ে বলল—নাঃ, চা ছেড়ে দিয়েছি।

অবাক হয়ে বললাম—তুই চা ছেড়ে দিয়েছিস ? তুই !

—হ্যাঁ। নেশা বজায় রেখে লাভ কি ? আমি দু-একদিনের মধ্যেই আত্মহত্যা করবো।

এত শান্তমুখে এবং স্বাভাবিকভাবে কানাই কথাটা বলল যে, প্রথমে আমি খেয়ালই করি নি। যেমন 'বিকেলে একটু ভদ্রেশ্বর যাবো' কিম্বা 'জামাটা কাচতে দিতে হবে' শুনলে কেউ চমকায় না, তেমন। তারপরেই সোজা হয়ে বসে বললাম—কি বললি কথাটা ?

কানাই বলল—ঠিকই শুনেছিস। আমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি।

—কিন্তু কেন ?

একটা নিঃশ্বাস ফেলে কানাই বলল—সে অনেক কথা। তা ছাড়া কারণগুলো বেশির ভাগই মনের ভেতরের, অনেক বুঝিয়ে বলা কঠিন। আমি যদি বলি আমার প্রথম যৌবনে আমাদের বসবার ঘরের জানালার পাশে একটা টগর গাছ ছিল, তাতে অজস্র ফুল ফুটতো ফাগুন মাসে হু-হু বাতাস এসে দোলা দিত, সে গাছটা এখন আর নেই—শুকিয়ে মরে গিয়েছে বছর আষ্টেক আগে, তাহলে এটাকে কি তুই আত্মহত্যার কারণ বলে মেনে নিবি ?

বললাম—না, তাহলে আমি তোকে একটা বদ্ধ পাগল বলে মেনে নেবো।

—তা মনে করলে তোকে দোষ দেওয়া যায় না এবং এইজন্যই ব্যাপারটা অন্যকে বোঝানো মুস্কিল। আমার জীবন যখন গড়ে উঠছিল যখন আমি ভবিষ্যতে কিছু একটা হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখছিলাম সেই সময়টার সঙ্গে ওই টগর গাছটা জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে। সন্ধ্যেবেলা ঘরে আলো নিভিয়ে বসে ওটার দিকে তাকালে

আমার মনে হত—জীবনে আর কিছু চাই না। সময় কাটার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সেই সব সরল আনন্দও চলে গেল, গাছটাও গেল শুকিয়ে। তার ফলেই—বুঝলি না?

আমি ঠিক কিছুই বুঝলাম না। তবে মনে হল কানাই খুব বিপজ্জনক খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। বরাবরই ও খুব ইমপাল্‌সিভ, চট করে একটা কাণ্ড করে ফেলতে বাধে না। যে কাজ করতে আমরা একমাস ভাবি রাত্তির জেগে দুশ্চিন্তা করে চোখের তলায় কালি পড়ে যায়, সেটা কানাই টিফিনের সময় সিঙ্গাপুরি কলা খেতে খেতে করে ফেলতে পারে। কানাইকে কোনো কিছু থেকে বিরত করাও খুব কঠিন। মনে মনে ভাবছি কিভাবে ওর চিন্তার মোড় ঘোরানো যায়, এমন সময় কানাই বলল—আমি একজন দেখিয়ে হতে চেয়েছিলাম।

—দেখিয়ে?

—হ্যাঁ। যেমন লিখিয়ে, গাইয়ে—তেমনি দেখিয়ে।

—সেটা কি জিনিস? সবাই-ই তো দেখিয়ে।

—কে বলেছে? তাকায় সবাই, কিন্তু দেখে ক'জন? দেখা একটা উঁচুদরের শিল্প। রবি ঠাকুরের কবিতায় আছে না—তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া, ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া? আমি জীবনকে সেইভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলাম। কত দেখবার জিনিস আছে বল তো? একটা জীবনে কি দেখে শেষ করা যায়? এই মনে কর—বর্ষার দিনে বাঁশঝাড়ের পাশে পুকুরে মাছ ধরতে বসে কচুর পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে দেখা, আকাশে কালো মেঘ আর তার নিচে দেওয়ালে লাগানো সারি সারি ভিজে ঘুঁটে, নরম মাটিতে অচেনা সাইকেল আরোহীর চাকার দাগ, খোলা বইয়ের পাতার ওপর দিয়ে পোস্তর দানার মত ছোট্ট পোকার হেঁটে যাওয়া, গত শীতে যে কোট হ্যাঙারে টাঙিয়ে রেখেছিলি—এই শীতে সেটা পরতে গিয়ে তার ভেতরের পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার ভুলে যাওয়া নোট আবিষ্কার করা, অন্ধকার বনে শালপাতা নড়ার শব্দ, যে লোক সঙ্গত কারণে ভয়ানক রাগ করেছে তার চোখের মণি—এরকম আরো কত কি, সব দেখে নেওয়ার পক্ষে দশটা জীবনও যথেষ্ট নয়। ভেবেছিলাম অন্যদের তো কত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার আই·এ·এস. হতে চায়, আমি ওসব কিছু না হয়ে সুন্দর জিনিস দেখার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকবো। এমন একটা কিছু অন্যায় চাওয়া নয়, বল্? অথচ দেখ্, আমাকে এই হপ্তাতেই আত্মহত্যা করতে হচ্ছে।

কানাই চুপ করল। আমিও চুপ করে বসে রইলাম। পরিস্থিতিটা একটু অদ্ভুত রকমের তাতে সন্দেহ নেই। পুরনো বন্ধু ছুটির দিন সকালে এসে তার আত্মহত্যা করার পরিকল্পনার কথা জানাচ্ছে। এমন অবস্থায় কি বলা যেতে পারে ভেবে পেলাম না।

একটা পাঁশুটে বেড়াল হেঁটে গেল পাঁচিলের ওপর দিয়ে। টেবিলে রাখা খবরের কাগজের পাতা ফরফর করে উড়ছে বাতাসে। রান্নাঘর থেকে ডালে ফোঁড়ন দেবার গন্ধ ভেসে এল।

কানাই নখ দিয়ে টেবিলক্লথের ওপরে আঁকিবুঁকি কাটছিল, এবার মুখ তুলে বলল—রমেন বলে ক্লাস সিক্সের একটা ছেলে সপ্তাহে তিন-চারদিন সন্ধ্যেবেলা আমার কাছে পড়তে আসে। খুব গরীব, বাবা নেই। রমেনের হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা

চলছে, শনিবার শেষ হবে। রবিবার দুপুরের দিকে আমি ঘুমের বড়ি খেয়ে—বুঝলি তো? জীবনে কারও ঋণ রাখি নি, কাউকে কথা দিয়ে খেলাপ করি নি। এ ছেলেটাকেও পড়াতে শুরু করেছি যখন, পরীক্ষা শেষ হবার আগে কিছু করা অনুচিত হবে।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক আত্মহত্যা করবে ঠিক করলে তাকে আটকানো কঠিন। সে বিষ খেতে পারে, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে পারে, ঘরে বন্ধ করে রাখলে গলায় দড়ি দিতে পারে—মোট কথা তাকে ঠেকানো যায় না। এক যদি তাকে যুক্তি দিয়ে পথে আনা যায়। সে-উদ্দেশ্যে বললাম—আচ্ছা, তোর আকাঙ্ক্ষা যখন এতই কম, তখন তোর বেঁচে থাকতে আপত্তি কি? তোর দেখার জিনিস তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না?

—নিচ্ছে।

—কি রকম?

—পৃথিবী বদলে যাচ্ছে। মানুষ আছে বলেই পৃথিবীটা সুন্দর। সেই মানুষ বদলে যাচ্ছে। আজকাল পাশের বাড়িতে কান্নার রোল উঠলে কেউ জানালা খুলেও জিজ্ঞাসা করে না কি হয়েছে। ট্রেনে, বাসে, পথে কেবল এক ছাঁচে ঢালা কতগুলো নিষ্ঠুর, কঠিন মুখ—সবাই যে করে হোক আরো বেশি কিছু উপার্জন করতে বেরিয়েছে। তাদের কারো কাছে কারো দয়া মায়া স্নেহ বা ভদ্রতার প্রত্যাশা নেই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মনে আছে তো? তিনিও প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে বসে তৃপ্তি পাচ্ছেন না, বলছেন—ম্যাচ্‌ ইট গ্রিভস্‌ মাই হার্ট টু সি হোয়াট ম্যান হ্যাজ মেড অফ ম্যান। আর এদিকে দেখ, মাথার ওপর পরমাণু বোমা নিয়ে ঘুরছে উপগ্রহের দল, সমস্ত পৃথিবীজুড়ে চলেছে, যুদ্ধের আয়োজন। এখানে আর কি দেখবো? কি দেখতে ভাল লাগবে? এমন পৃথিবীতে ভাল দেখিয়ে হওয়া যায় না।

হঠাৎ থেমে গিয়ে কানাই বলল—যাক গে এসব কথা। মোটের ওপর আমার টগর গাছটা মরে গিয়েছে। তেমন করে আর বাতাস বয় না।

আমার মনে পড়ল অনেকদিন আগে একবার আমি আর কানাই বারাসত হয়ে একটা গ্রামের মধ্যে বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখন কলেজে পড়ি একটু-আধটু কবিতাও লিখি। সিমহাট গ্রামের একটা ডোবার পাশ দিয়ে যেতে যেতে পা ফসকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম। জল বেশি ছিল না, কোমর পর্যন্ত কাদাজলে দাঁড়িয়ে দেখি একটা জামরুল গাছের ডাল ধরে ঝুঁকে পড়ে কানাই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বলছে—ভয় নেই, ধর আমার হাত শক্ত করে—উঠে আয়। আমি বন্ধুর হাত ধরে উঠে এসেছিলাম।

আজকাল কি কেউ বন্ধুর হাত ধরে তুলে আনে?

কানাই উঠে দাঁড়িয়ে বলল—প্রথম জীবনে অনেকেরই কবিতা লেখার শখ থাকে। আমারও ছিল। কয়েকটা খাতাভর্তি কবিতা লেখা আছে আমার। সে সব অবশ্য একেবারেই কিছু নয়—তবু নিজের কাছে তার একটা মূল্য আছেই। আমি তো বিয়ে-থাওয়া করি নি, কেউ নেই আমার। আমি মরে গেলে খাতাগুলো বাজে লোকের হাতে পড়ে সের-দরে বিক্রি হয়ে যাবে। সে আমার সইবে না। খাতাগুলো তোকে দিয়ে যেতে চাই। শনিবারের মধ্যে একদিন অফিসফেরত গিয়ে নিয়ে আসিস। চলি তাহলে—

কানাই চলে গেল বটে, কিন্তু মনটা সারাদিন বিষণ্ণ হয়ে থাকল। কেবলই মনে হতে লাগল বয়েস হয়ে যাচ্ছে, মনে হতে লাগল পৃথিবীটা আর আগের মত নেই। পৃথিবী বদলাচ্ছে, না আমার বয়েস বেড়েছে বলে এমন ঠেকছে? নাকি দুটোই? মনে পড়ে গল গতকাল ট্রেনে একজন আমার পা বুটজুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু তার মুখে দুঃখ ফুটে ওঠে নি। আমি আফ্রিকাতে রাইফেল হাতে অ্যাডভেঞ্চারে যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু কার্যত দীঘা ছাড়া কোথাও যেতে পারি নি।

জীবনটা এলেবেলে কেটে গেল, এমনি এমনি।

হিসেব করে দেখলাম প্রকৃত সুখ যাকে বলে তা কোনোদিন পাই নি। কিছু তাৎক্ষণিক উল্লাস আর আরামকে সুখ বলে ধরে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম। মাইনে পেয়ে ব্রয়লার মুরগী হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরেছি, বোনাস পেয়ে ঘরের কোণ থেকে বাবার পুরনো আর্মচেয়ার সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসিয়েছি রঙিন টিভি। ট্রেনে জানালার ধারে জায়গা পেলে অফিসে সারাদিন গুনগুন করে সুর ভেঁজেছি। প্রমোশন পেয়ে বাড়িতে দিয়েছি সত্যনারায়ণের সিন্নি। কিন্তু কয়েকদিন আগে গলির মোড়ে একটা ঘেয়ো কুকুরকে হোটেল থেকে ফেলে দেওয়া হাড় পরম তৃপ্তিতে চিবোতে দেখেছিলাম। আমি নিজে গত কুড়ি বছরে অত তৃপ্তি করে খাবার খেয়েছি কি?

নাঃ, কানাই আমার এ কি করে গেল?

তারপর অবশ্য, যেমন হয়—সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত নিত্যযাত্রার ঠেলাঠেলিতে, অজস্র মানুষের অবারিত কলরবে আমি এই বৈরাগ্য কাটিয়ে উঠতে পারলাম। শনিবার কানাইয়ের কাছে যাওয়াও হল না। এই ভাড়াবাড়ি ছেড়ে একটা ফ্ল্যাট কিনে উঠে যাবার মতলবে আছি, কিছু টাকা অ্যাডভান্সও করেছি এক জায়গায়। সেখানে একটা জরুরী কথা বলতে যাবার দরকার ছিল। আর নিজের মনের কাছে লুকোচুরি নেই, কানাইয়ের কাছে যাবার ব্যাপারটা ঠিক মনেও ছিল না। সে যতক্ষণ বসেছিল ততক্ষণ বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়েছিলাম—চলে যাওয়ার পরেই ধীরে ধীরে মনে হয়েছে সমস্ত ঘটনাটাই একটা পাগলামি। এমন বলে-কয়ে কি কেউ আত্মহত্যা করে?

কিন্তু রবিবার বিকেলে কথাটা মনে পড়তেই উঠে জামাকাপড় পরে কানাইয়ের বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়লাম। বুকের মধ্যে ধুক ধুক করছে। বড় ইমপাল্‌সিভ ছেলে, কি জানি হয়ত বা—

কাঁপা হাতে যখন কানাইয়ের দরজার কড়া নাড়লাম তখন ম্লান সন্ধ্যা খয়েরি ছায়া ফেলেছে পৃথিবীর ওপরে। মাথার ওপর দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে উড়ে যাচ্ছে পাখির দল।

দরজা খুললো কানাই নিজে।—ও তুই, আয় ভেতরে—

একজন মানুষকে জিজ্ঞাসা করা যায় না—হ্যাঁরে, তুই আত্মহত্যা করিস নি কেন? কাজেই চুপচাপ ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলাম। নড়বড়ে টেবিলে কিছু বই খাটের বাজুতে আর দরজার পাল্লায় আধময়লা জামাকাপড় আর ভেজা গামছা অগোছালভাবে পড়ে আছে। ঘরের মধ্যে ঢুকেছে সন্ধ্যার ছায়া। কানাই চেয়ারে বসে, কোনো কথা বলছে না।

একটু ইতস্তত করে বললাম—তোর সেই খাতাগুলো—মানে, ওগুলোর

জন্যই—

কানাইয়ের মুখে লজ্জার আভাস, যেন সে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েও রাখতে পারে নি। আমতা আমতা করে সে বলল—ওগুলো বরং এখন আমার কাছেই থাক। আসলে হয়েছে কি, আমার ইয়ে করাটা বোধহয় এক্ষুনি হয়ে উঠবে না। না, আমার দিক দিয়ে সব ঠিক ছিল, কিন্তু কাল পরীক্ষা দিয়ে এসে রমেন বলল—মাস্টারমশাই, আপনি না থাকলে আমার মত গরীব, বাপ-মরা ছেলেকে কে দেখত? তাও তো ধর এ গেল হাফ্-ইয়ারলি পরীক্ষা। সামনে অ্যানুয়াল আসছে। তারপর দেখতে দেখতে মাধ্যমিক। তারপরও কলেজ আছে, জীবনে দাঁড়ানোর প্রশ্ন আছে। ওরা সত্যিই বড় গরীব, প্রাইভেট টিউটর রাখার সামর্থ্য নেই, আমার ওপরেই ছেলেটা পুরোপুরি নির্ভর করেছে। তাই ভাবলাম যে ক'টা দিন—বুঝলি না?

এবার বুঝলাম। কানাই বারবার বলত লাগল সে যে আত্মহত্যা করার দিন পিছিয়ে দিচ্ছে এজন্য আমি যেন কিছু মনে না করি। তার মত বদলায় নি, নেহাৎ বাধ্য হয়েই—আচ্ছা, আমি তো শেয়ালদা হয়ে বাড়ি ফিরি। আমি কি গ্লোব নার্সারি থেকে তার জন্য একটা টগর গাছের চারা এনে দিতে পারি? সে অবশ্য দাম দিয়ে দেবে।

সভ্য-শিশু অয়স্কান্ত

বিয়ের আট বছর পর বিদ্যুৎ আর নীহারিকা ওদের প্রথম বাচ্চার বিষয়ে একমত হল। প্রথমও বটে আবার শেষও বলা যায়। একটি সন্তানের বেশি আজকাল আর ভাবা যায় না—সরকারও অনুমতি দেন না। ওরা অবশ্য বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরখাস্ত করে লাইসেন্স পেয়ে গিয়েছিল, তবে সেটা এখনও পড়ে আছে নীহারিকার ব্রেন-ওয়েভ লকারে (ব্রেন-ওয়েভ লকারগুলো বেশ সুন্দর করেছে। যার নামে লকার, তাকে লকারের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে একটা সাংকেতিক বাক্য উচ্চারণ করে ভাবতে হয়—লকার খুলে যাক। অমনি মালিকের চিন্তার ছোঁয়ায় লকারের পাল্লা খুলে যায়। তবে এটা করতে হবে লকারের পাঁচ ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়ে)। দশ বছরের মধ্যে ব্যবহার করা না হলে লাইসেন্স আপনিই বাতিল হয়ে যাবে। কাজেই শুক্রবার সকালে ছুটির মেজাজে (আজকাল উৎপাদন এমন এক জায়গায় পৌঁচেছে যখন সোম থেকে বৃহস্পতি কাজের দিন, শুক্র থেকে রবি ছুটি) চা খেতে খেতে আর ইলেকট্রনিক, ভিজিপ্লেটে দিনের খবর দেখতে দেখতে বিদ্যুৎ আর নীহারিকা সন্তানের প্রসঙ্গে একমত হয়ে গেল।

মতবিরোধ শুধু এক জায়গায়। বিদ্যুৎ চায় তাদের সন্তান ফিউশন টেকনোলজিস্ট হোক, আর নীহারিকা যা চায় সেটা ভদ্রসমাজে বলাই মুশকিল। বিদ্যুৎ নিজেই শুনে ভারি লজ্জিত হয়েছিল। বলেছিল—বল কি। চিত্রশিল্পী ছেলে দিয়ে তুমি কি করবে?

—আমার ভাল লাগে।

—দূর! ভবিষ্যৎ নেই, কিছু নেই—উপার্জন করে তো খেতে হবে? ওই তো ছাব্বিশ নম্বর সেক্টরের নক্ষত্র চৌধুরীর ছেলে আর্টিস্ট, আজ সে কি করছে? গতবছর চারটে এক্‌জিবিশন করে মাত্র এককোটি টাকার ছবি বিক্রি করতে পেরেছে।

আজ পর্যন্ত নিজের হোভারক্রাফট্ কিনতে পারে নি। এদিকে তেইশ বছর বয়েস হয়ে গেল—

নীহারিকা আমতা আমতা করে বলল—তখন বাচ্চার মডেলগুলো তেমন ডেভেলপ করে নি, নতুন বেরিয়েছিল। আজকাল আর কোনো খুঁত থাকে না—

—ওটা কোনো যুক্তিই নয়। বর্তমান সামাজিক অবস্থা যা, তাতে কবি বা শিল্পী ছেলে নিয়ে কি সোনালী ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবে? না না, এসব হচ্ছে সুইসাইডাল পলিসি। এটা বিজ্ঞানের যুগ, আমি ছেলে চাই খাপখোলা তলোয়ারের মত। অবশ্য তুমি ঠিক বুঝবে না, তোমাকে দোষ দিয়েই বা লাভ কি?

নীহারিকা একটু সংকুচিত হল। বিদ্যুৎ যে বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে সেটা তার জীবনের একটা বিশেষ লজ্জার ব্যাপার।

নীহারকা তার মায়ের গর্ভজাত সন্তান।

অবশ্য এজন্য বিদ্যুৎ তাকে কখনো তাচ্ছিল্য করে নি—মাঝে মধ্যে এরকম ঘরোয়া তর্কযুদ্ধে কথাটা মনে করিয়ে জিতে যাওয়া ছাড়া। নীহারিকার বাবা-মার আমলে প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বাচ্চার রেওয়াজ ভাল করে শুরুই হয় নি। তখনো অনেক শিশু মায়ের গর্ভ থেকে জন্মাত। এখন ভাবলে গা ঘিনঘিন করে বটে, কিন্তু এটা নির্মম ঐতিহাসিক সত্য।

তারপরেই প্রজননবিদ্যা হু হু করে এগিয়ে গেল, জেনেটিক এঞ্জিনিয়ারিং কোড্ তৈরি হল, সরকার আইন করে দিলেন কোনোও শিশুই আর মাতৃগর্ভ থেকে জন্মাবে না। বিশ্ব জিনব্যাঙ্ক থেকে জিন সংগ্রহ করে শিশুদের ক্লোন তৈরি করা হবে। একেবারে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে যন্ত্রে প্রস্তুত রেডিমেড বাচ্চা। মাটি তৈরি করে সার দিয়ে, বীজ পুঁতে অঙ্কুর থেকে গাছের চারা বড় করার অনেক ঝামেলা। নার্সারি থেকে তৈরি কলম এনে লাগালে যেমন পরিশ্রম বাঁচে—এও তেমনই। তা ছাড়া এই প্রথার আড়ালে রয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যার জয়গান।

কিন্তু সন্তান ঘরে আসার আগে আইন অনুযায়ী কিছু প্রস্তুতি নিতে হবে। সেগুলো করবার জন্য পরের সপ্তাহে একদিন ছুটি নিল বিদ্যুৎ। ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল ন'টা নাগাদ নীহারিকাকে নিয়ে ওদের অঞ্চলের শিশু শিক্ষা সদনের শাখায় হাজির হল।

মোটাসোটা গম্ভীর হেডমিস্ট্রেস পাইরেক্স কাচের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে আছেন। এদের বললেন—বসুন, কি চাই?

কেশে গলা পরিষ্কার করে বিদ্যুৎ বলল—আজ্ঞে, আমরা সামনের মাসের দু'তারিখে বাড়িতে বাচ্চা আনছি। সে ব্যাপারে—

—হুঁ লাইসেন্স পেয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বিয়ের পরে পরেই আমরা লাইসেন্স করে রেখেছিলাম। এবার ঠিক করেছি আর দেরি না করে—

—ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আপনি আজই ক্যাশ রিসিভিং-এ টাকা জমা দিয়ে ছেলের জন্য সিট রেজেস্ট্রি করে যান। একবছর বয়েসে ছেলেকে দিয়ে যাবেন, ওইসময় থেকেই আমরা কন্ডিশনিং শুরু করি। প্রতিদিন ন'টা থেকে তিনটে অবধি স্কুল।

টাকাকড়ি জমা দিয়ে বিদ্যুৎ ছেলেকে স্কুলে ভর্তি করে দিল—যে ছেলে

এখনো হয় নি, মানে আসে নি।

সেখান থেকে শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ছেলের জন্য সামাজিক পরিচয়পত্র বের করল বিদ্যুৎ, আগামী দশ বছরে যে যে অসুখ হতে পারে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করল। কেন্দ্রের সহায়ক ভদ্রলোক প্রৌঢ়, খুব অমায়িক। তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিষণ্ণ মুখে বললেন—আপনাদের দেখে ভারি হিংসে হচ্ছে। আমার যখন জন্ম তখন পৃথিবীতে কোথাও জিনব্যাঙ্ক নেই, প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড চাইল্ডের নামও কেউ শোনে নি। সন্তানের জন্ম তখন সেই পুরনো নৈসর্গিক উপায়েই ঘটে থাকে। আমারও—আমারও সেই হাস্যকর প্রাচীন পন্থায় জন্ম। এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জার দিক।

বিদ্যুৎ মুখে সমবেদনা ফুটিয়ে বলল—তাতে কি হয়েছে ? এখন তো আধুনিক বিজ্ঞানের সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছেন।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হয়ে বললেন—তা পাচ্ছি। এই তো, বছর দুই আগে সেরিব্রাল প্যাল্‌সি হয়ে ক্রমশ বুদ্ধিসুদ্ধি গুলিয়ে যাচ্ছিল, কিচ্ছু মনে রাখতে পারতাম না, লোক দেখলে চিনতে পারতাম না। অপারেশন করে মস্তিষ্কের অর্ধেকটা বদলে নিয়ে এখন বেশ ভাল আছি। সম্ভব ছিল চল্লিশ বছর আগে? আপনিই বলুন ?

এসব লোক একবার গল্প শুরু করলে সহজে থামবে না। বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে বেরিয়ে এল। সে যখন দরজার কাছে পেঁচেছে, ভদ্রলোক আবার পেছন থেকে ডেকে বললেন—মশাই পয়সা খরচ করে বাচ্চা কিনবেন, একটু ভাল জায়গা থেকে নেওয়াই ভাল। তেত্রিশ নম্বর রাস্তায় 'বিচিত্র বিপণি' নামে যে দোকান আছে, ওরা সবসময় নতুন স্টক রাখে—ওদের কাছ থেকে নেবেন। ডেট চলে যাওয়া মাল কিনে ঠকবার ভয় থাকবে না। গতবছর আমার নাতিকেও ওখান থেকে কেনা হয়েছে।

কৌতূহলী হয়ে বিদ্যুৎ জিজ্ঞাসা করল—কি নাতি নিলেন ? মাথা নিচু করে ভদ্রলোক বললেন—আমরা নিতান্ত মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক, বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী ছেলে, ছেলের বৌ মিলে একটা মাত্র হোভারক্র্যাফটে কাজ চালাই—আমরা দামি বাচ্চা কোথা থেকে কিনব বলুন ? বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার বাচ্চা কি আর আমাদের জন্য ? ওই মাঝারি দামে একটা মোটামুটি বাচ্চা কিনেছি আর কি !

বাড়ি ফেরবার সময় অটোক্র্যাফটের নরম গদিতে গা এলিয়ে স্কুল আর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাগজগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে নীহারিকা বলল—ছেলের একটা নাম ঠিক করবে না ? আপাতত দেখছি স্কুলের রসিদে ছেলের নাম তিনশো বিরাশি/হ, আর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রসিদে একহাজার একশো পঞ্চান্ন/ঙ। এমন নাম তো সারাজীবন চলে না। একটা ভাল নাম ভাব—

হেডরেস্টে মাথা এলিয়ে চোখবুজে শুয়ে ছিল বিদ্যুৎ, সেই অবস্থাতেই বলল ভেবেছি।

—ভেবেছ ? কি নাম ?

—অয়স্কান্ত !

'বিচিত্র বিপণি' দোকানটা সুন্দর, আধুনিক কায়দায় সাজানো—কিন্তু

মালিকের চেহারার সঙ্গে দোকানের কোনও মিল নেই। মালিক রমাপতি কুণ্ডুর (নাম শুনলেই বোঝা যায় লোকটা মাতৃগর্ভজাত) গায়ে সরু স্ট্রাইপের সার্ট, মাথার মাঝখানে সিঁথি, মুখে গদগদ হাসি। হাত কচলাতে কচলাতে এগিয়ে এসে রমাপতি কুণ্ডু বলল—কি দেখাব স্যার? কি নেবেন মা-জননী?

বিদ্যুৎ চোয়াল শক্ত করে বলল—মা-জননীটা অত্যন্ত আপত্তিকর সম্বোধন। আউটডেটেড।

রমাপতি কুণ্ডু পাকা ব্যবসায়ী, তার অমায়িক হাসি একটুও ফসকালো না। একইরকম গলায় বলল—যা বলেছেন স্যার। আমরা আউটডেটেড ওল্ড ফুল ছাড়া কি? কি দেখাবো ম্যাডাম?

—আমরা একটা ভাল বাচ্চা কিনতে চাই।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমাদের সদ্য-শিশুর স্টক খুব ভাল। সর্বদা কারেণ্ট মাল মজুত থাকে। ওরে, কে আছিস? স্যারকে আর ম্যাডামকে সদ্য-শিশুর সেকশনে নিয়ে যা—

দোকানটা ডিপার্টমেণ্ট স্টোর। একটু এগিয়ে বাঁদিকে ফিরেই একটা কাচের দরজায় স্টিকার লাগানো—সদ্য-শিশু। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই একজন সুবেশ যুবক কাউণ্টারের পেছন থেকে মার্জিত গলায় বলল—আপনার জন্য কি করতে পারি স্যার?

—আমরা একটি প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড চাইল্ড কিনতে চাই।

—মানে সদ্য-শিশু? নিশ্চয় স্যার। আপনাদের কি কোনোও বিশেষ পছন্দ আছে?

নীহারিকার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বিদ্যুৎ বলল—হ্যাঁ। আমি বৈজ্ঞানিক বাচ্চা চাই।

যুবকটি হাসিমুখে নীহারিকার দিকে তাকিয়ে বলল—আর ম্যাডাম? ম্যাডামও তাই?

নীহারিকা মাটির দিকে চোখ করে দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্যুৎ হেসে বলল—আসলে ম্যাডামের ইচ্ছে, ছেলে শিল্পী হবে, কবি হবে। আজকাল কি ওসব চলে, বলুন ভাই?

যুবকটি হেসে বলল—ম্যাডামের ইচ্ছেটা কিছু অন্যায় ইচ্ছে নয়। এ ব্যাপারটার আমি কিন্তু খুব ভাল মীমাংসা করে দিতে পারি।

নীহারিকা চোখ তুলে তাকাল।

—এ ধরনের বাচ্চার চাহিদা বাজারে বেশ দেখা দিয়েছে। কবিত্ব হচ্ছে লেটেস্ট ফ্যাশন। সেজন্য কোম্পানি 'কবৈজ্ঞানিক' নামে নতুন একটি সদ্য-শিশুর মডেল বাজারে ছেড়েছে, এই মাসখানেক আগে। কবি আর বৈজ্ঞানিক মিশিয়ে হচ্ছে কবৈজ্ঞানিক। জিন রেশিও এইট্টি-টোয়েণ্টি করা আছে। কবি কম, বৈজ্ঞানিক বেশি। অর্থাৎ সারাদিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করে রাত্তিরে শোবার আগে একটু কবিতা লিখবে, ছবি আঁকবে। নেবেন?

—একটু দেখতে পাওয়া যাবে?

—অবশ্যই, এদিকে আসুন।

কাউণ্টারের ওধারে কাচের সারি সারি বায়ু-নিরোধক আধারের গায়ে বিভিন্ন

মডেলের নাম লেখা। একটি আধারের সামনে দাঁড়িয়ে যুবকটি বলল—এই হচ্ছে কবৈজ্ঞানিক মডেল। নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। আধুনিকতম ক্লোনিং-এর কৌশলে শিশুকে ছ'মাসের করে দেওয়া হয়েছে এই মডেলে। কত সাশ্রয় ভাবুন! পুরো ছ'মাস শিশুপালনের খরচ বেঁচে যাচ্ছে।

কাচের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে হিমায়িত কক্ষে শুয়ে থাকা নিজের সন্তানের মুখ দেখল নীহারিকা।

ফোম দিয়ে প্যাক-করা সদ্য-শিশুর পার্সেলটি একজন কর্মচারী বিদ্যুতের অটোক্র্যাফটে তুলে দিয়ে এল। বিক্রেতা যুবকটি একটি কার্ডবোর্ডের প্যাকেট দেখিয়ে বলল—এর মধ্যে যে সাদা গুঁড়ো আছে তার সবটা এক গামলা ঈষদুষ্ণ জলে ঢেলে ভাল করে গুলে নেবেন। পার্সেল খুলে সদ্য-শিশুকে ডুবিয়ে দেবেন সেই জলে। ঠিক দশ থেকে বারো মিনিটের মধ্যে বাচ্চাকে তুলে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিলেই বাচ্চা কেঁদে উঠবে। ব্যস, বুঝবেন লাইফ সাইক্‌ল্‌ শুরু হয়ে গেল।

বিদ্যুৎ বলল—যদি, মানে ধরুন—কোনো কারণে যদি—

—ফেলিওর? লাইফ ফাংশন যদি স্টার্ট না করে? তক্ষুণি নিয়ে আসবেন। আমরা বদলে অন্য এক পিস দিয়ে দেব। ভাল কথা, পাউডার গুলে জল রেডি করে তারপর কাঠের বাক্সের সিল ভাঙবেন। ক্রায়োজেনিক সিল ভাঙবার পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে শিশুর দেহকোষ নষ্ট হতে শুরু করবে, যদি না প্রাণের ক্রিয়া শুরু হয়।

বাড়ি ফেরবার পথে বিদ্যুৎ বারবার মাথা ঘুরিয়ে পেছনের সিটে নিষ্প্রাণ ঘুমে অচেতন অয়স্কান্তকে দেখছিল।

পার্সেল হাতে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল বিদ্যুৎ। পার্সেলটা নীহারিকার হাতে দিয়ে বলল—তুমি নাও, ছেলে তোমার কোলে চড়েই প্রথম নিজের বাড়িতে ঢুকুক।

ছেলে কোলে ঘরে ঢুকল নীহারিকা, যে ছেলে কাল জীবন্ত হবে।

যত আধুনিক বাড়িই হোক, তাতে একটা পুরনো জিনিসপত্র রাখার কুশ্রী জায়গা থাকে। সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি আর গৃহস্থালির জিনিসের প্রতি মায়া মানুষের সহজাত। এই ভয়ানক আধুনিক যুগেও বিদ্যুতের বাড়িতে ছাদে ওঠবার সিঁড়ির নিচে নানা অপ্রয়োজনীয় ভাঙাচোরা জিনিস জড়ো করা থাকে। দেখায় খারাপ, কিন্তু প্রাণে ধরে স্বামী-স্ত্রী কেউই ফেলে দিতে পারে না। অয়স্কান্তকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়ে নীহারিকা শুনতে পেল সিঁড়ির নিচের ওই জায়গাটা থেকে খড়মড় করে কেমন একটা শব্দ আসছে। সে একটু শঙ্কিত হয়ে সেদিকে তাকাল। বিদ্যুৎ বলল—কি দেখছ ওদিকে?

—সিঁড়ির তলায় কিসের শব্দ হচ্ছে গো?

—শব্দ? কই দেখি—

বিদ্যুৎ এগিয়ে গিয়ে বেতের বাস্কেট, পিচবোর্ডের তোবড়ানো বাক্স, ছেঁড়া কোট আর ভাঙা কাঠের ক্রেটের পেছন থেকে উদ্ধার করে আনল সাদা দুটো বেড়াল ছানা। পেছন পেছন বেরিয়ে এল তাদের হলুদ রঙের মা।

—এঃ দেখেছ কাণ্ড? এখানে বেড়ালে বাচ্চা দিয়েছে!

নীহারিকা তাড়াতাড়ি বলল—রেখে দাও, রেখে দাও! মানুষের হাতের নুন লাগলে ওদের মা আর ছোঁবে না।

বিদ্যুৎ বিরক্ত হয়ে বলল—এরা কি এখানেই থাকবে নাকি?

—আহা কোথায় যাবে বেচারা ছেলেপুলে নিয়ে? ওদের কি আর ঘরবাড়ি আছে? তাড়িয়ে দিলে ওর ছানারা মরে যাবে। থাকুক ওরা—

কার্ডবোর্ডের বাক্সে ঝুপঝুপ করে বেড়ালছানা দুটো ফেলে দিল বিদ্যুৎ। তাদের মাও আবার ফিরে গেল ছানাদের কাছে।

সদ্য-শিশুর পার্সেলটা শোবার ঘরে খাটের পাশে টেবিলের ওপর রাখা হল। বিদ্যুৎ বেড়াল-ধরা হাত ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সামনে বাড়িয়ে রেখেছিল, এবার বেসিন থেকে হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বলল—মেজাজটাই খারাপ করে দিল। এবার আইন করে দেওয়া উচিত, পশুদেরও আর প্রাকৃতিক উপায়ে বাচ্চা হতে পারবে না। ডিসগাসটিং।

পরের দিন দুপুরে কোনোও ঝামেলা না করেই অয়স্কান্তর জীবন শুরু হয়ে গেল।

সারাদিন বাড়িতে ব্যস্ততা। ছ'মাসের সদ্যোজাত অয়স্কান্ত শুয়ে আছে, পলিফোমের তোয়ালেতে। মাঝেসাঝে একটু-আধটু কাঁদছে। 'বিচিত্র বিপণি' থেকে পাওয়া দেড়শো পাতার নির্দেশিকা খুলে দেখা হচ্ছে সদ্য-শিশুর খিদে পেলে কি করতে হয়, কান্না না থামলে কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত, চুপ করে থাকলেই বা কি বুঝতে হবে। পাতা ওলটাতে ওলটাতে নীহারিকা একবার মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল—আমাদের সময়ে এরকম কোনোও বই লাগত না, জান? মা আমাদের মুখ দেখলেই বুঝতে পারতেন আমাদের কি চাই—

বিদ্যুৎ কটমট করে তাকাতেই নীহারিকা লজ্জা পেয়ে বলল—অবশ্য আমি মোটেও বলছি না, জিনিসটা প্রশংসনীয়। তবে তখন তো এইরকমই ছিল—

প্রথম আনন্দ আর বিস্ময়ের ঝোঁকটা কেটে যেতেই মনে মনে একটা নিদারুণ সত্য অনুভব করল নীহারিকা।

অয়স্কান্তর প্রতি সে কোনোও টান অনুভব করছে না।

দিব্যি নধর হৃষ্টপুষ্ট নীরোগ, কলে তৈরি নিখুঁত বাচ্চা। কিন্তু ওটা যেন একটা কোথাকার কে তাদের বাড়িতে এসে তোয়ালের ওপর শুয়ে রয়েছে। নীহারিকার সঙ্গে তার কোনোও প্রাণের যোগ নেই। এই সেকটরের লাইব্রেরির বাংলা বিভাগ খুব ভাল। সেখান থেকে পুরনো বাংলা বই—যা আজকাল আর কেউ পড়ে না—এনে পড়া নীহারিকার নেশা। তাতে মা আর ছেলের কত গল্প পড়েছে নীহারিকা। ছেলের দিকে তাকিয়ে মায়ের বুকের মধ্যে নাকি স্নেহের সমুদ্র উথলে ওঠে। কিন্তু অয়স্কান্তকে দেখে তার তো সে-সব কিছুই হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে—যাঃ সংসারে আবার একটা কাজ বাড়ল।

কিন্তু এ কথা কাউকে বলা যাবে না। বিদ্যুৎকে নয়, স্কুলের জাঁদরেল হেড-মিস্ট্রেসকে নয়, প্রতিবেশীদের নয়, কারুকে নয়। সারাজীবন মিথ্যা মমতার মুখোশ পরে হাসিমুখে স্নেহের অভিনয় করে যেতে হবে। মনের ভাবকে সংযমের বাঁধ ডিঙিয়ে ওপরে উঠতে দিল না নীহারিকা।

কেবল পরের দিন বিদ্যুৎ অফিসে চলে গেলে, 'বিচিত্র বিপণি' থেকে দেওয়া

টিনের আদর্শ শিশুখাদ্য খেয়ে অয়স্কান্ত ঘুমিয়ে পড়লে, দুপুরের নির্জন মুহূর্তে চুপিচুপি নীহারিকা সিঁড়ির তলার কার্ডবোর্ডের বাক্স থেকে বেড়ালের ছানাদুটো বের করে কোলে নিয়ে আদর করতে বসল। আদিম উপায়ে মাতৃগর্ভজাত সেই নোংরা বাচ্চা দুটো।

হাত ধরো

নমস্কার। চেঞ্জে এসেছেন বুঝি? কি নাম মশাইয়ের? সুব্রত সান্যাল? আমার নাম অমর সেন। না, আমি চেঞ্জার নই—আমি এখানেই আছি গত পনেরো বছর। স্টেশন থেকে যে রাস্তাটা বাজার হয়ে সোজা এগিয়ে গেল নদীর দিকে, তারই ওপর ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকি। আপনি বোধহয় ম্যাকগ্রেগর অ্যান্ড টমাসের হলি-ডে হোমে উঠেছেন, তাই না? দেখুন, কেমন ধরেছি! আসলে আজ কয়েকদিন বিকেলে বারান্দায় বসে দেখছি আমার বাড়ির সামনে দিয়ে আপনি বেড়াতে যাচ্ছেন। ওদিকে থাকার জায়গা একটাই, ওই হলি-ডে হোম। তা, উদ্দেশ্য কি শুধুই বেড়ানো, না শরীরও সারাতে চান? পেটের গণ্ডগোল? ওঃ, তাহলে তো একেবারে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন। এখানকার জলে স্টীলের কিউব ফেলে দিলে দু'দিনে গলে যায়। পাথুরে জায়গা, টিউব-ওয়েল বসানো কঠিন। পাথর কেটে বসানো কুয়োর জলই খেতে হয়। একটু কষা স্বাদ। কিন্তু ভরপেট আহারের পর একঘটি জল খান, তিনঘণ্টা পর এমন খিদে পাবে যে, মানুষ দেখলে মনে হবে ধরে খাই। সাউথ বিহারে এমন জায়গা আর নেই।

নাঃ, চাকরি-বাকরি আমি করি না। বাবার আমলের কিছু পয়সা ব্যাঙ্কে রেখেছি, তার সুদ থেকে কোনোরকমে চালিয়ে দিই। আমার চাহিদা খুবই কম। দু'খানা ধুতি আর দু'খানা পাঞ্জাবিতে বছর চলে যায়। জনতা স্টোভে নিজে রান্না করে খাই। একা মানুষ, ভাতে-ভাত হলেই দিব্যি চলে যায়। তবে হ্যাঁ, চাকরি না করলেও আমি বেশ ব্যস্ত জীবন যাপন করি। আমি একখানা বই লিখছি। না না, গল্প-উপন্যাস নয়—ইতিহাসের। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করেছিলেন—বাঙালীর ইতিহাস নেই। ঠিক কথা। শুধু বাঙালী কেন, ভারতেরই বা ক'খানা ভাল ইতিহাস আছে? কি বললেন? যদুনাথ সরকার? রাখালদাস বাঁড়ুজ্যে? না মশাই, ওসবই নকল-নবিশী। ইংরেজের কাছে লেখাপড়া শিখে তাদের চোখ দিয়ে দেখা ইতিহাস। আমি একেবারে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখছি। পুরনো যত ধ্যানধারণা আমার বই বের হলে আমূল বদলে যাবে। কে ছাপবে তা জানি না। একজন প্রকাশক পাণ্ডুলিপির প্রথম শ'খানেক পাতা পড়ে খুব খুশি হয়েছেন। হয়তো তিনিই বের করবেন বইটা। সেজন্য অবশ্য আমার চিন্তা নেই। মহৎ কাজ লাভের আশা না করেই করতে হয়। প্রায় একহাজার পাতা লিখেছি, আরো হাজার পাতা হবে। চার ভলিউমের সুন্দর একটা সেট, কি বলেন? এখন চৈতন্যদেব এবং বাংলায় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ সম্বন্ধে লিখছি। আরো বছর তিনেক অন্তত লাগবে সমস্ত ব্যাপারটা শেষ করতে।

ওদিকে নয়, আসুন, আমরা এই বাঁদিকের পথটা ধরে কিছুদূর হেঁটে আসি। এমন সুন্দর বিকেলে বাজারের দিকে গিয়ে আর লাভ কি? ব্যাটারি কিনতে হবে?

বেশ তো, সে বেড়িয়ে ফেরবার পথে সন্ধ্যেবেলা কিনে নিলেই হবে এখন। শহরের বাইরে ওই যে ছোট পাহাড়টা, ওখানে গেছেন কখনো? তাহলে আর এখানে বেড়ালেন কি? ওর পেছনেই শুরু হয়েছে শাল, মহুয়া আর কেঁদগাছের বন। তারপর আরো দু'-তিনটে পাহাড়। একটা সুন্দর ঝরনা আছে জঙ্গলের ভেতরে। বন্ধুত্ব হয়ে গেল যখন, আমিই আপনাকে সব দেখিয়ে দেবো। ওই বনে ময়ূর ছিল অনেক, আজ থেকে আট-দশবছর আগেও দেখেছি। মানুষের যাতায়াত বেড়ে যাওয়াতে তারা কোথায় পালিয়েছে কে জানে! তবু ভাগ্য ভাল থাকলে দু'-একটার দেখা পাওয়া যেতে পারে। আর ধরুন যদি তা নাও হয়, তবুও হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলে আপনমনে ঘুরে বেড়ানোটাই বা খারাপ কি? আমিও তো একসময় কোলকাতায় থাকতাম, গোলমাল সহ্য না হওয়ায় পালিয়ে এসেছি এখানে। চলুন না, দেখবেন বনের ভেতর কি শান্তি। একবার ভাল লেগে গেলে আর ফিরতে ইচ্ছে করবে না।

আজ্ঞে হ্যাঁ, এইখানেই মোটামুটি শহর শেষ হয়ে গেল। দু'ধারে কেমন বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের মাঝখান দিয়ে পথটা চলেছে দেখছেন? পাথরের সঙ্গে অভ্র মেশানো রয়েছে বলে রোদ্দুর পড়ে চক্‌চক্‌ করছে। সিংভূম জেলায় খুব অভ্র পাওয়া যায়। আর হাতি। বুনো হাতির জন্য সিংভূম বিখ্যাত। মহুয়া পাকবার সময় ভালুকও দেখতে পাওয়া যায়। ওকি মশায়, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল কেন? ভয়ের কিছু নেই। পৃথিবীতে সবচেয়ে হিংস্র প্রাণী হচ্ছে মানুষ, বাঘ-ভালুক বা হাতি নয়। আপনিই বলুন না, আজ পর্যন্ত যুদ্ধে বা দাঙ্গায় যত মানুষ মারা পড়েছে, তত আর কিসে? মানুষ বড় দুষ্টু, বড় দুষ্টু।

না, এই পাহাড়টায় আমরা উঠবো না। চলুন, আরো এগিয়ে যাই। ঢুকে পড়ি বনের মধ্যে। মাইল খানেক দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম আছে, নাম কুলডেরা। জলতেষ্টা পেলে কুলডেরায় যাদু বাস্কের বাড়ি জল চেয়ে আপনাকে খাওয়াবো। দেখবেন কি পরিচ্ছন্ন ঘরকন্না। কাঁসার ঘটি চক্‌চক্‌ করছে যেন সোনা, উঠোনে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া যায়। মাটির ঘরের দেয়ালে চালবাটা দিয়ে আঁকা আল্‌পনা। কোলকাতায় অমনটি পাবেন না। বড়লোকের বাড়িতে দাগা কোম্পানির ওয়ালপেপার সাঁটা দেয়ালে। নীল পাহাড়, সাদা বরফ, ক'খানা ঝাউগাছ, সামনের হ্রদে লম্বা গলা রাজহাঁস চরছে—এইসব। পয়সা দিয়ে কিনে আনা জিনিস। বাড়ির গিন্নিকে কিছু একটা আঁকতে বলুন—আঙুরলতা দেখলে মনে হবে কাছিতে চালকুমড়ো ফলে আছে।

জঙ্গলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কেমন আলো কমে এল খেয়াল করেছেন? বাইরে এখনো রোদ্দুর রয়েছে, কিন্তু এখানে চারদিক ভরে আছে মোলায়েম ছায়ায়। ছোটবেলায় বাড়িতে বিয়ে-থাওয়া বা অন্য উৎসব থাকলে উঠোনে সামিয়ানা টাঙানো হত। সেই সামিয়ানার নিচে ঠিক এইরকম একটা নরম আলো খেলা করত। আমাদের ছোটবেলায় বিয়ের ভোজে দোকান থেকে কেনা মিষ্টি খাওয়ানো হত না। উৎসবের আগের দিন রাত্তিরে ভিয়েন হত। আঃ! সে কি মজা! বাঁকে করে ছানা আসছে, কারিগররা বসে ছানা জাঁক দিচ্ছে, কড়াইতে পান্তুয়া ভাজা হচ্ছে। সারারাত চলেছে কর্মকাণ্ড। আর আমরা ছেলেপুলেরা রাত জেগে ব্যাপার-স্যাপার দেখছি। মাঝে-মধ্যে বাবা-কাকাদের মধ্যে কেউ এসে দুটো করে গরম রসগোল্লা বা একথাবা সন্দেশ

হাতে দিয়ে যাচ্ছেন। ভিয়েন না করে উপায়ও ছিল না। কাজের সাতদিন আগে থেকে যেখানে যত আত্মীয়স্বজন ছড়িয়ে রয়েছে সবাই বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে এসে উপস্থিত হত। কাজকর্ম মিটে গেলেও আরো ক'দিন থেকে তবে তারা বাড়ি ফিরত। তাদের দৈনিক জলখাবারের পর্বই ছিল বিরাট, দোকান থেকে কিনে এনে কুলোনো সম্ভব ছিল না। ভিয়েনের কারিগররাই বোঁদে, ছানার মুড়কি, দরবেশ, অমৃতি এসব তৈরি করে দিয়ে যেত। সক্কালে উঠে গরম লুচির সঙ্গে কুমড়োর তরকারি আর বোঁদে—আঃ! ভাবা যায় না! আর এখন? কাজের দিন রাত আটটায় সেজেগুজে বাচ্চার হাত ধরে আত্মীয়রা আসে। এসেই আর কথা নেই, কেবল খোঁজ —নেক্সট্ ব্যাচ কখন বসছে? এই যে সুমন, দেখ তো ভাই এবার চারটে জায়গা রাখা যায় কিনা। আমাদের আবার উত্তরপাড়ায় ফিরতে হবে কিনা। তারপর ক্যাটারিং-এর খাওয়া, তিনবার ডাকলে হাফপিস মাছ পাওয়া যায়। বাড়িতে ফিরে অম্বল, সারারাত ছটফট। সকালে উঠে চোঁয়াঢেঁকুর। সব গেছে, বাঙালীর সব গেছে।

--কি বললেন? আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এখন আর পুরনো দিনের মত আপ্যায়নকে পারমিট করে না? ওটা মশাই নিতান্ত স্টক ফ্রেজ, আজকাল সবাই ওই কথা বলে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায়। মনে রাখবেন আমি ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করি। যে কোনো যুগের মানুষের পক্ষেই তার নিজের সময়টা সমস্যাবহুল। অতীতেও বাঙালী কেবল আমগাছের তলায় শুয়ে শ্যামাসঙ্গীত গাইত আর মাঝে মাঝে উঠে ভাত খেত—এমন নয়। আসলে আমাদের হৃদয়টাও বদলে গেছে। সমাজ, অর্থনীতি এসব তো মানুষেরই সৃষ্টি, না কি? সেগুলো ঘোলা হয়ে গেলে বদলাবার চেষ্টা তো আমাদেরই করতে হবে, গা ঢেলে দিলে চলবে কি করে! টয়েনবির লেখা পড়ে দেখবেন এ বিষয়ে।

একটু চুপ করে দাঁড়ান তো। কথা বলবেন না। বনের মধ্যে দূরে একটা পাখি ডাকছে শুনতে পাচ্ছেন? কর্কশ ডাক? বলুন তো কি পাখি ডাকছে? ময়ূর? হাঃ হাঃ, না না—ময়ূর নয়। সে আরো ভেতরে না গেলে পাবেন না, তাও কপাল ভাল থাকলে। অতদূর আমরা আজ যাবো না, ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে। তার ওপর আপনার টর্চে আবার ব্যাটারি নেই। ওটা হচ্ছে ধনেশ পাখির ডাক। চেনেন তো? শহরে রাস্তার ধারে মরা ধনেশ পাখি সাজিয়ে রেখে বাতের তেল বিক্রি করে? চওড়া বড় ঠোঁট? নিজেদের নানারকম লোভে জীবজন্তু মেরে আমরা সাফ করে দিচ্ছি। প্রকৃতি একদিন এর প্রতিশোধ নেবেই। ভুল যখন বুঝতে পারব তখন আর শুধরে নেবার সময় থাকবে না। অস্ট্রেলিয়ার ডিঙ্গো নামে জন্তুর নাম শুনেছেন? নেকড়ে বাঘের মত দেখতে। ডিঙ্গোরা উল ব্যবসায়ীদের ভেড়া মেরে খেয়ে ফেলত। তাদের জ্বালায় অস্থির হয়ে ব্যবসায়ীরা কয়েক হাজার কিলোমিটার লম্বা বেড়া দিয়ে দেয়। গ্রেট ডিঙ্গো ফেনস্ নামে বিখ্যাত বেড়া। আজ অস্ট্রেলিয়ায় যান—ডিঙ্গোর সংখ্যা হাতে গোনা যাবে। মেরে সব শেষ করে দিয়েছে। কি অন্যায় কথা ভাবুন দেখি! কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের ফলে প্রকৃতি একটি প্রজাতির সৃষ্টি করে, আর ব্যবসার অসুবিধে হচ্ছে বলে আমরা পঞ্চাশ বছরের ভেতর তাদের মেরে শেষ করে দিই। সমস্ত বিশ্বে একমাত্র পৃথিবীতেই হয়তো প্রাণের বিকাশ হয়েছিল, প্রতিটি প্রাণীই এখানে অভিনব, আশ্চর্য। যা শেষ হয়ে যাচ্ছে, তা আর

কখনো কোথাও ফিরবে না।

বড় বেশি কথা বলছি, না? নেহাৎ আমি বয়স্ক বলেই আপনি প্রশ্রয় দিয়ে শুনে যাচ্ছেন। হয়তো ভাবছেন– কোথায় বিপদ, কোথায় অসুবিধা তার ঠিক নেই —লোকটা খামোকা ভেবে মরছে। তেমন মনে করলে আপনাকে দোষ দেব না। বিদেশে এই ধরনের অনেক বাতিকগ্রস্ত লোক আছে, তাদের বলে অ্যাপোক্যালিপস্ ম্যানিয়াক। সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, বাতাসে অক্সিজেন কমে যাচ্ছে, সরকারের গোপন পারমাণবিক অস্ত্রের ভান্ডার আপনাআপনি ফেটে পড়তে পারে কিম্বা উত্তর মেরুর জমে থাকা বরফ সব যদি গলে যায় তবে কি ভয়ানক বন্যা হবে এইসব চিন্তা করে তারা রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না। আমি তাদের দলে নই। তবে কি জানেন, এমন সুন্দর পৃথিবীটা, এমন চমৎকার সকাল-বিকেল, রঙিন সূর্যাস্ত, খড়ের চালে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার শব্দ, স্বর্ণচাঁপার গন্ধ, শীতের দিনে চাদর মুড়ি দিয়ে গরম চা নিয়ে আড্ডা, সোদপুরে যাবো বলে বেরিয়ে হঠাৎ কোথাও কিছু নেই বেথুয়াডহরি চলে যাবার স্বাধীনতা—এই সমস্ত কিছু মিলিয়ে জীবন অদ্ভুত, আশ্চর্য! একে কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। অথচ কিছু কিছু লোক আছে যারা জীবনটাকে অকারণেই অসুন্দর করে তোলে। পয়সার লোভ, ক্ষমতার লোভ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। আচ্ছা, কি হবে বেশি পয়সা দিয়ে বলুন তো? একটার বেশি তো পেট না! চারটে মুরগী, দু'সের চালের ভাত, তিনডজন ডিম বা আশিটা রসগোল্লা কি আপনি একবারে খেতে পারেন? তিনটে শার্ট, পাঁচটা মোজা বা দুটো ওভারকোট পরতে পারেন? কাজেই দেখুন, উপভোগ করবার ক্ষমতা আমাদের সীমিত। তাহলে তার বেশি চেয়ে লাভ কি?

থামুন। বাঁদিকের এই পাহাড়টার নাম বনকাটি। আমরা এখন বনকাটি পাহাড়ে উঠবো। বেশি উঁচু নয়, কিছুটা পরিশ্রম হবে বটে—তবে মাঝখানে একবার বিশ্রাম করে নিলে পরিশ্রম টের পাবেন না। না, যাকে পথ বলে তেমন কিছু নেই। পাথরের ফাঁক দিয়ে, বনতুলসী আর পুটুস ঝোপ ঠেলে উঠতে হবে। সে ভারি মজা! শুকনো পুটুস গাছ ভেঙে গেলে কেমন একধরনের মিষ্টি বুনো বুনো গন্ধ বেরোয়, দেখবেন। পাহাড়ের ওপর পেঁৗছে পাখির ডাক ছাড়া কিছু শুনতে পাবেন না। আর গাছের পাতার ভেতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ। সমস্ত দুনিয়া দেখবেন অনেক নিচে পড়ে আছে, অনেক দূরে। সে-ই কোথায় শহরের শেষ প্রান্তের বাড়িগুলো, একটু একটু দেখা যায় কি যায় না। সংসারের যত ঝগড়া, লোভ, গোলমাল, দুঃখ-শোক—সবকিছুর থেকে নিজেকে আলাদা বলে মনে হবে। এবং সেইটে মনে হলেই সঙ্গে সঙ্গে টের পাওয়া যায় ওগুলো কত হাস্যকর। জীবন মূলত সরল, আমরাই তাকে জটিল করেছি।

রতনের কথা মনে পড়ে গেল। আমার ছোটবেলার বন্ধু। আমরা সাত-আটজন মিলে দত্তদের বাগানে ঢুকে কাঁচা পেঁপে চুরি করে খেতাম। একদিন বিকেলে দলবেঁধে ঢুকেছি পাঁচিলের ফাঁক দিয়ে, চারখানা বড় বড় পেঁপে পাড়া হয়েছে। বিষ্ণু পকেট থেকে ভাঁজকরা ছুরি বের করে সবাইকে পেঁপে কেটে ভাগ করে দিয়েছে। খবরের কাগজের মোড়কে আমরা নুন নিয়ে যেতাম। নিজের নিজের ভাগ পেয়ে ঘাসের ওপর বসে খেতে শুরু করলাম। দিনগুলোর কথা ভাবলে এখনো বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে! চাহিদা কত কম ছিল, অথচ কত বেশি সুখী

ছিলাম।

রতন ছিল আমাদের মধ্যে বয়েসে বড়। হাত আর পায়ের মাসল্ শক্ত, কেঠো কেঠো ধরনের। তার মেজাজটা ছিল কিছু উগ্র, কথায় কথায় সে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিত, ছোট ছেলেদের মাথায় চাঁটি মারত, রাস্তায় কুকুরের বাচ্চা দেখলেই কিক লাগাতো। সেদিন সে নিজের ভাগের পেঁপে চট করে শেষ করে ফেলে বিনয়ের কাছে গিয়ে বলল—এই, আমাকে আর একটু দে তো—

বিনয় শান্ত ছেলে, সে হয়তো এমনিতেই দিয়ে দিত। কিন্তু রতন অপেক্ষা না করে হঠাৎ খপ্ করে বিনয়ের হাত থেকে সবগুলো পেঁপের টুকরো কেড়ে নিল। বিনয় প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল, তারপর রেগে বলল—তুমি আমার পেঁপে নিলে কেন? রতন হাতের তেলোয় রাখা নুনে ঠেকিয়ে কচ্মচ্ করে পেঁপে চিবোতে চিবোতে একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল—বেশ করেছি, যা! কি করবি তুই?

বিনয় কাঁদো কাঁদো হয়ে ক্লাস নাইনে পড়া বিষ্ণুকে বলল—ও বিষ্ণুদা, দেখ না, আমার ভাগের সবটা কেড়ে নিয়েছে—

বিষ্ণু এগিয়ে এসে রতনকে বলল—এসব কি হচ্ছে? তুমি ওর কাছ থেকে খাবার কেড়ে নিলে কেন?

উত্তরে রতন বলল—তুমি ফোঁপরদালালি করছ কেন?

মিনিট খানেকের মধ্যে মারামারি বেধে গেল। আমরা সবাই মধ্যস্থ হয়ে দু'জনকে টেনে আলাদা করলাম। সে সময়টা ফিল্মে ভিলেনের অভিনয় করে প্রেমনাথ খুব নাম করেছে। রতনকে আলাদা করার পরেও সে প্রেমনাথের স্টাইলে দু'হাতের মুঠো পাকিয়ে চারদিকে তাকিয়ে বলে যেতে লাগল—এক এক করে চলে আয়, আ যাও—

হপ্তাখানেক বাদে একদিন রতনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা, সেদিন তুই অমন অকারণে একটা মারপিট বাধিয়ে দিলি কেন বল্ তো? বিষ্ণু কিন্তু কোনো অন্যায় করে নি—

রতন এই ধরনের মারপিট হপ্তায় দশটা করে থাকে। প্রথমটা সে মনে করতে পারল না আমি কোন্ ঘটনার কথা বলছি। তারপর বলল—ও, সেদিন সেই দত্তদের বাগানে? ও কিছু না—ওকে আবার ঝামেলা বলে নাকি? তোরা সবাই বসে শান্তিতে খাচ্ছিস, কোথাও কোনো চেঁচামেচি গোলমাল নেই—ব্যাপারটা আমার কেমন যেন লাগল। আমি তাই সত্যি বলতে কি, একটু ঝঞ্ঝাট মারপিট ছাড়া থাকতে পারি না। কেমন পানসে পানসে লাগে। তাই সেদিন দিলাম বাধিয়ে ঝগড়া। কেমন মজা হল বল তো?

পা ধরে গেছে বুঝি? হাঁপাচ্ছেন? বেশ তো, আসুন—আমরা ওই অর্জুন গাছের তলায় পাথরটার ওপর বসি। রতনের কথা কেন মনে পড়ল জানেন? কারণ বর্তমান দুনিয়ায় একই ব্যাপার ঘটছে, স্কুলের ছেলেদের মারপিটটাই একটু বড় আকারে। বরং রতন ভাল, কৈশোরের সারল্য নিয়ে সে আসল কথাটা বলে ফেলেছিল। আজ যাদের হাতে দুনিয়া চালানোর ভার, তারা বাইরে সাধুপুরুষ—ভেতরে সবাই রতন। চারদিকে সবাই সুখে আছে, শান্তিতে নিজের কাজ করে যাচ্ছে—এসব তারা সহ্য করতে পারে না। আমার মামার বাড়ির গ্রামের মোক্ষদা

ঠাকরুণের মত। সারাদিন ঝগড়া করতে না পেলে বিকেলের দিকে তার অম্বল হয়ে যেত।

বাতাসের মুখে শুকনো পাতা সর্‌সর্‌ শব্দে নড়ে যাচ্ছে এগাছ থেকে ওগাছের তলায়। সূর্যের লাল গোলক নেমে এসে ছুঁয়েছে দিগন্ত। হাওয়ায় কান পাতুন, গরম লোহা ঠাণ্ডা হয়ে আসার সময় যেমন শব্দ হয় তেমনি দিন ফুরিয়ে আসার শব্দ শুনতে পাবেন। এই শব্দ আমাদের সারাটা জীবন জুড়ে থাকে। ফুরিয়ে আসছে—ফুরিয়ে আসছে—ফুরিয়ে আসছে। জন্মের পরমুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। সবাই খেয়াল করে না, সবাই শুনতেও পায় না। যাদের কানে পৌঁছয় তারা অন্যরকম হয়ে যায়। তারা কারো সঙ্গে আর ঝগড়া করে না, কারো মনে কষ্ট দেয় না। তারা ছবি আঁকে, গান গায়, বাগান করে। যা দিয়ে তাকে মনে রাখা সম্ভব এমন কিছু কাজ আর আচরণ পেছনে রেখে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তেমন মানুষের সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। কতরকম চাহিদা আমাদের জীবনকে গলা টিপে ধরেছে ভাবুন তো? ভাল খাওয়া, ভাল পরা, দামি পোশাক, শাড়ি-গয়না-টিভি-ফ্রিজ-স্কুটার এবং আরো হাজার রকম জিনিস। এসব জিনিসের বেশির ভাগই আমাদের কোনো দরকার নেই। কিন্তু আমরা সেটা বুঝি না। সবাই সারাদিন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে জীবনযাত্রার মানকে আরো উন্নত করবার জন্য। এদিকে যে প্রায় সূর্যাস্ত হয়ে এল। না না, আমি এই সূর্যটার কথা বলছি না। আমাদের গানে সাহিত্যে চিন্তায় নৈতিক জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, খেয়াল করেছেন? জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে পাঁচজন জীবিত মহাপুরুষের নাম একনিঃশ্বাসে করতে পারবেন? পারবেন না, কারণ কেউ নেই।

ওদিকে বেশি ঝুঁকবেন না। হঠাৎ গড়িয়ে পড়লে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সাবধানে তাকিয়ে দেখুন, অন্তত পাঁচশো ফিট নিচে এবড়ো-খেবড়ো পাথরের টুকরো ছড়ানো জমি। এই পাঁচশো ফিটের মধ্যে দেয়ার ইজ নাথিং টু ব্রেক ইয়োর ফল। তিন বছর আগে ঠিক এইখান থেকে একজন চেঞ্জার নিচে পড়ে মারা যায়। হ্যাঁ, একটু সরে বসাই ভাল।

দেখুন, সূর্য নেমে গিয়েছে দিগন্তের নিচে। বাতাসে একটু ঠাণ্ডার ভাব লক্ষ্য করেছেন? এইরকম সময়টায় রোজ আমার মনে হয় বয়েস হয়ে এল, জীবন শেষ হয়ে আসছে। আমি হয়তো একদিন আর থাকবো না, কিন্তু যারা বেঁচে থাকবে তাদের জন্য নিষ্কণ্টক, সুন্দর একটা পৃথিবী রেখে যেতে পারলাম না। কি বলছেন? যা আমার হাতের বাইরে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে অস্থির হতে বারণ করছেন? এটা আপনি কেমন কথা বললেন? আমি মানুষ, পৃথিবীর তাবৎ মানুষের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে আমার সম্পর্ক আছেই। আমি কেবল আমার কথাই ভাবব? আমার নিজের যুগের কথাই ভাবব? পরবর্তী যুগে যেসব মানুষেরা আসবে তাদের ভালমন্দ চিন্তা করব না? বার্ট্রাণ্ড রাসেলের আত্মজীবনীতে এক জায়গায় উনি লিখছেন—'পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করার, যুদ্ধের সম্ভাবনামুক্ত করার পথে অনেক বাধা। একজন মানুষের একক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব নয়। তবু সারাজীবনের সাধনা দিয়ে সংসারের দাঁড়িপাল্লাটাকে আশাবাদী ভবিষ্যতের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়ে দিতে চেষ্টা করে গেলাম।' আমি সামান্য লোক,

রাসেলের মত অতবড় দাবি করতে পারি না। তবু সুদিন আসবার পথে একটি কাঁটাগাছও যদি উপড়ে ফেলে থাকতে পারি, তাই বা কম কি ?

কি করেছি জিজ্ঞাসা করছেন? সেটা আমি আপনাকে বলতাম না। কিন্তু আপনার চোখে আমি অবিশ্বাসের ছায়া দেখতে পাচ্ছি। শুনুন তাহলে। কিছুদিন আগে, এই ধরুন—বছর তিনেক আগে, একজন চেঞ্জার এখানে এসেছিল। আমার সঙ্গে সবারই আলাপ হয়ে যায়, এর সঙ্গেও হল। লোকটার বড় ব্যবসা ছিল কোলকাতায়, লিভারের কি একটা গুরুতর অসুখ হওয়ায় ডাক্তারের পরামর্শে এখানে এসেছিল শরীর সারাতে। এমন নির্লজ্জ, বেহায়া, ভোগসর্বস্ব লোক বড় একটা দেখা যায় না। ডাক্তারের বারণ না শুনে বাংলোয় বসে বসে মদ খেত। বৌ বলে যাকে সঙ্গে এনেছিল সে নাকি আসলে বিয়ে করা বৌ নয়। আদিবাসী যে মেয়েটা ওবাড়িতে রান্না করা জল তোলার কাজ করত, তার মারফৎই এসব কথা রটে গিয়েছিল শহরে। তবে আজকাল এতে মানুষ আর চমকায় না, সহজভাবেই মেনে নেয়।

একদিন বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরিয়েছি—এই আজকের মত—দেখি লোকটাও হাঁটতে বেরিয়েছে। তার চেহারাটাই যেন কেমন ময়লা মাখানো, জীবনে যা কিছু আমরা পবিত্র বলে ধরে নিই, তার ঠিক বিপরীত। হলদে বড় বড় দাঁত, ভিজে ভিজে পুরু ঠোঁট, মাংসল ফোলা গাল আর ধূর্ততা মেশানো চোখের চাউনি। পরিচয় হতেই লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করল এ শহরে সস্তায় বেশ কিছু জমি পাওয়া যাবে কিনা। সে একটা রবার ফ্যাক্টরি করতে চায়। কোলকাতা এবং তার আশেপাশে লোকজন বড় চালাক হয়ে গিয়েছে। এসব দিকে সস্তায় লেবার পাওয়া যাবে বলে তার ধারণা। গল্প করতে করতে আমরা ঠিক এইখানটায় এসে বসলাম, আজ যেখানে বসে আছি। সেদিনও সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, পাখি ডাকছিল বনের খাঁচায়। আমি তাকে সরল জীবনযাপনের গুরুত্ব বোঝাবার চেষ্টা করলাম, প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করার কথা বললাম। উত্তরে ব্যঙ্গের হাসি হেসে সে জিজ্ঞাসা করল আমার বংশে কেউ বৈষ্ণব কবি ছিল কিনা। পকেট থেকে দামি সিগারেট বের করে ধরাল, তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বলল– যুগ বদলে যাচ্ছে, বুঝলেন ? নরম ধাতের কবি-কবি লোকেদের জন্য এ যুগ নয়। একবার মরে গেলে তো সব ফুরুৎ। যতদিন বাঁচবো, খেয়ে-দেয়ে ফূর্তি করে প্রাণের সব সাধ মিটিয়ে নেবো। এতে অন্যায়টা কোথায় ? আমার ছেলে দুটোকেও দারুন ট্রেনিং দিচ্ছি, বুঝলেন ? একেবারে মার-কাটারি, বাপের মত। যে কোনো সিচুয়েশন অনায়াসে ফেস করবে। ভাল কথা, আজ রাত্তিরে আসুন না আমার বাড়ি ? মুরগীর রোস্ট খাওয়াবো, আর রয়্যাল স্যালুট। আসবেন ? একা জমে না—

আপনি যেখানে বসে আছেন, সেইখানেই বসেছিল লোকটা। এই অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশের মধ্যে লোকটাকে মনে হচ্ছিল ক্লেদাক্ত সরীসৃপের মত। যেন প্লেগের জীবাণুবাহী ইঁদুর। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম এই লোকটা অনেকদিন বেঁচে থেকে নিজের চারদিককে বিষাক্ত করবে, অনেক সরল মানুষকে বাঁকা পথ দেখাবে। পৃথিবীতে সুদিন আসতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

সামান্য ঠেলা দিয়েছিলাম। রাতে মুরগীর রোস্ট আর নকল বৌয়ের স্বপ্ন দেখছিল লোকটা। অন্যমনস্ক ছিল, সামলাতে পারে নি। দেখছেনই তো, এখান

থেকে নিচে ওই পাথরের ওপর পড়লে—হ্যাঁ, তিনবছর আগের সেই দুর্ঘটনার কথাই বলছি। নির্জন জায়গা, আমাদের কেউ একসঙ্গে দেখেও নি। দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি? না, বিবেকে আমার কোনো পাপবোধ নেই। সংসারের দাঁড়িপাল্লাটা আশাবাদের দিকে ঝুঁকিয়ে দিতে সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র। আপনি গিয়ে পুলিসে খবর দেবেন সে ভয়ও করি না। ইট্ উইল বি ইয়োর ওয়ার্ডস্ এগেনস্ট্ মাইন। আর আপনি তেমন করবেনই বা কেন?

অন্ধকার নামছে। চলুন এবার যাই। আপনার তো আবার ব্যাটারি কিনতে হবে।

সাবধানে নামবেন। ধরুন না কেন আমার হাতটা শক্ত করে। পথ যদিও দুর্গম, তবুও দেখবেন আমরা ঠিকঠাক পৌঁছে যাবই। শুধু হাতটা ছাড়বেন না, ধরে থাকুন চেপে।

খসড়া

ললিত বলল—সৌম্য, দিন কয়েকের জন্য আমার সঙ্গে কোলকাতার বাইরে যেতে পারবি?

পেপারব্যাকটা টেবিলের ওপর উল্টে রেখে বললাম—কোথায়?

—আমাদের দেশের বাড়িতে। বেশি নয়, কোলকাতা থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল হবে। কোনো কষ্ট হবে না, আমার গাড়িটা নিয়ে যাবো। গতবছর বাবা মারা গিয়েছেন জানিস তো? দেশের সম্পত্তি রাখা এখন একটা প্রবলেম হয়ে যাবে। আমি সবকিছু বিক্রি করে দিতে চাই—

বললাম—সেকি রে! বাপ-ঠাকুরদার জিনিস, হঠাৎ বিক্রি করে দিবি?

রনসন লাইটার দিয়ে সিগারেট ধরিয়ে ললিত বলল—আমারও খারাপ লাগছে বইকি, তবে সেণ্টিমেণ্টের জন্য এই ঝামেলা ঘাড়ে রাখবো কেন বল্? খবর পেলাম অলরেডি গ্রামের লোকেরা বাড়ি থেকে জানালা-দরজার পাল্লা খুলে নিয়ে যেতে শুরু করেছে। এবার জমি-জমা দখল করতে আরম্ভ করবে। সময় থাকতে বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা বরং অন্য কাজে লাগিয়ে দিই। ম্যাঙ্গো লেনের ভেতরে নিউম্যাটিক অ্যাপ্লায়েন্সের ব্যবসা ফেঁদেছি জানিস তো? হার্ড ক্যাশের অভাবে অনেক অর্ডার ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এই টাকাটা লগ্নী করলে আমার বার্ষিক আয় বেড়ে যাবে অন্তত থার্টি পারসেণ্ট। আর একটু বেশি উন্নতি করতে কে না চায় বল্? আমার গাড়িটা দেখেছিস? এ ব্যাটার্ড কণ্ট্র্যাপশন অফ্ সিক্সটি-ফোর মডেল, ওটাও ঝেড়ে দিয়ে নতুন গাড়ি কেনার তালে আছি। আয় না বাড়লে কিছুই হবে না। যাকগে—বল্, আর ইউ গেম্? যাবি আমার সঙ্গে?

—যাবো। কবে রওনা দিচ্ছিস?

—সামনের শনিবার সকালে। ফিরবো তার পরের শনিবার বিকেলে। বেশ ভাল একটা আউটিং হয়ে যাবে। তুই তাহলে জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে থাকিস, আমি সকাল সাতটা নাগাদ এসে তোকে তুলে নেবো—

শনিবার সকাল সাতটায় বাইরের রাস্তায় ললিতের গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। সুটকেশ হাতে নিচে নেমে গেলাম। স্টিয়ারিং-এ ললিত নিজেই বসে আছে,

ড্রাইভার নেয়, নি। পেছনের সিট্‌টা কাপড়ের ঝোলা, পিচবোর্ডের কার্টুন, বেতের বাস্কেট, ব্রিফকেস ইত্যাদিতে বোঝাই। তারই এক কোণে আমার সুটকেশটাও রেখে দিয়ে সামনের সিটে ললিতের পাশে গিয়ে বসলাম।

কোলকাতা ছাড়িয়ে কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার এগুতেই পথের দু'দিকে গ্রাম পড়তে লাগল। কাছে-দূরে অড়হরের ক্ষেত, আম-জামের বাগান। দিগন্তে ছবির মত আঁকা গাছপালার সারি। এসব জায়গায় পরিবেশ বিশেষ বদলায় না, একশো বছর আগেও যা ছিল আজও মোটামুটি তাই। কেবল কখনো কখনো মাঠের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া সারি সারি হাই-টেনশন তারের খুঁটিগুলো মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, পৃথিবী এগিয়ে চলেছে।

ছোট্ট একটা গঞ্জমত জায়গায় চা খাওয়ার জন্য গাড়ি থামালো ললিত। রাস্তার ধারেই দরমার বেড়া দিয়ে তৈরি দোকান। মাটির উঁচু উনুনে বড় কেটলিতে জল ফুটছে, পাশেই কাচের বয়ানে লাঠি বিস্কুট, কেক নামধারী ময়দার পিন্ড, চিঁড়ের খাজা। হাফপ্যান্ট পরা একটা বাচ্চা দৌড়ে এল গাড়ির জানালায় —কি চাই বাবু?

—দুধের চা বানাতে পারবি? জল দিবি না, শুধু দুধ দিয়ে চা-পাতা ফোটাবি।

—আজ্ঞে পারবো।

—তবে যা, একপো দুধে দুটো বানা।

ড্যাশবোর্ড থেকে একটা ক্যাসেট বের করে কার-স্টিরিওতে গুঁজে দিল ললিত। বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল—এভরিবডি ড্যান্স উইথ পা-পা-পা—

—কি উল্টোপাল্টা গান শুনিস তুই, রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট নেই?

দাঁত বের করে হেসে ললিত বলল—গাড়ি চালানোর সময় রবীন্দ্রসংগীত শুনলে আমার ঘুম পায়।

—তাই বলে এইরকম ভয়ানক গান—

—ওটা তোর স্নবারি। তুই সারাদিন ক'বার রবীন্দ্রনাথ নিয়ে আলোচনা করিস? এটা হচ্ছে গতির যুগ, ঘোড়ার গাড়ি, চাঁদের আলো, দরবারী আতর আর রাতভোর ঘরোয়া মজলিশের দিন চলে গিয়েছে। আজকাল সবই জোর কদমের—

রাগ করতে গিয়েও পারলাম না, কারণ ললিতের কথাটা ঠিক। আমি কিন্তু প্রত্যেকদিন সংস্কৃতি চর্চা করি না। তবে জিনিসটা স্নবারি নয়, ভেতরে কোথাও পুরনো দিনগুলোর জন্য একটু ভালবাসা রয়ে গিয়েছে, বর্তমানের প্রবল ঢেউয়ে তা মাথা তুলতে পারে না।

চা খেয়ে আবার যাত্রা। জাগুলিয়ার মোড় থেকে জাতীয় সড়ক ছেড়ে দিয়ে ডানদিকে একটা সরু রাস্তা ধরল ললিত। গাছপালা এবার আরো ঘন হয়ে এসেছে। রাস্তার ধারেই এঁদো পুকুর, বাঁশের ঝাড়। বিশ্বাস হয় না পঞ্চাশ কিলোমিটারের মধ্যেই কোলকাতা শহর।

বেলা এগারোটার মধ্যে ললিতের গ্রামে পেঁছে গেলাম। আম-কাঁঠালের বাগানে ঘেরা ঘুমন্ত গ্রাম। ললিতদের বাড়ি বেশ বড়, যদিও একতলা। চার-পাঁচখানা সিঁড়ি পেরিয়ে উঁচু রোয়াকে উঠতে হয়। প্রথমেই বৈঠকখানা, তারপর একটা উঠোন মত। সেই উঠোনের চারদিক ঘিরে ঘর। এর একটাতেই ললিতের

বাবা থাকতেন, অন্যগুলো বহুদিন বন্ধ। বৈঠকখানায় একটা পুরনো তক্তাপোষ রয়েছে। এদিকে দেশী ছুতোরের তৈরি মোটা পায়াওয়ালা টেবিল আর গোটা দুই বেঢপ চেয়ার। মাথার ওপরে আলকাতরা মাখানো মোটা মোটা কড়িকাঠ, তার ফাঁকে খড়কুটো দিয়ে তৈরি চড়ুইয়ের বাসা।

বেতের বাস্কেটে চিকেন স্যান্ডউইচ এবং দু'-তিনরকম মিষ্টি ছিল। বৈঠকখানার টেবিলে আমরা খাবার সাজিয়ে দু'দিকে চেয়ার নিয়ে বসে গেলাম। এবেলা আর রান্নার হাঙ্গামা করে দরকার নেই। শুনলাম গোপালের মা নামে এক বুড়ি এসে ওবেলা থেকে আমাদের রান্না করে দেবে।

খেতে খেতে ললিত হঠাৎ হেসে বলল—দেশের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে চিকেন স্যান্ডউইচ খাচ্ছি—ভাল মজা! জানিস, আমাদের বাড়িতে কখনো মুরগী ঢোকে নি—আজই বোধহয় প্রথম। কেমন দুশো বছরের একটা প্রথা ভেঙে দিলাম—

খেয়েদেয়ে একটা ইংরিজি পেপারব্যাক নিয়ে আমি তক্তাপোষে কাত হয়ে পড়লাম। ললিত ব্রিফকেস থেকে কিসব কাগজপত্র বের করে টেবিলে বসে দেখতে লাগল। বাইরে আমগাছের ডালে বসে পিড়িং পিড়িং করে কি পাখি ডাকছে। বাদবাকি সব নিশ্চুপ। বেলা আর ক'টাই বা হবে? দুটো? কোলকাতায় ছুটির দিন দুপুরে ফ্ল্যাটের বিছানায় শুয়ে ঠিক এই সময় শুনি নিচে রাস্তা থেকে ভেসে আসা জটিল শব্দের কনসার্ট। শহর কখনো ঘুমোয় না। এখানে স্তব্ধ দুপুরে পাখির ডাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুম এসে গেল।

জেগে দেখলাম বেলা প্রায় চারটে। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে বসেছেন ললিতের উল্টোদিকের চেয়ারে। পরনে মোটা ধুতি, সাদা হাফশার্ট। গাঁটওয়ালা লাঠিখানা টেবিলের ওপর আড় করে শোয়ানো রয়েছে। আমাকে জাগতে দেখে ললিত বলল —ঘুম ভাঙল? ইনি হচ্ছেন দীনুকাকা, বাবার ছোটবেলার বন্ধু। আমি এসেছি শুনে দেখা করতে এসেছেন।

দীনুকাকা কথা বললেন—বয়েসের তুলনায় তাঁর কণ্ঠস্বর আশ্চর্যজনক ভাবে ঋজু এবং বাচনভঙ্গি আদৌ গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট নয়। ললিতের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—বাবা ললিত, আমি কিন্তু শুধুই দেখা করতে আসি নি, তোমার মত ফেরাতে এসেছি।

ললিত বলল--জানি। কিন্তু আমি কি করব বলুন? আপনি যা বলছেন তা করার সাধ্য আমার নেই। দেশের সব সম্পত্তি আমাকে বিক্রি করে দিতেই হবে—

—তুমি জান, অতি দরিদ্র হতভাগ্যও কখনো তার ভদ্রাসন বিক্রি করে না।

—কোলকাতার বাড়িই আমার ভদ্রাসন, সেখানেই ছোটবেলা থেকে থেকেছি। রাগ করবেন না কাকা, এ বাড়ির জন্য কি আমার অতটা মায়া থাকা সম্ভব?

পকেট থেকে একটা গোল কৌটো বের করে একটুকরো হরতুকি মুখে দিলেন দীনুকাকা, তারপর বললেন—ঐতিহ্য মানো?

—আজ্ঞে?

—একটা বংশের বা জাতির যে ধারাবাহিকতা থাকে তাকে বলে ঐতিহ্য। সভ্যতার একটা বড় নিদর্শন হল নিজের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। তুমি যা করতে চলেছ তাতে তোমার ঐতিহ্য বজায় থাকবে কি?

হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গি করে ললিত বলল—আমি জিনিসটা আপনাকে

বোঝাতে পারছি না। আমি কোলকাতায় ব্যবসা করি, সে কাজে আমাকে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতে হয়। কখন আমি দেশের বাড়ি তদারক করতে আসব? গত দশ বছরে ক'বার পেরেছি? তাও বাবা ছিলেন বলে মাঝেমধ্যে বাবাকে দেখতে আসতাম। এসব তো পড়ে থেকে বেদখল হয়ে যাবে—

গ্রামের মানুষের তুলনায় দীনুকাকা বিলক্ষণ সভ্য। উঠে বারান্দার ধারে গিয়ে মুখে জমে ওঠা হরতুকির ছিবড়ে ফেলে এসে বললেন—তারও ব্যবস্থা করা যায়—

—যেমন?

—তোমার বাবা খুব বই পড়তে ভালবাসতেন। ছোটবেলা থেকে। আমাকেও বইয়ের নেশা সে-ই ধরিয়েছিল। স্কুল লাইব্রেরীতে তখন আর ক'খানা বই? তাতে আমাদের কুলোতো না। সপ্তাহে তিনদিন ছুটির পর হাঁ করে মহকুমা শহরের টাউন লাইব্রেরীর সামনে বসে থাকতাম, সন্ধ্যেবেলা লাইব্রেরী খুললে বই নিয়ে আবার পাঁচ মাইল পথ হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। এ নেশা বরাবর ওঁর থেকে গিয়েছিল, শেষজীবনেও কোলকাতা থেকে ডাকে বই আনাতেন, আমার কাছ থেকে পড়তে নিতেন। ভেতরবাড়ির দক্ষিণের ঘরটার তালা খুললে তোমার বাবার সারাজীবন ধরে সংগ্রহ করা বইয়ের রাশি দেখতে পাবে।

একটু থেকে দীনুকাকা বললেন—তুমি বরং এই বাড়িতে একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা কর, তোমার বাবার নামে। গ্রামের গরীব ছাত্রদের জন্য একটা টেক্সট-বুক সেণ্টারও করতে পার, সঙ্গে ফ্রি কোচিং ক্লাস। তুমি বাড়িটা ব্যবহার করতে দাও আর কিছু বই দাও। দেখাশুনো আমিই করব—

ললিত বলল—বুঝলাম। কিন্তু এর তো একটা রেকারিং খরচ আছে, যেমন মেরামতি, বই বাঁধানো, নতুন বই কেনা। কোচিং ক্লাশের মাস্টারমশাইরা হয়ত পারিশ্রমিক নেবেন না, কিন্তু তাঁদের জলখাবার দিতে হবে, তারপর ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি আছে—না দীনুকাকা, আপনার প্ল্যানটা উদার বটে, কিন্তু প্র্যাকটিকাল নয়।

দীনুকাকা উঠলেন, টেবিলের ওপর থেকে লাঠিখানা হাতে নিয়ে বললেন—প্রপার্টি তোমার, কাজেই তোমার মতামতই শেষ কথা। কিন্তু আমি হাল ছাড়বো না, রোজ আসব আর তোমাকে বিরক্ত করব—

বৃদ্ধ রোয়াকের সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলে ললিতকে বললাম—এ তো বেশ সাংঘাতিক বুড়ো! গ্রামর তুলনায় রীতিমত প্রগতিশীল।

—দীনুকাকা বেশ এডুকেটেড্। জুনিয়র হাইস্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন। ওই যে গোপালের মা এসেছে—

বছর সত্তর বয়েসের এক পাকাচুল বুড়ি রোয়াকের ওপর উঠতে উঠতে বলল —কেমন আছ খোকা? ছেলেপুলে ভাল আছে?

—এস গোপালের মা। হ্যাঁ, সবাই ভাল আছে। তুমি এক কাজ কর দেখি, চট্ করে উনুনে আঁচ দিয়ে একটু চায়ের জল বসিয়ে দাও। রাতে বেশি কিছু রান্না করে দরকার নেই, ভাত আর ডিমের ডালনা রেঁধো—

দন্তহীন মুখে অমায়িক হেসে বুড়ি বলল—আর আমি বুঝি না খেয়ে থাকব?

অপ্রস্তুত হয়ে ললিত বলল—ও, হ্যাঁ হ্যাঁ! তাহলে ডাল আর তরকারিও

বানিও। আমি টাকা দিচ্ছি, গোপাল বরং সাইকেলে করে বাজার নিয়ে আসুক।

চা খেতে খেতে বললাম—চল্ ললিত, তোর গ্রামটা একটু বেড়িয়ে দেখি –

—দেখার বিশেষ কিছু নেই। একটা মজে যাওয়া নদী, ঝোপজঙ্গল আর বাঁশঝাড়। আর হ্যাঁ, নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দিরও রয়েছে। চা খেয়ে নে, একটু ঘুরেই আসি--

কিন্তু ললিতের যাওয়া হল না। আমাদের চা শেষ হবার আগেই কুচকুচে সবুজ রঙের একটা গাড়ি এসে উঠোনের আমতলায় ললিতের গাড়ির পাশে দাঁড়াল। তার থেকে নামল মোটাসোটা গোলগাল চেহারার একজন অবাঙালী লোক, মুখে তৈলাক্ত মসৃণ হাসি। ললিত এগিয়ে গিয়ে বলল—আরে অম্বিকাপ্রসাদজী! আমি ভেবেছিলাম আপনি কালকে আসবেন। আসুন, উঠে আসুন—

আমার দিকে তাকিয়ে বলল—আমার আর যাওয়া হল না, একটু কাজের কথা বলতে হবে। তুই একাই বেড়িয়ে আয়। ছোট্ট গ্রাম, রাস্তা হারানোর ভয় নেই—

অনেকদিন শহর ছেড়ে বেরুই নি। বেড়াতে গেলেও গিয়েছি পুরী, হরিদ্বার, দিল্লী এসব জায়গায়। গ্রামের শান্ত স্বাভাবিক পরিবেশ মনকে যেন ঘুম পাড়িয়ে আনতে লাগল। ঝরাপাতা মাড়িয়ে সরু পায়ে-চলা পথ বেয়ে হেঁটে চলেছি, বিকেলের গাঢ় ছায়া ঘনিয়ে এসেছে নিবিড় গাছপালায় ঢাকা গ্রামপ্রান্তে। এই শেষবেলাতেও কি একটা পাখি পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে ডাকছে। পথ শেষ হল নদীর ধারে গিয়ে। এত সরু নদী যে, ওপারে কেউ খবরের কাগজ মেলে থাকলে তার হেডলাইন পড়া যায়। জলে স্রোত নেই, কেবল মৃদু বাতাসে তিরতিরে কাঁপন জেগে আছে। ঝুরি-নামা একটা বিরাট বটগাছের পাশে ভাঙা মন্দিরটা। মন্দিরের সামনে একটুখানি ঘাস-বিছানো জায়গায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম।

আমি কবি নই। কৈশোরে এবং প্রথম যৌবনে প্রায় সব ছেলেই কলেজের খাতার পেছন দিকে কবিতা লেখে। আমি তাও কখনো লিখি নি। তবু সেই নির্জন নদীর ধারের গ্রাম্য দৃশ্য আমাকে নিতান্ত মুগ্ধ করল। এরকম ক্ষেত্রে প্রকৃতিমূলক কোনো কবিতা মনে পড়া উচিত, কিন্তু অনেক ভেবেও বহুদিন আগে ইস্কুলে পড়া যতীন বাগচীর ‘ওই যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা আইড়ি খেতের আড়ে’ ছাড়া আর কোনো লাইন মনে এল না।

নদীর ওপারে ঘাসের আঁটি মাথায় একজন লোক অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ফিরবো বলে যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশে নক্ষত্র ফুটে উঠতে শুরু করেছে। এক একটা জায়গার অদ্ভুত প্রভাব রয়েছে মানুষের মনের ওপর। জোনাকি-জ্বলা বাঁশবনের ভেতর দিয়ে ললিতের বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে হঠাৎই মনে হল—কেন লোকে অকারণে আরো-বেশি-চাইয়ের পেছনে ছুটে জীবনটা নষ্ট করে? আনন্দে বাঁচা নিয়ে তো কথা, তা সে আনন্দ শহরের কোলাহল থেকে দূরে, উন্নতির মরীচিকা আর ক্ষমতার লোভ থেকে মুক্ত এমন একটা গ্রামের নিভৃত পরিবেশেও কি পাওয়া যেতে পারে না? যা পাওয়া যায় না তাকে ধরবার চেষ্টায় মিছিমিছি আমাদের সারাটা জীবন কেটে যায়।

উঠোন থেকে অম্বিকাপ্রসাদের গাড়ি উধাও হয়েছে। বৈঠকখানায় চুপ করে ললিত বসে। ঘর অন্ধকার।

—কিরে, আলো জ্বালাস নি?

ললিত আস্তে আস্তে বলল—হ্যাঁ, বলি জ্বালাতে। গোপালের মা রয়েছে রান্নাঘরে। ডাকি—

—অম্বিকাপ্রসাদ লোকটা কে? কি চায়?

ললিত যেন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছে, চমকে উঠে বলল—অ্যাঁ? অম্বিকা-প্রসাদ? সে হচ্ছে মহকুমা শহরের একজন বড়লোক ব্যবসাদার, আমার বাড়ি-জমি কিনতে চায়।

—ও-ই তাহলে খদ্দের?

—হুঁ।

ললিত আলো জ্বালাবার জন্য গোপালের মাকে ডাকবার কোনো উদ্যোগ করল না। অস্পষ্ট অন্ধকারে অনির্দেশ্য শূন্যে তাকিয়ে সে বসে আছে। বললাম—কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল?

—তা হল। অম্বিকাপ্রসাদ এখানে একটা ঘিয়ের কারখানা করবে। আশেপাশের গ্রামের গোয়ালাদের বরাত দেবে, তারা দুধ এনে হাজির করলে মেশিনে ঘি তৈরি হবে।

বৈঠকখানা ঘরে টেবিলের ওপাশে একটা জানালা, সে জানালার বাইরে নানান্ গাছপালার ঝুপসি জঙ্গল। হঠাৎ মৃদু হাওয়ায় গাছপালার পাতা খড়মড় করে উঠতে ললিত তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল।

বললাম—কি হয়েছে? কি দেখছিস?

ললিত বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—কিসের একটা শব্দ হল না?

—দূর! ও তো হাওয়ার শব্দ। কি হয়েছে তোর? খুব নার্ভাস দেখাচ্ছে—

ললিত আবার এসে চেয়ারে বসল। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল—একটু আগে একটা ঘটনা হল জানিস? অম্বিকাপ্রসাদ চলে যাবার পর আলো জ্বালবার জন্য ভেতরবাড়িতে যাচ্ছি, ঠিক মনে হল পশ্চিমের ঘরের সামনে বারান্দা দিয়ে কে যেন হেঁটে ওধারে বাঁকের আড়ালে চলে গেল—

ললিত অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করবার পাত্র নয়, তার ভাবান্তর দেখে অবাক হলাম। বললাম—আলো-আঁধারিতে কি দেখতে কি দেখেছিস। বাইরের লোক কে আসবে?

সারাজীবনের বিশ্বাস এবং আস্থা নাড়া খেলে মানুষের যেমন একটা বিহ্বল অবস্থা হয়, ললিতের মুখচোখের চেহারা অনেকটা সেরকম। সে আপনমনেই বলল—বাইরের লোক নয়, মনে হল বাবাকে দেখলাম—

হেসে বললাম—আসলে মেসোমশাইয়ের মৃত্যুটা তোকে বেশ ধাক্কা দিয়েছে। মনের এমন অবস্থায় ভুল দেখাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়—

কথার মাঝখানে হ্যারিকেন হাতে গোপালের মা ঢুকল।—আঁধারে বসে আছ কেন খোকা? আমাকে বলবে তো আলো দিয়ে যেতে? সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাবলাম তুমি ঘরে নেই বুঝি—

টেবিলের ওপর একটা শক্ত কাগজের রোল সুতো দিয়ে বাঁধা পড়ে রয়েছে। সেদিকে দেখিয়ে বললাম—ওটা কি রে?

—সম্পত্তি বিক্রির দলিলের খসড়া। অম্বিকাপ্রসাদ দিয়ে গেল। আমি অ্যাপ্রুভ করে দিলে স্ট্যাম্প-পেপারের ওপর পাকা দলিল লেখা হবে।

সন্ধ্যে থেকেই ললিত ঝিমিয়ে রইল। রাত্তিরে খেতে খেতে একবার জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা, পরলোক বলে কি সত্যিই কিছু আছে? তোর কি মনে হয়? মরে গেলে মানুষের আত্মাটা যায় কোথায়?

—জানি না ভাই। বড় বড় ঋষি আর পণ্ডিতেরা এ রহস্যের সমাধান করতে পারেন নি, আমি আর কি উত্তর দেব?

ললিত আর কিছু না বলে চুপ করে খাওয়া শেষ করল।

রাত ন'টার মধ্যে পাড়াগাঁ নিঃঝুম হয়ে পড়ে। কিন্তু আমরা শহুরে মানুষ, এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসতে চায় না। বললাম—তাস খেলবি ললিত? আয় দু'জনে মিলে ফিস্ খেলি—

ললিত রাজি হয়ে বসলো বটে, কিন্তু কেবলই খেলায় ভুল করতে লাগল। একসময় টেবিলের ওপর তাস ফেলে দিয়ে বলল—নাঃ, আর খেলতে ভাল লাগছে না। আয়, শুয়েপড়া যাক।

দু'জনে দুটো হাওয়া-বালিশ ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে নিয়ে বৈঠকখানার তক্তা-পোষেই চাদর পেতে পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর যখন ভাবছি ললিত নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে, আমারও দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, ঠিক তক্ষুণি ললিত বলল—তুই হ্যামলেট পড়েছিস?

ঘুমের ঘোরের মধ্যে বললাম—কি বলছিস?

—হ্যামলেট পড়েছিস? সেক্সপীয়ারের?

—পড়েছি।

—তাতেও ঠিক এমনি আছে না? দুর্গের ছাদে কুয়াশার মধ্যে হ্যামলেট তার মৃত বাবার আত্মাকে দেখতে পেয়েছিল। তুই যেমন আমার বন্ধু, তেমনি হ্যামলেটের বন্ধু ছিল হোরাশিও। হ্যামলেটের বাবা তাকে একটা ভয়ঙ্কর গোপন কথা জানাতে এসেছিল। আমাকেও কি বাবা কিছু বলতে চান?

আধো ঘুমের ভেতরে কি যেন একটা উত্তর দিলাম ললিতকে।

ঘুম ভাঙল ললিতের ঠেলায়। চোখ কচলে উঠে বসে বললাম—কি হয়েছে? ডাকছিস কেন?

রাত কটা কে জানে। টেবিলের ওপর কমিয়ে রাখা হ্যারিকেনটা ঘরের মধ্যে ভৌতিক আভার সৃষ্টি করেছে। বাইরে ঝোপঝাড় থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝির ডাক।

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে ললিত বলল—এক্ষুণি সে এসেছিল!

—কে?

ললিত চুপ।

বললাম—কে এসেছিল?

—জানি না। হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখলাম টেবিলের কাছে সে দাঁড়িয়ে। আমি জেগে উঠতেই আস্তে করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে বারান্দায় চলে গেল—

—চল্ দেখি বারান্দায়।

ললিত আর আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, ঠিকই দেখেছে ললিত। ওই তো ওধারের বারান্দা দিয়ে সাদা ধুতি পরা প্রৌঢ় কে একজন হেঁটে চলে যাচ্ছে। খালি গা, মাথায় পাকাচুল। নক্ষত্রের আবছা আলোয় তাকে দেখা যায় কি যায় না।

লোকটার হাতে ম্যাপের মত করে পাকানো একটা কাগজ।

দু'-একমুহূর্ত, তারপরেই অস্পষ্টদর্শন মূর্তিটি পশ্চিমের বারান্দার বাঁকে মিলিয়ে গেল।

মুখ দিয়ে বাতাস টানবার শব্দ করে ললিত বলল—আয় দেখি—

না, ছায়ামূর্তির পেছনে নয়, ঘরে ঢুকে হ্যারিকেনের আলোটা কল ঘুরিয়ে উজ্জ্বল করে দিল ললিত।

টেবিলের ওপর দলিলের খসড়াটা নেই।

এরপর বেশি কথা বলবার মানে হয় না। টেবিলের দু'ধারে চেয়ার পেতে দুই বন্ধু বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

আস্তে আস্তে ভোর হয়ে যখন সকালের আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ল, পাখি ডাকতে আরম্ভ করল গাছে গাছে, তখন হঠাৎই গতকাল রাত্তিরের অভিজ্ঞতাটা কেমন হাস্যকর আর অবাস্তব বলে মনে হল। কেবল—

কেবল খসড়াটা উধাও হওয়ার কোনো ব্যাখ্যা হয় না।

—জিজ্ঞাসা করলাম—এখন কি করবি ললিত?

ক্লান্ত হেসে ললিত বলল—অম্বিকাপ্রসাদের কাছে যাবো একটা নতুন খসড়া করাতে। টাকার বড় দরকার। বাড়িটা বিক্রি করে দিতে হবেই।

মেলা

সকালবেলার প্রথম বাসেই মগরাজপুরের মেলাতলা থেকে একটু দূরের পাকা রাস্তার ওপর এসে নামল রতন আর বিশু। প্রথম বাসেই ঠাসাঠাসি ভিড়। রাত্তিরের শেষ মেচেদা লোকালে এসে ওরা দেখল বাস চলে গিয়েছে। রাত্তিরে আর বাস নেই। দু'জনে রেল-ইস্টিশানে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিল। ভোর পাঁচটায় উঠে ইস্টিশানের স্টলে চা আর সুজি দিয়ে তৈরি নিম্‌কি বিস্কুট খেয়ে সাড়ে পাঁচটার বাস ধরেছিল। এই এখন এসে পেঁীচচ্ছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা বাসে। বেশ চড়চড়ে রোদ উঠে গিয়েছে। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি, বাতাসে তেমন শীতের কামড় নেই। বরং দুপুরের দিকে না-গরম না-ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে থাকে, মনের মধ্যেটায় কেমন করে।

চা-বিস্কুট খেয়ে ওরা যখন মেচেদা ইস্টিশানের বাইরে এল তখন বাসের ভেতরটা একেবারে বোঝাই হয়ে গিয়েছে। কোনোমতে হয়ত তারা দু'জন ঢুকতে পারে, কিন্তু সঙ্গের বস্তা আর টিনের তোরঙ্গ দুটো কিছুতেই সেখানে ধরবে না। ওরা একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এদিকে বাসেব হেল্পারটা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে 'চলে এস, চলে এস! মেচেদা—নরঘাট—কাঁথি! ছাড়লো বলে'—

রতন বলল—ও মামা, ছেড়ে দেবে বলছে যে—

বিশু এগিয়ে হেল্পারকে বলল—ও ভাই, লোক তো ডাকছো, ইদিকে বাসের

পেটে জায়গা নেই, লোক ধরাবে কোথায়?

পটে আঁকা নারায়ণের যে আঙুলে চক্র থাকে সেই আঙুল তুলে হেল্পার ওপর দিকে বাসের ছাদ দেখাল।

বিশু বলল—ছাদে? পড়ে যাব না?

—এত লোক যাচ্ছে রোজ, সবাই পড়ছে? এ বস্তা কার?

—আমাদের।

—যাবে কোথায়? কাঁথি?

—নাঃ, মগরাজপুরের মেলায়—

হেল্পার বলল—বস্তাপিছু একখানা করে টিকিট লাগবে। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে পড় এক্ষুণি। পরে ছাদেও জায়গা পাবে না—

—দুটো বস্তায় একখানা টিকিট নিলে হবে না?

হেল্পার গলা খাঁকারি দিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল—আচ্ছা, আচ্ছা—সে ঠিক আছে। তাহলে টিকিট পাবে না কিন্তু—

—দরকার নেই টিকিটের। আমাদের যাওয়া নিয়ে কথা—

হুড়মুড় করে দু'জন ছাদে উঠে ভাল জায়গা নিয়ে বসে গেল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সত্যিই ছাদও পুরো ভর্তি।

শহরের এলাকা ছাড়িয়ে সরু পিচঢালা রাস্তার দু'দিকে বড় বড় মাঠ, পুকুর, বাগান। মাঠের ওপর ভোরবেলার হাল্কা কুয়াশা জমে রয়েছে। হু-হু করে ছুটেছে বাস, বেশ ঝাঁকুনি। বিশু বলল—রতন, শক্ত হয়ে বোস, গড়িয়ে পড়ে যাস নে—

রতনের আমোদ লেগেছে। মাল রাখবার জায়গা ঘিরে কাঠের নিচু বেড়াটা এক হাতে চেপে ধরে সে বলল—পড়ব না মামা। কি মজা, হি হি!

তার আদ্দেক কথা জোর বাতাসে উড়ে যায়।

বিশুর ভাব হয়ে যায় পাশের আধবুড়ো লোকটার সঙ্গে। তার ঠান্ডার বাতিক, নস্যি রঙের মাফলার দিয়ে মাথা-কান জড়িয়ে বসে আছে। সে জিজ্ঞাসা করল—কদ্দুর যাওয়া হবে?

—মগরাজপুর। সেখানে মেলা হবে না? সেই মেলায় যাচ্ছি —

—মেলা দেখতে?

বিশু হেসে বলল—না গো, মেলায় দোকান দেবো। তেলেভাজা, সিঙাড়া, খাঁজা, বোঁদে, ঢাকাই পরোটা—এইসব।

লোকটা বলল—বাঃ, বাঃ—ভালই। কতদিন ওসব খাই না—

—এসো না মেলায়, খাইয়ে দেবো।

লোকটা আঁতকে উঠল।—ওরে বাব্বা! তার কি উপায় আছে? অম্বল, বেজায় অম্বল! জলে ভিজিয়ে দুটি মুড়ি খাই, তাও বুক জ্বালা করে। মহেশ কোবরেজের ভাস্কর লবণ খেয়ে বেঁচে আছি। বয়েসকালে খুব খেয়েছি হে! একসের চালের ভাত, একগামলা ডাল আর এককাঁসি আলুপোস্ত কোনো ব্যাপারই ছিল না। আমি নেমন্তন্ন খেতে বসলে আশপাশের পাঁচটা গাঁয়ের লোক ভিড় করে—শুয়ে পড়! শুয়ে পড়!

হতচকিত বিশু আর রতন কিছু বোঝবার আগেই আধবুড়ো লোকটা দু'হাতে তাদের দু'জনের ঘাড় ধরে নিচু করে দিয়ে নিজেও উপুড় হয়ে পড়ল।

পরমুহূর্তেই মামা-ভাগ্নের পিঠে সপাং সপাং করে কিসের বাড়ি লাগল।

—নাও, এবার মাথা তোলো—

বিস্মিত বিশু বলল—কি হল গো? কি লাগল পিঠে?

লোকটা পেছনের রাস্তা দেখাল—গাছ। ছাদে বসে আছি ভুলে গেছ নাকি? এই লাইনে সবাই সাবধান হয়ে চলে। কত বড় বড় গাছ দেখছ না পথের ধারে? ছাদে যারা বসে, তারা গল্প করে বটে, কিন্তু একটা চোখ খোলা রাখে গাছ আসছে কিনা দেখবার জন্যে।

রতন তাকিয়ে দেখল। শিরীষ গাছটা ততক্ষণে অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে।

তারপরে এই মগরাজপুরের মেলাতলা। ওদের সঙ্গে আরো পাঁচ-ছ'জন নামলো। বাস চলে যেতেই চারদিকে ভোঁ-ভোঁ। এ তো ধু-ধু মাঠ, কোথায় মেলা বসবে রে বাপু?

হ্যাঁ, ওই যে মন্দির দেখা যায় বটে।—চল্, চল্ রে, রতন। একটার ওপর আর-একটা বস্তা চাপা, তারপর কোণদুটো ধর। তোল এবারে—

—মামা, তোরঙ্গ দুটো?

—হ্যাঁ, তাও তো বটে। আচ্ছা, তুই যা আগে ওদুটো রেখে আয় মাঠের মধ্যে। কেউ নেবে না, এখান থেকে দেখা যায়। আমি বস্তা পাহারা দিই—

মাল পৌঁছে গেল মন্দিরের সামনে। মাঠের ভেতর বাঁশ আর চট দিয়ে দোকান তৈরির কাজ চলেছে। মেলা কমিটির লোকেরা বসে নিজেদের মধ্যে কি কথাবার্তা বলছে মন্দিরের চত্বরে। বাস থেকে ওদের সঙ্গে যারা নেমেছিল তারাও এসে কমিটির লোকেদের সঙ্গে দোকানেব ভাড়া নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। বিশু গিয়ে কাছে দাঁড়াল।

কমিটির লোকেরা বেশির ভাগই ময়লা ধুতি, ছিটের শার্ট আর চটি পরা। বিশু মেলায় ঘুরে ঘুরে ঘুণ হয়ে গিয়েছে। এরা নিতান্ত গেঁয়ো লোক, হঠাৎ মেলা কমিটির মেম্বার হয়ে হাতে ক্ষমতা পেয়েছে। এদের ভেজানো ভারি কঠিন। দর বিশেষ কমবে বলে মনে হয় না।

একজন এদেরই মধ্যে একটু আলাদা। পরনে ফুলপ্যাণ্ট আর গোলাপী গেঞ্জি, বাহার দিয়ে চুল কাটা। কথায় কথায় ইংরিজি বলছে। গাঁয়ের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে লেখাপড়া জানা লোক। সবাই মান্যও করে, কারণ সে কথা বলবার সময়ে বাকিরা চুপ করে যাচ্ছে। মেলা কমিটির একজন বয়স্ক লোক বিশুকে দেখিয়ে তাকে বলল—হারাধন বাবা, দেখ তো এ কি চায়? দাঁড়িয়ে রয়েছে—

হারাধন বিশুর দিকে তাকিয়ে বলল—কি চাই তোমার?

—আজ্ঞে, আমি মেলায় দোকান দিতে চাই।

—কিসের দোকান? হোয়াট্ শপ্?

—খাবারের। খাজা-গজা, সিঙাড়া, বোঁদে—এইসব।

ওদিক থেকে একজন বলল—দিনে দশটাকা করে দোকান ভাড়া দিতে হবে।

হারাধন সাঁ করে সেদিকে ফিরল।—মেনি টক্ নট। তাহলে তুমিই কথা বল।

লোকটা চুপ।

হারাধন বিশুকে বলল—যাই হোক, শুনলে তো? দিনে দশটাকা ভাড়া—

—আজ্ঞে, ওটা বড় বেশি হয়ে যায়। কিছুই লাভ থাকবে না তাহলে—

—কিছু করার নেই। এটাই রেট, সবাই দিচ্ছে।

—আমার ক্ষেত্রে একটু বিবেচনা করুন, আপনার হাতেই সব।

হারাধন ভুরু কুঁচকে বলল—তোমার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনা করা হবে কেন বল দেখি? হোয়াট্ ইজ দি বিকজ?

বিশু আর অন্য উপায় না দেখে বলল—আচ্ছা, আমি কমিটির সবাইকে রোজ বিকেলবেলা দু'খানা করে ঢাকাই পরোটা খাওয়াবো। পয়সা দিতে হবে না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল—দিনে চারটে করে টাকা দিই বাবু?

হারাধন বলল—সঙ্গে একখানা করে গজা। আর দিনে পাঁচটাকা।

তাই সই। বিশু রাজি হয়ে গেল।

কমিটির তো জনা ছয়েক লোক দেখা যাচ্ছে। খাবার খাওয়াতে অতটা গায়ে লাগে না, পড়তার মধ্যেই এসে যায়। আর এদিকে তৈরি দোকানও পাওয়া যাবে।

একজন ওদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে একটা ছাউনি দেখিয়ে বলল—এই তোমাদের দোকান। বসে যাও। আজ থেকেই কি খাবার বানাবে?

—মেলা তো কাল থেকে?

—হ্যাঁ। তবে আজও বিকেলে লোকের ভিড় হবে। কি কি দোকান এসেছে দেখতে আসবে সব। আজই লাগাও—

বিশু বলল—দেখি।

দোকানের সামনে খোলা, বাকি সবদিক চট দিয়ে ঢাকা। চালের ওপর কিছুটা বাড়তি চট গোটানো ছিল, সেটুকু টেনে নামিয়ে দিয়ে বিশু দোকানঘরখানাকে দুটো কামরার মত করে ফেলল। একটা বড়, একটা ছোট। সামনেটায় দোকান বসবে, পেছনটায় থাকা যাবে।

—যা রতন, বস্তা খুলে মালপত্র বের করে ফেল। মন্দিরের পেছনে মেলা ভাঙা ইঁট পড়ে আছে, চাপাকলটাও আছে দেখলাম। একটু কাদামাটি ছেনে উনুন বানিয়ে ফেল দিকি। আমি ততক্ষণ চান করে আসি। বাস রাস্তার ধারে পুকুর রয়েছে, সেইখেনে যাচ্ছি—

চড়চড়ে রোদে পুকুর অবধি যেতেই যেন গা পুড়ে যায়। পুকুরে নেমে বেশ অনেকক্ষণ ধরে আরামে চান করল বিশু। একবার সাঁতার দিয়ে এপার-ওপার করল। তারপর গা-মাথা মুছে ফিরে এসে দেখে রতন এরই মধ্যে উনুন গড়ে ফেলেছে। নড়বড়ে একখানা সরু বেঞ্চির ওপরে সাজিয়েছে খাবার রাখবার চাঙাড়ি আর গামলা ক'খানা।

—বেঞ্চিখানা কোথায় পেলি রে?

রতন হেসে বলল—মন্দিরের সেবাইতের বাড়ি থেকে চেয়ে এনেছি। দিনে আটআনা ভাড়া। আগে দেখতে পেয়েছি বলেই হল, আমার দেখাদেখি আরো দু'জন দোকানদার গিয়ে হাজির—তারা পেল না।

—তোর ভারি বুদ্ধি। দে, উনুনটা ধরিয়ে দে—

উনুনে আঁচ দিয়ে মাথায় একখাবলা তেল মেখে রাঙা গামছাটা নিয়ে পুকুরে চান করতে গেল রতন। পুকুরের ওপারে একটা ঝাঁকড়া পরশ-পিপুল গাছ, বাতাসে তার পাতা ঝিরঝির করছে। একদমে ওপারে গিয়ে গাছটার নিচে বসে কোমরে জড়ানো গামছার ভাঁজ থেকে ক্ষয়ে ছোট হয়ে যাওয়া সাবানের টুকরোটা বের

করল। রতন সৌখীন মানুষ, সে একদিন অন্তর সাবান দিয়ে চান করে।

সাবান মাখতে মাখতে রতন দেখল মেলার দিকের ঘাটে একটি মেয়ে এসে চান করতে নেমেছে। লাল জমির ওপরে কালো ডুরে শাড়ি পরা। তেলের শিশি আর সাবানের বাক্স ঘাটলায় রেখে জলে নামল মেয়েটা। আহা, ময়লা হলেও মুখখানা—এখান থেকে যতদূর বোঝা যাচ্ছে—বেশ সুন্দর। গোলগাল স্বাস্থ্য। জলে কাপড় ভিজে গিয়ে—না, ছিঃ। তাকাতে নেই।

একটা শালিক কিছু দূরে ঘাসের দানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপরে গাছের পাতার ঝিরঝির শব্দ। রতন গায়ে সাবান ঘসছে তো ঘসছেই। হু-হু বাতাসে ফেনা শুকিয়ে খরখরে হয়ে গেল। সরাসরি মুখ না তুলেও চোখের কোণের আধো চাউনিতে টের পাওয়া যায় মেয়েটা সদ্য ডুব দিয়ে উঠে চুলের গুছি আলাদা করতে করতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কণ্ঠির উলটো ভাঁজে সাবানের টুকরো গুঁজে (আরো একদিন চলবে) দাঁড়িয়ে উঠল রতন, দু'হাত ওপরে তুলে পাড় থেকে ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়ল। জলের মধ্যে সোজা ভেসে থেকে হাত দিয়ে জল কাটতে কাটতে একবার অপাঙ্গে তাকাল মেয়েটার দিকে। এত সুন্দর লাফখানা দেখেছে তো, না কি?

দেখেছে। অকস্মাৎ জলের শব্দে চমকে উঠে অবাক হয়ে এদিকে তাকিয়ে রয়েছে। বেশ মেয়েটা, কালো হলেও—

ফুর্তির চোটে ঝপাঝপ্ দুই হাত্তা সাঁতার কেটে শোঁ করে এপার চলে আসে রতন। মেয়েটার পাশ দিয়ে পাড়ে উঠে মাঠ পেরিয়ে মেলাতলার দিকে যেতে যেতে গান ধরে—

তার হাতে ছিল চুড়ি,
সে যে ভেজে দিত মুড়ি,
ও ভাই, মুড়ি বিনা আমার আর প্রাণ বাঁচে না—

চালে-ডালে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়েছে বিশু। পাশে বঁটি নিয়ে বসে বেগুনি কুটেছে একরাশ। গানের সুর শুনে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ডেকচির গায়ে পারা-ওঠা আয়নাটা ঠেকনো দিয়ে গভীর মনোযোগে ক্ষৌর কাটছে রতন।

—খিচুড়ি চাপালে মামা?

—হুঁ।

—আর বেগুনি?

—হুঁ।

মামার দিকে তাকাল রতন। কম কথা বললে বুঝতে হবে মামা চটেছে। হঠাৎ চটল কেন? মুখে সে বলল—ওঠো মামা, আমি কুটে দিচ্ছি—

দ্বিরুক্তি না করে বঁটি ছেড়ে দিল বিশু।—পাতলা করে কাটবি।

মামা বেগুনি কাটে ঘুড়ির কাগজের মত। রতন অতটা পারে না। মামার হয় কিলোতে দুশো টুকরো, তার হয় দেড়শো।

তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ময়দা মাখতে বসে গেল রতন। আজ হবে বেগুনি, কচুরি, আলু-কুমড়োর ঘ্যাঁট আর খাজা। খাজার জন্য মোটা চিনির রস তৈরি করে রাখা আছে ওপাশের ডালডার টিনে। রতন বলল—কচুরিতে কি কলাইয়ের ডালের পুর দেওয়া হবে?

—পাগল! ছাতুর সঙ্গে হিং মিশিয়ে পুর বানা। আগে মেলার অবস্থা দেখি। ভাল বুঝলে কাল থেকে কলাইয়ের ডালের পুর করে রাধাবল্লভি বলে বাজারে ছাড়বো। পনেরো পয়সা করে দামও বাড়ানো যাবে। আজ এই থাক

মেলা অবশ্য ভালই। কাল থেকে মেলা বসার তারিখ কিন্তু আজই বিকেল থেকে বহুলোক ঘোরাঘুরি আরম্ভ করে দিয়েছে। সন্ধ্যে হতে না হতে একঝুড়ি বেগুনি সাফ। তখনো খদ্দের আসছে। রতন বলল—ও মামা, চট করে আরো বেগুন কেটে নেবো নাকি? তুমি বেসন গুলে ফেল তাহলে

না, আজ আর ভাজবো না। সকাল সকাল না এলে আমাদের খাবার ফুরিয়ে যায়, এই কথাটা রটতে দে। কাল বেশি করে ভাজিস এখন -

বেগুনি, কচুরি ইত্যাদির সঙ্গে তেঁতুল, ধনেপাতা আর কাঁচালঙ্কার একটা চাটনিও একচামচ করে দেওয়া হয়। চাটনির আকর্ষণেও অনেক খদ্দের আসে। একচামচ চাটনি চেটে মেরে দিয়ে আবার চায়। বিশু বলে—তাহলে আর দুটো ভাজা কিনতে হবে ভাই ফিরি চাটনি দু'বার হয় না

সন্ধ্যে গাঢ় হতে কমিটির লোকেরা কচুরি আর খাজা খেয়ে গেল। রতন অবাক হয়ে দেখল মন্দিরের সেবায়েতও এসে জুটেছে। লোকটার কাছে গিয়ে সে বলল - তুমি এখানে কেন? তোমাকে তো বেঞ্চিভাড়া দেওয়া হচ্ছেই।

লোকটা মিটিমিটি হেসে বলল—আমি মেলা কমিটিরও মেম্বার।

রাত আটটার পরে ভিড় কমে এল। গ্রাম্য জায়গা, বেচাকেনা যা হবার সন্ধ্যের পর ঘণ্টা দুইয়ের ভেতরেই হয়ে যায়। গোটা দশেক কচুরি বেঁচে গিয়েছে। বিশু বলল—কিছু রাঁধিস না রতন, এই কচুরি খেয়েই আজ চলে যাবে।

খাওয়াদাওয়া হতে হতে মেলাতলা নির্জন হয়ে এল। ফুরফুরে বাতাস দিচ্ছে, শতরঞ্চি পেতে দোকানের সামনে শুয়েছে মামা-ভাগ্নে। মাথার ওপরে একআকাশ নক্ষত্র, চিৎ হয়ে শুয়ে সেদিকে তাকিয়ে ছিল রতন। বিশু শুয়ে অবধি বকবক্ করে যাচ্ছে, তার কথায় সায় দিতে দিতে বিরক্তি ধরে গেল রতনের।

—দু'-একমাসের ভেতর দোকানটা আরো বড় করবো, বুঝলি?

রতন বলল—হুঁ।

শুধু খাজা-গজা বিক্রি করে উন্নতি নেই। এই যেমন চলছে তেমনই চিরকাল চলবে। পয়সা করতে হবে, বুঝলি? পয়সা—

—হুঁ।

—এবার দোকানটাকে দু'ভাগ করবো। একদিকে খাবার বিক্রি হবে, আর একদিকে লটারির দোকান। ওই যে পিচবোর্ডের টুকরোতে নম্বর লিখে যে লটারি হয়, জানিস তো? খুব লাভ—

—হুঁ।

মামা আরো কিসব বলে চললো। রতন ভাবছিলো সকালে পুকুরঘাটে দেখা মেয়েটার কথা। সুন্দর চোখ মেয়েটার। সে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একবার আড়চোখে তাকিয়েছিল। উঃ, বুকের মধ্যেটায় কেমন করে ভাবলে! মেলায় কারো দোকানে এসেছে নিশ্চয়। একবার একটু কথা বলবার সুযোগ হয় না? তার জীবনটা বৃথাই গেল কেবল তেলেভাজা বিক্রি করে।

রতন উঠে পড়লো শতরঞ্চি থেকে। বিশু ঘুমজড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলো

—কোথায় যাচ্ছিস ?

—এই, একটু—মাঠে আর কি—

—হুঁ, তাড়াতাড়ি ফিরিস।

মেলা ঘুমিয়ে পড়েছে এত রাতে। এখানে-ওখানে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে, শোবার আগে দোকানী বসে হিসেব করছে দিনের বেচাকেনার। রতন আস্তে আস্তে মাঠের কোণে বেরুবার রাস্তার দিকে চললো।

ওদিকের সারির একেবারে শেষ দোকানে আলো নেই. কিন্তু অন্ধকারে কি যেন একটা নড়ছে। আর একটু কাছে যেতে নক্ষত্রের আবছা আলোয় ফুটে উঠলো এক নারীমূর্তি। সকালে দেখা সেই মেয়েটি। খেজুরপাতার চাটাই বিছিয়ে অন্ধকারেই চুল আঁচড়াচ্ছে। দোকানের ভেতরে গুটিশুটি পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে একটা হুমদোপানা লোক। সামনে এসে রতনের গতি কমে গেল।

মেয়েটার ঠোঁটের কোণে কি সামান্য হাসি ? তারার আলোয় ভাল বোঝা যায় না। সাহস করে রতনও একটু হাসল। খারাপ কিছু নয়, চেনা লোককে দেখেও তো মানুষ হাসে।

তারপরেই গায়ে কাঁটা দিল রতনের। মেয়েটা তর্জনী ঠোঁটের ওপর রেখে তাকে চুপ করে থাকতে বলছে। রতন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মেয়েটা এবার ঘুমন্ত লোকটাকে একবার দেখিয়ে রতনকে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলো।

ব্যাপারটা ভাল বুঝতে না পেরে রতন মাঠ থেকে বেরিয়ে পুকুরধারে গিয়ে দাঁড়ালো। ও যা ভাবছে, সত্যি কি তাই হবে ?

হ্যাঁ, মাটির পৃথিবীতে মাঝে মাঝে স্বর্গ নেমে আসে বটে। ওই যে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ছায়ার মধ্যে ছায়া হয়ে হেঁটে আসছে মেয়েটা। যেন বাতাসে ভেসে আসছে।

রতনের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে পর পর দু'বার ঢোঁক গিললো।

—আমাকে খুব খারাপ মেয়ে ভাবছো, না ?

রতন চুপ। তার হাতের তালু ঘেমে উঠেছে।

– কি, সত্যি তো ?

কোনোরকমে রতন বলল—না না, তা কেন ভাবব ? বা রে—

—এই যে আমি এত রাত্তিরে তোমার সঙ্গে একা কথা বলতে এলাম, ভাল মেয়েরা কি এমন করে ?

রতন তবুও চুপ করে আছে দেখে মেয়েটা বলল—বোস না এইখেনটায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না—

ঘাসের ওপর বসে মেয়েটা বলল—আসলে কি জানো, লজ্জা না করেই বলছি —তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। যখন হবার তখন একবার দেখাতেই হয়। তুমি মানুষটাও ভাল—

রতন গলার স্বর কিছুটা ফিরে পেয়েছে। বলল—কি করে বুঝলে ?

—ও বোঝা যায়, মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারে। পুকুরে যখন চান করছিলাম তুমি একবারও তাকাও নি। অন্য ব্যাটাছেলেরা হাঁ করে চেয়ে দেখে। তুমি তাদের মত নও—

—তোমার নাম কি ? সেটাই তো জিজ্ঞেস করা হল না।

—আমার নাম আলতা। ভাল নাম না?

—খুব সুন্দর নাম। আমি আগে এমন শুনি নি—

আলতা বলল—নামটা বাবার দেওয়া। বাবা মরে গেছে, নামটা আছে কেবল—

রতন বলল—দোকানের ওই লোকটা তোমার বাবা না?

—নাঃ। দূরসম্পর্কের কাকা। ভারি পাজি লোক, কেবল খাটায়। একটা পয়সা হাতখরচ দেয় না। বছরে দু'বার কাপড় দেয়, তাও সাত দোকান খুঁজে সবচেয়ে মোটাখানা নিয়ে আসবে। এই দেখ না, আমি এত বড়টা হয়েছি, আমার বিয়ে দেবার নামগন্ধও করে না—

মেয়েটা ভালই, তবে আর একটু নরম-সরম আর লাজুক হলে যেন ভাল হত। মেয়েরা নিজের মুখে বিয়ের কথা বললে যেন কেমন শোনায়। তা যাক, সব গুণ সবার মধ্যে থাকে না।

—তোমার মা নেই আলতা?

না। বাবা যাওয়ার পরের বছরই মা-ও মরে গিয়েছে। মা থাকলে এতদিনে আমার বিয়ে দিয়ে দিত।

রতন একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কথা ঘোরাবার জন্য সে বলল—তোমার কাকার কিসের দোকান?

—তোমাদের মতই, খাবারের। তবে আমরা শুধু নিমকি আর অমৃতি ভাজি। আমার হাতের অমৃতির নাম আছে, কত দূর দূর থেকে লোক খেতে আসে—

রতন উৎসাহিত হয়ে বলল—তুমি অমৃতি ভাজার কায়দা জানো?

মুচকি হেসে আলতা বলল—জানিই তো। মোটা কাছির মত পাকের অমৃতি না, সরু সরু পলতের মত পাক, দেখলে মনে হবে কারুকাজ করা। তেমনটি তুমি খাও নি—

—তোমাকে বলেছে'

আলতা হেসে বলল—কাল বিকেলে খদ্দের সেজে এসে দুটো খেয়ে যেও, তারপর বোলো আলতা মিথ্যেবাদী কিনা। তবে কাকা যেন টের না পায় তোমার সঙ্গে আমার চেনা আছে। তাহলে আমাকে আর আস্ত রাখবে না—

তারপরেই আবার হেসে বলল—অবশ্য কাল রাত্তিরে যদি এইখানে আসো তাহলে তোমার দু'খানা অমৃতির দাম আমি ফিরিয়ে দেবো। তোমাকে খাইয়ে পয়সা নেব না—

রতনের সাহস বেড়েছে, সে বলল—পয়সা নেবে না কেন, আমি তোমার কে?

—আজ কেউ নও, একদিন তো হতেও পারো।

—আচ্ছা, কাল আসবো এই সময়ে। পয়সার জন্য না। তোমার জন্য।

মাতাল হাওয়া ঢেউ তোলে পুকুরের জলে, ভেঙে ভেঙে যায় নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব। রাতজাগা পাখি ডাকছে মাঠের পারে কোনো গাছের ডালে বসে। কেমন যেন একটা নেশা-নেশা ভাব চারদিকে। আবছা আলোয় কি সুন্দর দেখাচ্ছে আলতাকে। ছোটবেলায় ঘুম পাড়াবার সময় বুড়ি ঠাকুমা রতনকে রাজপুত্র আর রাজকন্যার গল্প বলত। সেই রাজকন্যার মত যেন আলতা।

রতন হঠাৎ আলতার একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল—তুমি আমাকে বিয়ে করবে আলতা? আমার কিছু জমানো টাকা আছে, তা দিয়ে আমরা

মেলায় মেলায় দোকান দেব। তুমি অমৃতি ভাজবে, আমি বানাবো কচুরি, সিঙাড়া, গজা—এইসব। দু'জনে মিলে কেমন মজা করে সংসার করবো। করবে বিয়ে?

আলতো মাথা নিচু করে বলল—হুঁ-উ-উ। কিন্তু আমাকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করতে হবে। আমি চলে গেলে কাকার দোকানে খদ্দের কমে যাবে, সেজন্য আমার বিয়ে দেয় না। পালাতে হবে—

বসন্তের নিভৃত রাত্রির এক আলাদা মোহ আছে। সেই মোহ তরল অন্ধকারের সঙ্গে মিশে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। স্বভাব-লাজুক রতন আজ মুখর হয়ে উঠেছে। সে বলল—তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি আলতা। বেশ তো, তুমি পালিয়েই চলো আমার সঙ্গে। কাল রাত্তিরে এখানে এসো, এ নিয়ে কথা বলব।

নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এসে মামার পাশে শুয়ে পড়ল রতন। জ্বলজ্বলে বড় তারাটা, যেটাকে সে ঠিক মাথার ওপরে দেখে গিয়েছিল, এখন হেলে পড়েছে পুকুরের ওপারের পরশ পিপুল গাছটার মাথায়। একটু বাদে বাদে একটা রাতজাগা কোকিল ডেকে উঠছে দূরে কোথায়। এমন রাতে ঘুম আসে না, আকাশভরা তারার দিকে চেয়ে শুধু ভাবতে ইচ্ছে করে। ঘুম আসে না কিছুতেই।

সকালবেলা জেগে উঠে রতনের মনে হল পৃথিবীটা বদলে গিয়েছে। সমস্ত মাঠটায়, পরশ-পিপুল গাছের পাতায়, আকাশে বাতাসে কোথাও আর কালো রাতের সে স্বপ্নের এতটুকু অবশেষ পড়ে নেই। রাত্রির নির্জনতায় যে প্রান্তরকে পরীর রাজ্য বলে মনে হয়েছিল, এখন পুব আকাশ বেয়ে উঠে আসা সূর্যের রূঢ় আলোয় সেটাকে মনে হচ্ছে কেবলই একটা ঘেসো মাঠ। এক একদিন এমন হয়, ভোর থেকেই বোঝা যায় আজ দিনটা খারাপ যাবে।

বিশু দাঁতন চিবোতে চিবোতে টিনের মগ হাতে ফিরে এল মাঠের দিক থেকে। মগটা রতনকে দিয়ে বলল—যা, চট্ করে মাঠ সেরে আয়। তারপর আজ কি হবে পরামর্শ করে ফেলি। কালকের অনেক তরকারি বেঁচে গিয়েছে—কিছু রসুন ভেজে ফোড়ন দিয়ে স্পেশাল তরকারি বলে চালিয়ে দেব। উনুন ধরিয়ে চট্ করে ফোড়নটা দিয়ে রাখ, নইলে গন্ধ হয়ে যাবে—

সে এগুতে যাবে, পেছন থেকে বিশু আবার বলল—মাঠের ওই কোণায় আর একটা খাবারের দোকান দিয়েছে দেখেছিস? দোকানের মালিকের ভাইঝি পাগল হয়ে গিয়েছে। কত লোক দাঁড়িয়ে দেখছে, আহা বেচারা

টিনের মগ হাতে গামছা পরা রতন কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এমন হবে সে তো বুঝতেই পেরেছিল। দিনের আলোয় কি রাতের স্বপ্ন থাকে? তার জীবন তেলেভাজা বিক্রি করেই কাটবে।

দোকানের সামনে বেশ ভিড়। গ্রাম্যদেশে এসব খবর বাতাসের আগে রটে যায়। নিষ্কর্মা লোকের দল ভিড় করে তামাসা দেখতে এসেছে। কার যেন প্রশ্নের উত্তরে আলতার কাকা তিনকড়ি মল্লিক বলছে—না মশাই, ও বরাবরই পাগল। বিয়েও তো দিয়েছিলাম কণ্টসৃষ্ট করে—তখন এতটা ছিল না। এখন স্বামী নেয় না, আবার এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে। কি বিপদেই যে পড়েছি! এ মেলায় দোকান করা এখানেই চুকে গেল। ও মেয়ে নিয়ে—বেঁধে রাখতে হয়েছে দেখছেন না? ছেড়ে দেবো? না মশাই, সে সম্ভব নয়। এখনি সব ভাঙচুর করবে। বাড়িই নিয়ে যেতে

হবে। দেখি কি করা—

আলতাকে বেঁধে রেখেছে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে হাতে দড়ি দিয়ে। তার চোখে অদ্ভুত উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। একটু ফাঁকা দেখে রতন সেখানে গিয়ে দাঁড়াল। চোখে চোখ পড়তেই খিলখিল করে অসংলগ্ন হাসি হেসে আলতা বলল—বলেছিলাম না কাকা বেঁধে রাখবে, কিছুতেই পালাতে দেবে না?

তারপর গলা নামিয়ে বলল আজ রাত্তিরে দেখা করবে তো? সেই কালকের জায়গায়, কেমন? দোকান দেব না আমরা দু'জনে?

সেদিন দুপুরেই আলতাকে নিয়ে দোকান গুটিয়ে চলে যায় তার কাকা। তিনদিন পরে মেলা শেষ হলে তমলুকের বাসে জিনিসপত্র নিয়ে উঠে বসে বিশু আর রতন। এবার ঘোষপাড়ায় সতীমায়ের মেলা। তারপর আড়ংঘাটা, নবাবগঞ্জ, মাহেশ। তারও পরে চরপাড়ার নন্দোৎসব—আলতা চলে যায়, পূর্ণিমা ফুরিয়ে কৃষ্ণপক্ষের রাতে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। কেবল মেলা থাকে, সামনের দিকে এগিয়ে চলা থাকে।

বাসের ছাদে জমিয়ে বসে বিশু বলল—বুঝলি রতন, সেদিন যা বলছিলাম। দোকানটা এবার বড় করতে হবে। উঠেপড়ে লাগ দিকি।

চতুষ্কোণ

॥ এক ॥

অমিতা

স্টেশনের কাছে তেমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে অমিতা সন্ধ্যেবেলার জনস্রোত দেখছিল। বিকেল পার হয়ে গেলেই তাদের এই মফঃস্বল শহরেও আর রাস্তা পার হওয়া যায় না। গাড়ির পর গাড়ি চলেছে সারি দিয়ে, তার ফাঁকে ফাঁকে রিক্সা, সাইকেল আর পায়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের ভিড়। মাঝে মাঝে এমন ভিড়ের মধ্যে পড়লে অমিতা ভাবে—আচ্ছা, এত মানুষ চলেছে কোথায়? সবারই কি খুব জরুরী কাজ আছে? মাত্র দশ বছর আগেও, যখন সে স্কুলে পড়ত পথে তো এত গাড়িঘোড়া লোকজন ছিল না? রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে সে কতদিন বাড়ির পেছনে শেয়ালের ডাক শুনেছে। তাদের বাড়ির পেছনে সেই জমিতে এখন জঙ্গল কেটে ডোবা ভরাট করে আধুনিক শপিং কমপ্লেক্স হচ্ছে। বাতাসে জোর গুজব, সেখানে ভিডিও লাইব্রেরী, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিউটি পার্লার এসব হবে। বেচারী শেয়ালের দল পালিয়েছে দেশ ছেড়ে। অবশ্য বিউটি পার্লারের ব্যাপারে অমিতার একটু ঔৎসুক্য আছে, পাড়ার রুবি বৌদি মাসে দু'বার করে কোলকাতা থেকে ফেসিয়াল করিয়ে আসে—ঠিক বয়কাট না হলেও কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা শ্যাম্পু করা চুল আর চকচকে মুখে বৌদিকে তখন ভারি সুন্দর দেখায়। এটাকে সে তত নিন্দা করার মত কিছু বলে মনে করে না। আধুনিক আবিষ্কারের সুযোগ তো সবাই নিচ্ছে, তাহলে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিজেকে আর একটু আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলে দোষ কি? খরচও এমন কিছু নয়, 'সানন্দা'য় দেখেছে—মাত্র পঞ্চাশ।

ভিড়ের মধ্যে একটু ফাঁক পেয়ে রাস্তা পার হল অমিতা। সে এখন যাবে রেল-লাইনের ওপারে গানের টিউশনিতে। আজ কিছুটা দেরি হয়ে গিয়েছে, ছ'টায়

পেঁছনোর কথা, এখন বাজে ছ'টা কুড়ি। পেঁছতে সাড়ে ছ'টা হয়ে যাবে। একটা রিক্সা নিলে ভাল হত। না থাক, না-হয় একদিন একটু দেরিই হবে। যা ছাত্রী আগ্রহ ক'রে দৌড়ে যাবার কিছু নেই। গত চারমাসে একখানা গান তুলতে পারে নি মেয়েটা। আসলে সবার গান হয় না, এরও হবে না। গলায় সুর নেই, তালের বোধ নেই, শেখবার আগ্রহ নেই। গান সবাই শেখে, তাই মেয়েটা শেখে। আর টিউশনি ছেড়ে দেবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই, তাই অমিতা শেখায়।

বরং টিউশনি না ছাড়বার যথেষ্ট কারণ আছে। সেই কারণের নাম প্রভাস। গত বছর ছাত্রীর জন্মদিনে পরিচয়। অনেক আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব এসেছিল। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, ছাত্রীর মা বললেন—অমিতা, তুমি আমাদের একটা গান শোনাও না—দু'একবার মৃদু আপত্তি করে অমিতা হারমোনিয়ম নিয়ে বসল। একঘর লোকের সামনে গান গাইতে মন্দ লাগে না। স্কুলে পড়বার সময় যখন সে গান শিখতে আরম্ভ করে, তখন তার মনে একরাশ উচ্চাশা ছিল। তার গলায় সুর আছে, এবং অনেকের চেয়েই সে ভাল গাইতে পারে একথা সে জানে। গান গেয়ে নাম করা এমন কি কঠিন? কিন্তু বছরের পর বছর কেটে যাচ্ছে, প্রোগ্রামের কনট্রাক্ট ফর্ম নিয়ে তার কাছে উদ্যোক্তারা ছুটে আসছে না। মাঝে মধ্যে এপাড়া ওপাড়ার ছোটখাটো ফাংশানে সে গান গেয়ে থাকে বটে, কিন্তু তারা টাকা দেয় না, তাদের অনুষ্ঠানের খবর কাগজেও ছাপা হয় না। বিভিন্ন দৈনিকপত্রে তার বয়েসী কত মেয়ের ছবি আর নাম বেরোয়, দেখে তার মনে—না, ঠিক ঈর্ষা নয় - একটা জ্বালা-মেশানো হতাশা জেগে ওঠে। তার হবে না? সে কি চিরদিন এই দু'পয়সার ছোট্ট মফঃস্বল শহরে চল্লিশ টাকার প্রাইভেট টিউশনি করে যাবে?

কোলকাতায় না গেলে কিছু হবার নয়। যা কিছু বড় বড় অনুষ্ঠান সব সেখানেই হয়। বড় বড় মানুষেরা—যারা অমিতাকে সত্যিকারের ভাল প্রোগ্রামে গাইবার সুযোগ দিতে পারে, কাগজে ছবি ছেপে দিতে পারে—তারাও কোলকাতাতেই থাকে। কিন্তু সেখানে কেউ তাকে চেনে না, কে তাকে ডেকে নিয়ে দেড়হাজার শ্রোতার সামনে মঞ্চে বসিয়ে দেবে? অথচ কারো কারো তো হচ্ছে, তারা কি করে সুযোগ পায়?

গান গাইতে গাইতে অমিতা দেখল নিমন্ত্রিতদের সবার পেছনে বেতের চেয়ারে বসে একটি সুদর্শন যুবক সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ছেলেটির বয়েস বছর ত্রিশেক, পরনে সাদা ট্রাউজার্স আর হাল্কা বাদামি রঙের স্পোর্টস গেঞ্জি। মুখে বিস্মিত আগ্রহ ফুটিয়ে সে অমিতার গান শুনছে। অনেক ঘরোয়া আসরে গান গেয়ে অমিতা শুকনো বাহবা আর দায়সারা প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু এই মুগ্ধতার রূপ অন্যরকম। তার বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

গান শেষ হবার পর উপস্থিত নিমন্ত্রিতরা 'বাঃ, বেশ', 'কি মিষ্টি গলা' ইত্যাদি বলতে লাগলেন—যেমন বলাটা প্রথা। কেবল পেছন থেকে সেই ছেলেটি বলল—আপনি আর একখানি গান করুন না—

অনেকেই বিরক্ত হয়ে ছেলেটির দিকে তাকাল। ভেতর-বারান্দাতে খাবার জায়গা হয়ে গিয়েছে, কলাপাতা পড়েছে, লুচির গন্ধ ভাসছে বাতাসে, খাওয়ার ডাক আসে—এমন সময় কোনো পাগল গান শুনে লুচি ঠাণ্ডা করে? অনুরোধকারী কিন্তু উদ্‌গ্রীব হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। অমিতার কাছে অন্য শ্রোতারা

মুছে গেল, আসরে একজন মাত্র প্রকৃত সমঝদার থাকলেও সেটাই পরম লাভ, গায়ক তার জন্যেই গান করে—আর সে শ্রোতা যদি যুবক এবং সুপুরুষ হয়--

খাওয়ার সময় ছেলেটি বসল অমিতার পাশে, নিজেই কায়দা করে পাশে বসার ব্যবস্থা করল কিনা কে জানে। অন্তত অমিতার তাই মনে হল। কিছুক্ষণ চুপচাপ খাবার পর ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে বলল—আপনি কিন্তু অদ্ভুত গান করেন। অন্যদের খাবার তাড়া না থাকলে আরো দু'একটা শুনতাম--

প্রশংসার মাদকতা আছে। অমিতার খিদে চলে গিয়েছিল। সে হেসে বলল—এমন আর কি, তবে আপনার ভাল লেগেছে শুনে আনন্দ পাচ্ছি--

ছেলেটির পরিচয় জানবার জন্য অমিতার কৌতূহল হচ্ছিল। বোধহয় সেটা আন্দাজ করে ছেলেটি বলল—'আমার নাম প্রভাস সেন। আপনি তো পুবালীকে গান শেখান, তাই না? আমি পুবালীর দাদার বন্ধু, দমদমে থাকি।' তারপর হেসে বলল--'এভাবে পরিচয় দিতে হলে প্রফেশনের কথা এসে যায়। আমি বাঁধা চাকরি কিছু করি না, কয়েকজন বন্ধু মিলে একটা ভিডিও ফিল্ম ইউনিট খুলেছি। প্রথম প্রথম লোকের বাড়িতে বিয়ে-বৌভাত-পৈতের ছবি তুলতাম। এখন একটা টেলি-ফিল্মের কাজ চলছে। অবশ্য কতদূর কি হবে জানি না। মাঝে মাঝে বাংলা ছবিতে অ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টারের কাজ করি'—

অমিতার নাকে মাদকতাময় ফুলের গন্ধ ভেসে এল। প্রভাস সেই জগতের মানুষ যেখানে সে পেঁছিতে চায়। সেই রোমাঞ্চকর স্বপ্নের জগতের কথাই সে বলছে। একটা লুচিই অমিতা বহুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চলল।

—আপনি কি এখনও গান শেখেন? না শুধুই শেখান?

- শিখি। শনিবার বিকেলে কোলকাতা যাই ক্লাস করতে।

- তাই নাকি? কোথায় শেখেন?

অমিতা ঠিকানা বলল। প্রভাস বলল—আপনি গান ছাড়বেন না। সত্যি বলছি, কাজের সূত্রে আমাকে অনেক অভিনেতা আর গায়কের সংস্পর্শে আসতে হয়, কত ছেলেমেয়ে এসে সিনেমায় নামতে চায় আর প্লেব্যাক করতে চায়। তাদের বেশির ভাগেরই না আছে গলায় সুর, না আছে অভিনয়ের প্রতিভা। এই এখানে আপনার মত একজনকে দেখতে পাবো আশাই করি নি—

সমস্তই অমিতার মনের কথা। ঠিক এমন একজন লোকের অপেক্ষাতেই সে ছিল যে তাকে চিনতে পারবে, এগিয়ে দিতে পারবে খ্যাতির পথে।

অবশ্য পরেরটা নিতান্তই আকাশকুসুম। তবু প্রভাস তার প্রশংসা তো করেছে, তাই বা কি কম?

পরের শনিবার গান শিখে বেরুতে সন্ধ্যে সাতটা হয়ে গেল। এক্ষুণি বাস পেয়ে গেলে শেয়ালদা থেকে সাতটা চল্লিশের লোকালটা ধরতে পারবে। গলি থেকে বেরিয়ে দু'পা হাঁটলেই বাস-স্টপ, গানের খাতা আর ভ্যানিটি ব্যাগ আঁকড়ে ধরে অমিতা দ্রুতপায়ে বাস ধরার জন্য এগুলো।

গলির ঠিক মুখে পেঁছিতেই কার গলা—নমস্কার। চিনতে পারছেন?

বুকের মধ্যে রক্ত ঢেউ খেলে ওঠে। প্রভাস সেন!

আড়ষ্ট গলায় অমিতা বলল—আপনি! আপনি এখানে কি করে—

প্রভাস হেসে বলল—একটু কাজে এদিকে এসেছিলাম, হঠাৎ দেখা হয়ে

গিয়েছে বলতে পারলে দোষ কেটে যেত, কিন্তু আমি নির্বিকার মুখে মিথ্যে কথা বলতে পারি না। আপনি রাগ করুন আর যাই করুন, সত্যি কথা এই যে, আপনার সঙ্গে দেখা করব বলেই আধ ঘণ্টা আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

কে জানে সত্যের চেহারা কেমন, কিন্তু মিথ্যেও যদি এমন মধুময় হয় তাতে অমিতার আপত্তি নেই। সে মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ মেয়ে, প্রভাসের মত ছেলে—যে শহরের কত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে অহরহ দেখছে—তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারাটা অমিতার পক্ষে গৌরবের কথা বই কি।

– আপনি তো শেয়ালদা থেকে ট্রেন ধরবেন? চলুন, আমিও দমদম পর্যন্ত আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে যাই, আপনার আপত্তি নেই তো? আপত্তি করবেন না। দেখুন, কতক্ষণ থেকে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছি—

কিছু কিছু লোকের অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করার অদ্ভুত দক্ষতা থাকে। সন্ধ্যের কোলকাতায় দেড় মিনিটের মধ্যে প্রভাস কি করে একটা খালি ট্যাক্সি জোগাড় করে ফেলল, বলল—উঠুন।

প্রায় অচেনা একজন যুবকের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে সংকোচ বোধ হচ্ছিল অমিতার। প্রভাস তাড়া দিল—কি হল, উঠে পড়ুন, আমি দরজা ধরে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকব বুঝি?

কেউ কেউ সর্বনাশের নেশামাখানো মোহন হাসি হাসতে পারে, যা দেখে অথৈ জলে ঝাঁপ দিতেও দ্বিধা হয় না। প্রভাস সেই হাসি হাসল।

ট্যাক্সিতে উঠে বসল অমিতা। পাশেই ভদ্র দূরত্ব রেখে প্রভাস। তার গা থেকে হাল্কা সুগন্ধ ভেসে আসছে, গন্ধটা পুরুষমানুষের কথা মনে এনে দেয়। বিজ্ঞাপনে দেখেছে আজকাল বিশেষ করে পুরুষদের জন্য নানারকম পাউডার আর সেণ্ট বেরিয়েছে। তেমন কিছু মেখেছে নাকি প্রভাস? জোরালো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের কাছে থাকলে তার মত অনভিজ্ঞা, অল্পবয়সী মেয়ের যে আত্মসমর্পণের ভাব আসা সম্ভব, সেই মুগ্ধতা অমিতাকে একটু একটু করে গ্রাস করছিল।

শেয়ালদায় নেমে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিল প্রভাস। অমিতা লক্ষ্য করল তার মানিব্যাগ অনেকগুলো একশো আর পঞ্চাশ টাকার নোটে ফুলে আছে। নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে ব্যাগটা আবার পকেটে রেখে প্রভাস বলল—কিছু খাবেন? খিদে পেয়েছে নিশ্চয়?

–নাঃ। এই সময় আমি কিছু খাই না—

—আজ আমার অনুরোধে কিছু খান। আচ্ছা, বেশি কিছু নয়, চলুন ওই স্ন্যাক বারে দাঁড়িয়ে চিকেন প্যাটিস্ আর কফি খাওয়া যাক—

কেমন একটা ব্যক্তিত্ব আছে প্রভাসের, তার অনুরোধ এড়ানো বড় মুশকিল। অমিতা বলল—আচ্ছা, চলুন।

কফিতে চুমুক দিয়ে প্রভাস বলল—আসলে একটা কাজের অ্যাডভান্স হিসেবে আজ বেশ অনেকগুলো টাকা পেয়ে গিয়েছি। ইচ্ছে করছে ট্যাক্সি করে খুব খানিকটা ঘুরে বেড়াই, কিম্বা কোনো ভাল হোটেলে ঢুকে পেটভরে ভালমন্দ খাই। কিন্তু এগুলো বন্ধু ছাড়া একা ভাল লাগে না। আমার তেমন কোনো বন্ধু নেই—

—কিন্তু আপনি যে কাজ করেন তাতে তো অনেক বন্ধু পাওয়ার কথা—

—ভুল কথা। এ লাইনে বড্ড রেষারেষি, কে কাকে ছাড়িয়ে উঠে যেতে পারবে

সবাই সেই চেষ্টায় ব্যস্ত। আমাকে কেউ ভালবাসে না, সবাই ঈর্ষা করে—

প্রভাসের গলায় প্রকৃত বিষণ্ণতার সুর। অমিতা বলল—সে কি! আপনার মত হাসিখুশি লোককে কেউ ঈর্ষা করতে পারে?

প্রভাস মৃদু হেসে চুপ করে রইল।

—উত্তর দিলেন না?

—সত্যি উত্তরটা যা, সেটা নিজের মুখে বলা ভাল দেখায় না। খুব সামান্য অবস্থা থেকে যুদ্ধ করতে করতে এখানে এসে পেঁৗছেছি। ভাল কাজ শেখায় এখন সবাই আমাকে চায়, সেটা বন্ধুদের সহ্য হবে কেন বলুন?

হঠাৎ অমিতা বলে ফেলল—আপনার কি সত্যিই একজন বন্ধু চাই?

বলেই তার মুখ লাল হয়ে উঠল। এঃ, কথাটা কি বিচ্ছিরি শোনাল! প্রভাস হয়ত ভাবতে পারে সে ইচ্ছে করে কোনো ইঙ্গিত করতে চেয়েছে।

প্রভাস কিন্তু উত্তর না দিয়ে কেমন অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই প্রথম দিন। তারপর প্রায় প্রতি সপ্তাহেই প্রভাস এসে দাঁড়িয়ে থাকে গানের স্কুলের গলির মোড়ে। এখন তারা পরস্পরকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে। প্রথাগত ভাবে কেউ কাউকে প্রেম নিবেদন করে নি, কিন্তু দু'জনেই মনে মনে বুঝেছে দু'জনের মনের কথা। একদিন অমিতা বলল—শোনো, তুমি অমনভাবে আর গলির মুখে দাঁড়াবে না। আমার বন্ধুরা সঙ্গে থাকে। গত শনিবার একজন মেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল তোমার কথা—

প্রভাস হেসে বলল ভালই তো। তারও বোধহয় আমাকে পছন্দ হয়েছে -

– বোকো না।

প্রভাস হাসতেই লাগল।

সুখের দিনগুলো নৌকোর মত জীবননদীতে সাদা পাল তুলে কেমন তরতর করে চলে যায়। উপযুক্ত বয়েসে সঙ্গী খুঁজে পাবার উন্মাদনা, প্রভাসের অবশ করে দেওয়া হাসি, তার গা থেকে ভেসে আসা পুরুষালি সুঘ্রাণ– সব মিলিয়ে অবিশ্বাস্য স্বপ্নের মত। এতদূর ভেসে গিয়েছিল অমিতা যে, শনিবারগুলোতে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে চিরপরিচিত সংসারটা কেমন নোংরা নোংরা লাগত। গামছায় কাপড়ে তোরঙ্গে বাক্সে মাদুরে মিলিয়ে কেমন ভ্যাপসা গন্ধ। তারপরেই মনে মনে জিভ কাটতো অমিতা ছিঃ, নিজের বাড়ি সম্বন্ধে এরকম ভাবতে নেই। ছোটবেলা থেকে এই পরিবেশেই সে বড় হয়েছে, আজ হঠাৎ তার মন এত বদলে গেল কেন?

মনকে ধমক দেওয়া যায়, কিন্তু তার গতিকে সহজে মোড় ফেরানো যায় না। সময় যাবার সঙ্গে সঙ্গে অমিতা নিজের বাড়িতে নিজেকে আগন্তুক বলে মনে করতে শুরু করল। কয়েকদিনের জন্য যেন সে এখানে বাস করতে এসেছিল, এবার সে নিজের আসল জায়গায় ফিরে যাবে। সেখানে তার প্রকৃত আপনজন রয়েছে।

মনের এমন অবস্থায় শুধু শনিবারে কুলোয় না। প্রভাস ছেলেমানুষের মত করত—না, তোমাকে আসতেই হবে অমিতা। এই দেখ ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে রেখেছি—তোমার তো দুপুরের শো ছাড়া চলবে না। ফিল্মের নাম দেখেছ? লাভ স্টোরি। তোমার-আমার গল্প—

আসতেই হত অমিতাকে। ঠাণ্ডা, অন্ধকার সিনেমা হল, হাতের ওপর

প্রভাসের হাতের উষ্ণ ছোঁয়া—কখন যেন পর্দার গল্পের সঙ্গে নিজের জীবনটা মিলেমিশে এক হয়ে যায়। সিনেমার পর কোনোদিন অ্যাম্বার কোনোদিন স্কাই রুমে আশ্চর্য সব খাবার খাওয়া। মেনু পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল অমিতা, একটা খাবারের নামও যদি সে আগে কখনো শুনে থাকে! চারদিকে কেমন স্বপ্নিল আলো, কোথা থেকে চাপা বাজনার আওয়াজ ভেসে আসছে, পায়ের নিচে নরম কার্পেট—জোরে কথা বলতে ভয় হয়, জোরে শব্দ হলে এই স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

কাবলি নান আর প্রন্ ইন ক্রিম সস্ খেতে খেতে একদিন প্রভাস বলল—অমিতা, তুমি প্রফেশনাল হও না কেন?

একটু অবাক হয়ে অমিতা বলল—তার মানে?

—মানে, তোমার এখন বাইরের প্রোগ্রাম নেওয়া উচিত, গান গেয়ে তোমার টাকা পাওয়া উচিত। সব কিছুই তো দাম দিয়ে পেতে হয়, তোমার গানই বা লোকে বিনা পয়সায় শুনবে কেন? শোনো অমিতা, তোমার মধ্যে প্রতিভা আছে, অবহেলা করে তাকে নষ্ট হতে দিও না—

প্রভাস ঠিক মনের কথাগুলো বলে। প্রতিভা অবশ্য অনেক বড় কথা, তবে সুযোগ পেলে সে কারো চেয়ে খারাপ গাইবে না এ বিশ্বাস অমিতার আছে। আসল ব্যাপার হল, সে সুযোগ তাকে দিচ্ছে কে?

সত্যিই কি প্রভাস মনের কথাগুলো টের পায়? সে বলল—তুমি হয়ত ভাবছ প্রফেশনাল হতে বলা সোজা, কিন্তু প্রোগ্রাম দিচ্ছে কে? ধরো যদি আমি যোগাযোগ করে দিই তাহলে কি তুমি রাজি হবে?

এরই অপেক্ষায় অমিতা ছিল, ইংরেজিতে একেই বলে লাকি ব্রেক। তবু সে প্রথমেই 'হ্যাঁ' বলল না। অনেক কিছু ভাববার আছে, মা-বাবা কেউই মেয়ের বেশিক্ষণ বাইরে থাকা পছন্দ করেন না। দূরে ফাংশান হলে অনুমতি পাওয়া কঠিন হবে। এমনিতেই রাজি হন কিনা সন্দেহ। প্রভাসকে সে বলল কথাটা।

—আমি তোমাকে একটা বুদ্ধি দিতে পারি, যদি কিছু মনে না কর—

—কি?

—মা-বাবাকে জানানোটা এখন কি একান্তই দরকার? ছাত্রীর বাড়ি নেমন্তন্ন বা কোনো বান্ধবীর সঙ্গে কোথাও যাচ্ছ এমন কিছু বললেও তো চলে। তারপর যদি একটু নাম করতে পার—আমার বিশ্বাস তুমি তা পারবে—তখন মা-বাবা জানতে পারলে খুশিই হবেন।

সবই ঠিক, তবু মধ্যবিত্ত সংশয় আর দ্বিধা কাটতে চায় না।

পরের সপ্তাহেই স্কুল থেকে বেরিয়ে গলির মোড়ে প্রভাসের সঙ্গে দেখা। অমিতা বলল—আবার এখানে এসেছ? বলেছি না বন্ধুরা হাসাহাসি করে—

—উপায় ছিল না, তাড়াতাড়ি তোমাকে একটা খবর দেওয়া দরকার, তাই চলেই এলাম। কাল একটা প্রোগ্রাম করতে পারবে?

উত্তেজনা চেপে রেখে অমিতা বলল—কোথায়?

—কোলকাতাতেই। খুব বড় কিছু নয়, পাড়ার ছেলেরা মিলে করছে, বাইরের একজন আর্টিস্ট চায়। যাবে?

অমিতা ইতস্তত করতে লাগল।—একটু ভেবে দেখি।

—ভাববার সময় নেই। কাল সন্ধ্যেবেলা প্রোগ্রাম, তুমি রাজি হলে আমি

এখুনি গিয়ে তাদের জানাবো। নইলে তারা অন্য লোক খুঁজবে। তোমার মতামত এখনই বলতে হবে—

অমিতা বলল—যাবো।

খুশি হয়ে প্রভাস বলল—তারা অবশ্য বেশি টাকা দিতে পারবে না, তবে সেজন্য কোনো দুঃখ কোরো না, প্রথমদিকে যে যা দেয় নিয়ে নাও, পরে নাম বেরিয়ে গেলে নিজেই ফি ডিক্টেট করতে পারবে–

পরের দিন মধ্য কোলকাতার একটা গলির মধ্যে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পাঁচখানা গান গাইল অমিতা। সামনে চটের ওপর গোটা পঞ্চাশেক ছোট ছোট কোলাহলরত বাচ্চা ছেলেমেয়ে, পেছনে কয়েক সারি চেয়ারে শ'খানেক পাড়ার ভদ্রলোক। উভয় দলই গানের সমান বোদ্ধা। এদের সামনে কি গান করবে অমিতা? তবু ক্লাবের ছেলেদের ব্যবহার ভাল লাগল। ট্যাক্সি থেকে সে আর প্রভাস নামতেই তারা দৌড়ে এসে ক্লাবের ঘরে নিয়ে বসালো। জানালা আর দরজায় উৎসুক চোখের চাহনি। ফিসফিস কথা -আর্টিস্ট এসে গিয়েছে। শুনলেও ভাল লাগে।

কেউ বুঝুক না বুঝুক, গানের শেষে সবাই হাততালি দিল। এসব অমিতার কাছে নতুন জিনিস, বেরিয়ে আসার সময় তার মাথার ভেতরটা কেমন হাল্কা হাল্কা লাগছিল। ক্লাবের ছেলেরাই ট্যাক্সি ধরে দিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে অমিতার দিকে বাড়িয়ে ধরল প্রভাস নাও, ধরো। তোমার আজকের উপার্জন। দুশো আছে। ধরো -

হাতে করে টাকাটা নিতে লজ্জা করছিল, কিন্তু নেবার পর অদ্ভুত উন্মাদনা! আধঘন্টা গান করে পাঁচটা টিউশনির সারা মাসের টাকা।

তারপর আর একটা। তারপর আরও। কখনো সোদপুর, কখনো পলতা, কখনো বাঘা যতীন। দক্ষিণা কখনো দুশো, কখনো আড়াইশো। এভাবে চালানোর দুটো বড় অসুবিধে রয়েছে– প্রথমত, নিজের সৌভাগ্যের কথা কারুকে বলা যায় না -এবং যা না করতে পারলে সবটাই বৃথা। গোপন খ্যাতি বলে কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, উপার্জন করা টাকাগুলো দিয়ে কিছু করা যাচ্ছে না। প্রায় এক হাজার টাকা জমেছে মোটমাট, এর অর্ধেক বাবা আর অর্ধেক মাকে দিতে ইচ্ছে করছে। সামান্য পেনশন আর একতলার ভাড়া দিয়ে কষ্ট করে বাবাকে সংসার চালাতে হয়, হঠাৎ এই টাকাটা পেলে এবং মাঝে মাঝেই পেতে থাকলে কত সুবিধে হত। কিন্তু প্রথমে কিছু বলা হয় নি, মিথ্যে অজুহাতে বাইরে থাকার অনুমতি আদায় করা হয়েছে। এখন সব ভেঙে বলা খুব অসুবিধাজনক। বরং আরো কিছুদিন যাক, দাদা আসবার কথা আছে আমেরিকা থেকে—তখন সবার মন-মেজাজ ভাল থাকবে। দাদাকে দিয়েই বলানো যাবে কথাটা।

দাদাও যেন আজকাল কেমন হয়ে গিয়েছে। প্রথম প্রথম বাড়িতে কত চিঠি লিখত, সবার খোঁজখবর করত। চার বছর আগে যখন শেষবার এসেছিল, সবার জন্য কতরকমের সুন্দর সুন্দর জিনিস নিয়ে এসেছিল। বাবাকেও মোটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল সেকথা অমিতা জানে। সময় যাবার সঙ্গে সঙ্গে চিঠির সংখ্যা কমে এসেছে, অনেকদিন খবর না পেয়ে বাবা নিতান্ত ব্যস্ত হয়ে চিঠি দিলে হয়ত একটা দায়সারা উত্তর আসে। অমিতার বন্ধু উত্তরার বাড়িতেও ঠিক একই সমস্যা, তার দাদাও আমেরিকা যাবার পর আর বাড়ির সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখে না।

আচ্ছা, ও দেশটা কি সোনা দিয়ে তৈরি ? এতই চোখ ধাঁধিয়ে যায় যে পেছনে ফেলে আসা সব ভুলে যেতে পারা যায় ? সামনের মাসে দাদা আসছে, দেখা যাক বদলেছে কিনা, বদলালে কতটা বদলালো।

কিন্তু পারিবারিক সমস্যার চেয়ে তার ব্যক্তিগত সমস্যা এখন জটিলতর। সমস্যার শুরু মাস দুই আগে, যেদিন প্রভাস তাকে জিজ্ঞাসা করল অমিতা বেথুয়াডহরি যেতে পারবে একটা প্রোগ্রামে ? ভাল টাকা দেবে

–কবে ?

সামনের রবিবার। যাবে ?

অমিতা বলল–কিন্তু বেথুয়াডহরি তো অনেক দূরে, ফাংশান করে ফেরা যাবে ?

প্রভাস একটু ইতস্তত করে উত্তর দিল—সেটাই হয়েছে মুশকিল। ওদের ফাংশান আরম্ভই হবে রাত ন'টায়, চলবে সারারাত। তোমার প্রোগ্রাম দেবে হয়ত রাত দেড়টা কি দুটোয়। কাজেই ফেরার প্রশ্ন ওঠে না। আমিও ভাবছিলাম তুমি রাজি হবে কিনা—

স্বাধীনতার একটা সীমা আছে, কোথাও না কোথাও থামতেই হয়। অমিতা অনেকদূর এগিয়েছে, এবার রাশ টানবার পালা। সে বলল না, রাত্তিরে বাইরে থাকা অসম্ভব। বাবা-মা কখনোই রাজি হবেন না।

প্রভাস স্বাভাবিকভাবেই বলল—সে তো ঠিকই, আমিও তাই ভেবেছিলাম। থাকগে তাহলে। জানতাম তুমি যেতে পারবে না, তবু গোপাল ঠাকুরকে বলেছিলাম, কারণ এরা বেশ বড় অনুষ্ঠানই করে—প্রতি বছর অনুষ্ঠানের খবর কাগজে ছাপা হয়। পাঁচশো টাকাও দেবে—যাতায়াতের খরচ বাদে। একটা বড় সুযোগ ছিল। যাকগে—

গোলাপী স্বপ্নের মোহ এড়ানো বড় কঠিন। অমিতা বলল পরশু আমি একবার কোলকাতায় আসবো, তুমি সেদিন কোথাও দেখা করতে পারবে ? এর মধ্যে একটু ভেবে দেখি—

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অমিতা বলল—একটা কথা বলব ?

অমিতার গলার স্বরে অবাক হয়ে প্রভাস বলল—কি ?

–এ কথাটা আমার নয়, তোমারই বলা উচিত ছিল। তুমি দেরি করছ বলে আমাকেই এগিয়ে আসতে হচ্ছে। একটা ব্যাপারে আমরা বোধহয় একটু ভুল করছি।

—কি ভুল অমিতা ?

—অনেকদিন আমরা মেলামেশা করছি, এবার বোধহয় আমার বাবার সঙ্গে তোমার কথা বলা উচিত। এরকম সান্নিধ্যের তো একটাই স্বাভাবিক পরিণতি থাকে, তাই না ?

প্রভাস হেসে বলল—এই কথা ! কিছুদিনের মধ্যেই তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলব এখন। তবে আমাকে মাস ছয়েক সময় দিতে হবে, কোম্পানিটা আর একটু সলিড ফুটিং পাক, তারপর। ঠিকই, এমন লুকিয়ে দেখা করে আর কতদিন চলে। বিয়েটা হয়ে গেলে তোমারও আর প্রোগ্রাম করতে গেলে কারো অনুমতি নিতে হবে না। কি বলো ?

অমিতা হাসলো।

—দেখ, যদি রবিবার যেতে পারো তাহলে ভাল হয়। থাকার অসুবিধে হবে না, ওরা ডাকবাংলো বুক করে রেখেছে আর্টিস্টদের জন্য। আর—আর আমি তো থাকবো তোমার সঙ্গে। ভয় কি?

অমিতা রাজি হল। বাড়িতে জানালো—কোলকাতায় এক বন্ধুর বিয়ে, বাসরে রাত জেগে গান গাইতে হবে। অনেক করে ধরেছে, উপায় নেই।

সমস্যার শুরু হল এভাবেই।

গান শেষ করে রাত আড়াইটেয় যখন ডাকবাংলোয় এলো অমিতা। তখন অন্য শিল্পীরা আসরে। পুরো ডাকবাংলোয় কেবল সে আর প্রভাস। ক'মাস পরেই প্রভাস তার স্বামী হবে, তবু মন কেমন সায় দেয় না। প্রভাস কিন্তু সহজ, স্বচ্ছন্দ। অমিতার ঘরে তাকে পৌঁছে দিয়ে পকেট থেকে দশ টাকার একটা বেশ মোটা বাণ্ডিল বের করে এগিয়ে ধরল প্রভাস এই নাও, তোমার আজকের উপার্জন। সত্যি অমিতা, আর কিছুদিন পরে তুমি তো আমার থেকে বেশি রোজগার করতে শুরু করবে। কি মজাই লাগছে। সামনের শনিবার খাওয়াতে হবে কিন্তু, কেমন?

খুশির চোটে খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল প্রভাস, হাত দিয়ে পাশের জায়গাটা দেখিয়ে বলল -এখানে একটু বোসো না

না, ছিঃ। তুমি নিজের ঘরে যাও—

—বা রে, একটু বসলে কি হয়েছে? তুমি তো আমার বৌ

প্রভাসের মধ্যে একটা হাল্কা ছেলেমানুষি আছে, সঙ্গে সেই অবশ করে দেওয়া হাসি—যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায় না। অমিতা তার পাশে গিয়ে বসল। তার দিকে কাত হয়ে হাতের ওপর মাথা রাখল প্রভাস, স্থির চোখে একটু তাকিয়ে বলল—তুমি আমাকে ঠিকঠাক বিশ্বাস কর না, না?

প্রত্যাসন্ন বিপর্যয় মানুষ বোধহয় আগে থেকে আন্দাজ করতে পারে। প্রভাসের দৃষ্টির সামনে তার বুকের ভেতরে কেমন করে উঠল। তবু সে সহজ স্বরে বলবার চেষ্টা করল—কেন তুমি একথা বলছ? বিশ্বাস না করলে তোমার সঙ্গে আমি এখানে আসতাম?

—বিশ্বাস কর তাহলে?

—নিশ্চয়।

মুখটা সামান্য তুলে প্রভাস বলল—প্রমাণ দাও।

এই রাতটার কথা গত দু'মাস অনেক ভেবেছে অমিতা। নিজের কৃতকর্মের জন্য মানুষ সব সময় বোধহয় দায়ী থাকে না। অমিতা খুব একটা হাল্কা বা প্রচলিত অর্থে সুলভ মেয়ে নয়, তবু সে রাতের মাদকতাময় নির্জনতা নিভৃত অবসরের সুযোগ—সবচেয়ে বড় কথা–অপরিণামদর্শী যৌবন, সমস্ত মিলিয়ে তাকে বাস্তব পৃথিবীটা ভুলিয়ে দিল।

পরের দিন সকালে রিক্সা করে স্টেশনে আসার পথে প্রভাস ফিসফিস করে বলল—কালকের ব্যাপারটার জন্য তুমি মনে কোনো দ্বিধা রেখো না। আমি কিন্তু প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই আমার স্ত্রী হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করেছি, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানটাই যা বাকি। আমাদের ঘনিষ্ঠতা কোনোভাবেই পাপ নয়—

পাপ না হতে পারে, কিন্তু এ ধরনের ঘনিষ্ঠতা গুরুতর ব্যক্তিগত সমস্যার জন্ম দিতে পারে। তবু এর একটা নেশা আছে, সর্বনাশা ঘূর্ণিতে পড়লে একেবারে অতলে না পৌঁছনো পর্যন্ত থামা যায় না। মাসখানেকের মধ্যে আরো দু'-তিনটে রাত্তিরের ফাংশানে গাইলো অমিতা। প্রভাসের কে এক বন্ধু দিল্লী বেড়াতে গেছে, তার ফাঁকা ফ্ল্যাটে একটা দুপুরও কাটালো দু'জনে।

হঠাৎই এক শনিবার প্রভাস এল না। গানের স্কুল থেকে বেরিয়ে অমিতা দেখল গলির মোড়ের পরিচিত জায়গাতে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। বুধবার বিকেলে লাইট হাউস সিনেমার উল্টোদিকে বইয়ের দোকানটার সামনে দেখা হয়ে আসছে বরাবর। সেখানেও কেউ নেই বুধবার। পরের শনিবারও নয়। কি হল প্রভাসের?

এতদিন মনে হয় নি, এখন অকস্মাৎ খেয়াল হল—প্রভাসের বাড়ির ঠিকানা সে জানে না। নিয়মিত দেখা হওয়াটা এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে, ঠিকানা নেবার কথা কখনো মাথায় আসে নি। বাড়ির ঠিকানা তো দূরের কথা, প্রভাসের সঙ্গে হঠাৎ দরকার পড়লে কোলকাতায় কোথায় যোগাযোগ করা সম্ভব তাও সে জেনে রাখে নি। খুব ভুল হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয় অসুখ-বিসুখ হয়েছে বেচারার। কিন্তু এতদিন? তার যে খুব জরুরী দরকার প্রভাসের সঙ্গে।

কোলকাতায় প্রথম যে ক্লাবে প্রভাস তাকে গাইতে নিয়ে গিয়েছিল, একদিন বিকেলে সেখানে গেল অমিতা। কয়েকজন ছেলে ক্যারাম খেলছিল, তারা চিনতে পারল অমিতাকে।—দিদি যে! কি খবর? ভাল আছেন?

—হ্যাঁ ভাই, একটু দরকারে এসেছিলাম—একটা খবরের জন্য। আচ্ছা, প্রভাসবাবুর ঠিকানাটা আপনারা কেউ জানেন কি?

—প্রভাসবাবু?

—যাঁর সঙ্গে আমি প্রোগ্রাম করতে এসেছিলাম।

ছেলেটি বিস্মিত হয়ে বলল—ওঁর ঠিকানা তো জানি না, মাঝে মাঝে ফাংশানের ব্যাপারে আমাদের ক্লাবে আসতেন—এই পর্যন্ত।

—কিভাবে ঠিকানাটা জোগাড় করা যায় বলতে পারেন?

—না দিদি। আমরা তো ওঁকে ভাল চিনি না। দু'-একবার দেখেছি মাত্র—

প্রথমদিকে অমিতা উদ্বিগ্ন হয়েছিল প্রভাসের অসুখ হয়েছে মনে করে। কিন্তু প্রায় একমাস কেটে যেতে বিশ্রী একটা সন্দেহ তার দানা বাঁধতে শুরু করল। প্রভাসের তো জানা উচিত অমিতা কতখানি ব্যস্ত হবে। অসুখ হলেও কি একখানা পোস্টকার্ডে দু'লাইন লিখে দেওয়া যেত না? কাউকে দিয়ে খবরও তো পাঠাতে পারত। নাঃ, কোলকাতার বুক থেকে যেন উবে গিয়েছে প্রভাস। এমন একটাও সূত্র নেই যা ধরে তার কাছে পৌঁছনো যায়।

আজ যখন সে টিউশানিতে বের হচ্ছে, বাবা ডাকলেন—শোনো।

—কিছু বলছ বাবা?

—বেরুচ্ছ দেখছি। কখন ফিরবে?

ঢোঁক গিলে অমিতা বলল—এখুনি ফিরবো বাবা, আটটার মধ্যে—

কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে থেকে ভূপতি বললেন—ইদানীং তুমি বড্ড বাইরে বাইরে থাকো। মাঝে তো দু'জন বন্ধুর বিয়েতে রাত্তিরেও ফেরো নি। এসব ভাল নয়। তুমি বড় হয়েছ, বোঝবার বয়েস হয়েছে,

আমি আর বেশি কি বলব ? কিন্তু এ নিয়ে কথা রটলে তোমার বিয়ে দেওয়া কঠিন হবে সেটা নিশ্চয় বোঝো ? বিয়ের কথাও না-হয় বাদ দেওয়া গেল, ব্যক্তিগত চরিত্রের ওপর কালো দাগ পড়াও তো খুবই দুঃখজনক। বাবা হিসেবে আমার উচিত তোমাকে সাবধান করে দেওয়া। এখন তুমি যা ভাল বোঝো—

ভূপতির কথায় অমিতার মনের তলায় লুকিয়ে থাকা ভয়—যেটা সে নানা যুক্তি এবং আশাবাদী কল্পনা দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টা করছিল—বেরিয়ে এল কালো মুখোশ পরে।

বাবা, তুমি আমাকে আরো আগে সাবধান করলে না কেন ?

এই পৃথিবীতে, এই মুহূর্তে নিশ্চয় কোথাও প্রভাস রয়েছে। কেবল তার সঙ্গে দেখা হবার কোনো উপায় অমিতার জানা নেই। রূপকথার সেই মায়া-আয়না একটা যদি সে পেত, যার সামনে দাঁড়িয়ে তার ভেতরে যাকে ইচ্ছে দেখতে পাওয়া যায়।

আর তার সন্দেহটা যদি সত্য হয়, তাহলে দেখা হয়েই বা কি লাভ ? কারো কোনো দোষ নেই, কোনো দায়িত্ব নেই—ভুল সে নিজে করেছে। যত সুদূরপ্রসারী হোক, এর ফল তাকে একা ভোগ করতে হবে।

একটু ক্ষীণ আশা জেগেই থাকে, কিছুতেই মুছে যেতে চায় না। হয়ত বাইরে চলে যেতে হয়েছে হঠাৎ, অথবা ঘটেছে অভাবনীয় কিছু দেখা হলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। আবার সূর্য উঠবে।

একবার—মাত্র একবার প্রভাসকে অমিতার বড় দরকার।

॥ দুই ॥

ভূপতি

জোর বাতাস দিচ্ছে আজ সকাল থেকেই। এলোমেলো দমকা বাতাসে ভূপতির ধুতির কোঁচা উড়ে যাচ্ছে, পাঞ্জাবি ফুলে উঠছে বিচিত্র আকার নিয়ে। লোহার রেলিংটা শক্ত করে ধরে ভূপতি দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একটু আগে ওপাশের স্পীকারে ঘোষণা হয়েছে—দশ মিনিটের ভেতর নামবে বোম্বের ফ্লাইট। আজ তিন বছর পর ভূপতি দেখবেন ছেলেকে, আজ তো আনন্দ হবার কথা, কিন্তু চোখে কেবল জল আসছে কেন কে জানে !

স্নেহ নিম্নগামী। তিনি ছেলের জন্য যতটা ভাবেন, না দেখতে পেলে মন যতটা খারাপ হয়, অজয়ের তা হবার কথা নয়। সে সবে জীবন শুরু করেছে, সামনে কত স্বপ্ন, রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চের প্রতিশ্রুতি। বাবাকে সে নিশ্চয় ভালবাসে, মাকেও। কিন্তু দিন মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার, বিভিন্ন প্রয়োজনে ভাগ করে দিতে দিতে তাঁদের বেলা আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তা হোক, ছেলে ভাল থাক। সে আনন্দে থাক। তার আরো উন্নতি হোক।

তাঁর আশেপাশে আরো কয়েকজন অপেক্ষা করছে বোম্বে ফ্লাইটের। তারা এবার আঙুল তুলে দিগন্তের দিকে কি দেখাচ্ছে। ভূপতি তাকিয়ে দেখলেন দূর আকাশে একটা কালো বিন্দু ক্রমেই বড় হচ্ছে। দেখতে দেখতে অবিশ্বাস্য গতিতে সেটা কাছে এসে একটা বিরাট এরোপ্লেন হয়ে গেল—ল্যাজে আর গায়ে সাদার

ওপর আগুন রঙের রেখা টানা। আর কিছুক্ষণ বাদেই অজয়কে তিনি দেখতে পাবেন।

দশ মিনিট কেটে গেল, পনেরো মিনিট। বাব্বাঃ, এরোপ্লেন থেকে নামতে এত সময় লাগে! হ্যাঁ, ওই যে এবার যাত্রীরা বেরোতে আরম্ভ করেছে। ওই আসছে অজয়। প্রথমে যেন নিজের ছেলেকেই চিনতে অসুবিধে হয়। তিন বছর আগে শেষ দেখেছেন, এর মধ্যেই যেন আরো বদলে গিয়েছে। ফর্সা রঙ, মাথায় ঢেউ খেলানো একরাশ চুল, ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ। চমৎকার ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে তাঁর দিকে, তাঁকে দেখতে পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল। অজয় তখন একবছর ক'মাসের, সবে হাঁটতে শিখছে। টেবিলের পায়া ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে একটু সরে গিয়ে ভূপতি ডাকতেন—আয় আয় খোকা, চলে আয় দেখি কেমন পারিস--অমনি টলমল পায়ে খোকা রওনা দিত। পেঁছে বাবাকে ধরে ফেলতে পারলে কি হাসি! সবে তখন চারখানা দাঁত উঠেছে খোকার। সেই তাঁর ছোট্ট খোকা কেমন সুন্দর দেখতে হয়েছে! সগর্বে একবার চারদিকে তাকালেন ভূপতি।

অজয় এসে বাবাকে প্রণাম করল।—ভাল আছ বাবা? তুমি কষ্ট করে এতদূর আসতে গেলে কেন? আমি তো একাই চলে যেতে পারতাম। তোমার শরীর ভাল নয়—

ভূপতির গলার কাছে কি একটা আটকে যাচ্ছে, ছেলের হাত ধরে তিনি কি বললেন ভাল বোঝা গেল না।

—তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ব্যাগেজ কালেক্ট করে নিই, তারপর ট্যাক্সি নেওয়া যাবে। তুমি কিসে এসেছ, ট্যাক্সিতে?

ভূপতি দু'বার বাস বদল করে এসেছেন, সেকথা ছেলেকে বলতে কেমন সঙ্কোচ হল। তিনি চুপ করে রইলেন।

বাড়ি আসার পথে অজয় স্বাভাবিকভাবে ভূপতির সঙ্গে কথা বলতে লাগল, যেন রোজই দু'জনের দেখা হয়। অজয়ের জামার বুকপকেট থেকে বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট উঁকি দিচ্ছে—খেয়াল করে নি বোধহয়। ভূপতি যতটা সম্ভব সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখলেন। কোথায় মনের ভেতরে একটা কষ্টের খোঁচা বিঁধছে, তিনি ছেলেকে দেখে যতখানি উচ্ছ্বসিত, সে তুলনায় অজয় শান্ত—আবেগহীন। বদলটা ভাষায় বলা কঠিন, কিন্তু বোঝা যায়।

অজয়ের ব্যবহারে ত্রুটি ধরবার কিছু নেই। বাড়ি এসে সে মাকে প্রণাম করল, শরীরের খবর নিল, বোনের সঙ্গে রসিকতা করল পুরনো দিনের মত। তাহলে? পার্থক্যটা হল কোথায়? নাকি ছেলে অনেকদিন বিদেশে থাকার ফলে নিজেরাই তার সঙ্গে ঠিকভাবে মিলতে পারছেন না?

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর অজয়কে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে এলেন ভূপতি। অমিতাকে শুতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, অপর্ণা এখনো রান্নাঘরে খুটখাট কাজ করছেন, তার আওয়াজ ভেসে আসছে। বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া মত হয়ে ভূপতি ছেলেকে ডাকলেন—আয়, আমার কাছে এসে বোস্—

অজয় এসে তাঁর পাশে বসল।

সস্নেহে ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে ভূপতি বললেন—তোর শরীর কেমন

আছে বল. ঠিকমত খাওয়াদাওয়া করিস তো?

অজয় হেসে বলল—স্টেট্‌সের খাওয়া এখানে কেউ ভাবতে পারবে না। ওদেশে খাবারে ভেজাল দেবার সাহস হয় না কারো, তার শাস্তি ভয়ানক কড়া। মাছ মাংস দুধ অঢেল—আমি দিনে প্রায় দেড় কিলোগ্রাম দুধ খাই। তবে জ্বাল দেওয়া দুধ নয়, ফয়েল দিয়ে সিল করা বোতল ফ্রিজে রাখা থাকে, ইচ্ছেমত বের করে খাই—

—কাঁচা দুধ খাস? কাচা দুধে পেটখারাপ করে—

না বাবা, পাস্তুরাইজ করা জীবাণুমুক্ত দুধ। খেয়ে কারো অসুখ করলে কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা হবে, কোম্পানিকে হাজার হাজার ডলার জরিমানা দিতে হবে।

এখন তোর রান্নাবান্নার ব্যবস্থা কি? আগের মত বাইরে খাস না তো?

—না। দুটো ঘর পাশাপাশি নিয়ে দু'জন থাকি, নিজেরাই রান্না করে নিই—

ভূপতি বললেন—সে বন্ধু বাঙালী?

না, সে ওদেশেরই ছেলে, ভার্জিনিয়ায় বাড়ি। ক্রায়োজেনিকস্ এক্সপার্ট।

দু'জনে মিলে একটা কাজের লোক রাখিস না কেন? অন্তত রান্না করে বাসনকোসন ধুয়ে দিয়ে যেতে পারে এমন—

অজয় আবার হাসল।—তুমি বুঝতে পারছ না বাবা, বিরাট উপার্জন না থাকলে সে দেশে কেউ কাজের লোক রাখতে পারে না। প্রত্যেকে নিজের কাজ নিজেরাই করে নেয়। অসুবিধে নেই কিছু রান্না করা খাবার টিনে পাওয়া যায় খুলে গরম করে নিলেই হল।

রান্নাঘরের কাজ সেরে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে অপর্ণা এসে বসলেন খাটের পাশের চেয়ারে। সেদিকে তাকিয়ে ভূপতি বললেন- এই যে, তোর মাও এসেছে। তোকে কয়েকটা জরুরী কথা বলব, ভাল করে ভেবে উত্তর দিবি। তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। আজ শুনে রাখ, পরে বললেও চলবে।

—কি কথা বাবা?

চশমাটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ভূপতি বললেন—তুই এবার কতদিন থাকবি ঠিক করে এসেছিস?

—মাস দুয়েক থাকবো। প্রয়োজন হলে আরো একমাস বাড়াতে পারি।

সমগ্র পরিবারের মনের মধ্যে জেগে থাকা প্রশ্নটা এবার বেরিয়ে এল—তুই কি আর দেশে ফিরবি না? আমেরিকাতেই থেকে যাবি?

সরাসরি বাবার চোখের দিকে না তাকিয়ে অজয় বলল—এ বিষয়ে আমি এখনো ঠিক কোনো সিদ্ধান্ত নিই নি। অনেক কথা ভাববার আছে—

—দেশে ফিরে এলে তোর কি চাকরি পেতে অসুবিধে হবে?

অজয় যেন একটু অবাক হয়ে বলল—তা কেন? ফিরে এলে এখুনি পাঁচ কি সাত হাজার টাকা মাইনের চাকরি পেতে পারি। কিন্তু ওদেশে আমি এর চারগুণ মাইনে পাই। আর মাইনেটা তো বড় কথা নয় বাবা, এখানে গবেষণা এবং ভাল কাজকর্ম করার সুযোগ নেই, বাঁধাধরা ফ্রেমের মধ্যে থাকতে হবে। ওখানে যে ল্যাবরেটরি আমি ব্যবহার করবার সুযোগ পাই, এখানে তেমন কেউ চোখেও দেখে নি। এই মুহূর্তে ফিরে এলে আমার কাজ বন্ধ হয়ে যাবে।

ভূপতি অস্ফুট গলায় বললেন—ঠিকই তো, ঠিকই তো—

অপর্ণা বললেন—খোকা, তোকে একটা কথা জানানো হয় নি, পাছে তুই ব্যস্ত হয়ে পড়িস। গত বছর তোর বাবার—

ভূপতি অস্থির হয়ে উঠলেন—আঃ, ওকথা থাক। বলার দরকার নেই—

অজয় মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—কি হয়েছে মা? কি লুকোচ্ছ তোমরা?

অপর্ণা বললেন—বছরখানেক আগে তোর বাবার একবার হার্ট অ্যাটাক হয়ে গিয়েছে। বাজার করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন, লোকজন ধরাধরি করে দিয়ে যায়। দশ দিন নার্সিং হোমে ছিলেন। ডাক্তার বলেছে—এক্ষুণি ভয়ের কিছু নেই বটে, কিন্তু খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোনোরকম দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনার কারণ না ঘটে। তা সে কি করে হবে বল? সংসার চালাতে গেলে সব সময় দুশ্চিন্তা তো আছেই। কে ভার নেবে?

অজয় বলল—বাবার অসুখের কথা তোমরা আমাকে জানাও নি কেন? খুব অন্যায় করেছ। আমি চিকিৎসার জন্য টাকা পাঠাতে পারতাম—

ভূপতি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন—অজয় টাকা পাঠানোর কথা বলল, একথা বলল না যে, খবর পেলে আমি চলে আসতাম।

নাঃ, ছেলেকে দোষ দিয়ে লাভ কি? একবার আসা-যাওয়ায় সব মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা খরচ। বাস্তব দিকটাও তো ভাবতে হবে। তিনি বললেন-ওকথা বাদ দে, আমি এখন ভালই আছি। আমার চিন্তা অমিতার বিষয়ে। তোর সঙ্গে আলোচনা দরকার।

—কেন, অমিতার কি হয়েছে?

—জানি না। আজকাল প্রায়ই দেরি করে বাড়ি ফেরে, মাঝে দু-একদিন বান্ধবীর বিয়েতে গিয়ে রাত্তিরে বাড়ি ফেরে নি। আজ মাসখানেক দেখছি মুখ গম্ভীর, কারো সঙ্গে কথা বলে না। এটা মেয়েদের স্বাধীনতার যুগ তা জানি, কিন্তু স্বাধীনতা আর স্বেচ্ছাচারিতায় পার্থক্য আছে। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ এসব চালচলন মানবে না। তুই থাকতে থাকতে অমিতার বিয়ের ব্যবস্থা করে যা—

অজয় মাথা নিচু করে শুনছিল, এবার মুখ তুলে বলল—তোমরা সম্বন্ধ দেখ, অমিতার বিয়েতে যা খরচ লাগে আমি দেব—

তারপর কি ভেবে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—আর একটা কথা, গত দু'বছর তোমাদের কোনো টাকা পাঠাতে পারি নি, তোমরা হয়ত রাগ করেছ। আমি একটা দু-ঘরের অ্যাপার্টমেণ্ট কিনছি, তার জন্য টাকা কিস্তিতে জমা দিতে হচ্ছে। এখন যে ঘরখানায় থাকি সেটা বড্ড ছোট, কাজের খুব অসুবিধে হয়। তবু যেভাবেই হোক, আমি অমিতার বিয়ের খরচ দেব। সামনের বছর থেকে তোমাদেরও কিছু কিছু পাঠাতে পারব আশা রাখি—

ভূপতি বললেন—ওদেশে থাকবি কিনা সে বিষয়ে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত যখন নিস নি, তখন অ্যাপার্টমেণ্ট কিনছিস কেন?

অজয় একটু থতমত খেল, তারপর বলল—প্রধানত কাজের সুবিধার জন্য। তাছাড়া অ্যাপার্টমেণ্ট তো যে কোনো সময়েই বিক্রি করে দেওয়া যায়—

ভূপতি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—তা বটে। যা শুয়ে পড় গিয়ে, রাত হয়েছে—

ঘরের আলো নিভিয়ে দিতেই জানালা দিয়ে রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো এসে মশারির গায়ে পড়ল। এই সময়টা ভূপতির ভারি ভালো লাগে। জীবনের যা কিছু সমস্যা তা সবই রয়ে গেল বটে, কিন্তু কাল সকালের আগে সে বিষয়ে চিন্তা না করলেও চলে। এখন কেউ ডাকতে আসবে না, কেউ বিরক্ত করবে না—সহস্র জটিলতায় আবিল পৃথিবীটা এই মুহূর্তে থমকে রয়েছে তাঁর মশারির দুর্গে বাধা পেয়ে। সমস্ত দুঃখ, আনন্দ, হাসি ও কান্নার অধিকারের বাইরে কোথায় যেন একটা অদ্ভুত প্রশান্তির জগৎ আছে। আলো নিভিয়ে শোবার পর ঘুমের আগের একঘণ্টা সময়ে আজকাল মাঝে মাঝে ভূপতি সেখানে পৌঁছে যান। তাঁর বুকের ব্যথাটা থাকে না, রক্তের চাপ কমে আসে, ডাল-ভাত-তরকারি খেয়ে কাটিয়ে দেওয়া অকিঞ্চিৎকর মধ্যবিত্ত জীবনটা হঠাৎ খোলামেলা খুশির আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কোথায় যেন একটা বিরাট শালবন। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তার পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে মাটিতে। মৃদু বাতাসে অস্পষ্ট মর্মরধ্বনি জেগেছে বনে বনে। কি সুখ! কি অনাবিল শান্তি সেইখানে। ভূপতি রোজ এই জ্যোৎস্নালোকিত অরণ্যে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করেন।

আজ হল না।

ছেলে বিদেশে থাকে, তার উন্নতির পথে তিনি বাধা হবেন না—আজও বিকেলে কাকে যেন বলেছেন কথাটা। সব মিথ্যে—সব বানানো কথা। তিনি চান এক্ষুণি ছেলে ফিরে আসুক, তাঁর কাছে কাছে থাকুক। আঠাশ বছর আগেকার তাঁর সেই ছোট্ট খোকা—তিনি ওকে ছেড়ে থাকতে পারছেন না আর। তাঁর মন কেমন করছে।

কিন্তু কাউকে সে কথা বলা যাবে না কিছুতেই। কিছুতেই না।

পরের দিন সকালে ভূপতি চা খেয়ে থলে হাতে বাজারে বেরুলেন। কাগজটা ভাঁজ করা অবস্থায় বারান্দার টেবিলে পড়ে আছে, ফিরে এসে পড়বেন এখন। আজকাল আর কাগজ পড়তেও তেমন ইচ্ছে করে না। মারামারি, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সন্ত্রাস—এ কেমন যুগ এসে পড়ল? পেনশন নেবার আগে অফিসে যাতায়াতের পথে তিনিও অবশ্য সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করতেন। কিন্তু যত বয়েস বাড়ছে, ভাবনাচিন্তা করার সময় পেয়ে তাঁর মনে হচ্ছে এসব কিছুই কিছু নয়। জীবনের সব পথের শেষেই তো অনিবার্য মৃত্যু অপেক্ষা করে রয়েছে, তাহলে খামোখা অর্থ, ক্ষমতা, খ্যাতি অর্জনের জন্য এই ভয়ানক প্রতিযোগিতায় নেমে লাভ কি? বরং সেই সময়টা সবাই মিলে শিল্প আর বিজ্ঞানের চর্চা করলে মানব সভ্যতা অনেক এগিয়ে যেত। অথবা এসব হয়ত তাঁর মত অবসরপ্রাপ্ত, রক্তের জোর কমে যাওয়া প্রৌঢ়ের সবদিক বাঁচিয়ে শান্তিতে থাকার গূঢ় ইচ্ছা। মানুষ বোধহয় এই প্রতিযোগিতা আর অশান্তিই পছন্দ করে।

ভূপতি প্রথমেই মাছের বাজারের দিকে গেলেন, দেরি হলে পছন্দসই মাছ আর পাওয়া যায় না। ফেরার সময়ে তরি-তরকারি নিয়ে নিলেই চলবে।

বাজারে পাঁচু তার পুরনো জায়গাতে বসে আছে, ভূপতিকে ডাকল—আসুন বাবু, গঙ্গার ইলিশ নেবেন? ভাল ইলিশ পেয়েছি আজ

ধনুকাকৃতি টাটকা মাছগুলো দেখে ভূপতির লোভ হল। জিজ্ঞাসা করলেন —কত করে যাচ্ছে?

—আজ্ঞে, পঁচাত্তর টাকা।

প্রথমে ভূপতি ভাবলেন তিনি ভুল শুনেছেন। বললেন—পঁচিশ টাকা?

পাঁচু হাসল, বলল—না বাবু, পঁচাত্তর টাকা। পঁচিশ টাকায় ইলিশ মাছের দিন কি আর আছে? নেন বাবু, ভাল মাছ—

—বল কি হে পাঁচু? এই সেদিনও তো ত্রিশ টাকায় ইলিশ দিয়েছে আমাকে। মাস তিনেক আগেকার কথা হবে, এর ভেতর এত বাড়ে কি করে?

—ইলিশ বাবু জালে একদম পড়ছে না, দিনে আট-দশটা। চালান বাড়লে দাম একটু কমবে, তবে ত্রিশে আর বোধহয় নামবে না বাবু—

নানা অভাবের গ্রাস থেকে বাঁচানো একটি পঞ্চাশ টাকার নোট নিয়ে বাজারে এসেছিলেন ভূপতি। পঁচাত্তর টাকার ইলিশ তিনি কিভাবে কিনবেন? কিন্তু বাজারে ঘুরে দেখলেন ইলিশের দর পাঁচু ঠিকই বলেছে, আর অন্য মাছ যা আছে তা অজয় খেতে পারবে না। ছোটবেলা থেকেই কাঁটাওয়ালা মাছ খেতে চায় না অজয়। আচ্ছা, পাঁচুর কাছ থেকে বরং পাঁচশো গ্রাম কাটা রুই নিয়ে যাওয়া যাক। সে বরং ভাল।

তিনি ফিরে এসে দাঁড়াতেই পাঁচু জিজ্ঞাসা করল—ছোটখোকা এসেচে শুনলুম বিলেত থেকে? কতদিন থাকবে?

পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক সরপুঁটির দর করছিল, কথাটা শুনে সে একবার ভূপতির দিকে তাকাল। মনে মনে তৃপ্তি মিশ্রিত গর্ব অনুভব করলেন ভূপতি। ক'টা লোকের ছেলে বিদেশে চাকরি করে? পাঁচুকে বললেন—বিলেত নয় পাঁচু, বিলেত হল ইংল্যান্ড, ইংরেজদের দেশ। আমার ছেলে থাকে আমেরিকায়, সেটা আরো দূর।

—কতটুকু দেখেচি খোকাকে, একদিন যাবো দেখতে—

একটা কিলো দেড়েকের ইলিশ তুলে ওজন করছে পাঁচু। ভূপতি ব্যস্ত হয়ে বললেন—ইলিশ নয়, আমাকে পাঁচশো কাটা পোনা দাও—

পাল্লা নামিয়ে মাছটা হাতে নিয়ে পাঁচু বলল—এককিলো তিনশো। তিনশোর দাম নেবো না, ওটা খোকা খাবে। ব্যাগটা দিন—

—না পাঁচু, আমার কাছে টাকা নেই, আমি নিতে পারবো না—

পাঁচু একটু ঝুঁকে ব্যাগে ইলিশটা ভরে দিয়ে বলল—আস্তে আস্তে দিয়ে দেবেন এখন, তাড়া নেই কিছু। কি করবো বাবু, দিনকাল পড়েছে খারাপ। এই বাজারে বসে আপনাকে তিন টাকা সের ইলিশ বেচেছি, এখন আশি টাকা দরে বিক্রি করেও আগের মত লাভ হয় না। খোকা বাড়ি এসেচে, নিয়ে যান মাছটা। টাকা পরে যখন হোক দেবেন—

সবাই মিলে দুপুরে খুব আনন্দ করে মাছটা খাওয়া গেল। কেবল অমিতা বিশেষ কিছুই খেল না। শরীর নাকি খারাপ, খিদে নেই। কি যে হয়েছে মেয়েটার! দিনরাত শুধু ঘুরে বেড়ালে কি শরীর ভাল থাকে?

খেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় আধশোয়া হয়ে একটা বই খুললেন ভূপতি। ক'দিন ধরে ইশারউডের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী পড়ছেন, কিন্তু তেমন ভাল লাগছে না। ভারতের মহাপুরুষ আর ধর্মের বিষয়ে বিদেশের মানুষেরা খুব আগ্রহী, দলে দলে লোক ভারতে এসে হরিনাম করছে, নিজেদের দেশে যোগাভ্যাস

আর ধ্যানের কেন্দ্র স্থাপন করছে। কিন্তু ভূপতির কেমন যেন মনে হয়, তারা এসবের গভীর মর্ম ঠিক বোঝে না।

একগ্লাস জল হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকল অমিতা। ভূপতি বললেন—কি রে ?

—তোমার হজমের ওষুধটা খেয়ে নাও, এই যে জল—

- খাচ্ছি। আয় দেখি, একটু বোস আমার এখানে—

একটু ইতস্তত করে অমিতা বসল। ভূপতি সস্নেহে মেয়ের গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—বড্ড চেহারাটা খারাপ হয়েছে তোর। ভাল করে খাবি আর মনের আনন্দে থাকবি। আর বেশি বেরুস না বাড়ি থেকে। কি হবে ফাংশানে গান গেয়ে ? দেখ্ খুকি, আমরা সাধারণ গেরস্ত মানুষ, ছেলেপুলে আত্মীয়স্বজন নিয়ে সুখে ঘর করেই আমাদের আনন্দ। ভাল করে গান শেখ না, তাতে তো কোনো আপত্তি নেই। যদি কেউ শুনতে চায়—শোনাবি, যদি ফাংশানে ডাক আসে—গাইবি। কিন্তু পাগলের মত খ্যাতির পেছনে ছুটবি না, ওতে কেবল কষ্ট বাড়ে। হাততালি পাওয়া জীবনের সবচেয়ে বড় কথা নয়, সবচেয়ে বড় জিনিস হল সুখ আর শান্তি।

অমিতা মুখ নিচু করে বসেছিল। ভূপতি বললেন—এবার একটা ভাল পাত্র দেখে তোর বিয়ে দিয়ে দেব। আচ্ছা খুকি, তোর মনে আছে। ছোটবেলায় আমার কোলে চড়ে বেড়াতে যেতিস ? কোথাও আমার যাবার উপায় ছিল না, বেরুচ্ছি দেখলেই ঝাঁপিয়ে এসে কোলে উঠতিস—

এই পর্যন্ত বলে ভূপতি দেখলেন অমিতার চোখে জল। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে কার চোখে না জল আসে ?

যা, দুপুরবেলা বরং মায়ের পাশে গিয়ে একটু শুয়ে থাক। বই পড়বি একটা ? এই নে, বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' পড়েছিস ? নিয়ে যা, অমন বই হয় না। পড়ে বলিস কেমন লাগল—

নিঃশব্দে বই নিয়ে চলে গেল অমিতা।

মেয়েটা কাঁদে কেন ? কি কষ্ট ওর মনে ?

মনের মধ্যে নানারকম আশঙ্কা জেগে ওঠে, প্রাণপণে সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে ভুলে থাকবার চেষ্টা করেন।

অনেকদিন আগে ছোট্ট অমিতাকে কোলে নিয়ে চাটুজ্যেদের আমবাগানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সময়টা বিকেল। এই শহর তখন কত নির্জন ছিল, সুন্দর ছিল। সেই বাগানে একঝাঁক টিয়াপাখি দেখে অমিতার কি কান্না—একটা তাকে ধরে দিতেই হবে। পরে রথের মেলা থেকে মেয়েকে গাঢ় সবুজ রঙের মাটির টিয়াপাখি কিনে দিয়েছিলেন ভূপতি। বলেছিলেন—রোজ গান শোনাবি আর যত্ন করবি, তাহলে পাখি জ্যান্ত হয়ে উঠবে।

অমিতা বারান্দার কোণে একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সের ভেতর পাখিটাকে রেখে সকাল-বিকেল আবোলতাবোল গান শোনাতো, একটুকরো কাপড় দিয়ে ঝেড়েপুঁছে পরিষ্কার করতো। যত্নের প্রাবল্যে কিছুদিনের মধ্যেই পাখির রঙ উঠে গেল, ভেতরের মাটি বেরিয়ে পড়ল, কিন্তু পাখি জ্যান্ত হল না।

আজ হঠাৎ ভূপতির মনে হল জীবনটা আসলে ঠিক এইরকম একটা মাটির রঙ করা পুতুলকে প্রাণ দেবার চেষ্টার মত। শৈশব-যৌবনের অসম্ভব স্বপ্নের রঙে রাঙানো জীবনকে প্রাণের প্রাচুর্যে পূর্ণ করতে মানুষের কত আয়োজন, কত

সাধনা। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই মৃন্ময় স্বপ্নমূর্তির রঙ উঠে যায়, ভেতরের মাটি বেরিয়ে পড়ে।

নাঃ, ভূপতির এরকম ভাবা উচিত নয়। তাঁর অপূর্ণতা কিসের? মানুষ যা যা কামনা করে তা সবই প্রায় তিনি পেয়েছেন। ছোটখাটো হলেও নিজের একটুখানি বাড়ি আছে। দীর্ঘকাল চাকরি করে নিজের বাড়িতে অবসরজীবন যাপন করছেন। বৌ ঝগড়াটে নয়। ছেলে বিদেশে কাজ করে। আর কি চাই মানুষের? তিনি সামান্য মানুষ, রাজাগজা হবার স্বপ্ন কখনো ছিল না—এতেই তো সুখী থাকা উচিত।

কিন্তু তা হয় না। কিছুটা অপূর্ণতার বোধ থেকেই যায়।

কলেজে পড়বার সময় বন্ধুবান্ধব মিলে আড্ডা দিতে দিতে নৌকো করে আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবার কথা ভেবেছিলেন, কুইন্সল্যাণ্ডের মরুপ্রান্তরে তারাভরা আকাশের নিচে তাঁবু ফেলে রাত কাটাবার পরিকল্পনা ছিল। সব লোকই তো চাকরি করে, বিয়ে করে, সংসার করে, তারপর একদিন মরে যায়। তিনি আর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্ষিতিরঞ্জন ঠিক করেছিলেন পশুপাখি ধরার ব্যবসা করবেন। সার্কাস পার্টি, চিড়িয়াখানা বা জীবজন্তু পুষতে ভালবাসে এমন লোকের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে তাদের হাতী, বাঘ, জিরাফ, গণ্ডার, পাখি সব ধরে দেবেন। দুই বন্ধু বসে কিভাবে ব্যবসা চলবে তার নিয়মকানুনও ঠিক করে ফেলেছিলেন। অর্ডারের সঙ্গে অর্ধেক টাকা অগ্রিম, বাকি ডেলিভারীর সময়ে। একটা টিম তৈরি করতে হবে, তাদের নিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরে ঘুরে বেড়ানো! আর কোনো বাঙালী এমন ব্যবসা করার কথাও ভাবে নি!

ক্লাস পালিয়ে তিনি আর ক্ষিতিরঞ্জন চিড়িয়াখানার লেকের ধারে ঘাসের ওপর বসে বাদামভাজা খেতে খেতে আলোচনা করতেন। আসন্ন অ্যাডভেঞ্চারের সম্ভাবনায় শরীর পুলকিত হয়ে উঠতো। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসবার আগে আধো তন্দ্রার ঘোরে দেখতে পেতেন দক্ষিণ আফ্রিকায় মাটো গ্রোসোর নিবিড় উষ্ণমণ্ডলীর অরণ্য, সে অরণ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে আমাজন নদী। গাছের ডালে ডালে বিচিত্রবর্ণ টুকান পাখির দল।

পরবর্তী জীবনে ভূপতি বেনারসের চেয়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যান নি। অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে একবার রামনবমীর মেলা দেখতে গিয়ে সন্ধ্যেবেলা পঞ্চকূট পাহাড়ে উঠে পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন। ক্ষিতিরঞ্জন সারাজীবন একটা পেরেকের কারখানায় কেরানীর কাজ করে ছানির জন্য বর্তমানে চোখে দেখতে পান না। একমাত্র ছেলে বিয়ে করে বৌকে নিয়ে আলাদা হয়ে গিয়েছে, বাবা-মাকে দেখে না। কিছুদিন আগে ধর্মতলা-ওয়েলেসলীর মোড়ে একবার দেখা হয়েছিল। প্রথমে ভূপতি চিনতেই পারেন নি, ঝুঁকে পড়ে ফুটপাথে সাজানো হাওয়াই চটি দর করছিলেন ক্ষিতিরঞ্জন। পরনে আধময়লা ধুতি আর হাফশার্ট, পায়ে তালি দেওয়া চপ্পল। মাথায় ছোট ছোট কদমছাঁট চুল। চোখে বিকট পাওয়ারের পুরু লেন্সের চশমা। তার আবার একখানা ডাঁটি নেই, সাদা সুতো দিয়ে কানের সঙ্গে জড়িয়ে বাঁধা। পিঠে হাত রাখতেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—কে? কে?

—বল্ তো কে?

মোটা কাচের পেছনে মঙ্গলগ্রহের প্রাণীর মত বিবর্ধিত চোখ প্রচেষ্টার

অতিশয্যে আরো বিস্ফারিত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন— আমি - আমি আজকাল চোখে ভাল দেখতে পাই না। কে বলুন তো ?

কাঁধে একটা চাপড় মেরে ভূপতি বললেন—কি আপনি-আজ্ঞে করছিস ' আমি ভূপতি, তোর ক্লাস-মেট। তুই এত বুড়ো হয়ে গেলি কি করে ?

ক্ষিতিরঞ্জনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। —ভূপতি! কেমন আছিস ?

—আর কেমন আছি ! রিটায়ার করেছি গত বছর। এখন অখণ্ড অবকাশ। খুব একা একা লাগে, তোরাও কেউ আর খোঁজখবর নিস না। চল্ কোথাও বসে কিছু খেতে খেতে গল্প করা যাক—

বন্ধুকে হাত ধরে রাস্তা পার করে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোডের একটা খাবারের দোকানে ঢুকলেন ভূপতি। কচুরি আর রসোমালাইয়ের অর্ডার দিয়ে বললেন— ওঃ, কতদিন পরে দেখা! তুই কি করছিলি এখানে ?

ক্ষিতিরঞ্জন ম্লান হেসে বললেন—দেখলি তো, জুতো দর করছিলাম। দুই পায়ের তলায় এত বড় বড় কড়া পড়েছে। বাড়িতেও খালিপায়ে হাঁটতে বেজায় কষ্ট হয়—রবারের নরম জুতো পরলে একটু আরাম পাই। তা, দোকানে বড্ড দাম, তাই ফুটপাথ থেকে—

—তুই এখনো চাকরি করছিস ?

—না ভাই। আরো বছর তিনেক করতে পারতাম, কিন্তু চোখে দেখি না— কাজে ভুল হয় বলে এক বছরের মাইনে হাতে দিয়ে গেল জানুয়ারি থেকে বসিয়ে দিয়েছে। কোলকাতা এসেছিলাম বৌয়ের ওষুধ নিতে। বাতে খুব কষ্ট পাচ্ছে। স্যাকরাপাড়া লেনে এক বুড়ো কবিরাজ আছে, তার বাতের তেল মালিশ করে ব্যথাটা আজ মাস দুই হল কম।

ভূপতি বললেন—চোখে দেখিস না মানে কি, ছানি ?

—হ্যাঁ।

—তার জন্য কষ্ট পাচ্ছিস কেন ? অপারেশন করিয়ে নে—

ক্ষিতিরঞ্জন বললেন—ভাবছি তো, কিন্তু হয়ে উঠছে না। খোকন বৌ নিয়ে আলাদা বাড়িতে থাকে, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তার বৌয়ের বনে না। আমার হাতেও নেই পয়সা, এক বছরের মাইনে ভেঙে আর কতদিন চলে বল্ ? পনেরো—কুড়ি - পঁচিশ টাকা নিয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াই, এই করে ডাল আর ভাত খেয়ে চালাচ্ছি। হাসপাতালে গেলে বিনা পয়সায় অপারেশন করে দেয় জানি, কিন্তু সেখানে নিয়েই বা যায় কে, আর অপারেশনের পর যে ক'দিন চোখে ব্যাণ্ডেজ করা থাকবে সে ক'দিন সংসারই বা সামলায় কে ?

ভূপতি ভেবেছিলেন পুরনো বন্ধুর কাছে ছেলের বিদেশে যাওয়ার গল্পটা ফলাও করে করবেন, কিন্তু ক্ষিতিরঞ্জনের ছেলে তাঁকে দেখে না—এ অবস্থায় নিজের ছেলের কৃতিত্বের গল্প করলে তা খুব নিষ্ঠুর শোনাবে। তাই ক্ষিতিরঞ্জন যখন ছেলেমেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ভূপতি সংক্ষেপে বললেন- তারা সব ভাল আছে।

চারখানা বড় বড় কচুরি, ছোলার ডাল আর দু'খানা রসোমালাই খেয়ে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ক্ষিতিরঞ্জন। তাঁর ব্যগ্র ভঙ্গিতে গোগ্রাসে খাওয়া দেখেই বোঝা যায় তিনি খুব ক্ষুধার্ত। ছোলার ডাল আরো

দু'বার চেয়ে নিলেন। ভূপতি বললেন—আর দু'খানা কচুরি নিবি?

—নাঃ, আর না। ইচ্ছে খুবই করে, কিন্তু শরীর আজকাল আর ঠিক বশে নেই। শেষে পেটের গোলমাল হলে বিপদে পড়বো—

—ক্ষিতি, মনে আছে, আমরা সেই পশুপাখি ধরবার কোম্পানি খুলবো ঠিক করেছিলাম? সেই নৌকো করে আটলাণ্টিক পার হবার প্ল্যান—

পুরু কাচের পেছন থেকে নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্ষিতিরঞ্জন বললেন—তুই বোধহয় তাহলে সত্যিই লোক চিনতে ভুল করেছিস। আমি সেই মানুষ নই, সে ক্ষিতিরঞ্জন পঁয়ত্রিশ বছর আগে মারা গিয়েছে।

বাড়ির সামনে জায়গা নেই, তবু তারই মধ্যে বারান্দার নিচে নর্দমার ধার দিয়ে একটা কি গাছ গজিয়ে উঠলো। প্রথমটা ভূপতি বুঝতে পারেন নি, তারপর চিনতে পারলেন—তেলাকুচো লতা। রোজই একটা লোহার পাত দিয়ে গোড়ার চারদিকের মাটি খুঁচিয়ে দিতেন, চায়ের পাতা ছড়িয়ে দিতেন। গাছটা দেখতে দেখতে বেশ সতেজ হয়ে বেড়ে উঠলো। একদিন অপর্ণা দেখতে পেয়ে বললেন—কি গাছ গো?

ভূপতি বললেন—বল তো কি গাছ?

কিছুক্ষণ দেখে অপর্ণা বললেন—শশা, না?

—নাঃ, তেলাকুচো।

অবাক হয়ে অপর্ণা বললেন—এমা, তেলাকুচো! সেই গাছের জন্য তুমি এত যত্ন করছো?

উবু হয়ে বসে ভূপতি গাছের গোড়া খোঁচাচ্ছিলেন, এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি কখনো তেলাকুচো ফল দেখেছো? পাকলে লাল টুকটুকে দেখায়, ভারি সুন্দর। নাই বা কাজে লাগলো, গাছটা কি তেজে বেড়ে উঠছে দেখ দেখি—আমি যত্ন করছি বলেই তো? জীবনে কোনো কিছুই বলবার মত নেই, কোনো সার্থকতা নেই। অন্তত এই তেলাকুচো লতাটা তো আমি বড় করে তুললাম। এটুকুই আমার গর্ব।

দুপুর গাঢ় হয়ে চোখে তন্দ্রা নেমে আসে। হাত থেকে খসে পড়ে যায় ইশারউড্। আপাতত ঘুমের মধ্যে সাফল্য নেই, ব্যর্থতাও নেই। বেদনাও নেই, উল্লাসও নেই। অহঙ্কারও নেই, বিনতিও নেই। কি এসে যায় মাটো গ্রোসোর জঙ্গলে টুকান পাখি ধরতে যাওয়া না হলে? কি এসে যায় অর্জনে অথবা পরাজয়ে? জীবনের শেষে সমস্ত অস্তিত্ব আবৃত করে যখন ঘুম নেমে আসবে তখন কোথায় লেখা থাকবে সার্থকতা অথবা হতাশার হিসাবনিকাশ? তাতে কি-ই বা এসে যাবে ভূপতির?

॥ তিন ॥

অজয়

ভারতবর্ষে অজয় আর পাকাপাকিভাবে ফিরে আসবে না। এ বিষয়ে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কথাটা বাবা-মার মুখের ওপর বলতে তার আটকাচ্ছে। বাবাকে সে ভালবাসে, মাকেও। তবে সে ভালবাসা এত তীব্র নয় যার জন্য সে

নিজের ভবিষ্যৎ বিসর্জন দিয়ে দেশে ফিরে আসতে চাইবে। আজকাল তার রুচি বদলেছে। কোলকাতাকে একটা নোংরা আর ঘিঞ্জি শহর বলে মনে হয়, নিজেদের বাড়িটা কুশ্রী অন্ধকূপের মত লাগে। জল খেতে ভয় করে, যদি ডিসেন্ট্রি হয়ে যায়।

সে অকৃতজ্ঞ নয়। বাবা তাকে অনেক কষ্ট করে মানুষ করেছেন, মা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের প্রতি তার কর্তব্য আছে এবং সে কর্তব্য তাকে করতেই হবে। কিন্তু নিজের মনের কাছে কোনো লুকোচুরি চলে না, ছোটবেলার কথা মনে পড়ে সে বাবা অথবা মায়ের প্রতি বিশেষ কোনো মানসিক দুর্বলতা অনুভব করে না। অর্ধেক পৃথিবী দূরে সে থাকে। দূরত্ব বোধহয় সম্পর্কের গাঢ়তাকে এভাবেই কমিয়ে আনে। সে দেশের সাচ্ছল্য, আর্থিক সুযোগসুবিধা তাকে মুগ্ধ করেছে। সামনে জীবনের যে দীর্ঘ পথ বিস্তৃত তার বাঁকে বাঁকে রয়েছে আরো উন্নতি, আরো অনেক বিচিত্র সম্ভাবনা। বাবা-মায়ের জন্য এসব ছেড়ে সে ভারতের বদ্ধ জলাশয়ে ফিরে আসতে পারবে না।

এডিথের কথাও সে বাড়িতে বলতে পারে নি। বাবার ইচ্ছে ভাল বাঙালী মেয়ে দেখে তার বিয়ে দিয়ে ছেলেকে সংসারী করা। কিন্তু বাবা বুঝতে পারছেন না ভাল মেয়ে বলতে যা বোঝায় আমেরিকায় বাস করতে গেলে তেমন মেয়ে অচল। সে দেশে মেয়েরা স্বামীর সঙ্গে সমান তালে সবকিছু করে, কেবল ঘরে বসে রান্না করে না। এডিথ ঠিক তেমনি মেয়ে। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ এডিথ বেশ নাম করেছে। নিজের একটা বিশেষ মেথডে কাজ করে সে অনেক কাজের অর্ডার পায়। গত দু'বছরে বহু উইকএন্ডে তারা শহর থেকে আড়াইশো কি তিনশো কিলোমিটার বেড়াতে গিয়ে নির্জনে রাত্রিবাস করেছে। ছোট্ট তাঁবুর বাইরে অগ্নিকুণ্ড জেলে তাতে টিনের খাবার গরম করে খাওয়া, তারপর কফির জল চাপিয়ে সিগারেট ধরিয়ে মুখোমুখি বসে গল্প। আমেরিকার মেয়েরা কোনোরকম ঘনিষ্ঠতা ঘটে গেলেই বিয়ের জন্য আবদার করে না, সহজে ভালবাসার কথাও বলে না। অজয় বা এডিথ পরস্পরকে এখনো ভালবাসার কথা বলে নি, কিন্তু সম্পর্কটা যে সেদিকেই এগুচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই।

মাকে হয়ত রাজি করানো যাবে, কিন্তু বাবা কিছুতেই এডিথকে পুত্রবধূ হিসেবে মেনে নেবেন না। বাধা দেবেন না ঠিকই, তবে মেনেও নেবেন না।

বাবা আর মায়েরই বা কি ব্যবস্থা করা যায়? বিদেশে এসব হাঙ্গামা নেই। সেখানে বুড়ো মানুষেরা ওল্ড এজ হোম-এ থাকে। ছেলেমেয়েরা একটু বড় হলেই বাপ-মায়ের সঙ্গে আর থাকে না, তাদের কাছে কেউ কোনো প্রত্যাশাও করে না। কিন্তু এখানে বাবা-মাকে বার্ধক্য নিবাসে পাঠালে ভয়ানক নিন্দে হবে।

এবার এসে আত্মীয়স্বজন বা পুরনো আলাপীদের সঙ্গে বিশেষ একটা দেখা করতে যায় নি অজয়। গেলে সবাই দুটো প্রশ্ন করবেই--সে কত মাইনে পায়, এবং সে দেশে আর ফিরবে কিনা। দু'চারজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিরক্ত হয়ে এখন অজয় বাড়িতেই থাকে, মাঝে মাঝে বেরিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আসে।

বিদেশে যাবার আগে অজয় জানতো না মানুষের জীবন কতটা দ্রুতগতিসম্পন্ন হতে পারে, কত অভাবনীয় স্বাচ্ছন্দ্য মানুষ পেতে পারে। নিজের দেশের চিরাচরিত সঙ্কীর্ণতা আর অসুবিধার মধ্যে ফিরে এবার যেন তার হাঁপ ধরছে। সঙ্গে রয়েছে একটু অপরাধবোধ। সে পালিয়ে গিয়ে যেন নিজের স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছে।

কিন্তু কিছু করার নেই, একবার প্রাচুর্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে আর ফিরে আসা খুব কঠিন।

অমিতার বিয়ের ব্যবস্থাটা করে ফেলা দরকার। কি হয়েছে মেয়েটার কে জানে! সব সময় মুখ শুকনো, কথা কম বলছে—অমিতা তো এমন ছিল না। অবশ্য অমিতার বিয়ের বয়েস হয়েছে, এই বয়েসে স্বাভাবিকভাবেই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলো চরিতার্থতা কামনা করে। অজয় এদেশে থাকে না, বাবা-মা বোনের বিয়ে ঠিক করে ফেললে সে টাকার ব্যবস্থা যেখান থেকেই হোক করে দেবে।

তারপরেই শুরু হবে আসল সমস্যা। অমিতা এখন রয়েছে, বুড়োবুড়িকে দেখাশুনো করতে পারছে। তার বিয়ে হয়ে গেলে বাড়ি খালি হয়ে যাবে। বাবা আর মাকে দেখাশুনো করবে কে? কিন্তু সেই সমস্যার জন্য তো অমিতার বিয়ে স্থগিত রাখা যায় না।

বাবা-মাকে সে কিছুদিন করে তার সঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে রাখতে পারে। একেবারে নয়, কারণ সেক্ষেত্রে অমিতা কার কাছে থাকবে? প্রথমে বাবা ঘুরে এলেন, কিছুদিন পর মা। কিন্তু চিরকাল তাঁদের সে নিজের কাছে রাখতে পারবে না। কাজেই সেভাবে সমস্যাটা মিটছে না।

বিকেলের দিকে বেরুবার জন্য অজয় জামাকাপড় পরছিল। বিরাটিতে এক বুড়ি পিসিমা থাকেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। অনেক বয়েস হয়েছে, শরীরও বিশেষ ভাল নয়। সামনেরবার যখন সে আসবে, পিসিমা আর হয়ত ইহ-জগতে থাকবেন না। এখন গেলে রাত ন'টার মধ্যে ফিরে আসা যাবে।

শার্ট গলিয়ে হাতঘড়ি পরছে, চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো অমিতা।

—দাদা কি কোথাও বেরুচ্ছিস?

—হ্যাঁ, একটু বিরাটিতে পিসিমার বাড়ি যাবো। কেন রে?

—আজ যাস না। তোর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে—

অজয় একটু অবাক হয়ে তাকালো। অমিতার মুখ ফ্যাকাশে, চোখে এক ধরনের শূন্যতামাখা দৃষ্টি। নিজের সাংসারিক ব্যাপারে খুব বেশি অভিজ্ঞতা না থাকলেও অজয় বুঝতে পারলো চারদিক থেকে সমস্ত রকম ভরসা হারিয়ে ফেললে মানুষের চোখে এই ধরনের চাউনি ফুটে ওঠে। এ ভাল কথা নয়।

অজয় জিজ্ঞাসা করল—কি কথা বলবি রে? কি হয়েছে তোর?

সরাসরি সে কথার জবাব না দিয়ে অমিতা অজয়ের দিকে তাকিয়ে বলল—দাদা, তুই আমাকে ছোটবেলার মত ভালবাসিস?

অমিতার গলার স্বরে কেমন যেন অসহায়তা মাখা। এতদিনেও যা পুরোপুরি হয় নি, বোনের দিকে তাকিয়ে অজয়ের হঠাৎ মন কেমন করে উঠল। এ অনুভূতি এখনো তার ভেতরে কোথাও ছিল তাহলে?

এগিয়ে গিয়ে বোনের কাঁধে হাত রেখে অজয় বলল—একথা জিজ্ঞেস করছিস কেন অমি? ভাইবোনের ভালবাসা কি কখনো কমে যায়?

—মনে আছে দাদা, ছোটবেলায় সব গোপন কথা তোকে বলতাম? কোনো দুষ্টুমি করে ফেললে তোকে ডেকে বলতাম, তুই মাকে দিয়ে বাবাকে বলিয়ে বকুনি খাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতিস।

অমিতার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অজয় বলল—বেশ, আজ আর বিরাটি যাবো না। আজ চল তোকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি। ঘুরতে ঘুরতে তোর কথা শুনবো- তুই জামাকাপড় বদলে আয়। আমি ততক্ষণ চা খেয়ে নিই

বাইরে বেরিয়ে অজয় বলল—ব্যারাকপুর গান্ধীঘাটে যাবি ?

—সে তো অনেকদূর দাদা, পনেরো-ষোলো কিলোমিটার হবে—

—তা হোক, আজকাল দেখছি চৌমাথার মোড়ে কোলকাতার দিকে ফিরতি ট্যাক্সি অনেক পাওয়া যায়, তারই একটা ধরে নেবো এখন

ঘণ্টা দুয়েক পরে।

গান্ধীঘাটের বাঁধানো সিঁড়ির ওপর বসে আছে অজয় আর অমিতা। ওদের আসতে দেখে ভেতরের চত্বরে ছড়িয়ে থাকা কিছু কর্মহীন ছোকরা ছেলে শিস্ দিয়ে দু'একটা সরস মন্তব্য করেছিল, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও এক ধরনের সহজ দূরত্ব লক্ষ্য করে তারা একটু অবাক হয়ে দূরে সরে গিয়েছে।

দাদাকে সব খুলে বলেছে অমিতা। এই বিশাল পৃথিবীতে একমাত্র দাদাকেই বোধহয় সে এমন করে মনের ভেতরটা খুলে দেখাতে পারে।

অজয় ভুরু কুঁচকে জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। অকস্মাৎ তার নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা দূর হয়ে গিয়েছে। রক্তের টান বড় সাংঘাতিক টান, দূরে পালিয়ে থেকে সে টান থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

একটু পরে অমিতা বলল—দাদা।

—উঁ ?

আমার কি হবে দাদা ? আমি এখন কি করবো ?

অজয় চোখ ফিরিয়ে বোনের দিকে তাকালো। বলল—তোকে কিছুই করতে হবে না, কোনো ভয় নেই—যা করবার আমিই করবো।

একমুহূর্তে অমিতার বুকের থেকে সমস্ত ভার নেমে ভেতরটা হাল্কা হয়ে গেল। তার সেই পুরনো ভরসাস্থল দাদা বলেছে কোনো ভয় নেই, সত্যিই তাহলে চিন্তার কারণ নেই। দাদা সব ঠিক করে দেবে।

সব কথা শুনে আমাকে তুই ঘেন্না করছিস না তো ?

অজয় হাসলো, বলল—বোকার মত কথা বলিস না। সরল বিশ্বাসে ভালবেসে তুই বিপদে পড়েছিস। মানুষ যতই ওপরে সভ্যতার পালিশ লাগাক, এখনো সে প্রবৃত্তির শাসন মেনে চলে, প্রবৃত্তির কাছে আমরা সকলেই অসহায়। তাছাড়া তোকে বিচার করবার আমি কে ? আমি নিজে কি এসবের ঊর্ধ্বে ?

অমিতা জিনিসটাকে কথার কথা হিসেবেই নিল। কিন্তু অজয় এডিথের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার কথা মনে করে এটা বলেছে। বিদেশে মেয়েরা শারীরিক পবিত্রতার বিষয়ে অনেক উদার, এবং তারা সাবধানীও বটে, কাজেই সেখানে সহসা এমন সমস্যার উদ্ভব হয় না। কার বিচার কে করে ?

অজয় বলল—তুই প্রভাসের সঙ্গে কোথায় কোথায় যেতিস আমাকে বল। আমি আগে একবার নিজে সব খোঁজ করে দেখি। সমস্ত ব্যাপারটার একটা সরল ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। হয়ত লোকটা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, কিম্বা বাইরে কোথাও চলে যেতে হয়েছে—

- না দাদা, তাহলে একটা খবর দিতে কি বাধা ছিল। সে নয়—

—তবুও একজন মানুষকে দোষী বলবার আগে শেষ অবধি দেখা উচিত।

অমিতা আর কিছু বললো না বটে, কিন্তু সে মনে মনে বুঝে গিয়েছে প্রভাস আর ফিরবে না, সে চিরকালের জন্য চলে গিয়েছে।

অজয় বলল—বাবা-মাকে কিছু জানানোর প্রয়োজন নেই। তবে প্রভাসকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমি যা বলবো নির্দ্বিধায় তা করতে হবে। রাজি?

অমিতা মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালো।

· চল, বাড়ি যাই। রাত হয়ে আসছে।

ওরা দু'জনে উঠে বেরুবার গেটের দিকে এগুলো।

অজয়ের এক পুরনো বন্ধু আজকাল ফোটোগ্রাফির ব্যবসা করে। নিজের বাড়ির একতলার ঘরে ডার্করুম আর স্টুডিও করেছে। তবে স্টুডিওতে বেশি লোক ছবি তোলাতে আসে না, বন্ধুর বিয়ে-থাওয়া বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ছবি তুলে দিয়ে আসে। তাতে লাভ বেশি।

গ্রে স্ট্রীট থেকে একটা সরু গলি ঢুকেছে বাঁদিকে, সে গলির ভেতরে বন্ধুর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অজয় ডাকলো—বিশু! বিশ্বজিৎ—

বিশ্বজিৎ বোধহয় ভেতরে কোনো কাজ করছিল, বেরিয়ে এসে অজয়কে দেখে অবাক হয়ে বলল—আরে, তুই! কবে এলি? আয়, ভেতরে আয়—

ঘরের ভেতরে একটা বড় কাজ করার টেবিল, তার ওপর অজস্র কাগজপত্র রিটাচ্ করবার রং আর তুলি, একটা নিকন এবং একটা ন্যাশনাল ভিডিও ক্যামেরা। ঘরের একটা অংশ প্লাইউডের পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা। সেখানে প্রিন্টিং আর ডেভেলপিং-এর কাজ হয়। চেয়ারের ওপর থেকে একগোছা ছবির খাম টেবিলে রেখে চেয়ারটা অজয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ বলল—বোস এখানে। কবে এসেছিস? একটা খবর পেলে তো আমি নিজেই দেখা করতে চলে যেতাম। বরাবরের মত চলে এলি, না আবার ফিরে যাবি?

এই প্রথম এ প্রশ্নে অজয়ের বিরক্তি এল না। সে বলল—এখনো কিছু ঠিক করতে পারি নি। এমন অনেক কোম্পানি আছে চলে এলে আমাকে লুফে নেবে। কিন্তু তাহলে আমার গবেষণার কাজের ক্ষতি হবে। তুই তো বুঝিস, এদেশে রিসার্চের কোনো সুবিধে নেই, অন্তত আমেরিকার মত নয়। এদিকে বাবা-মা ক্রমশ বুড়ো হচ্ছেন, বাবার এর মধ্যেই একটা মাঝারি স্ট্রোকও হয়ে গিয়েছে। বোন আজ বাদে কাল বিয়ে হয়ে চলে গেলে বাবা-মাকে দেখবে কে? বড় প্রব্লেম রে—

বিশ্বজিৎ হেসে বলল—প্রব্লেম আবার কি? ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে আয়। বুড়ো বয়েসে নাতি-নাতনিকে গল্প করবার মত যথেষ্ট ফরেন বেড়িয়েছিস। বাইরে থাকলে শেষকালে শান্তি পাবি না। আমার এক দূরসম্পর্কের পিসেমশাইয়ের ওরকম হয়েছিল। প্রথমে মোহে পড়ে ফিরতে চায় নি, লন্ডনের মফঃস্বলে বাড়ি করে, মেম বিয়ে করে সে এক সরগরম কাণ্ড। পরে যখন ভুল বুঝতে পেরে ফিরতে চাইল তখন শেকড় এমন গভীরে চলে গিয়েছে যে, তাকে উপড়ে আনা কঠিন। মনের কষ্টে ভুগে ভুগে শেষে পিসেমশাই বিলেতেই মরে গেল। মেমসাহেব আর খোকাখুকিরা এদেশে কোনোদিন এল না। ব্যস, বংশের একটা ধারা লোপাট'

অজয় বলল—তোর কাছে একটা খবরের জন্য এসেছিলাম বিশু। তুই তো

ছবি তোলার লাইনে আছিস, প্রভাস সেন বলে কাউকে চিনিস?

ভুরু কুঁচকে বিশ্বজিৎ বলল—প্রভাস সেন? মনে করতে পারছি না তো! কি করে? ফ্রি-ল্যান্স ফোটোগ্রাফার?

—ঠিক জানি না। তবে রেইনবো এণ্টারপ্রাইজ বলে নতুন একটা ভিডিও ফিল্ম তোলার কোম্পানির সঙ্গে জড়িত বলে শুনেছি-

—ভিডিও ছবি তোলার কোম্পানি? তাহলে আমি বলতে পারবো না, ওসব বড় বড় ব্যাপার, আমি বিয়ে-পৈতে-জন্মদিনে ছবি তুলে বেড়াই। তবে খবর নিতে পারি। খুব জরুরী দরকার? কি ব্যাপার বল দেখি?

অজয় বলল—ব্যাপারটা একেবারেই পার্সোনাল। যদি প্রয়োজন হয় তোকে নিশ্চয় বলবো, তবে এখন নাই বা শুনলি -

—ও কে ফ্রেণ্ড, কাল এই সময় আমার এখানে চলে আয়, আমার একজন চেনা লোক আছে, সে এই লাইনে সব খবর রাখে, আমি আজই তার কাছে যাচ্ছি—

পরের দিন অজয় আবার বিশ্বজিতের কাছে গেল।

বিশ্বজিৎ টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে একগোছা ছবির চারধার কেটে সমান করছিল। বন্ধুকে দেখে বলল- এসে গেছিস? খবর পেয়েছি—

—খবর খারাপ না ভাল?

সেটা নির্ভর করে লোকটাকে তোর কেমনভাবে প্রয়োজন তার ওপর। যদি প্রভাসের সঙ্গে পার্টনারশিপে জাল নোটের ব্যবসা খুলতে চাস তাহলে অত্যন্ত উপযুক্ত লোক এবং এটা তোর পক্ষে ভাল খবর। যদি তার সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে চাস তাহলে খবরটা ঠিক উল্টো, এমন হারামজাদা পাজী লোক দুনিয়ায় নেই—

অজয় চমকে তাকাতে, বিশ্বজিৎ বলল—সরি, ওভাবে বলাটা আমার উচিত হয় নি, আমি ঠাট্টা করছিলাম। আসলে খবর নিয়ে জানলাম রেইনবো এণ্টারপ্রাইজ নামে কোনো কোম্পানি নেই, আর প্রভাস সেন নামে একজন পাখোয়াজ ছেলে ওই লাইনে ঘুরে ঘুরে লোক ঠকিয়ে বেড়ায়। ফিল্মের জগতে এরকম বহু লোক আছে, যারা ইণ্ডাস্ট্রীর সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু চকচকে চেহারা নিয়ে ভালো জামাকাপড় পরে সরল বিশ্বাসী ইয়ং ছেলেমেয়েদের মাথায় হাত বুলোয়। কাউকে বলে অভিনয়ের চান্স পাইয়ে দেবে, কাউকে বলে ফিল্মে গান গাইবার সুযোগ করে দেবে। কারো কাছ থেকে টাকা নেয়, কারো কাছ থেকে অন্যরকম সুযোগ গ্রহণ করে। প্রভাসের একটা বিশেষ খেলা হচ্ছে কোনো সুন্দরী অল্পবয়েসের মেয়েকে প্রেমের অভিনয় করে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া, তারপর তাকে বিপদে ফেলে কেটে পড়া।

অজয়ের গলা শুকিয়ে এসেছিল, সে জিজ্ঞাসা করলো—এখন প্রভাস কোথায়?

—কেউ বলতে পারছে না। মাঝে মাঝে কোলকাতা তার পক্ষে গরম হয়ে উঠলে সে ডুব দেয়, আবার সবদিক ঠাণ্ডা হলে হয়ত দু'-তিন বছর পরে ফিরে আসতে পারে। ইদানীং কিছুদিন একজন অল্পবয়েসী মেয়ের সঙ্গে প্রভাস ঘোরাঘুরি করছিল, তাকে সম্ভবত ফাঁসিয়েছে। টাকা-পয়সা মেরেছে অনেকের কাছ থেকে। বহুলোক তার খোঁজে নাকি ঘোরাঘুরি করছে। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে প্রভাস সময় থাকতে কেটে পড়েছে। তার আর খবর পাওয়া যাবে না মনে হয়।

অজয় কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলো, তারপর বলল—বিশু আমি কেন

লোকটার খোঁজ করছি সে কথা প্রয়োজন হলে জানাবো বলেছিলাম। এখন সে প্রয়োজন হয়েছে। যে মেয়েটির সঙ্গে প্রভাস ইদানীং ঘনিষ্ঠতা করেছিল বলে শুনেছিস, সে আমারই বোন অমিতা। অমিতা খুব বিপদগ্রস্তা।

বিশ্বজিৎ প্রথমে কিছুক্ষণ এমনভাবে ছবির ধার কেটে যেতে লাগলো যেন সে অজয়ের কথা শুনতেই পায় নি, তারপর হঠাৎ কাজ বন্ধ করে বলল—যেভাবে ভাবছি তোর বোন কি সেভাবেই বিপদগ্রস্তা?

অজয় বন্ধুর দিকে তাকালো। বলল—হ্যাঁ।

—কি করবি ভাবছিস?

—অমিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরে চিন্তা করবো, আপাতত আসন্ন বিপদটা থেকে রেহাই পাওয়া দরকার। আমি অনেকদিন ভারতে থাকি না, তেমন কাউকে চিনিও না। তোকে হেল্প করতে হবে ভাই—

বিশ্বজিৎ বলল—দিন দুই বোনকে নিয়ে বাইরে থাকতে পারবি? আমার এক বন্ধুর নার্সিং হোম আছে, সে ভাল ডাক্তার। আমি তাকে বলে রাখব, সে কোনো প্রশ্ন করবে না। বাড়িতে বোঝানোর ভার তোর—

—ঠিক আছে. সামনের শুক্রবার সকালেই আমি অমিতাকে নিয়ে যাবো, তুই যোগাযোগ করে রাখিস। ঠিকানাটা দে—

ঠিকানা লেখা কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে বেরুবার সময় অজয় একটু থমকে দাঁড়ালো, বিশ্বজিতের একখানা হাত ধরে বলল—তোর এই উপকার আমি ভুলবো না

উত্তরে বিশ্বজিৎ তার হাতে একটু চাপ দিলো।

রাত্তিরে খেতে বসে অজয় বলল—বাবা, অমিতার জন্য একটা সম্বন্ধ ঠিক করেছি কোলকাতায়। শুক্রবার মেয়ে দেখাতে হবে—

ভূপতি অবাক হয়ে বললেন—তাই নাকি? কই, আগে বলিস নি তো?

—আজই ঠিক হল। কোলকাতায় যে বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম সেই দিল খবরটা।

—পাত্র কি করে?

—পাত্র? ইয়ে, পাত্র ব্যাঙ্কে কাজ করে। সে সব ঠিক আছে। কিন্তু মেয়ে তারা এখানে এসে দেখবে না, কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখাতে হবে। পাত্রের বাবার শরীর খুব খারাপ, তিনি এতদূর আসতে পারবেন না, অথচ তাঁকে না দেখালেও নয়। ঠিক করেছি যে বন্ধু খবরটা দিয়েছে তার বাড়িতেই দেখিয়ে দেব। তোমার প্রথমে যাবার দরকার নেই, যদি কথা এগোয় তাহলে পাত্রের বাড়ি নিয়ে যাবো—

ভূপতি বললেন—দেখ, যা ভালো বুঝিস—

খাওয়ার পরে অজয় অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। একটু বাদে তাকে মশলা দিতে এলো অমিতা। জার্মান সিলভারের ছোট কাজকরা কৌটো থেকে সুপুরির কুচি আর লবঙ্গ অজয়ের হাতে দিয়ে বলল—দাদা, শুক্রবার তুই আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি? তুই কি প্রভাসের কোনো খোঁজ পেয়েছিস?

একমুহূর্ত ইতস্তত করে অজয় বলল—না।

—তাহলে?

—অমি, তুই আমাকে কথা দিয়েছিস আমি যা বলবো তাই শুনবি। কোথায়

যাচ্ছি এখন তোর জেনে লাভ নেই, শুক্রবার বেরিয়ে বলবো—

অমিতা চুপ করে রইলো।

গাঙ্গুলিবাড়ির হুলো বেড়ালটা পাঁচিলের ওপর দিয়ে মাছের কাঁটার লোভে তাদের রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছে। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ. একটু ঝুঁকে পড়লে মেঘের ফাঁকে চাঁদ দেখা যায়। অজয় সিগারেটে শেষ টান দিয়ে পাঁচিলের ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অমিতা বলল—আমি বুঝতে পেরেছি। ইস্, আমার জন্য তোকে কি না করতে হচ্ছে! আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না দাদা—

অজয় বলল—পাগলের মত কথা বলিস না। যা, শুয়ে পড় গিয়ে। তোর লজ্জার কোনো কারণ নেই। এ পৃথিবীতে যে পাপ করে সে ভালো থাকে. তার ফল ভুগতে হয় ভালো মানুষদের। আর আমার কথা বলছিস? আমি তো পুরুষ-মানুষ. এত কম বোঝায় পুরুষের ঘাড় কুঁজো হয় না। দায়িত্ব সব আমার. তুই নিশ্চিন্তে ঘুমো

শুক্রবার সকালে অমিতাকে নিয়ে কোলকাতায় গেল অজয়। বাড়ি ফিরলো রাত দশটায়। ভূপতি দেরি দেখে মনে মনে অস্থির হচ্ছিলেন, বললেন কি রে. এত রাত হল কেন? খুকি কই?

—মেয়ে দেখা হয়ে গিয়েছে বাবা। অমির হঠাৎ দুপুর থেকে খুব জ্বর এসেছে. জ্বর গায়েই মেয়ে দেখানো হল—কি আর করা যাবে! এখনো প্রায় একশো তিন জ্বর, আমি আর নিয়ে আসতে সাহস করলাম না—

ভূপতি ব্যস্ত হয়ে বললেন—সে কি! খুকি কোথায় রইলো তাহলে?

—তুমি ভেবো না, আমার বন্ধুর মা তার কাছে বসে আছেন। আমিও থেকে যেতাম. কিন্তু তোমাদের একটা খবর না দিলে নয়। গাঙ্গুলিদের ফোন নাম্বারটাও মনে করতে পারলাম না—

অপর্ণা উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন—বাড়াবাড়ি কিছু না তো?

নাঃ। ডাক্তার ডেকে দেখিয়ে দিয়েছি। বোধহয় ঠান্ডা লেগে হয়েছে। কাল সকালেই আমি চলে যাব। হয় কাল, নয়তো পরশু নিয়ে আসবো।

রবিবার বিকেলে অমিতাকে নিয়ে বাড়ি এলো অজয়। মেয়েকে দেখে ভূপতি বললেন—এঃ, দু'দিনে কি চেহারা হয়েছে তোর!

অমিতা চুপ করে রইলো। অজয় বলল—বড্ড জ্বরটা হয়েছিল কিনা! আরো দু'-একদিন বিশ্রাম করে এলে ভালো হত। তোমরা চিন্তা করবে বলে নিয়ে এলাম। একটু রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে—

অপর্ণা কেমনভাবে যেন মেয়ের দিকে তাকালেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

হপ্তাখানেকের ভেতরে অমিতা অনেকখানি সামলে উঠলো। তবে সে আর টিউশনিতে বেরোয় না. কোলকাতায় গান শিখতেও যায় না। অজয় একদিন বলল —তুই যে বাড়ি থেকে বেরুনোই বন্ধ করে দিলি, এতটা কিন্তু ভালো নয়—

—না দাদা, বেরুনো বন্ধ করবো কেন? তবে অকারণে আর ঘুরে বেড়াবো না। একটা জিনিস ঠিক করেছি, বুঝলি?

—কি রে?

—পাড়ার ছেলেমেয়েদের জন্য বাড়িতেই একটা কোচিং ক্লাস খুলবো ঠিক

করেছি। বারান্দায় ক্লাস বসবে। খুব অল্প মাইনে করবো, যাতে সবাই দিতে পারে। জনসেবাও হবে, আমার নিজের হাতখরচাও চলে যাবে। ভালো হবে না?

অজয় একটু হাসলো, বলল—ভালোই তো। যতদিন তোর পাকাপাকি কোনো ব্যবস্থা না করতে পারি ততদিন এটাই চলুক—

নার্সিং হোম থেকে অমিতাকে নিয়ে আসার আগে অজয় বিশ্বজিতের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। কথায় কথায় বলেছিল—অমির জন্য চিন্তায় আছি, বুঝলি? এই ঘটনার পর কে আর ওকে বিয়ে করবে? লুকিয়ে কিছু করারও আমি পক্ষপাতী নই—

স্টুডিওর কোণে হিটারে জল চাপিয়ে চা বানাচ্ছিল বিশ্বজিৎ। গরম জলে চায়ের পাতা ছেড়ে সে বলল—তোর প্রবলেম সলভ্ করাই তো দেখছি বর্তমানে আমার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, এটাও কি করা যায় দেখছি—

—না, আমার জন্য আর কারো কাছে তোকে ছোট হতে হবে না—

—যদি কারো কাছে ছোট না হতে হয়?

—লুকিয়ে আমি বিয়ে দিতে পারবো না। সব কথা জেনেশুনে যদি কেউ রাজি হয় তবেই—

—ধর, সব কথা জেনেশুনেই কেউ রাজি আছে?

অজয় অবাক হয়ে বিশ্বজিতের দিকে তাকালো, বলল—না বিশু, দিস্ ইজ টু মাচ্ অফ এ স্যাক্রিফাইস্ টু মেক—এ তুই করিস না—

—স্যাক্রিফাইস্ না হাতি। আসলে ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু পাগলাটে মত তো, সামাজিক নিয়মকানুন আমি মানি না। কেউ একটা ভুল করলে সে ভুলের দাগ চিরকাল গায়ে লেগে থাকে না। এখন তুই রাজি কিনা বল—

বড় হবার পর আর কখনো কাঁদে নি অজয়, তার গলার কাছটা আড়ষ্ট হয়ে এসেছিল। বাংলা সিনেমায় সাধারণত এসব হতে দেখা যায়, বিশ্বজিৎ কি সত্যিই কথাটা বলেছে?

চায়ের কাপ সামনে রেখে বিশ্বজিৎ বলল—নে, চা খা। কি ভাবছিস অত?

—বিশু, আমি বাইরে থাকলে তুই আমার বাবা-মাকে একটু দেখিস। আব—আর অমিতাকেও। এবার বছরখানেকের মধ্যেই হয়ত আমি ফিরে আসবো—

চায়ে চুমুক দিয়ে বিশ্বজিৎ বলল—ভাবিস না, আমি দেখাশুনো করবো—

দুপুরে বিভূতিভূষণের 'দেবযান' পড়ছিলেন ভূপতি। ইশারউড্ শেষ হয়ে গিয়েছে। আপাতত পাড়ার লাইব্রেরী থেকে বিভূতিভূষণের বই পর পর আনিয়ে পড়ছেন।

অজয় এসে তাঁর পাশে বসলো। তার গায়ে স্যান্ডো গেঞ্জি, পরনে ডোরাকাটা পায়জামা। সে ছেলেমানুষি গলায় বলল—বাবা, একটু সরে যাও না, তোমার পাশে একটু শুই—

ভূপতি অবাক হলেন, খুশি হলেন। ব্যস্ত হয়ে সরে গিয়ে বললেন—শো এই বালিশখানা নে। পাশবালিশ নিবি?

—বাবা, আমি ঠিক করে ফেলেছি, সামনের বছর আমি ফিরে আসছি। সব কিছু গুছিয়ে নিতে বছরখানেক লাগবে—

ভূপতি অবাক হয়ে বললেন—কিন্তু তোর কাজকর্ম? না না, তোর ভবিষ্য

নষ্ট হয়ে যাবে—

একহাতে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বালিশে মুখ গুঁজে অভয় বলল—তা হোক বাবা। তোমাদের সকলকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

॥ চার ॥

অপর্ণা

সকালে বাজার থেকে ফিরে ভূপতি অভ্যাসমত রান্নাঘরের মেঝেতে থলে উপুড় করে স্ত্রীকে তরি-তরকারি দেখাতে বসলেন। একটু বড় হবার পর ছেলেমেয়েরা তাঁর এই অভ্যেস নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করত। যত সামান্য বাজারই হোক, বৌকে না দেখানো পর্যন্ত শান্তি নেই। মাঝে মাঝে অপর্ণা বলতেন—আঃ, এখানে ঢাললে কেন? সব্জির ঝুড়িতে রাখো না, আমি গিয়ে দেখছি-

ভূপতি বলতেন—না, তুমি আগে দেখ কেমন বাজার করেছি। এই হচ্ছে আধসের সিম, এ তোমার শুট্‌কো ছিবড়েওয়ালা সিম নয় এ হল মাখম সিম, বেশি সেদ্ধ করলে গলে যাবে। এই হল একাজোড়া কাঁঠালি কলার মোচা কাল বড়ি দিয়ে ঘণ্ট কোরো তো। তারপর হাসিমুখে বেছে বেছে অনেকগুলো কাঁকরোল এক জায়গায় করে হাতে নিয়ে তুলে দেখালেন—তুমি ভাজা খেতে ভালবাস, তাই আনলাম। কেমন, ভালো না?

স্বামীর এই অভ্যেসটা অপর্ণাকে ভারি তৃপ্তি দেয়। রোজ এমন কিছু দামি জিনিস আসছে না বাজার থেকে, কিন্তু বাজার যতই তুচ্ছ হোক, ভূপতির আদরের স্পর্শটুকু অপর্ণা উপভোগ করেন।

আজও ভূপতি পুরনো দিনের মত বাজার থেকে কেনা জিনিসপত্র একটা একটা করে দেখালেন। বৌয়ের পছন্দসই সামান্য একটা কিছু রোজই আনেন, এবং সেটি চমক হিসেবে সবচেয়ে শেষে দেখান। আজ সবশেষে দুটি মাঝারি মাপের করপুঁটি মাছ বের করে ভূপতি বললেন—তোমার জন্যে এনেছি, তুমি ভালবাস—অনেকদিন পর টাটকা সরপুঁটি দেখলাম। কালোজিরে—কাঁচালঙ্কা দিয়ে তেলঝাল বানিও। খোকা-খুকিরা কাঁটাওয়ালা মাছ ভালবাসে না—ওদের জন্য ভাল আড়মাছ আছে -

অপর্ণা দেখলেন ভূপতি ঘামছেন। খদ্দরের পাঞ্জাবিটা ভিজে পিঠের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। কথা বলতে গিয়ে একটু হাঁপাচ্ছেন।

—তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে?

একটু বিস্মিত হয়ে ভূপতি বললেন—না, ঠিক শরীর খারাপ নয়—আসলে গরমটা বড্ড পড়েছে তো—

—উনুনের তাতে বোসো না। ঘরে গিয়ে জামা খুলে পাখা চালিয়ে একটু হাওয়া খাও—সরপুঁটি দুটো খুব সুন্দর হয়েছে।

দুপুরে আলুর দম হবে। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে ফেন গালবার জন্য উপুড় করে রেখে রান্নাঘরের কোণে মাটির জালা থেকে একগ্লাস ঠাণ্ডা জল নিলেন অপর্ণা, তাতে চিনি আর লেবুর রস দিয়ে সরবৎ বানালেন, তারপর উনুনে সেদ্ধ করবার জন্য আলু চাপিয়ে সরবৎ হাতে ঘরে এলেন।

জামা খুলে ভূপতি পাখার নিচে শুয়ে আছেন। অপর্ণা কাছে এসে জিজ্ঞাসা

করলেন—একেবারে শুয়ে পড়লে যে? সত্যি করে বল, শরীর কি বেশি খারাপ লাগছে?

ভূপতি কনুইয়ে ভর করে উঠে বললেন—এমন কিছু নয়। বয়েস হচ্ছে তো, রোদ্দুর থেকে এলে একটু ক্লান্ত লাগে। হাতে কি? সরবৎ নাকি? দাও—

চিনি আর লেবু দিয়ে সরবৎ খেতে ভূপতি ভালোবাসেন। গ্লাস খালি করে স্ত্রীর হাতে ফেরৎ দিয়ে বললেন—বোসো না একটু, কথা বলি—

অপর্ণা হেসে বললেন—বয়েস হচ্ছে আর দিন দিন খোকা হচ্ছ, ছেলেমেয়েরা দেখলে কি ভাববে? তাছাড়া উনুনে রান্না চাপানো রয়েছে—

—উঠোনে আমার তেলাকুচো গাছটা কেমন সুন্দর ঝাঁকালো হয়ে উঠেছে দেখেছো?

কথার গতি কোন্‌দিকে বুঝতে না পেরে অপর্ণা তাকিয়ে রইলেন।

– গাছটাকে ঠিক করে যত্ন করবে, বুঝেছো? যেন বেঁচে থাকে—

অপর্ণা আস্তে আস্তে ভূপতির পায়ের কাছে খাটের ওপর বসলেন, তারপর বললেন—তুমিই যত্ন কোরো, আমাকে বলছো কেন?

ভূপতি হেসে বললেন—বুঝেছি। শোনো, সবকিছুকে অমঙ্গল হিসেবে ধরে নাও কেন? আজ পর্যন্ত কেউ কোনো উপায়ে মৃত্যুকে ঠেকাতে পেরেছে? ওটা জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। একদিন আমরা সবাই চলে যাবো, আমাদের লোকে ভুলেও যাবে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে বেশিদিন বাঁচা খারাপ, জানো? পুরনো পরিচিত মানুষেরা কেউ থাকে না। দেখ না কেন, আমার বাবা একজন অত্যন্ত সৎ এবং বন্ধুবৎসল লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁকে মনে করতে পারে এমন কাউকে তো এখন দেখি না। কাজেই এ ব্যাপারটাকে শান্তমনে মেনে নেওয়াই ভাল।

অপর্ণা চুপ করেই বসে রইলেন।

—তারপর আসে তোমার-আমার সম্পর্কের কথা। কিছুদিন আগে বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবযান' নামে একখানা উপন্যাস পড়ছিলাম। বইখানা মৃত্যুর পরের জগৎ নিয়ে লেখা। আজকালকার মানুষ হয়ত মানতে চাইবে না, কিন্তু আমার দৃঢ়বিশ্বাস হয়েছে বিভূতিভূষণ ঠিক লিখেছেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের—অবশ্য যদি ভালোবাসা থাকে। কাজেই ভয় কি?

এত গভীর তত্ত্বের কথা অপর্ণা বোঝেন না। বিশাল মহাজীবনের সন্ধানে তাঁর প্রয়োজন নেই। তাঁর সঙ্কীর্ণ জগতের গন্ডীর মধ্যে রয়েছে ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ঘরের কোণে পাতা লক্ষ্মীর আসন, পুত্রকন্যার ভালো থাকা, স্বামীর দীর্ঘজীবন। তিনি সাধারণ মেয়ে, তিনি এইটুকুই বোঝেন। অথচ তাঁর জীবনটাই এরকম—ভালো হতে হতেও পুরোপুরি ভালো হয় না। খোকা দেশে ফিরে আসতে চায়, একথা শুনে যে আনন্দ হয়েছিল, কোলকাতা থেকে ফেরার পর মেয়েকে দেখে সে আনন্দ অনেকটা শুকিয়ে গিয়েছে। অমিতাকে দেখে ইদানীং মনের মধ্যে কেমন একটা বিশ্রী সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল। স্বামী পুরুষমানুষ, তারপর আপনভোলা লোক, তিনি আর কি বুঝবেন? কিন্তু মাকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়। তারপর কোলকাতায় মেয়ে দেখাতে যাওয়া—কেমন যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না। শরীর খারাপ নিয়ে মেয়ে ফিরলো। জ্বর থেকে উঠলে যেমন হয়, এ তেমনি না। হয়ত বিপদের কথা মা-বাবাকে বলতে পারে নি, দাদাকে বলেছে। যাক, এ নিয়ে ভাবতেও ভয়

করে। বিপদ কেটে গিয়ে থাকলেই মঙ্গল। জানলেই মনের অশান্তি।

সংসার বড় বিচ্ছিরি জায়গা। কোনো মনের সাধ এখানে পুরোপুরি মেটে না। ছোটবেলায় তাঁর নেকড়া দিয়ে তৈরি দুটো পুতুল ছিল, দিদিমা বানিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাণের চেয়েও প্রিয় ছিল পুতুল দুটো। একটা ছেলে, আর একটা মেয়ে। সারাদিন রাংতা, রঙিন শাড়ির টুকরো, পুঁতির মালা—এইসব দিয়ে তাদের সাজাতেন। অজয় আর অমিতা যখন বাচ্চা, তখন অপর্ণার মনে হত ছোটবেলার সেই পুতুল দুটোই যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সময় যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারছেন ছেলেমেয়ের ওপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আর নেই। ইচ্ছেমত তাদের চালনা করতে পারেন না, কথা শোনাতে পারেন না।

তার ওপর ভূপতির এইসব ভয় দেখানো কথা!

কয়েকদিন ধরে অজয় তাঁকে কিছু একটা বলতে চাইছে, কিন্তু বলে উঠতে পারছে না। কি বলবে খোকা? দিন পাঁচ-সাত আগে, অজয় তখন অমিতাকে নিয়ে কোলকাতায় গিয়েছে, ছেলের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখতে গিয়ে ডায়েরির মধ্যে অপর্ণা একটি বিদেশী মেয়ের ছবি দেখেছেন। ছবির পেছনে ইংরেজিতে কি সব লেখা, তিনি পড়তে পারেন নি। কার ছবি ওটা? আইবুড়ো ছেলের কাছে সযত্নে রাখা কোনো মেয়ের ছবি পাওয়া গেলে তিনি মনে করেন তার একটাই মানে হয়। অন্তত তাঁর সময়ে তাই হত। এই নিয়েই কি অজয় কিছু বলতে চায়? নইলে তার এত দ্বিধা কেন? মেয়েটাকে দেখতে ভাল লাগে নি, বাঙালী মেয়েদের মত কেউ কি আর দেখতে সুন্দর? খাটো ঝুলের পা বের করা ফ্রকমত পরে মেয়েটা একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে হাসছে।

না, সংসারে সত্যিই পুরোপুরি সুখ কখনো আসে না।

অমিতার যাই হয়ে থাকুক, সে এখন ভালো আছে। আবার হাসছে, কথা বলছে। খোকারও কি করে যেন মন ঘুরে গিয়েছে, হয়ত সে দেশে ফিরে আসবে। কিন্ত সঙ্গে করে এই ছবির মেয়েটাকে নিয়ে এলে তিনি মেনে নিতে পারবেন না। তিনি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে মেনে নিলেও ভূপতি খুব দুঃখ পাবেন। মুখে কিছু বলবেন না বটে—সেরকম মানুষই তিনি নন—কিন্তু ভেতরে ভেতরে একেবারে ভেঙে যাবেন।

তার চেয়ে অজয় না বলতে পারলেই ভাল।

অজয় যখন সবে কলেজে ঢুকেছে, তখন থেকেই অপর্ণা মনে মনে ভাবতেন - ছেলে উপযুক্ত হলেই অল্পবয়েসে তার বিয়ে দেবেন। অল্পবয়েসী, সুন্দরী, ছিপছিপে চেহারার একটি নম্রমুখী বৌ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে, তাঁকে রান্নায়, ঘরের কাজে, সত্যনারায়ণ পুজোর গোছগাছে সাহায্য করছে—এই ছবিটা প্রায়ই দেখতে পেতেন। আজকাল মেয়েদের স্বাধীনতা বলে কি একটা হুজুগ উঠেছে বাজারে—জিনিসটা তিনি বুঝতে পারেন না। মেয়েরা নাকি আর বাড়ির গণ্ডীর মধ্যে আটক থাকতে চাইছে না। কিন্তু এর ভেতরে বন্দীদশা কোথায়? আর স্বাধীনতাতেই বা কে হাত দিচ্ছে? তিনি তো সারাজীবন স্বামীকে যত্ন করে, ঘরের কাজ করে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করে কখনো নিজেকে পরাধীন ভাবেন নি, কোনো কষ্টও পান নি। ভূপতির সংসারে কোনো নিষেধ ছিল না, অপর্ণা যেখানে ইচ্ছে গিয়েছেন, নিজের ইচ্ছেমত কাজ করার অধিকার পেয়েছেন। সংসারের বিষয়ে

কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার সময় ভূপতি সর্বদা স্ত্রীর মত জিজ্ঞাসা করতেন। তাহলে কষ্ট কোথায়? আমার নিজের সংসার, আমার স্বামী পুত্র, আমি তাদের জন্য করবো না? স্বামী যেমন বাইরে পরিশ্রম করছেন, স্ত্রীও তেমনি সংসারে। দু'জনেই চাকরি করতে বেরিয়ে গেলে সংসার ভেসে যাবে যে! মায়ের আদর, বাপের স্নেহ না পেলে ছেলেমেয়ে কি মানুষ হয়?

না, আধুনিক মেয়ে নয়। অজয়ের জন্য লক্ষ্মী, ঘরোয়া বৌ আনবার ইচ্ছে তাঁর। এখন যদি বা ছেলে দেশে ফিরবে বলে মনে হচ্ছে, তার কাছে বিদেশী মেয়ের ছবি কেন? ছেলেকে কি একবার বুঝিয়ে দেখবেন?

নাঃ। আগে অজয় মুখফুটে বলুক। তাঁর তো ভুলও হয়ে থাকতে পারে।

ছেলের ফিরে যাওয়ার দিন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। আর মাত্র এক সপ্তাহ। তারপর আবার কতদিনের জন্য সে চলে যাবে বহুদূরে। বুড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে সময় যেন হু-হু করে কেটে যেতে থাকে। ছোটবেলায় এক একটা বছর কাটতে চাইত না। অপর্ণার বাপের বাড়ি নদীয়া জেলায় নাকাশীপাড়ার কাছে এক গ্রামে। কি সুন্দর ছিল সেই গ্রাম! এখনো চোখ বুজলে স্বপ্নের মত ছায়ায় ভরা আম-কাঁঠালের বাগান, ঘুঘু ডাকা দুপুরবেলার বাঁশবন, ঘেঁটু আর আসশেওড়ার জঙ্গলের ভেতর দিয়ে প্রাণের বন্ধু মনোরমার বাড়ি যাবার সুঁড়ি পথটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মনোরমাদের বাড়ির দাওয়ায় বসে পুতুল খেলতে খেলতে দু'জনে হিসেব করতেন পুজোর আর কতদিন বাকি আছে। দু'মাস—একমাস বাইশ দিন একমাস দশদিন—দিন আর কাটে না। বাবা কৃষ্ণনগরে চাকরি করতেন, পুজোর সময় তিনি গোয়াড়ী বাজার থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন জামাকাপড় কিনে আনবেন। তার চেয়েও বড় আনন্দ—বাবাকে দশ-বারোদিন কাছে পাওয়া যাবে। তারপর দীর্ঘ উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষার পর বাবার হাত ধরে বারোয়ারীতলায় ঠাকুর দেখতে যাওয়া। বুকের গভীরে ব্যথার একটা মোচড়ের সঙ্গে অনুভব করেন—সেসব দিন আর ফিরবে না। বাবা-মা মারা গিয়েছেন কবেই! সম্পত্তি ভাগ হয়ে জ্ঞাতিরা বেদখল করে নিয়েছে। বড়ভাই থাকে বর্ধমান জেলার গুসকরাতে। হাঁপানিতে শয্যাগত, উঠে-চলে বেড়াবার ক্ষমতা নেই। ছোটভাই রেডিমেড জামাকাপড়ের দোকান দিয়েছে তমলুকে। আসা-যাওয়া বিশেষ নেই, মাঝেমধ্যে চিঠিপত্র দেয় এই পর্যন্ত। বাপের বাড়ির সঙ্গে এজন্মের মত সম্পর্ক চুকে গিয়েছে। হারানো দিন আর ফেরে না।

যাবার আগের দিন রাত্তিরে খেতে বসে অজয় বলল—মা, আমি ঠিক করেছি মাস চারেক পরে বাবাকে কিছুদিনের জন্য আমার ওখানে নিয়ে যাবো। আমি প্লেনের টিকিট পাঠিয়ে দেবো, ওখানে এয়ারপোর্টে আমি এসে রিসিভ করে নেবো। মাস দুই থেকে বাবা ফিরলে তারপর তোমাকে নিয়ে যাবো, কেমন? কোনো ভয় নেই, বাবা প্লেনে তুলে দেবেন, আমি নামিয়ে নেবো—

অপর্ণার মন তৃপ্তিতে ভরে গেল। তিনি বললেন—তুই নিয়ে যেতে চাইছিস, এই আমাদের কত। তোর বাবাকে নিয়ে যা—আমি মেয়েমানুষ, আমার বিলেত বেড়ানোর সখ নেই। তুই ফিরে এসে আমার কাছে থাকলেই আমি খুশী—

—না মা, তুমিও একবার ঘুরে আসবে চলো। এ সুযোগ তো বারবার আসে না। আমি ফিরে এলে আর কোনোদিন যাবো কিনা তারও ঠিক নেই। বাবার

পরেই তুমি যাবে—

যাওয়ার দিন সকালে অজয় নিজেই গিয়ে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আনলো। ভূপতি ছেলেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবেন বলে তৈরি হলেন। অজয় বলেছিল—তুমি আর কেন কষ্ট করে যাবে বাবা? বিশ্বজিৎ বলে আমার এক বন্ধু এয়ারপোর্টে আসবে, সেই হেল্প করে দেবে এখন। তুমি থাকো—

ভূপতি অটল। তিনি যাবেনই।

অজয় বলল—ঠিক আছে, চলো। ট্যাক্সিটা আমি ধরে রেখে দেবো। ওতে করেই তুমি ফিরে আসবে।

ছেলেকে দইয়ের ফোঁটা কপালে পরিয়ে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অপর্ণা চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। অজয় বলল—মন খারাপ করছো কেন মা? এবার তো আর বেশিদিন না—মাত্র এক বছর।

অজয়ের গাড়ি চলে যাবার পর সমস্ত শূন্য। ঘরদোর, আসবাবপত্র সবই ঠিক আছে, তবু চারদিকে এক অপরিসীম শূন্যতা। আগামী এক বছরের আগে তা আর কোনোভাবেই পূর্ণ হবার নয়।

বিকেল তিনটের মধ্যে ভূপতির ফেরবার কথা। চারটের সময় অপর্ণা একটু ব্যস্ত হয়ে মেয়েকে বললেন—তোর বাবা এখনো ফিরলো না কেন বল দেখি

—চিন্তা কোরো না মা, ফ্লাইট অনেক সময় দেরি করে ছাড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে এখন।

পাঁচটা। ছ'টা।

সংসারে পুরোপুরি সুখ কখনো আসে না। অপর্ণার মনের মধ্যে আসন্ন দুঃসংবাদের ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন কি খবর আসছে—তাঁর মন বলছে, এতো ভুল হবার নয়। আজই কিনা খোকা চলে গেল। সে থাকলে - অবশ্য, তার প্লেন ছাড়বার আগেই যদি ভূপতির শরীর খারাপ হয়ে থাকে—বাবার এমন অবস্থা দেখলেও কি সে প্লেনের টিকিট ফেরৎ দেবে না? ভগবান করুন, তাই যেন হয়ে থাকে—

কিম্বা যদি একেবারেই খারাপ হয়' সেজন্যেই হয়ত দেরি হচ্ছে—

সাতটা।

অপর্ণা বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বাতাসে কেমন একটা অস্বস্তিকর বন্ধভাব। বুক যেন চেপে ধরে।

তেলাকুচোর লতাটা বারান্দার থাম জড়িয়ে উঠতে শুরু করেছে এবার। আজ সকালের তাড়াহুড়োতে ভূপতি জল দিতে ভুলে গিয়েছেন। গাছের গোড়ার মাটি খটখটে শুকনো।

কি সব ভয়ানক অমঙ্গলের চিহ্ন! হাঁপিয়ে উঠে বাথরুমের বড় প্ল্যাস্টিকের মগ ভর্তি করে জল এনে অপর্ণা গাছটার গোড়ায় ছিটিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে লাগলেন।

ঠিক সেই সময়ে বাড়ি ঢুকলেন ভূপতি, সঙ্গে অজয়েরই বয়েসী একটি ছেলে।

জলের মগ হাতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অপর্ণা, ভূপতি সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—এই সন্ধ্যেবেলা গাছে জল দিচ্ছ যে?

বিভীষিকা থেকে ত্রাণ পাবার স্বস্তি, ধরা পড়বার লজ্জা ইত্যাদি মিশ্র অনু-

ভূতির দোলায় দুলতে দুলতে অপর্ণা বললেন—তোমার এত দেরি হল যে?

—কি আর করব? আসবার সময় রাস্তায় যা জ্যাম! দেড় ঘণ্টা চুপ করে গাড়িতে বসে। এ হচ্ছে আমাদের খোকার বন্ধু, একসঙ্গে পড়ত। খোকা আলাপ করিয়ে দিয়ে গেল। এর নাম বিশ্বজিৎ, ভারি ভালো ছেলে। খোকা না ফেরা পর্যন্ত বিশ্বজিৎ আমাদের দেখাশুনো করবে—

ছেলেটি হাসিমুখে বলল—তার পরেও, মেসোমশাই—

অমিতা একবার বাইরে এসেই বিশ্বজিৎকে দেখে ঘরের মধ্যে পালিয়ে গেল।

ভূপতি বললেন—চলো বাবা, ঘরে গিয়ে বসবে চলো। তুমি দেখ ওকে কি খেতে দেবে—

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসবার আগে অপর্ণার মনে হল—কে ছেলেটা? খোকার তো কত বন্ধুই ছিল, কাউকে তো স্বামী এত আদর করে বাড়িতে নিয়ে আসেন নি? খুকিই বা ছেলেটাকে দেখে এমন করে দৌড়ে পালালো কেন? সারা সন্ধ্যেটা ভূপতি তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হেসেছেন। অপর্ণার ঘোর সন্দেহ হল সংসারে বাপ-ছেলে আর মেয়ে মিলে কি একটা ষড়যন্ত্র চলেছে, একমাত্র তিনিই কিছু জানেন না। ভারি অভিমান হল অপর্ণার।

এমন সময়ে বই বন্ধ করে বেড-সুইচ টিপে আলো নেভালেন ভূপতি। স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে বললেন—ঘুমোলে নাকি? এদিক হও—তোমাকে আজ একটা চমৎকার আনন্দের খবর দেব।

সমাপ্ত